উৎসর্গ

কাঙ্ য়ূ-ওয়ে ও লিয়াঙ্ চি-চাও,

তোমরা অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছ। এই জন্যই তোমরা যুবক এশিয়ার প্রণম্য।

হয়ত বা তোমাদের জীবন এক বিরাট পরাজয়ের মহানাট্য দেখাইতে দেখাইতেই ফুরাইয়া আসিবে। কিন্তু নবীন চীনের গোড়াপত্তনে তোমরাই প্রথম শিল্পী। এই কারণে দুনিয়ার কর্ম্মবীর ও ভাবুক সমাজ তোমাদিগকে নবতন্ত্রের পথ-প্রবর্ত্তকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে।

সেই সম্বর্দ্ধনায় যোগ দান করিয়া যুবক ভারতও অগ্রণী-বীরদের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

নিবেদন

এই গ্রন্থ লেখা শেষ হইয়াছে ১৯১৬ সালের জুন মাসে। তাহার পর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই পাঁচ বৎসরে দুনিয়ার সর্ব্বত্র অনেক ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাব চীনেও পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য সেই প্রভাবের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। তাহার জন্য নূতন পর্য্যটনের আবশ্যক।

এক হিসাবে যাহা পর্য্যটকের ডায়েরি মাত্র আর এক হিসাবে তাহাই সভ্যতা-বিজ্ঞানের বা মানব-তত্ত্বের মশালা বা উপকরণ। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলা সমাজ-বিজ্ঞানের রসদ জোগাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক ভ্রমণ-কাহিনীরই এক অংশ বিবরণ মাত্র। পর্য্যটক চোখে যাহা দেখিতেছেন, কাণে যাহা শুনিতেছেন অথবা কেতাবে যাহা পড়িতেছেন তাহা সঠিক বর্ণনা করার দিকে তাঁহার প্রথম ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। অপরদিকে বিবৃত বস্তুগুলার ব্যাখ্যা করা এবং সমালোচনা করার ঝোঁকও কম বেশী সকল লেখকেরই থাকে। এই ব্যাখ্যা-সমালোচনার তরফটা অর্থাৎ কোনো সভ্যতাকে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার ধরণ-ধারণটা লেখক মাত্রেরই নিজস্ব। এইখানেই "নানা মুনির নানা মত"।

সম্প্রতি চীনাতথ্যের কথা বলিতেছি। যাঁহারা আমার "Chinese Religion through Hindu Eyes" পড়িয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সেই গ্রন্থে কনফিউশিয় মত, শিন্তো, মহাযান, এবং

পৌরাণিক-তান্ত্রিক-হিন্দু ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনাসম্বন্ধে যে সকল ইঙ্গিত বা বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রাচীন এশিয়া-বিষয়ক কোনো গ্রন্থেই বোধ হয় পাওয়া যায় না। আবার, "বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য" গ্রন্থে পুরাণা ও নয়া চীনের জীবনধারাসম্বন্ধে যে সকল টীকা টিপ্পনী বা বিশ্লেষণ সমালোচন প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলির ভিতরও অন্য কোনো চীন-বিশেষজ্ঞের আলোচনাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। মতগুলা স্বচিন্তিত ও স্বাধীন,—কতখানি গ্রহণীয় তাহা বিচারের বিষয়।

যে চোখে "বর্ত্তমান জগৎ" দেখিয়া বেড়াইতেছি তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পরিষ্কার করিয়া কোথাও লেখা হয় নাই। যাঁহারা এই গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলা মাসিকপত্রের মধ্যে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেক ধানাই-পানাইয়ের ভিতর সেই চোখটাও হয়ত আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। এটাকে বোধ হয় গোটা "যুবক এশিয়ার" চোখ বলিতে পারি। ইংরেজিতে শিকাগোর International Journal of Ethics নামক ত্রৈমাসিকে (জুলাই ১৯১৮) "Futurism of Young Asia" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার ভিতর যুবক এশিয়ার আলোচনাপ্রণালী বা তর্ক-বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে দেখানো হইয়াছে।

এই "লজিক্" বা যুক্তি সমাজ-বিজ্ঞায় প্রবর্ত্তিত হইলে সভ্যতা-বিজ্ঞান কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে তাহারও কথঞ্চিৎ নমুনা দিয়াছি। আমেরিকার ক্লার্ক-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of International Relations ত্রৈমাসিকের (জুলাই ১৯১৯) "Americanization from the Viewpoint of Young Asia," শিকাগোর Open Court মাসিকের (নবেম্বর ১৯১৯) "Confucianism, Buddhism and Christianity", এবং এলাহাবাদের Hindustan Review মাসিকের (সেপ্টেম্বর ১৯২০) "Comparative Politics from

Hindu Data*, এই তিনটা প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। Love in Hindu Literature (Tokyo, 1916) এবং Hindu Art: Its Humanism and Modernism (New York 1920) এই পুস্তিকা দুইটাও দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায় "প্রবাসী"তে, কয়েক পৃষ্ঠা "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন"-এ এবং একটা প্রবন্ধ (তাজা ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন) "গৃহস্থ"য় বাহির হইয়াছিল। অধিকাংশই পূর্ব্বে কোনো কাগজে ছাপা হয় নাই। কতকগুলা ছবি "প্রবাসী" আফিস হইতে পাওয়া গিয়াছে। সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থও তাঁহারই আনুকূল্যে প্রকাশিত হইল।

চীনসম্বন্ধে লেখকের অন্যান্য রচনা নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

1. "The Democratic Background of Chinese Culture" (The Scientific Monthly, January 1919, New York).
2. "The Fortunes of the Chinese Republic" (The Modern Review, September, 1919, Calcutta).
3. "Political Tendencies in Chinese Culture" (*Ibid*, January 1920).
4. "The Beginnings of the Republic in China" (*Ibid*, August 1920).
5. "The Pen and the Brush in China" (The Asian Review, October 1920, Tokyo).

6 "The International Fetters of Young China" (The Journal of International Relations, January 1921, Clark university).

কাঙ্ ও লিয়াঙ, ইঁহারা গুরু ও শিষ্য। দুই জনেই আবার নবীন চীনের স্রষ্টা। তাঁহাদের নামের সঙ্গেই এই গ্রন্থ জড়িত থাকুক।

প্যারিস, ফ্রান্স
৯ মার্চ্চ, ১৯২১

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচী

বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য

প্রথম অধ্যায়

দেওয়ালবহুল মহানগর

১। মুকডেন হইতে পিকিঙ্

সন্ধ্যার গাড়ীতে পোর্ট-আর্থার হইতে মুকডেনে ফিরিলাম। পথে ঘণ্টাখানেক ডাইরেনে থাকা গেল। এইখানে জাপানী-মাঞ্চুরিয়ার বড় বড় কর্ম্মচারী ও সেনাপতি উঠিলেন।

মুকডেন পর্য্যন্ত জাপানী কোম্পানীর রেল। সকালে চীনা গবর্ণমেণ্টের গাড়ীতে বসিলাম। মুকডেন হইতে পিকিঙ্ ৫২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ২২ ঘণ্টার রাস্তা।

জাপানী রেলে যে-সমুদয় আরাম উপভোগ করা গিয়াছে চীনা রেলে তাহা পাওয়া গেল না। চীনাদের বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

জাপান এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার মুকডেন পোর্ট-আর্থার পর্য্যন্ত রেলে শ্বেতাঙ্গ কদাচিৎ চোখে পড়ে। মুকডেনের পর দেখিতেছি গাড়ীভরা শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনী। ইঁহাদের ভিতর পর্য্যটক বেশী নাই—প্রায় সকলেই চীনে কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। ভারতবর্ষে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি যেমন একপ্রকার শ্বেতাঙ্গদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, চীনেও এই দৃশ্যই দেখিতেছি। দু একজন চীনাকে প্রথম শ্রেণীতে দেখিলাম—কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত নিষ্প্রভ। ভারতবর্ষেও প্রথম শ্রেণীর দেশী আরোহিগণের অবস্থা এইরূপই। অধিকন্তু গাড়ীতে গার্ড একজন

শ্বেতাঙ্গ। ষ্টেশনে ষ্টেশনে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর দুই চারিজন দেখিতে পাইতেছি। চীনে শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব আছে—জাপানে বিন্দুমাত্রও নাই। এইজন্যই শ্বেতাঙ্গেরা চীনাদিগকে আদর করে। শুনিলাম, যে পথে চলিতেছি তাহার মূলধন জোগাইয়াছেন ইংরেজ "লক্ষপতিগণ"।

মাঞ্চুরিয়ার উর্ব্বর সমতল প্রান্তরের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। মাঝে মাঝে নদী পার হইতেছি। ভারতীয় দৃশ্য মনে পড়ে। কোথাও কোথাও নদীর বন্যায় সেতু বাঁধ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। কয়েক দিন হইল একটা বড় নদীর উপদ্রবে বহু পল্লীর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। শুনিলাম, অনেক মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। রেলে বসিয়া বন্যার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল।

এই-সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত জনপদ ছিল না। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পর হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নগর নানাস্থানে গড়িয়া উঠিতেছে। একটা বড় সহরের নাম সিন্-মিন-ফু। ইহা মুকডেন হইতে বেশী দূরে নয়। আর একটা প্রসিদ্ধ সহর চিন্-চো-ফু। ইহা অতি প্রাচীন নগর। গাড়ীতে বসিয়াই দেখিলাম একটা সুদীর্ঘ গোলাকার প্যাগোডা নগরের স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে তাং-বংশীয় সম্রাটগণের আমলেও মাঞ্চুরিয়ার এই নগর সুপরিচিত ছিল। অদ্যাপি মাটির প্রাচীর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উপসাগরের অশ্ব-পৃষ্ঠে-দ্রুত রেলপথ বিস্তৃত। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্বসীমা আরম্ভ হইয়াছিল অ্যান্টুঙে। এইবার পশ্চিম সীমাও অতিক্র[illegible] করিতে হইল। ইহার পর শান-হাই-কোয়ান নগরে গাড়ী থামিল[illegible] মুকডেনের পর এত বড় সহর আর নাই। এই নগরের পূর্ব্ব প্রা[illegible] হইতে চীনের অব্যাহত [illegible] "গ্রেট ওয়াল্" বা "বিরাট প্রাচীর" বা[illegible] হইয়াছে। এই দেওয়াল[illegible] চীনের উত্তর সীমা বলা যাইতে পা[illegible]

কারণ মঙ্গোলিয়ার দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে চীন্-বংশীয় সম্রাট শি-হুয়াঙতে এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। নগরে সমুদ্র এবং পর্ব্বত উভয়ের প্রভাবই বিরাজমান। প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরও দৃষ্ট হয়।

পরদিন প্রত্যূষে টিন-সিন নগরে পৌছিলাম। এতবড় সহর ও বন্দর চীনে বেশী নাই। শাংহাইয়ের পরেই ইহার প্রতিপত্তি। এইখানে প্রায় সকল শ্বেতাঙ্গই নামিয়া গেলেন। বিরাট আফিস, কারখানা, চিম্নি, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়া চীনে আধুনিকতার পরিচয় পাইলাম। আর ৩।৪ ঘণ্টার ভিতর গাড়ী পিকিঙে আসিয়া পৌছিল।

আন্টুঙ হইতে পিকিঙ পর্য্যন্ত কোথাও ধান্যের চাষ দেখি নাই—কিন্তু কোরিয়ায় ফুসান হইতে আন্টুঙ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ধান্যক্ষেত্র চোখে পড়িয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিকে ভুট্টা বজরা ও কাওনের ক্ষেত দেখিতেছি। শত শত মাইল ধরিয়া এই একধরণের শস্যশ্যামল ভূমি দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। সাতশত মাইল পাটের জমি কিরূপ দেখাইবে? সেইরূপ একঘেয়ে দৃশ্যই আন্টুঙের পর হইতে পাইতেছি।

ইটের বা মাটির দেওয়াল, প্রাচীরবেষ্টিত পল্লী বা নগর, টিকিওয়ালা পুরুষ ও নীলবসনাবৃত নরনারী, ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছি জাপানের আবেষ্টন বহুকাল ছাড়াইয়া আসিয়াছি। জাপানী দৃশ্যের মধ্যে এক্ষণে আছে কেবল খোলার ছাদ। লোকজনের আকৃতি এখানে কিছু অধিকতর দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট।

চীনারা ষ্টেশনে ভাজাডিম, সিদ্ধ মুরগী, কাটা ফলমূল ইত্যাদি বেচিতে আসে। জাপানী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌষ্ঠবজ্ঞান চীনাসমাজে দেখিতেছি না। নাউ, কুমড়া, পদ্মচাক, আঙ্গুর, তরমুজ, শশা ইত্যাদি নিজিনিষ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। সন্ধ্যাকালে এবং সকালে সমগ্র

রজনীগন্ধার গাছ লইয়া মালীরা ষ্টেশনে বেচিতে আসে। রুটি পাকৌড়ি ইত্যাদিও বিক্রয় হইতেছে।

পিকিঙ্ পৌছিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটা উচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া চলিলাম। এখান হইতে প্রাচীরের প্রভাব আরম্ভ হইল।

২। প্রথম দিবস—চীনের দুর্দ্দশা

আজকাল নজর বড় হইয়া উঠিতেছে। কাজেই পিকিঙ্ দেখিবামাত্র একটা অপরিষ্কার নগরের দৃশ্য চোখে পড়িল। প্রকাণ্ড ফটকের সম্মুখে রেলওয়েষ্টেশন। গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে আসিলাম।

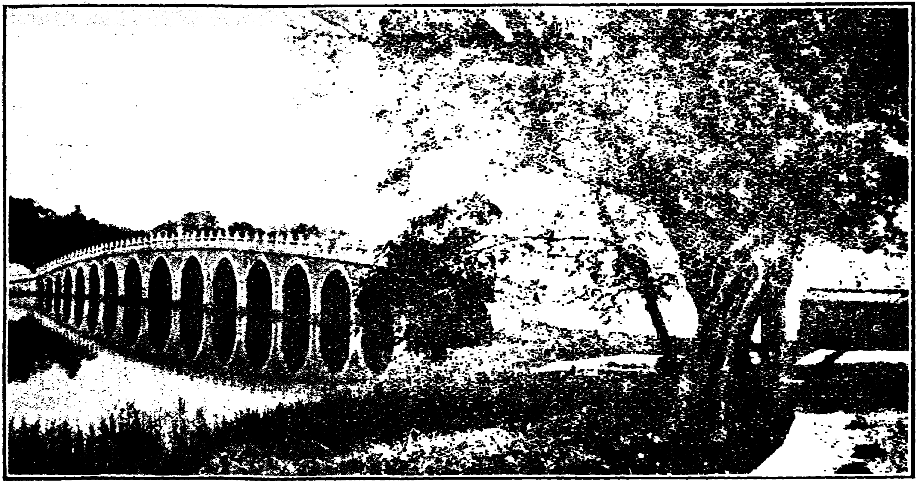
আবার যেন কায়রোতে ফিরিয়া আসিয়াছি। হোটেল বিদেশীয় মহাজনগণের মূলধনে, বিদেশীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহাই চীনের সর্ব্ব-বিখ্যাত হোটেল। ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মাণ ইত্যাদি নানাদেশীয় অংশী-দারেরা সমবেত হইয়া হোটেল চালাইতেছেন। ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হইবার পর জার্ম্মাণগণকে হোটেলের কর্ত্তৃত্ব হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চীনারা এখানে সেবক মাত্র। দুই একজন চীনা অতিথিও দেখিলাম। কিন্তু জাপানের হোটেলসমূহে ইয়োরামেরিকানগণের যে দুরবস্থা দেখিয়াছি চীনা "স্বরাজের" প্রধান নগরের ইণ্টার্ন্যাশন্যাল হোটেলে চীনা অতিথি-গণের সেই দুরবস্থা দেখিতেছি। শ্বেতাঙ্গ নরনারীগণ এখানে মহা আনন্দে উল্লাসে কালাতিপাত করিতেছেন। চীন ইহাঁদের ভোগভূমি—জাপান ছাড়া এশিয়ার সকল জনপদই ইহাঁদের ভোগভূমি।

হোটেল যে পাড়ায় অবস্থিত তাহার নাম "লেগেশন" মহাল্লা। এই এই অঞ্চলে ইয়োরামেরিকার সকল রাষ্ট্র এবং জাপান তাঁহাদের প্রতি-নিধিগণের আফিস, লেগেশন, দূতকার্য্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন।

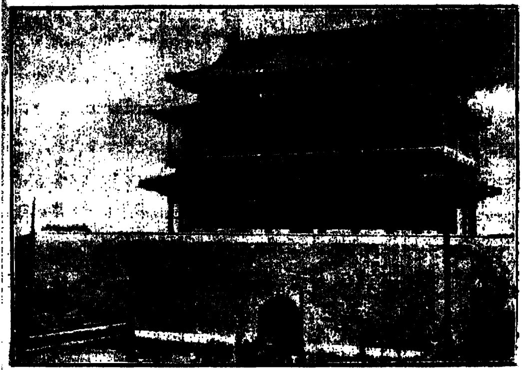


পিকিংএর উত্তর দরওয়াজা



মর্ম্মর সেতু,—গ্রীষ্ম-ভবন (পিকিঙ)

তাঁহাদের পল্টনও এই অঞ্চলে রক্ষিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই পাড়াটা চীনা স্বরাজের বহির্ভূত; চীনারাষ্ট্রের কোন এক্তিয়ার এই স্থানে নাই। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগো ইত্যাদি বড় বড় নগরে জার্ম্মাণ মহাল্লা,



আভ্যন্তরীণ দেওয়ালের এক ফটক।

চীনাটোলা, পোলটুলি, ইহুদিবাজার ইত্যাদি যে ধরণের, পিকিঙের এই "দূত-মহাল্লা" সেই ধরণের নয়—ইহা একটা বিদেশী পাড়া মাত্র নয়। এই অঞ্চলকে বিদেশী-মুল্লুক বলা উচিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে "বক্‌সার" বা কুস্তীগির নামধারী চীনা স্বদেশসেবকগণ চীন হইতে বিদেশীয়দিগকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। তাহার ফলে দেখিতেছি বিদেশীয়েরা চীন জুড়িয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে। হায় চীন!

এইরূপ বিদেশী-মুল্লুক চীনের প্রত্যেক নগরে নগরেই আছে। সাধারণতঃ এই ধরণের বিদেশীয় ভোগভূমিকে "কন্‌সেশন" বলা হইয়া থাকে। জাপানীরা বহুকাল এই অত্যাচার স্বদেশে সহ্য করিয়াছে। এক্ষণে

তাহারা প্রবল—কাজেই অন্যান্য ইয়োরামেরিকানদের মতন জাপানীরাও চীনের বুকে বসিয়া নানাপ্রকার "অধিকার" ভোগ করিতেছে।

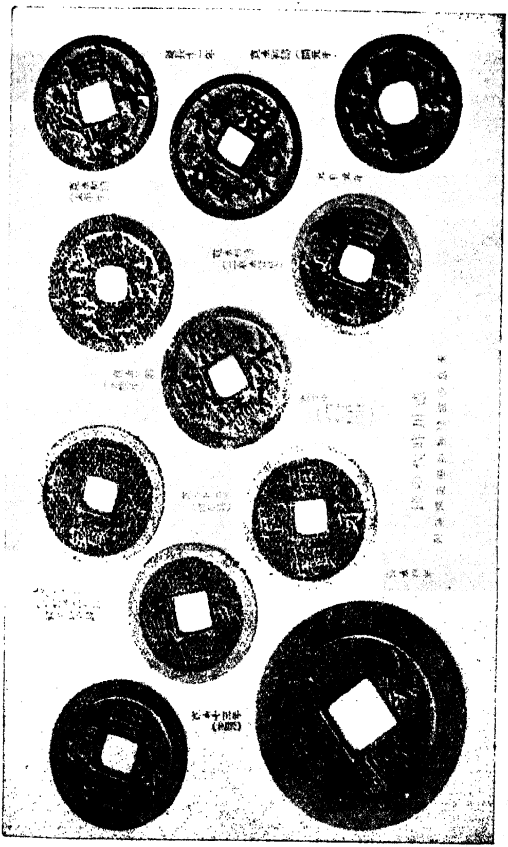
নব্য ধরণের অট্টালিকার কোনটা ব্যাঙ্ক, কোনটা কাছারীঘর, কোনটা ব্যারাক। সর্ব্বত্রই বিদেশীর প্রভুত্ব। চীনাদের গতিবিধিও এই অঞ্চলে নাই। কেবল অট্টালিকাগুলির সম্মুখে চীনা রিক্শ-কুলী দেখিতে পাই।

দুনিয়ার আর কোথাও বিদেশীয় রাষ্ট্রের পোষ্ট-আফিস আছে কিনা জানি না। চীনের বড় বড় নগরে জাপান, ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মাণ, রুশ ইত্যাদি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য চীনা ডাকঘরও আছে। চীনা "স্বরাজের" বা স্বাধীনতার মূল্য কতখানি তাহা এই বিদেশীয় পোষ্ট-আফিসের অস্তিত্বেই বেশ প্রমাণিত হয়। শুনিতেছি চীনারা ডাকঘরের উন্নতিবিধানে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছে। কালে হয়ত বিদেশী পোষ্ট-আফিস থাকিতে দিবার আবশ্যকতা দূরীভূত হইবে।

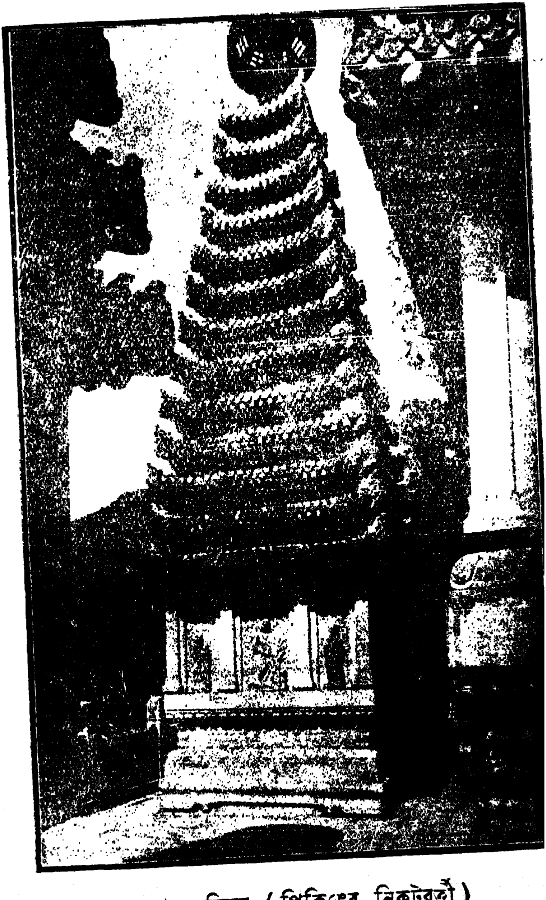
চীনের টাকা পয়সা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। এক এক নগরে এক এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন। মুদ্রার মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। আধুনিক চীনের সর্ব্ব অঙ্গেই ঘা। চীনের দুর্দ্দশা ঘুচিবে কি ?

চীনদেশের বিরাট প্রাচীর সম্বন্ধে গল্প ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। প্রাচীর-বেষ্টিত নগর বা পল্লী কিরূপ হয় তাহা অনেকেরই জানা আছে। পিকিঙে আসিতে আসিতে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ বিরাট প্রাচীরের কোণ ঘেঁষিয়া আসিয়াছি। মুক্‌ডেনে প্রাচীর-বেষ্টিত নগর দেখা হইয়াছে। পিকিঙ-নগরেরও একটা প্রাচীরের কিয়দংশ রেলে বসিয়াই দেখিয়াছি।

রাস্তায় বাহির হইয়া বুঝিতেছি—পিকিঙ একটা প্রাচীর-বেষ্টিত নগর



প্রাচীন চিনের মুদ্রা



তাও-মন্দিরে (পিকিঙের নিকটবর্ত্তী)

মাত্র নয়। এই নগরের সর্ব্বত্রই প্রাচীর দেখিতে পাই। যেখানে যাই সেইখানেই হয় মন্দিরের প্রাচীর, না হয় প্রাসাদের প্রাচীর, না হয় সাধারণ গৃহের প্রাচীর, না হয় দূত-কার্য্যালয়ের প্রাচীর, না হয় নগরের প্রাচীর—সর্ব্বত্রই উচ্চ দুর্গদেওয়াল-স্বরূপ বেড়া চোখে পড়ে। সমস্ত সহরটাই যেন দেওয়ালে-ভরা। তাহার উপর নগরটা স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—প্রকোষ্ঠগুলি এক-একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর। প্রত্যেক নগরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রথমে রাজপ্রাসাদ। ইহা একটা নগর বিশেষ। ইহার ভিতর উচ্চ কর্ম্মচারী বা ম্যাণ্ডারিন এবং পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ইহার নাম "নিষিদ্ধ পুরী"। ইহা দেওয়ালে ঘেরা। "নিষিদ্ধ পুরী"র চারি প্রাচীরের বাহিরে আর একটা নগর। তাহার নাম "রাজ-নগর"। ইহার চতুর্দ্দিকেও প্রাচীর। তাহার চারিদিকে আর একটা নগর। এই নগরকে তাতার বা মাঞ্চুনগর বলা হয়। তাতার-নগরের প্রাচীরই পিকিঙ মহানগরীর সর্ব্ববহিঃস্থ আবেষ্টন। তাতার-নগরের দক্ষিণে আর একটা নগর তাহাকে বলা হয় চীনা-নগর। এই চীনা-নগরের উত্তর-প্রাচীর এবং তাতার-নগরের দক্ষিণ-প্রাচীর একই। অপর তিনদিকে তিনটা প্রাচীর। কাজেই দেওয়ালভরা মহানগরের যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকেই দেওয়াল দেখি। কোন উচ্চস্থান হইতে মুসলমান-নগরের সাধারণ দৃশ্য দেখিলে যেমন গম্বুজ, মিনারেট, মস্জিদ্ ইত্যাদিই চোখে পড়ে, কোন হিন্দুনগরের চিত্রে যেমন মন্দির মঠ ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পিকিঙের বিশেষত্ব তাহার দেওয়াল ও ফটক।

জলের কল পিকিঙের সর্ব্বত্র নাই। রাস্তায় কোণে কোণে পাতকুয়া, ইঁদারা ইত্যাদি দেখিতেছি। বালতিতে করিয়া রাস্তায় জল ছিটান হইতেছে। আমরা আমাদের দেশে শীতকালে গাঁদা ফুল দেখি, এখানে

ভাদ্রমাসের ভরা গরমেও গাঁদাফুলের মালা বিক্রয় হইতেছে। জাপানীদের যেমন কোন বিশেষ শিরস্ত্রাণ নাই, চীনাদের মাথায়ও সেইরূপ কোন আবরণ দেখি না। জাপানী ও চীনা জাতিদ্বয় এই হিসাবে বাঙ্গালী। চীনাদের মাথায় লম্বা চুলের বেণী আজও বিরল নয়। অবশ্য ইহা মাঞ্চুদের খাঁটি স্বদেশী আবিষ্কার। চীনা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষুদ্র চরণযুগল মুকডেন, এমনকি সিউল হইতেই দেখিতেছি। ইহারা রাস্তায় হাঁটে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অসহ্য গরম—রাস্তায় ধূলাবালির দৌরাত্ম্য—তাহার উপর "রেতে মশা দিনে মাছি।" গলিতে গলিতে ঘুরাফিরা করিলাম। রিকৃশ ও গাধায়-টানা শ্যাম্পানি এই দুই যানের ব্যবহার বেশী। দুই একখানা ঘোড়ার ল্যাণ্ডো এবং ট্যাক্সি গাড়ী কখনও কখনও দেখা যায়। সন্ধ্যার সময়ে রিকৃশতে লোকজনের গতিবিধি বাড়িতেছে। বড় রাস্তা বেশী নাই। ইলেক্‌ট্রিক বাতির আয়োজন আছে। কোন রাস্তায় ট্রাম নাই।

তোকিও, কিয়োতো ইত্যাদি নগর দেখা থাকিলে মধ্যযুগের প্রাচ্য এশিয়া সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। এই নগরদ্বয়ের আধুনিক অংশ বর্জ্জন করিলে মধ্যযুগের চীনা সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার সুস্পষ্ট চিত্র পাইতে পারি। চীনের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই জাপানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কাজেই জাপানে চীনের জিনিষই দেখিয়াছি। তবে জাপানীরা চীনা মালের উপর ঘষিয়া মাজিয়া খানিকটা নূতন জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতে এক অভিনব সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু "মেজি"যুগের প্রভাবে জাপানে নব্য আলোক প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু পিকিঙে সেই মধ্যযুগের মামুলি ব্যবস্থাই দেখিতেছি, তাহার উন্নতি আর হয় নাই। বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকার আবিষ্কারসমূহও এখানে বিরল। এই কারণে শিষ্যকে দেখিয়া যত আনন্দ পাইয়াছি স্বয়ং গুরুর

গৃহে আসিয়া তত পাইতেছি না—পাইব কিনা সন্দেহ, এমন কি অনেকটা হতাশ ও দুঃখিতই হইতে হইবে বুঝিতেছি।

যাহা হউক, অলিগলি, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার, লোকজনের চলাফেরা ইত্যাদি পিকিঙে যেরূপ, জাপানের নগরে নগরে তাহারই অনুকরণ দেখিয়া আসিয়াছি। মোটের উপর, কায়রো, তোকিও, পিকিঙ্—প্রাচ্য-জগতের সকল নগরেই একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই-সকল ধরণধারণ ইয়োরামেরিকার কুত্রাপি নাই। বাঙ্গলাদেশে মধ্যযুগের নগর একটাও নাই বলিলেই চলে। আজকালকার ঢাকা মুরশিদাবাদ মুসলমানী আমলের সাক্ষ্য বেশী দেয় না। তবে উত্তর ভারতে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর ইত্যাদি নগরে মধ্যযুগের এশিয়া খানিকটা বুঝা যায়। সেই মধ্যযুগই পিকিঙেও দেখিতেছি বলা যাইতে পারে। দিল্লীর লোক চীনাদের ভাষা বুঝিবে না। কিন্তু পিকিঙে আসিলে অন্যান্য সকল বিষয়ে ভারতীয় দৃশ্যই দেখিবে। দিল্লীতে নিউইয়র্কে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কিন্তু পিকিঙে কায়রোতে, দিল্লীতে কিয়োতোতে প্রভেদ অতি সামান্য মাত্র।

রাত্রিকালে একটা চীনা হোটেলে আহার করিতে গেলাম। চীনে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। এ কথা বোধ হয় অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর জানা আছে। কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস চীনে মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার সম্বন্ধে "মডার্ণরিভিউতে" একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আর কোন ভারতবাসী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। যাহা হউক আজ চীনা মুসলমানের হোটেলে আহার করা গেল। অবশ্য সাজসজ্জা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি দেখিয়া বৌদ্ধ, কন্‌ফিউশিয়ান বা মুসলমান চীনাদের মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব। আমার দোভাষী মহাশয় খৃষ্টান মতাবলম্বী।

প্রথমেই গরম জলে তোয়ালে ভিজাইয়া মুসলমান ভৃত্য টেবিলের

সম্মুখে রাখিয়া গেল। মুখ মুছিয়া আহারে বসা এখানে রীতি। চপ-ষ্টিকও আসিল। তাহার পর নানাপ্রকার ফলমূল ও শাকসব্জীর আয়োজন। দুগ্ধহীন চিনিহীন গরম চা'র সঙ্গে কুমড়ার বীজভাজা খাইতে পাইলাম। নানাপ্রকার বীজভাজা চীনারা খাইয়া থাকে। ধনিয়ার শাক, শিঙ্গারা, কেশুর, বাদাম সিদ্ধ, আখরোট ভাজা, পদ্মচাকার বীজ ইত্যাদি নিঃশেষ হইলে খাঁটি ভারতীয় রুটি পাওয়া গেল। রুটি আমার ফরমায়েস অনুসারে আসে নাই। চীনারা এই রুটিই খাইয়া থাকে। নূতন তরকারির মধ্যে খাইলাম কচি বাঁশের বা কঞ্চির ঝোল, খাইতে মন্দ না। মাছমাংস ছিল, গ্রহণ করিলাম না।

হোটেলে প্রবেশ করিবার সময়ে এক উচ্চ চীৎকার শুনিয়াছিলাম। আহার করিতে বসার পর এইরূপ চীৎকার বহুবার শুনিতে পাইলাম। দোভাষী বলিলেন—"মহাশয়, ভয় পাইবেন না। অতিথি গৃহে প্রবেশ করিলে চীনারা এইরূপে অভিবাদন করিয়া থাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরূপ ডাকাতের ডাক কেন ?" ইনি বলিলেন—"হোটেলের ম্যানেজার চীৎকার দ্বারা জানান যে একজন আসিয়াছেন। অমনি যে যেখানে আছে সকলে সমস্বরে চীৎকার করে।"

জাপানী খাদ্য খাইয়া পেট ভরে নাই। চীনা আহার্য্য-দ্রব্য ভারতবাসীর রপ্ত হওয়া সহজ।

চীনে স্বরাজ বা রিপাব্লিক বোধ হয় আর টিকিল না। চীনা সমাজে নানাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা রাজতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছে। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্টই বোধ হয় সম্রাট হইবেন।

৩। দ্বিতীয় দিবস—বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউশিয়ান মন্দির

দেবতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, পাপতত্ত্ব, পুণ্যতত্ত্ব, স্বর্গ-নরকতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা বর্ত্তমান জগতের কোথাও নাই। বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয়

জীবনেই নব্য মানবের চরম বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। যীশু, মহম্মদ বুদ্ধ, ব্রহ্মা ইত্যাদি জীব শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। ইহাঁদের প্রভাবে কোন ব্যক্তির বা জাতির জীবন বিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয় না। ধর্ম্মচর্চ্চা গতানুগতিক ভাবে চলিয়া যাইতেছে। তবে ইয়োরামেরিকার জাতিগুলি জীবিত, এইজন্য উহাদের মন্দির গীর্জ্জা ইত্যাদিতে সকল-প্রকার জীবন্ত অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়ে। এশিয়ার জাতিপুঞ্জ নির্জ্জীব, কাজেই এখানকার মসজিদ মন্দির মঠে অনেক সময়ে ঘর ঝাড়িবার লোকও দেখা যায় না। এই যা প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশীয় জনগণের জীবন হয় পলিয়ামেণ্টে, না হয় বিজ্ঞান-মন্দিরে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই; অবনত এশিয়ার জীবন না দেব-মন্দিরে, না বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রকটিত। ইয়োরামেরিকায় মানব-জীবনের ধারা কোন-না-কোন কেন্দ্রে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু পরাধীন এশিয়ার মানব জীবনহীন অস্থিকঙ্কালসার নিস্পন্দ "ফসিল" বা জীবন্মৃত মাত্র। এই জনপদের যেখানে যেখানে খানিকটা চৈতন্য, কর্ম্মপ্রবণতা বা উদ্দীপনা বা জাগরণ লক্ষ্য করি সেখানে ইয়োরামেরিকারই খানিকটা ছায়া দেখিতে পাই মাত্র। স্বদেশী এশিয়ার কোথাও জীবনবত্তা নাই। নব্য জাপান এই হিসাবে এশিয়ার বহির্ভূত।

চীন একটা প্রকাণ্ড "ফসিল"। লেগেশন-মহাল্লায় ইয়োরামেরিকার এবং জাপানের জীবন অনুভব করিতেছি। এই বিদেশী মুলুক পার হইয়া একবার স্বদেশী পিকিঙে পদার্পণ করিলে চীনাদের যে তিমির সেই তিমিরই দেখিতে পাই। নবজীবনের উষা কোথাও কোথাও কিছু কিছু উঁকি মারিতেছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর একটা নিঝুমের পালা। পিকিঙের সর্ব্বত্র মধ্যযুগই বিরাজমান। ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে সেই মধ্যযুগ জমাইয়া রহিয়াছে। যথাকালে এই-সমুদয় কেন্দ্রেই মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইত। আজ এখানে কেবল ইট কাঠ চূণ সুরকি মাত্র পড়িয়া

রহিয়াছে। অনেক মন্দিরে মাত্র ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই—সকল মন্দিরেই আগাছা-পরগাছা বনজঙ্গল জন্মিয়াছে। মন্দির সংস্কার করিবার জন্য লোকজন এবং অর্থব্যয় অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে। এইজন্যই বলিতে হয় মন্দিরগুলি প্রাচীন জীবনের স্মৃতিস্তম্ভ মাত্র—পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য বিষয় মাত্র। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এখানে কিছুই পাইবেন না।

পিকিঙে এইরূপ দুইটা বড় "ফসিল" দেখিয়া আসিলাম। একটার নাম লামা-মন্দির অপরটার নাম কন্‌ফিউশিয়ান মন্দির।

চীনা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তিনটা করিয়া পথ থাকে। এই হিসাবে চীনা ফটকগুলির সঙ্গে অন্য দেশীয় ফটকের সাদৃশ্য নাই। লামা-মন্দিরের ফটকে তিনটা স্বতন্ত্র ছাদ, মধ্যবর্ত্তী ছাদ উচ্চতর। ইনামেলের টালিতে ছাদ নির্ম্মিত। মুক্‌ডেনেও এই টালির ব্যবহার দেখিয়াছি। ছাদের কিনারায় সয়তান-বিদ্বেষী জীবজন্তুও দেখিলাম। ড্রেগনচিত্র চীনের সর্ব্বত্রই অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

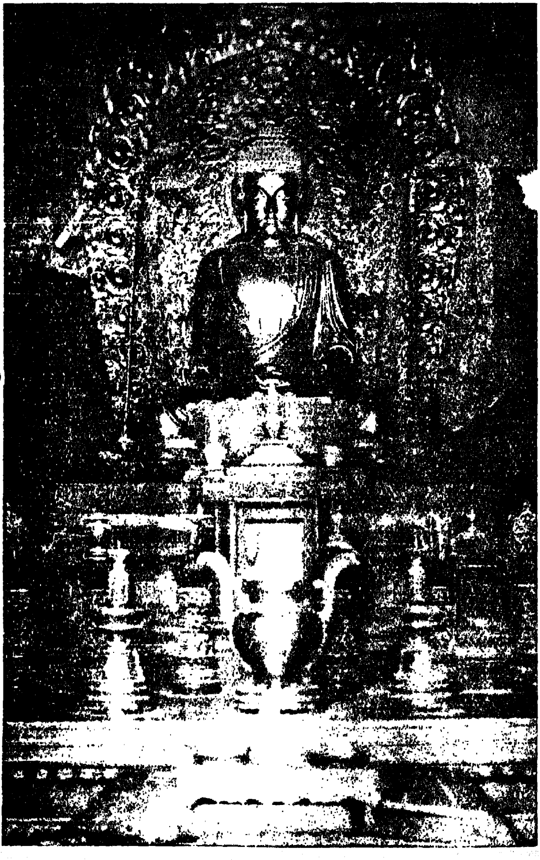
মন্দিরটা পূর্ব্বে প্রাসাদ ছিল। তৃতীয় মাঞ্চু সম্রাট ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাসাদকে মন্দিরে পরিণত করেন। তিব্বত হইতে সমাগত লামা-পুরোহিতগণের জন্য ইহা প্রদত্ত হয়। সুপ্রশস্ত সেজ-বাঁধান ৫।৬ প্রাঙ্গণে এই অট্টালিকা সম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের প্রাধান্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেক ফটক পার হইবার সময়ে দ্বাররক্ষকেরা দশ পয়সা করিয়া আদায় করে।

বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে ঘণ্টা-গৃহ এবং ঢাক-গৃহ অত্যাবশ্যক। এখানেও আছে। পিত্তলের সিংহ প্রস্তরমঞ্চের উপর দ্বাররক্ষকস্বরূপ।

মন্দিরের গৃহগুলি আমাদের সুপরিচিত শিখরবিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা নহে। প্যাগোডার আকারেরও নহে। জাপানে যেরূপ বাসগৃহ-সদৃশ সৌধগুলিই মন্দিরের জন্য ব্যবহৃত হয়, পিকিঙেও সেইরূপ। বস্তুতঃ

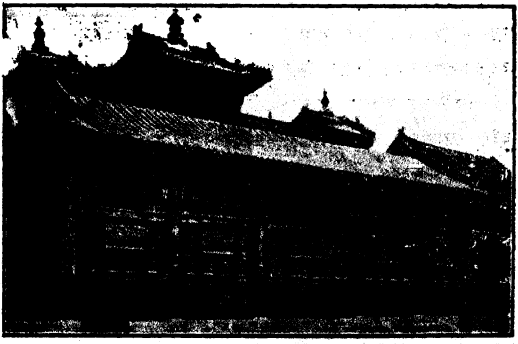


লামা মন্দির (পিকিঙ)



সৌভাগ্যদাতা বুদ্ধ,—লামা-মন্দিরে (পিকিঙ)

জাপানীদের মন্দির-রচনা চীনাদেরই অনুকরণ। তবে জাপানী গৃহের ছাদগুলি ত্রিভঙ্গিম ও বক্রাকৃতি—চীনা ছাদসমূহের রেখা সোজা ও অবক্র।



পিকিঙের লামা-মন্দির।

মন্দিরের ভিতর বুদ্ধমূর্ত্তি। সোনালি কলাই করা পিত্তলে এইগুলি নির্ম্মিত। ভারতীয় বুদ্ধের নাকচোখ দেখিলাম না। দেখিলেই মঙ্গোলীয় জাতির মুখশ্রী বুঝা যায়। প্রধানতঃ তিন-প্রকার বুদ্ধের কল্পনা চীনা-মন্দিরে দেখিতে পাই। দীর্ঘ আয়ু দান করিবার জন্য এক-প্রকার বুদ্ধ আছেন। সৌভাগ্যবিধাতা বুদ্ধ দ্বিতীয়-প্রকার, তৃতীয়-প্রকার বুদ্ধ চিকিৎসক। এতদ্ব্যতীত অমঙ্গল নাশ করিবার জন্য এবং সয়তানকে দূরে রাখিবার জন্য দ্বাররক্ষক, গৃহরক্ষক ইত্যাদি বুদ্ধ বা বুদ্ধবাহনও চীনা মন্দিরে বিরাজমান। মন্দিরের ভিতর পূজাপাঠ স্তোত্র গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে। একটা গৃহে তিব্বতী ভাষায় লিখিত পুঁথি দেখিলাম। চীনা পুঁথি সেলাই করা

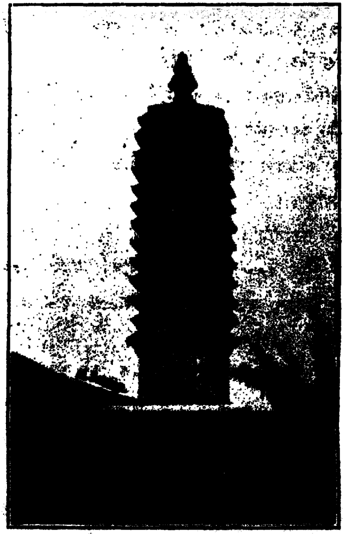
হয়। তিব্বতী পুঁথির পত্রগুলি দুইখানি কাঠের ভিতরে আলগাভাবে রক্ষিত থাকে। ভারতীয় পুঁথির আকারও এইরূপ। মন্দিরগুলির কড়ি বর্গায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। অক্ষরগুলি কিছু স্বতন্ত্র। মাঞ্চুরা তিব্বতী বৌদ্ধ-প্রভাব পিকিঙে রক্ষা করিতে যত্নবান্ ছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ ও উত্তরতম চীনে প্রচারিত হইত। সকল যুগেই তিব্বত চীনাধর্ম্মে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

একটা বড় মন্দিরে প্রায় ৪০০ শিশু, যুবক ও প্রৌঢ় লামা উপবিষ্ট হইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে। জাপানের কোয়াসান পাহাড়ে কোবো দাইশির মন্দিরেও এই ধরণের সামগানই হইয়া থাকে। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ—সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রার্থনা, উপাসনা, সঙ্গীত, স্তোত্র, "সার্ভিস্," "হিমস্" নামাজ, তপ্সির, মন্ত্র ইত্যাদি একপ্রকার। অথচ খৃষ্টান মহোদয়গণ বৌদ্ধ মন্দিরের বাক্যাড়ম্বরে বিস্মিত হন। অখৃষ্টানেরাও খৃষ্টমন্দিরের উপাসনাপদ্ধতিতে কেবল বক্তৃতা, গলাবাজি এবং কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত মাত্র শুনিতে পান! খৃষ্টানের ভক্তি অখৃষ্টান বুঝে না। অখৃষ্টানের হৃদয় খৃষ্টান বুঝে না।

অধ্যাপক ডিকিন্সন পিকিঙের এই মন্দির দেখিয়া বলিতেছেন—

"But neither here nor anywhere have I seen anything that suggest vitality in the religion. I enterd one of the temples yesterday at dusk and watched the monks, chanting and processing round a shrine. * * They began to giggle like children at the entrance of the foreigner and never took their eyes off us. Later, individual monks came running round the shrines, beating agony as though to call the atten-

tion of the deity, and shouting a few words of perfunctory praise of prayer. Irreverence more complete I



তেরো তলা বৌদ্ধ প্যাগোডা।

have not seen even in Italy, nor beggary more shameless."

ভিক্ষুকের উপদ্রব দরিদ্র দেশমাত্রেই আছে। সুতরাং চীনা-মন্দিরে ভিক্ষুকসংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপহাস না করাই সঙ্গত। কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিত বৌদ্ধ উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া যে মত প্রচার করিলেন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত খৃষ্টান-মন্দিরের ভিতর বাহির দেখিয়া সেইরূপ মতই

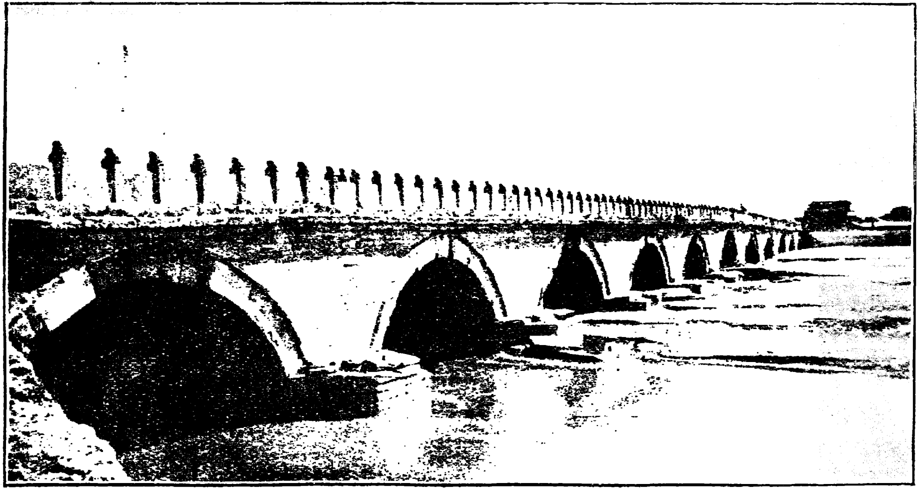
প্রচার করিবেন না কি? চোখ বুজিয়া ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিলে অথবা উচ্চকণ্ঠে বাইবেলের গৎ গাহিতে পারিলে এবং রবিবার সুন্দর পোষাক পরিয়া গীর্জ্জায় যাইবার নিয়ম থাকিলেই কি ভক্তি-প্রবণতা প্রমাণিত হয়? ভক্তি আর ভণ্ডামি বাহির হইতে বুঝা বড় সহজ নয়। অখৃষ্টান দর্শকেরা খৃষ্ট-মন্দিরে ভণ্ডামিই হয়ত লক্ষ্য করিবে।

একটা মন্দিরে সুবৃহৎ মৈত্রেয়ী মূর্ত্তি। শুনিলাম, তিব্বত হইতে এই কাষ্ঠমূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল। উচ্চতা ৭২ ফুট—গৃহের মেজেতে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ অবয়ব দেখিবার জো নাই। বিভিন্ন মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের চিত্র দেওয়ালে ঝুলিতেছে।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই লামাদিগের বাসগৃহ রহিয়াছে। এই সমুদয়ে প্রায় ৫০০ পুরোহিত বাস করে। ইহারা সকলেই অবিবাহিত। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য স্থান হইতে এই-সকল মঠবাসীর আগমন হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম ইত্যাদির প্রভাব যথেষ্ট। জাপানের ও চীনের বৌদ্ধ ধর্ম্মে আর আমাদের পৌরাণিক ধর্ম্মে বেশী প্রভেদ পাই না। তবে ক্রিয়াকলাপ হিন্দুপূজাপদ্ধতিতে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে।

জাপানে একটা নূতন ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি—তাহাতে বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অত্যল্প। তাহার নাম শিন্তো ধর্ম্ম। চীনে একটা নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের পরিচয় পাইতেছি। তাহার নাম কন্‌ফিউশিয়ান ধর্ম্ম। ইহাতে দেবতত্ত্ব একপ্রকার নাই। ভারতবাসী চীনাসমাজের আর কোন কথা না জানিলেও কন্‌ফিউশিয়াসের নাম শুনিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষের আর কোন তত্ত্ব না শুনিলেও মনুর নাম জানেন। আমরা মনু-বাক্য বলিলে যাহা বুঝি চীনারা কন্‌ফিউশিয়ান-



মার্কো পোলো সেতু,—গ্রীষ্মভবন (পিকিঙ)



কন্‌ফিউশিয়ান মন্দির (পিকিঙ)

বাক্য বলিলে ঠিক সেইরূপ বুঝে।

এই চীনা মজুর পুস্তকাদি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এতদিনে তাঁহার উপদেশানুযায়ী মন্দির দেখিবার সুযোগ ঘটিল। লামা-মন্দিরের অনতিদূরেই এই কন্‌ফিউশিয়ান মন্দির অবস্থিত।

ফটক ও কয়েকটা প্রাঙ্গণ পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইল। প্রত্যেক প্রবেশপথেই বক্‌শিশ দিতে হয়। প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ ওক-বৃক্ষ দণ্ডায়মান। বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। দোভাষী বলিলেন—"এইগুলির উপর খোদিত লিপি দেখিতেছেন। মাঞ্চু সম্রাট্‌গণের আমলে যত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম লেখা রহিয়াছে। আজকালকার স্বরাজ-প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান-শি-কাইয়ের নামও একটা প্রস্তরফলকে দেখিতে পাইবেন।" ফটকের সম্মুখেই দুইটা গৃহে বিশাল প্রস্তরকূর্ম্মের উপর এই ধরণের প্রস্তর-স্তম্ভ দেখা গেল। মুক্‌ডেনের রাজকবর দেখিতে যাইয়াও এইরূপ স্মারকলিপি-সংযুক্ত কূর্ম্ম-স্তম্ভ সাক্ষাৎ করিয়াছি। শুনিলাম মাঞ্চুসম্রাট্‌গণ কন্‌ফিউশিয়াসের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য এই-সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

মাঞ্চুরা পিকিঙে রাজধানী বসাইবার পর মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কীস্থান ইত্যাদি প্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। এই জন্য যুদ্ধে বহু সেনাপতির জীবন নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কতকগুলি স্তম্ভ আছে। এই-সমুদয় দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে দেখিলাম।

কন্‌ফিউশিয়ান মতাবলম্বীরা অনেকটা শিন্তো মতাবলম্বীদিগের মত পিতৃপুরুষগণের পূজা করিয়া থাকে। পূজার অনুষ্ঠান বিশেষ কিছু নয়—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদের নাম স্মরণ করা অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা এই ধর্ম্মের অঙ্গ। এই জন্য চীনা মজুর মন্দিরে ফলক খোদিত

লিপি, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদির বাহুল্য দেখিতেছি। কোন কোন প্রস্তরে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানী-প্রবর কন্‌ফিউশিয়াসকে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রদান করা সম্রাট্‌গণ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। আজও জাপানের মিকাদো ইজে পল্লীর শিন্তো মন্দিরে পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন।

এই মন্দির অতি পুরাতন—প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নব্য জাপানে যেরূপ শিন্তো মন্দিরগুলি সুরক্ষিত হইতেছে—পিকিঙেও দেখিতেছি কন্‌ফিউশিয়ান্ মন্দির প্রতি-বৎসর সংস্কার করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ মন্দিরগুলির দুরবস্থা জাপানে যেরূপ চীনেও তেমনি।

দোভাষী বলিলেন—"প্রতিবৎসর সম্রাট্ এই মন্দিরে পূজা করিতে আসেন। সেই সময়ে শূকরের মাংস, ভাত, শাক শব্জী ইত্যাদির ভোগ চড়ান হয়।" ভোগের জন্য মন্দিরের ভিতর টেবিল দেখিলাম, তাহার সম্মুখে বাতিদান এবং ধূপদান অবস্থিত।

কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। কাষ্ঠফলকে কন্‌ফিউশিয়াসের নাম লেখা রহিয়াছে। এই নামের সম্মুখেই ভোগ, বাতি ইত্যাদির আয়োজন হইয়া থাকে। ঘরের ভিতর দুই ধারে এই ধরণের নাম-সংযুক্ত কাষ্ঠফলক আরও অনেকগুলি আছে। দোভাষী বলিলেন—"এই সমুদয় কন্‌ফি-উশিয়াসের শিষ্য এবং প্রশিষ্যগণের নাম।" তাঁহাদের স্মৃতিফলকের সম্মুখেও ভোগবাতি ইত্যাদির সরঞ্জাম দেখিলাম।

কন্‌ফিউশিয়াসের নামফলকে চীনাভাষায় যাহা লেখা আছে তাহার অনুবাদ পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষ "কন্‌ফিউশিয়াসের আত্মা"। ঘরের ভিতর আরও কতকগুলি রচনা দেখিলাম। দোভাষী সেই সমুদয়ের ইংরেজী অনুবাদ বলিতে লাগিলেন :—

(১) Confucius is a perfect man.

(২) No such man in the world as Confucius.

(৩) Confucius is the ancestor of all Chinese sages.

(৪) Confucius is a Chinese teacher for 10,000 generations.

(৫) Virtues and tenets of Confucius cannot be compared with heaven and earth.

(৬) Education of Confucius as deep as water in ocean.

কন্‌ফিউশিয়ানেরা কোন দেবদেবীর ধার ধারে না—তাহাদের মতপ্রবর্ত্তক ঋষিবরের নাম স্মরণ করে মাত্র। এই ধর্ম্মকে বীরপূজা বলা কর্ত্তব্য। হিন্দুরা বুদ্ধ মনু সম্বন্ধে এইরূপ বীরপূজক নহে কি? কন্‌ফিউশিয়াস সম্বন্ধে চীনাদের যে স্তোত্র, মনু সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণায়ও সেই স্তোত্রই পাইব। মনু সম্বন্ধে যদি সূত্রাকারে বলা হয়—

(১) মনু একজন আদর্শ মানব

(২) মনুর সমান মানব জগতে দ্বিতীয় নাই

(৩) মনু ভারতীয় জ্ঞানিবর্গের আদিপুরুষ

(৪) মনু দশ হাজার পুরুষকাল হিন্দুজাতির ঋষি থাকিবেন

(৫) মনু-প্রবর্ত্তিত মতবাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে তুলনা নাই

(৬) মনুর পাণ্ডিত্য সাগরাম্বুর ন্যায় গভীর।

তাহা হইলে হিন্দুমাত্রই বুঝিবে যে তাহারা মনুকে এই চোখেই দেখিয়া থাকে। সমাজসংস্থাপক, নীতিপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্মোপদেষ্টা মনুকে যাহারা গুরু বিবেচনা করে তাহারা চীনা কন্‌ফিউশিয়ানদের আদর্শানুযায়ী ধর্ম্মেও আস্থাবান্। সুতরাং হিন্দুত্বে কন্‌ফিউশিয়ান মতবাদও পাইতেছি বলিতে হইবে।

ঋষি কনফিউশিয়াস যে-সমুদয় উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রধানতঃ চারি শাখায় বিভক্ত :—

(১) কর্ত্তব্য (ব্যক্তিগত ও সমাজগত) (২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক ধনোৎপাদনের নিয়ম (৩) রাষ্ট্রশাসন ও আইন-বিজ্ঞান (৪) প্রচার-কার্য্য। ভারতীয় শুক্রাচার্য্য-প্রচারিত নীতিশাস্ত্রেও এই-সকল কথার আলোচনাই আছে, তবে কনফিউশিয়াস তাঁহার মত সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য তাহা করেন নাই। কিন্তু হিন্দুসাহিত্যের যে-কোন নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, সেগুলিকে প্রচার করা পাঠকগণের একটা মহা কর্ত্তব্যই বিবেচিত হইত।

*

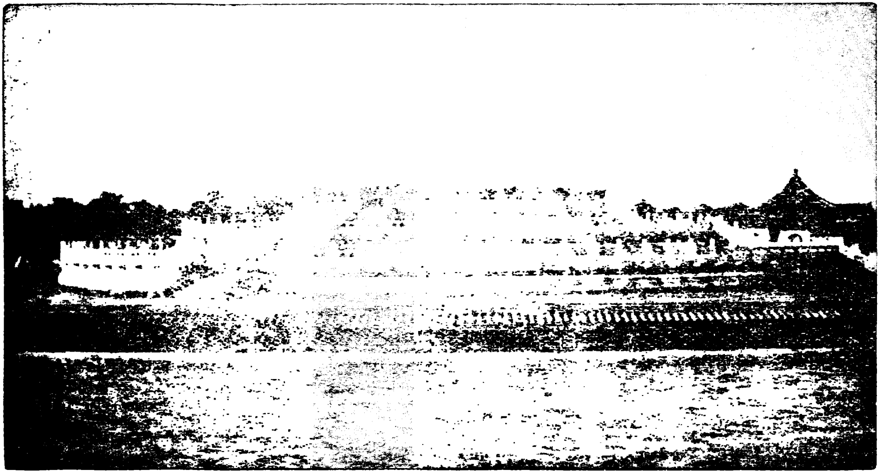
শিন্তো মন্দিরে যেরূপ, কনফিউশিয়ান মন্দিরেও সেইরূপ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, লামা সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না। কনফিউশিয়ান মতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা হাঁটু পাতিয়া মাথা নোয়াইয়া প্রার্থনা করে। সম্রাট্ হয়ত মাঝে মাঝে কনফিউশিয়াসের গুণকীর্ত্তন করিয়া গীত রচনা করিতে পারেন। এই সকল গীত গাহিয়াও ভক্তেরা আদি গুরুর বন্দনা করে।

পিকিঙের বৌদ্ধ মন্দিরে এবং কনফিউশিয়ান মন্দিরে সর্ব্বত্রই ড্রেগন-চিত্র দেখিতেছি। ড্রেগন-সর্প চীনাদের কল্পনায় স্বর্গস্থ সম্রাটের আত্মা। সম্রাজ্ঞীর আত্মা ফিনিকস্ পক্ষীর আকার গ্রহণ করে। এই দুই জীব চীনে অমর জীবনের চিহ্ন। সেইরূপ কূর্ম্ম এই দেশে দীর্ঘ আয়ুর লক্ষণ। এই জন্য চীনা শিল্পে কূর্ম্ম ড্রেগন ও ফিনিকস্ বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

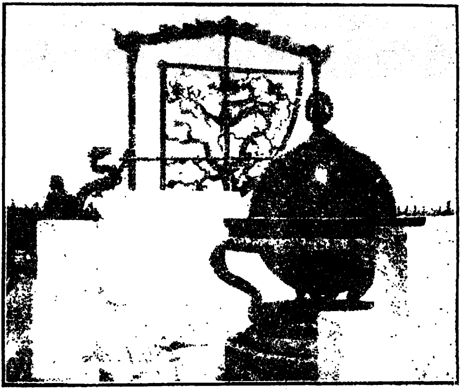
কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডকে ঢাক বলিয়া দেখান হইল। তাহাদের গাত্রে লিপি খোদিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এই "প্রস্তরের ঢাক"গুলিতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীর সম্রাট্গণের কীর্ত্তিকলাপ বিবৃত রহিয়াছে। এই সমুদয়কে ঐতিহাসিক শিলা-লিপি বিবেচনা করা উচিত।



এক বাজারের ভিড় (পিকিঙ)



বিশ্বপূজার বেদি (পিকিঙ)



পিকিঙ মান-মন্দিরের যন্ত্র

বিকালে ভাতারপ্রাচীরের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণ হইতে সমস্ত নগরের দৃশ্য দেখিতে গেলাম। এইখানে একটা মান-মন্দির রহিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম মোগল সম্রাট্ কুব্‌লা খাঁ এই "অব্‌জার্ভেটরি" প্রস্তুত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চু সম্রাটের অনুরোধে একজন ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ এই যন্ত্র-গৃহের উন্নতি বিধান করেন। গ্রহ-পর্য্যবেক্ষণালয়ের কতিপয় পিত্তলনির্ম্মিত যন্ত্র প্রাচীরের ছাদে রক্ষিত হইতেছে—কয়েকটা যন্ত্র প্রাঙ্গণেও দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—"১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমাদের বক্‌সারেরা বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। সেই সময়ে বিদেশীয়েরা পিকিঙে নানাস্থান দখল করিয়া বসে। জার্ম্মাণেরা এই মান-মন্দির হইতে কয়েকটা যন্ত্র বার্লিনে লইয়া গিয়াছে।" ফরাসী নরপতি চতুর্দ্দশ লুই একটা যন্ত্র চীন সম্রাট্‌কে উপহার দিয়াছিলেন।

এই মান-মন্দিরে চীনা সরকারের গণিতজ্ঞ বিভাগ কার্য্য করেন। এইখানে চীনা জোতির্ব্বিদ্‌গণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এক গৃহে কতকগুলি আরবী অক্ষরে লিখিত বড় বড় কাগজ দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল মধ্যযুগে বহুকাল পর্য্যন্ত আরব্য পণ্ডিতগণ পিকিঙের গণিত-চর্চ্চা বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জেসুটেরা নিযুক্ত হইতে থাকেন। একজন ফরাসী পাদ্রী কিছুকালের জন্য এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

রাত্রিকালে একটা বাজার দেখিয়া আসিলাম। বিশেষত্ব কিছু নাই। পরে একটা বাগানে বেড়াইতে গেলাম। স্বরাজ বা রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই বাগানে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। বস্তুতঃ ইহা উদ্যান নয়—মাঞ্চু সম্রাট্‌গণের একটা মন্দির এইখানে ছিল। রাজ প্রাসাদের বাহিরেই এই স্থান।

পয়সা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে হয়। বাগানের ভিতর হোটেল চিত্রগৃহ ইত্যাদি রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই গৃহগুলিই মন্দির ছিল। দলে দলে যুবক ও প্রৌঢ়গণ বাগানের নানাস্থানে বসিয়া পান ভোজন করিতেছে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরও আছে। শিক্ষিত চীনা ব্যক্তিবর্গের ইহা একটা সম্মিলন-স্থান বুঝা গেল। বাগানের বাহিরে বহুসংখ্যক রিক্‌শ দাঁড়াইয়া আছে। ল্যাণ্ডো এবং ট্যাক্‌সিগাড়ীও কয়েকখানা দেখিলাম। ধনবান্ জনগণেরও সমাগম হইয়া থাকে বুঝিতেছি।

৪। তৃতীয় দিবস—পিকিঙে তিব্বতী ও মোগল প্রভাব

এই দুই দিবস অসহ্য গরম পড়িয়াছে। দিবাভাগের ৭।৮ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকাও অসম্ভব। মাথা ধরিতেছে। হনলুলুতেও এইরূপ হইয়াছিল।

আজ হঠাৎ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বৃষ্টি। বাহিরে যাওয়া অসাধ্য। বিকালে বাহির হইলাম। পথে রিক্শ চালানও কষ্টকর। কাদা এত বেশী। ভারতীয় পল্লীগ্রামে গরুর গাড়ীর চাকা কর্দ্দমাক্ত পথে যেভাবে চলে পিকিঙের বড় রাজপথেও রিক্শ সেইভাবে চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ গলিসমূহের অবস্থা ত বর্ণনাতীত। সহরের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্তে পৌছিলাম। তাহার পর এক বিশাল ফটক অতিক্রম করিয়া পিকিঙের বহির্ভাগে আসিলাম। বলা বাহুল্য এখানে জলকাদা উভয়েরই সমাবেশ। কোথাও ডোবার জল ভাঙ্গিয়া, কোথাও কাদায় হাঁটু ডুবাইয়া কুলীরা রিক্শ চালাইতে লাগিল। বর্ষাকালে যাঁহারা গরুর গাড়ীতে মোসাফের হইয়াছেন তাঁহারা এই দৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। চীনের বর্ষাদৃশ্য দেখিতে দেখিতে জনপ্রাণিহীন প্রকাণ্ড মাঠের উপর আসিয়া পড়িলাম।

দোভাষী বলিলেন—"পিকিঙে প্রথম রাজধানী মোগল আমলে স্থাপিত হয়। আমরা কুব্লা খাঁ স্থাপিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে চলিতেছি। সে ৭০০ বৎসরের কথা। মোগলদের পরে মিঙ্‌বংশীয় সম্রাট্‌গণ দক্ষিণদিকে রাজধানী সরাইয়াছেন। সেইখানেই মাঞ্চুরাও রাজত্ব করিতেন। আজকালকার রাজনগর মিঙদের স্থাপিত।" মোগলেরা অবসন্ন হইলে তাঁহাদের প্রাসাদ মন্দিরে পরিণত হয়। মিঙেরা এই কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে মন্দির মাত্র দেখিতে পাইতেছি। মোগল আমলের রাজধানীর চারিদিকে মৃত্তিকাপ্রাচীর ছিল—তাহার পরিধি ১৮ মাইল।

লোকেরা এই স্থানে "পীত মন্দির" দেখিতে আসে। সৌধের ছাদ পীতবর্ণ ইনামেল টালিতে নির্ম্মিত। এই জন্য নাম পীত মন্দির। মোগল আমলে পীত মন্দির রাজদরবার ছিল। এই গৃহের অলঙ্কারগুলি অন্যান্য চীনা সৌধের অলঙ্কারের অনুরূপ নয়। মিঙ্ ও মাঞ্চু যুগের অট্টালিকায়

ড্রেগন, ফিনিক্স ইত্যাদির প্রাধান্য দেখিতে পাই—নকসা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিও বিভিন্ন। পীত মন্দিরের প্রাচীরে, কড়িবর্গায়, কার্ণিশে কথঞ্চিত ভারতীয় নক্সার মত কারুকার্য্য দেখা গেল। সমস্ত মেজে মর্ম্মর বাঁধান। গৃহ এক্ষণে নিতান্ত জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন সম্পদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের দালাই-লামা পিকিঙে আসিয়াছিলেন। তিনি এই পীত মন্দিরে বাস করিতেন। দালাই-লামা চীনা বৌদ্ধসমাজে "জীবন্ত বুদ্ধ" বা বুদ্ধাবতার নামে পূজা প্রাপ্ত হন। কাজেই দালাই-লামার স্বভূমি তিব্বত চীনাদের নিকট স্বর্গস্বরূপ। সেইরূপ ভারতবর্ষকে জাপানীরা তেন্‌জিকু বা স্বর্গ বলিয়া জানে।

সেদিন মাঞ্চুসম্রাট্-স্থাপিত লামামন্দিরে তিব্বতী ভাষা ও পুরোহিতগণের প্রভাব দেখিয়াছি। আজও তিব্বত হইতে নিয়মিতরূপে সন্ন্যাসীর দল আসিয়া এই মঠে বাস করিয়া থাকে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লাসা হইতে দালাই-লামা পিকিঙ পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনি এই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। মোগল জাতীয় পুরোহিতগণের কর্ত্তাও তিব্বতের দালাই-লামা। একদল পুরোহিত তিব্বতী শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন।

মাঞ্চু আমলে তিব্বতের প্রভাব পিকিঙে বেশী দেখিতে পাই। মাঞ্চুরা পিকিঙে সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বেই দালাই-লামার ভক্ত ছিলেন। মুক্‌ডেনেও তাঁহারা তিব্বত হইতে লামাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের পদধূলিতে মুক্‌ডেনকে পবিত্র করা হইত। মুক্-ডেনের লামা-প্যাগোডা জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে দেখিয়াছি।

ভারতীয় বুদ্ধের অবতারস্বরূপ তিব্বতী দালাই-লামা পীত মন্দিরে অবস্থানকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।



দালাই-লামার প্রস্তর-স্তূপ।

বুদ্ধাবতারের সমাধিস্তম্ভের জন্য মাঞ্চুসম্রাট্ একটি সুরম্য মর্ম্মর প্যাগোডা নির্ম্মাণ করান। পীত মন্দিরের পার্শ্বেই এই স্তূপ অবস্থিত। পিকিঙের ভিতরে বা বাহিরে বোধ হয় এরূপ সুন্দর কারু-কার্য্যসমন্বিত বাস্তুশিল্পের নিদর্শন আর নাই। স্তূপের নিম্নভাগ অষ্টভুজ উপরিভাগ গোলাকার—উচ্চতম অংশ সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। শিরোদেশে সোনালি পিত্তলের আবরণ। চারিকোণে চারিটা স্তম্ভ।

ভারতীয় স্তূপসমূহ যেরূপ নানাপ্রকার চিত্রে ও খোদাই কার্য্যে পরিপূর্ণ, পিকিঙের এই মর্ম্মরস্তূপও সেইরূপ। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্ত্তি, দিকপাল ইত্যাদি প্যাগোডায় এবং স্তম্ভসমূহে খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ড্রেগন এবং ফিনিক্সের নকসা ত আছেই। পীত মন্দিরে যে ধরণের অলঙ্কার দেখিতে পাই এই স্তূপে সেই ধরণের অলঙ্কার নাই। ইহা খাঁটি চীনা বা মাঞ্চু রীতিতে গঠিত। চীনসাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ য়ুন্নান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তর আনীত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

মাঞ্চুরা তিব্বতী লামাকে স্বয়ং বুদ্ধদেবের মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। স্তূপের গায়ে নানাপ্রকার খোদাই কার্য্য দেখিয়া এইরূপই বিশ্বাস হয়। আমরা বুদ্ধজীবনের নানাকথা চিত্রে, খোদাই কার্য্যে স্তূপগাত্রে দেখিয়া থাকি। অবিকল সেই ধরণের জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষাবৃত্তান্ত, কর্ম্মবৃত্তান্ত, এবং নির্ব্বাণ বা মৃত্যুবৃত্তান্ত, দালাই-লামা সম্বন্ধে মর্ম্মরস্তূপের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ভারতীয় স্তূপে এবং পিকিঙের এই প্যাগোডায় দর্শকমাত্রেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক স্থানে দেখিলাম দালাই-লামা বৃক্ষ হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। কোথাও বা তাঁহার ধ্যান, উপাসনা এবং বৈরাগ্যের দৃশ্যও কল্পিত হইয়াছে। পিকিঙে উপস্থিত হইলে মাঞ্চুসম্রাট তাঁহাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাও বুঝিতে পারি। তাহার পর রোগশয্যার চিত্র, চিকিৎসকের আগমন, শিষ্যগণের প্রার্থনা ইত্যাদিও বিবৃত রহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যখন মৃত্যু হইল তখনকার দৃশ্যে জীবজন্তুর ক্রন্দনও দেখান হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-চিত্রেও এইরূপই দেখিতে পাই। একটা দৃশ্যে দেখা গেল সকলেই কাঁদিতেছে—কেবলমাত্র একজন সুখী। কারণ সে বুঝিল যে দালাই স্বর্গে যাইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্যক্তিই পরে দালাইয়ের পদে অধিষ্ঠিত হন।

মূর্ত্তিগুলির কল্পনা এবং গঠন অতি সুন্দর। উচ্চতম স্থাপত্যকার্য্যের নিদর্শন বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের কথা প্রায় প্রত্যেক মূর্ত্তিই ভগ্ন দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—"১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্‌সার-বিদ্রোহের সময়ে জাপানীরা এই বর্ব্বরোচিত কার্য্য করিয়াছে। তাহারা এই মন্দির দখল করিয়াছিল।"

শুনিলাম পিকিঙের এই কেন্দ্রে সোনালি পিত্তলের বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হয়। এখান হইতে মঙ্গোলিয়ায় এবং তিব্বতে এই সমুদয় রপ্তানি হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ মন্দিরে নানাতিথিতে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে লামা পুরোহিতগণ মুখোস পরিয়া নাচগান করিয়া থাকে। বলদ, হরিণ, ভূত প্রেত, দৈত্য দানব ইত্যাদি নানাবেশে লামাদিগকে দেখা যায়। কোন কোন উৎসবে এই প্রকার নাচগানের দ্বারা সয়তানের অনুচরবর্গকে বিতাড়িত করা হইয়া থাকে।

মুসলমান হোটেলে রুটি তরকারি আহার করিয়া রাত্রিকালে একটা চীনা থিয়েটারে গেলাম। মুক্‌ডেনে যেরূপ দেখিয়াছি পিকিঙেও নাট্যাভিনয় সেইরূপই। দর্শকেরা যথাস্থানে বসিয়া ফলমূল চা কাফি ইত্যাদি আহার করিতেছে। হট্টগোল যথেষ্ট। জাপানী থিয়েটারে এবং "নো" মণ্ডপে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ সংযত।

৫। চতুর্থ দিবস—পিকিঙের নানামহাল্লায়।

কুব্‌লা খাঁর প্রবর্ত্তিত মোগল রাজধানীর প্রাসাদ পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। সেই আমলের কোন অট্টালিকা আজকাল আর দেখা যায় না। কেবল ঢাক-গৃহ এবং ঘণ্টা-মন্দির তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই দুইটি সৌধ বর্ত্তমান রাজধানীর উত্তরাংশে

অবস্থিত। শুনা যায় এই ঘণ্টা-গৃহই নাকি মোগল-পিকিঙের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ঘণ্টা-গৃহের ঘণ্টা মোগল আমলে নির্ম্মিত হয় নাই। পরবর্ত্তী মিঙ্‌বংশীয় সম্রাট্‌গণের আদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘণ্টার উচ্চতা ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ১০ ফুট। ধাতুর পাত ৯ ইঞ্চি পুরু।

এই ঘণ্টার ঢালাই সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। যে কারিগরের হাতে এই কার্য্যের ভার ছিল সে দুইবার সম্রাটের পছন্দসই ঘণ্টা প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হয়। তৃতীয়বার আদেশ প্রদান করিবার সময়ে সম্রাট্ বলিলেন—"এইবার কৃতকার্য্য না হইলে তোমার কঠোর শাস্তি হইবে। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাও হইতে পারে।" শিল্পীর চিত্তে ঘোরতর উদ্বেগ দেখা দিল। তাহার একমাত্র কন্যা পিতার অস্থিরতা লক্ষ্য করিল। কন্যা রূপে গুণে অসাধারণ ছিল। এই কন্যা ব্যতীত শিল্পীর পরিবারে আর কেহ ছিল না। কন্যা একজন গণকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিল। গণক বলিলেন—এইবারও তোমার পিতা অকৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু যে সময়ে ধাতু গলান হইবে সেই সময়ে তরল পদার্থের মধ্যে যদি কুমারীর রক্ত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে সম্রাটের অভিপ্রেত ঘণ্টা প্রস্তুত হইতে পারিবে।" যথাসময়ে ঘণ্টা তৈয়ারি দেখিবার জন্য নগরের লোকেরা কারখানায় উপস্থিত হইল। ছাঁচের মধ্যে ধাতু ঢালা হইতেছে এমন সময়ে একটা চীৎকার শুনা গেল—"পিতার জন্য আত্মোৎসর্গ।" তৎক্ষণাৎ দেখা গেল—বালিকা তপ্ত ধাতুর মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। পিতা কন্যাশোকে উন্মত্ত হইয়া গেল—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘণ্টার ধ্বনিতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন।

সাহিত্য-ভবন।

কন্ফিউশিয়ান মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই "হল্ অব্ ক্লাসিক্‌স্" নামক একটি সৌধ আছে। এখানে প্রসিদ্ধতম চীনা সাহিত্যের সংগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। সৌধে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি দ্বিতল সুন্দর ছাদ-বিশিষ্ট কাষ্ঠভবন। মর্ম্মরের ভিত্তি এবং রেলিং চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের নানাস্থানে দেখা গেল। দোভাষী বলিলেন—"এই সৌধকে প্রাসাদ বিবেচনা করিতে পারেন। একটা সিংহাসন ইহার ভিতরে আছে। তৃতীয় মাঞ্চুসম্রাট্ এই গৃহে অধ্যয়ন করিতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনা ক্লাসিক্‌স্ কোন্ গৃহে রক্ষিত?" দোভাষী বলিলেন—"ঐ যে প্রাঙ্গণের দুই ধারে লম্বা বারান্দা দেখিতেছেন উহার ভিতর প্রায় ১০০ সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক রহিয়াছে। এই ফলকগুলির উপর লিপি খোদিত হইয়াছে। এই ফলকগুলি গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন পত্রবিশেষ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গ্রন্থরক্ষার এইরূপ বিচিত্র নিয়ম কেন?" দোভাষী বলিলেন—"খৃষ্টপূর্ব্ব আমলে সম্রাট্ শি হুয়াঙতি বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া সাম্রাজ্যকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করেন। ইনি নিজবংশে সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইত যে, শিক্ষিত চীনারা হয়ত তাঁহার বংশজাত নৃপতিগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। এইজন্য দেশ হইতে পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্য, বিদ্যালয় ও গ্রন্থমালা সকলই নির্ম্মূল করিবার জন্য শি হুয়াঙতি যত্নবান্ হন। তাঁহার নির্য্যাতনে বিদ্বানেরা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং বিদ্যালয় ও গ্রন্থশালাসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু সম্রাট্ দেশের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একত্র অগ্নিসাৎ করেন।"

পাগ্‌লামি একবার দেখা দিয়াছিল মহাপ্রাচীর রচনায়—এইবার দেখা গেল গ্রন্থভস্মীকরণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৃতীয় মাঞ্চুসম্রাট্ বিদ্যা, ধর্ম্ম ও শিল্পের একজন সহানুভূতিসম্পন্ন "সংরক্ষক" ছিলেন। পাছে আবার কোন ক্ষ্যাপা সম্রাট্ সাহিত্য-ধ্বংস-যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন এই ভয়ে তিনি প্রসিদ্ধ চীনা-বেদগুলি প্রস্তরে লেখাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাও এক ধরণের পাগলামি নহে কি?

চীনারা কনফিউশিয়াস-প্রচারিত এবং কনফিউশিয়াস মতাবলম্বী যে-সমুদয় গ্রন্থকে বেদ স্বরূপ সম্মান করে সকলগুলি এই সাহিত্য-ভবনে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থগুলির ইংরেজী নাম প্রদত্ত হইতেছে:—

(১) The Canon of Changes. (পরিবর্ত্তন-বেদ)

(২) The Canon of Poetry or the Book of Odes. (সাম-বেদ)

(৩) The Canon of History. (ইতিহাস-বেদ)

(৪) The Spring and Autumn Annals—with three Commentaries. (বসন্ত ও শরৎ কথা)

(৫) The Book of Rites. (ক্রিয়াকলাপ)

(৬) The Chou Ritual. (চাও যুগের ধর্ম্ম-সূত্র)

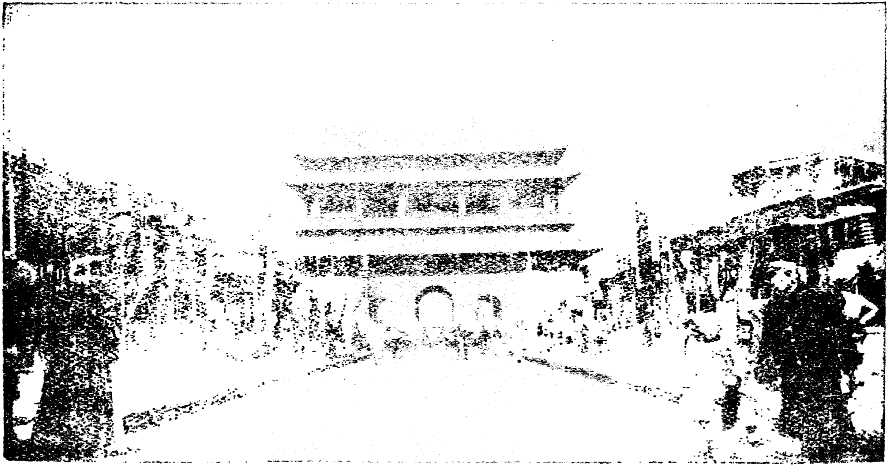
(৭) The Decorum Ritual. (শিষ্টাচার)

(৮) The Book of Filial Piety. (সন্তানের কর্ত্তব্য)

(৯) The Confucian Analects. (কনফিউশিয়াসের বচন)

(১০) The Book of Mencius. (মেনশিয়াস্ নীতি)

এই মাঞ্চু সম্রাট্ তিব্বতী দালাই-লামার ভক্ত ছিলেন আবার কনফিউশিয়াসেরও ভক্ত ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই মন্দির-নির্ম্মাণে ও সংস্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। পিকিঙের বহু অট্টালিকা



ঘণ্টা-ঘর (পিকিঙ)



মানমন্দিরের এক যন্ত্র (পিকিং)

এই সাম্রাটের আমলেই নূতন নির্ম্মিত অথবা সংস্কৃত করা হইয়াছে। মর্ম্মর-স্তূপ ইহাঁরই লামা-ভক্তির নিদর্শন। এই ক্লাসিক্স্ ভবনের প্রশস্ত সৌধসমূহ তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয়। প্রাঙ্গণের একস্থানে একটি সুন্দর তোরণদ্বার দেখা গেল। ইহার ভিতর তিনটি খিলান। দ্বারের উভয় দিকে পাঁচ-প্রকার বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর ও ইনামেলের আবরণ রহিয়াছে। খিলানের কোণগুলিতে মর্ম্মরের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর ফটকটা পিকিঙের বাস্তুশিল্পে অত্যুচ্চ গৌরবের অধিকারী।

এই সম্রাটের দশটি আজ্ঞা সাহিত্য-ভবনের এক প্রকোষ্ঠে খোদিত রহিয়াছে। সম্রাট্, মন্ত্রী, পিতা, মাতা, সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী এবং বন্ধু—এই দশ প্রকার লোকের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে দশ অনুশাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

চীনাদের জগৎপ্রসিদ্ধ কারুকার্য্য।

সাহিত্য-ভবন হইতে "নিষিদ্ধ নগর" বা রাজপ্রাসাদে আসিলাম। রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ম্যাণ্ডারিন উপাধিধারী উচ্চ কর্ম্মচারী এবং প্রাসাদের ভৃত্যগণ ব্যতীত অন্য কোন লোক এই আবেষ্টনে প্রবেশ করিতে পারিত না। আজকাল আট আনা মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া সকলেই ইহার ভিতর যাইতে পারে।

প্রাসাদ আজকাল একপ্রকার খালি পড়িয়া রহিয়াছে। কোন গৃহে মিউজিয়াম, কোন গৃহে আফিস, কোন গৃহে হোটেল বসান হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই এই প্রাসাদে বাস করেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী মাঞ্চুসম্রাটের পরিবারবর্গ এই নিষিদ্ধ নগরের অভ্যন্তরেই একটা ক্ষুদ্র সৌধে জীবন যাপন করিতেছেন। দর্শকের সংখ্যা যথেষ্ট, এই জন্য প্রাসাদের এক গৃহে হোটেল রক্ষিত হইতেছে। চা পান করা গেল। পিকিঙে

কোন উল্লেখযোগ্য মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় ছিল না। এক বৎসর হইল প্রাসাদের ভিতর কতকগুলি গৃহে প্রাচীন হস্তশিল্পের নিদর্শনসমূহ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব বা আর্কিয়লজির মিউজিয়াম ইহা নয়। এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চীনা শিল্পকর্ম্মের নমুনা সংগৃহীত। চীনাদের যে-সকল কারুকার্য্য বিশ্ববিশ্রুত তাহারই বহু-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ বস্তু এইখানে দেখিলাম।

এ কয়দিন পিকিঙের প্রাচীন সৌধাদি দেখিতে দেখিতে পীতবর্ণ ইনামেল টালির ছাদ ও দেওয়ালের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি। জাপানে এই শিল্পের পরিচয় পাই নাই। কাষ্ঠশিল্পের কারিগরি জাপানীদের বিশেষত্ব। চীনাদের হাত কাষ্ঠশিল্পেও কম পাকা নয়। বস্তুতঃ জাপানীরা কাষ্ঠশিল্পের অনুশীলনে চীনাদেরই শিষ্য।

প্রাসাদের নূতন সংগ্রহালয়ে সম্রাট্-পরিবারের সঞ্চিত মূল্যবান্ দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাইলাম। এগুলির কোনটা ৩০০ বৎসরের পুরাতন, কোনটা মোগল আমলের জিনিষ, কোনটা খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীর তাঙবংশীয় প্রস্তর। দ্রব্যসমূহ প্রাচীন বলিয়াই বিশেষরূপে যে আদরণীয় তাহা নহে। এরূপ কারিগরি, শিল্পনৈপুণ্য এবং কলাচাতুর্য্য জগতে বিরল। বহু স্থানের বহু মিউজিয়াম দেখিলাম—নানাধরণের সৌন্দর্য্য চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই মিউজিয়ামে যে সমুদায় কারুকার্য্য দেখিতেছি তাহার তুলনা অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে করা অসম্ভব।

ধাতুর উপর নানা-প্রকার রং লাগান দেখিয়া মনে হয় যেন চিত্রাঙ্কন এইমাত্র করা হইয়াছে। ভারতীয় বিদ্রী সদৃশ "ক্লয়জন্ শিল্প" দেখিতে দেখিতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের আকরে আসিয়া পড়িলাম। তাহার পর পোর্সলেন বা চীনাবাসন। বলা বাহুল্য পৃথিবীতে যে বস্তুকে চীনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেই বস্তু তাহার জন্মভূমিতে দেখিতেছি। কেবল

তাহাই নহে। সেই দেশের রাজপ্রাসাদে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিই দেখিতেছি। কাজেই পোর্সলেনের চূড়ান্ত দেখা হইল না কি? তবে সমজদার হওয়া আবশ্যক। হাতীর দাঁত, বাঁশ, কাঠ, পিত্তল ইত্যাদি নানাপদার্থ-সম্পর্কিত শিল্পকার্য্যের নমুনাও এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হইতেছে। জাপানে রেশমের উপর সেলাই কার্য্য দেখিয়া যেরূপ একটা শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছি, পিকিঙে এই মিউজিয়াম দেখিয়া কতকগুলি কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। অবশ্য বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত শিল্পের যুগে এই সকল কারুকার্য্য শীঘ্রই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এখানকার কোন কোন পোর্সলেন বাসনে ইতালীর চিত্রকরগণের অঙ্কিত ইয়োরোপীয় দৃশ্য দেখিলাম।

মুসলমান-পাড়া

সহরের ভিতর কয়েকটা মুসলমান মস্‌জিদ দেখিয়া আসিলাম। এই অঞ্চলে বহু মুসলমানধর্ম্মী চীনাদের বাস। ঘরবাড়ী, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি দেখিয়া ইস্‌লামের বিশেষত্ব কিছু বুঝা গেল না। কোন কোন গৃহের দ্বারে আরবী অক্ষরে নাম লেখা দেখিলাম।

একটা মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেছি এমন সময়ে বহু সংখ্যক বালক বালিকা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলাম—"লা এলাহ্ ই ল্লাল্লা"।

অমনি আমার চারিদিক্ হইতে চীনা কণ্ঠে আওয়াজ হইল—"মহম্মদিন রসুল্লাল্লা।"

সুতরাং আরবীতে নামাজ আজান ইত্যাদি পঠিত হইয়া থাকে বুঝা গেল। কিন্তু মস্‌জিদের নির্ম্মাণে মুসলমানী রীতি আদৌ অবলম্বিত হয় নাই। বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউশিয়ান মন্দির এবং প্রাসাদ ইত্যাদি যে-ধরণে নির্ম্মিত,

মুসলমান মন্দিরও সেই ধরণেই নির্ম্মিত। এমন কি, চীনা গৃহের ছাদের কোণে কোণে সয়তানের অনুচরবর্গকে তাড়াইবার জন্য যে-সকল পশুমূর্ত্তি রক্ষিত হয়, চীনাদের ইস্‌লাম-মন্দিরের ছাদেও সেইগুলি দেখা গেল।

কয়েক জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন মৌলবী-স্থানীয় ব্যক্তি বলিলেন—"আমাদের প্রত্যেকের দুইটা করিয়া নাম। একটা চীনা অপরটা আরবী। এই বালিকার নাম ফাতিনা, উহার নাম সার্বাওঁ।"

দিনে পাঁচবার করিয়া নামাজ পড়া চীনা মুসলমানদেরও রীতি। পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ইহারা উপাসনা করে। ভারতবর্ষেও এই রীতি। কিন্তু মিশরবাসীদের পক্ষে মক্কা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত—এইজন্য মিশরীয় মুসলমানেরা পূর্ব্বমুখী হইয়া নামাজাদি পাঠ করিয়া থাকে।

মস্‌জিদের সম্মুখে আরবীতে লেখা রহিয়াছে—

"বিশ্‌মিল্লা হির্‌ রহমানুর্‌ রহিম্‌।"

ইহা ইস্‌লামধর্ম্মীদিগের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ।

হিন্দুরা সকল শুভকার্য্যের পূর্ব্বে যেরূপ "ওঁ গণেশায় নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া থাকে, পুস্তকারম্ভেও এইরূপ লিখিয়া থাকে, মুসলমানেরা সেইরূপ এই প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে।

মস্‌জিদ ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে মৌলবী সাহেব বলিলেন—"আলেইকম সেলাম।"

পিকিঙে প্রায় বিশ হাজার মুসলমান পরিবারের বাস। গোটা চল্লিশেক ছোট বড় মস্‌জিদ আছে। শুক্রবার যথা-রীতি ধর্ম্মপালন হইয়া থাকে। শূকর ভোজন নিষিদ্ধ। চীনে ধর্ম্মকলহ বড় দেখা যায় না। মিঙ্‌ এবং মাঞ্চু সম্রাট্‌গণ মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণে রাষ্ট্রকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিতেন। যখন রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চীনা, তিব্বতী,

মোগল ও মাঞ্চুর স্থায় ইস্‌লামধর্ম্মীদিগকে চীনদেশের পঞ্চম জাতি বিবেচনা করা হইয়াছে। এইজন্য চীনস্বরাজের পতাকায় পাঁচ রং।

৬। চীনে দুনিয়া-পূজা

চীনা ইস্‌লামের পরিচয় পাইলাম। কন্‌ফিউশিয়াস এবং দালাই-লামার প্রভাবও দেখিয়াছি। চীনাসমাজে অন্যান্য ধর্ম্মপদ্ধতিও প্রচলিত আছে। সেগুলি কোন ধর্ম্মের অন্তর্গত বুঝিতেছি না। আজ পিকিঙের "টেম্পল অব্‌ হেভন্", "অল্টার্ অব্‌ এগ্রিকাল্‌চার" ইত্যাদি দেখিতে যাইয়া তাহার সন্ধান পাইলাম।

টেম্পল্ অব হেভন্ শব্দে "স্বর্গ-মন্দির" বুঝায়। কিন্তু ইহার চতুঃসীমায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, নরক, পরকাল, ইহকাল, ইত্যাদির কোন চিহ্ন নাই। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদির নামগন্ধও এই স্বর্গ-মন্দিরের পূজাপার্ব্বণে পাওয়া যায় না। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইল ইহাকে প্রকৃতি-পূজা বা বিশ্ব-পূজা বা জগৎ-পূজার মন্দির বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমগ্র দুনিয়াকে হেভন্ বলা হইয়াছে।

মুখ্যভাবে কন্‌ফিউশিয়াস অথবা বুদ্ধ কাহারও প্রভাব এই দুনিয়া-পূজায় বিন্দুমাত্র নাই। গ্রহতারা, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ধরিত্রী, দিবা রাত্রি ইত্যাদির আরাধনা এই পূজার অনুষ্ঠান। যাগযজ্ঞ বলিদান ইত্যাদিও মহাসমারোহে হইয়া থাকে। এই পূজায় জনসাধারণের কোন অধিকার নাই। সম্রাট্ স্বয়ং ইহার পূজারি ও ভক্ত। সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য তিনি এইখানে দুনিয়ার পূজা করিয়া থাকেন। চীনে রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্রাট্‌গণ প্রতিবৎসর যথাসময়ে পূজা করিতে আসিতেন। পঞ্জিকা-অনুসারে পূজার তিথি নির্দ্ধারিত হয়।

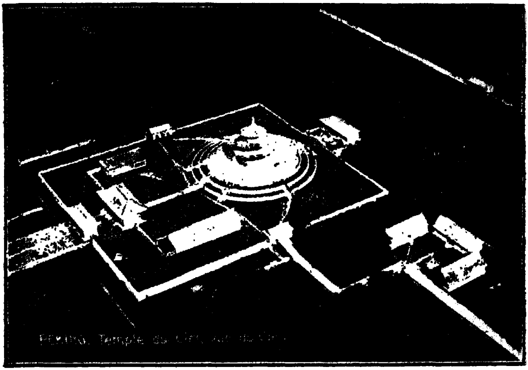
অতি প্রশস্ত ভূখণ্ড উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার ভিতরে উদ্যান এবং প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির ও বেদিসমূহ। প্রবেশ করিয়া দেখি পিকিঙের অন্যত্র যেমন, এখানেও সকল স্থানে বন জঙ্গল আগাছা পরগাছা ইত্যাদির প্রকোপ। সমগ্র চীনদেশটাই যেন সংস্কারের অভাবে পচিয়া যাইতেছে। পিকিঙ্, মুক্‌ডেন এই দুই সহরে কেবল ধ্বংসোন্মুখ গলিত-প্রায় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইতেছি। প্রাচীনের সকল ঠাটই বজায় আছে—প্রবল ভূমিকম্পে কোন নগরের ধ্বংস সাধিত হইলে তাহার যেরূপ দৃশ্য হয় মুক্‌ডেন-পিকিঙে তাহা দেখি না। এই দুই সহরে পুরাতন সবই রক্ষিত হইতেছে অথচ সর্ব্ব-অঙ্গে ঘা। একখানা কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি স্বরূপ চীনাসমাজ দর্শকগণের কৌতূহল আকর্ষণ করে মাত্র—পুঁথির আকৃতি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পত্রের সংখ্যাও গণনা করিতেছি, অথচ লিপিগুলি সবই বিলুপ্তপ্রায়, ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব।

যাহা হউক বনজঙ্গল ঠেলিতে-ঠেলিতে পিকিঙের এই রাজকীয় মন্দিরের সৌধসমূহের সমীপবর্ত্তী হইলাম। ভাবিতেছি এইগুলি যখন প্রথম নির্ম্মিত হয় তখন ইহাদের পশ্চাতে জনগণের কত উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল। সেই জীবনের গৌরব আজও এই জীর্ণশীর্ণ বিরাট অট্টালিকাসমূহের সম্মুখে দাঁড়াইলে অনুমান করিতে পারি। চীনসাম্রাজ্যেরই উপযুক্ত বিশ্ব-পূজার আয়োজন সন্দেহ নাই।

মিঙ্ সম্রাট্‌গণের আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মন্দির প্রথম স্থাপিত হয়। তাহার পর সময়ে সময়ে সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বৎসরে তিনবার করিয়া পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

একটা গৃহে সম্রাট্ উপবাস করিয়া রাত্রি যাপন করেন। একটা গৃহে রন্ধনাদি হয়। কোথাও পশু দগ্ধ হইয়া থাকে। কয়েকটা সৌধে প্রাচীন সম্রাট্‌গণের স্মৃতিফলক রহিয়াছে। পিতৃপূজার স্থানও এই রাজকীয়

পূজায় আছে। কনফিউশিয়ানদিগের প্রভাব খানিকটা দেখা যায়।



চীনের বিশ্বমন্দির, আকাশ-যান হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ।
মধ্যস্থলে ধানের মরাইএর মতন প্রধান মন্দির, তাহার চারি ধারে তিন স্তবকে তিনটি বেদি ও সোপানাবলী।

এই মন্দিরের সম্মুখের ছবি প্রবাসীতে পূর্ব্বে একাধিক বার বাহির হইয়াছে।

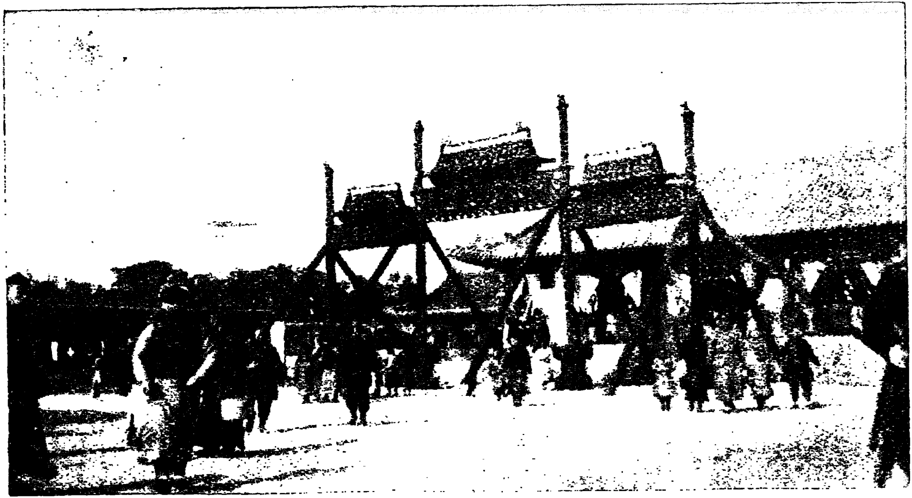
স্বর্গ-মন্দিরের বাস্তুশিল্পে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় সুনীল এনামেল-টালি। পিকিঙের অন্যান্য সৌধে, প্রাসাদে ও মন্দিরে গাঢ় পীতবর্ণের চক্‌চকে মসৃণ টালি দেখিয়াছি। বোধ হয় এই দুনিয়া-পূজার মন্দির ছাড়া চীনারা নীলবর্ণ টালির ব্যবহার অন্য কোথাও করে নাই। কেবল ছাদের জন্যই এই বর্ণের প্রয়োগ হইয়াছে এরূপ নয়। গৃহসমূহের ভিতর চিত্রাঙ্কন, অলঙ্কারবিন্যাস ইত্যাদিতেও নীলবর্ণের প্রাচুর্য্যই লক্ষ্য করিতেছি। মোটের উপর একটা নীলিমার আবেষ্টনে রহিয়াছি।

দোভাষী বলিলেন—"আকাশের রঙের সঙ্গে মিলাইবার জন্য স্বর্গ-মন্দিরে নীল টালির অত্যধিক ব্যবহার করা হইয়াছে।"

প্রথমেই গোলাকার মন্দিরসদৃশ সৌধ দেখিলাম। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। ছাদ ত্রিতল—শীর্ষদেশে সোনালি বর্ণের আবরণ। একটি উচ্চ ও প্রশস্ত মঞ্চের উপর মন্দির স্থাপিত। এই মঞ্চে উঠিতে তিন ধাপ পার হইতে হয়। সমস্তটা মর্ম্মরের প্রস্তুত। পিকিঙের বহুদূর হইতে এই গোল মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরে সম্রাট্ জলবৃষ্টি এবং প্রচুর শস্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। চীনা বৎসরের প্রথম দিবস এই অনুষ্ঠান হয়।

মিঙ্ ও মাঞ্চু সম্রাট্‌গণের স্মৃতিফলক দুই সৌধে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই দুনিয়া-পূজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যসমূহ স্বর্গ-বেদিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোলমন্দির হইতে ছাদহীন গোলাকার "অল্টার অব্ হেভন্" বা স্বর্গ-বেদিতে আসিলাম। এই বেদি তিন ধাপে বিভক্ত, আগাগোড়া মর্ম্মরে নির্ম্মিত। সর্ব্বনিম্নে ইহার বিস্তার ২১০ ফুট, দ্বিতীয় স্তরের বিস্তার ১৫০ ফুট এবং সর্ব্বোচ্চ মঞ্চের বিস্তার ৯০ ফুট। প্রত্যেক ধাপ উঠিতে নয়টা করিয়া সিঁড়ি পার হইতে হয়।

সাতাইশটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিলাম। ইহার কেন্দ্রস্থলে একখানা গোলাকার মর্ম্মরপ্রস্তর। এই প্রস্তরের চারিদিকে গোলাকার প্রকোষ্ঠ। এইরূপ নয়টা প্রকোষ্ঠে উচ্চতম স্তর বিভক্ত। প্রথম কোষ্ঠ নয়টা মর্ম্মরখণ্ডে গঠিত, পরবর্ত্তী কোষ্ঠ ১৮টা মর্ম্মরখণ্ডে গঠিত, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে নবম কোষ্ঠ ৮১টা মর্ম্মরখণ্ডে গঠিত। চীনাদের বিবেচনায় ৮১ সংখ্যা শুভসূচক। বেদির সর্ব্বনিম্ন ধাপে ১৮০টা ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে, দ্বিতীয় ধাপে ১০৮টা স্তম্ভ আছে, সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ৭২টা স্তম্ভ আছে; এইরূপে সমগ্র বেদিতে ৩৬০টা ক্ষুদ্র স্তম্ভ দণ্ডায়মান। চীনা গণনায় বৎসরে ৩৬০ দিবস।



বিশ্ব-মন্দিরের ফাটক (পিকিঙ)



বৌদ্ধ প্যাগোডা (পিকিঙের নিকটবর্ত্তী)

বেদিতে কোন ছাদ নাই, পূজার সময়ে পীতবর্ণ সাটিনের তাঁবু খাটান হইয়া থাকে। সম্রাট্ কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেন। চীনসম্রাট্‌কে "সন্ অব্ হেভন্" বা বিশ্ব-পুত্র বলা হইয়া থাকে। পূজার দিন তিনি বিশ্বের প্রতিকৃতিস্বরূপ এই গোলাকার বেদির মধ্যকেন্দ্রে থাকিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেন। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্মর কোষ্ঠের শিলাখণ্ডের উপর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতিনিধিস্বরূপ স্মৃতিফলকগুলি রক্ষিত হয়। বিশ্বপুত্র বিশ্ব-পূজার জন্য সমগ্রবিশ্বকে এইরূপে নিজের সম্মুখীন করিয়া লন। বিশ্ব-মন্দিরের কল্পনায় চীনাদের কবিত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি-পূজার অন্তর্নিহিত দার্শনিকতাও পরিস্ফুট। জগতের নানাশক্তিকে একস্থানে সমবেত করিয়া বিশ্বপুত্র দুনিয়ার ঐক্যকে অর্থাৎ বিশ্বপতিকে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য উপলব্ধি করিবার এই প্রণালী উপেক্ষণীয় নয়। বহুর মধ্যে যে বিরাট-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন এই উপায়েই তাঁহার সন্ধান সাধারণ্যে প্রচার করা হইত। এই হিসাবে পিকিঙের এই রাজকীয় বিশ্ব-মন্দির চীনসমাজের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। বৎসরের আরম্ভে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা, বৎসরান্তে সাম্রাজ্যের হিসাব প্রদান এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধনা—এই তিন উদ্দেশ্যে সম্রাট্‌গণ তিনবার করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। বেদান্ত বল, "প্যান্‌থীজ্‌ম্" বল, ব্রহ্ম বল, একেশ্বরবাদ বল সবই এই চীনা প্রকৃতি-পূজায় বিদ্যমান। আবার শক্তিপূজা, বহুপূজা, বৈচিত্র্যপূজা, চন্দ্রপূজা, গ্রহপূজা সবই এখানে মজুত রহিয়াছে।

প্রাসাদ হইতে সম্রাট্ যখন বিশ্ব-পূজার মন্দিরে আসিতেন সেই সময় পিকিঙে সহর ভরিয়া মহাসমারোহ হইত। বিরাট শোভাযাত্রা বাহির

হইত। মন্ত্রী, ম্যাণ্ডারিন, রাজা-রাজড়া, আমীরওমরাও ইত্যাদি কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পাল্কীতে, কেহ পদব্রজে সম্রাটের সঙ্গী হইতেন। এদিকে গানবাজনার ধুম চলিত। সম্রাটের পক্ষে এই পূজা নিতান্ত সখের সামগ্রী ছিল না। কারণ তাঁহাকে দুই তিন দিন ধরিয়া অনাহারে থাকিতে হইত—এবং উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান আরাধনা ইত্যাদিতে সময় কাটাইতে হইত।

বিশ্ব-মন্দির দেখিয়া কৃষিবেদি দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সম্রাট্ চীনদেশে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া চীনাসমাজে সংস্কার প্রচলিত আছে। সেই কৃষক-সম্রাটের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই বেদি নির্ম্মিত। মিঙ্ সম্রাট্গণের আমলে ইহা প্রস্তুত করা হয়। সম্রাট্গণ সেই পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন এবং বৎসরে একবার করিয়া এইখানে ভূমিকর্ষণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

চীনারা নদী এবং পর্ব্বতও পূজা করিয়া থাকে। চীনদেশে পাঁচটা পবিত্র পর্ব্বত এবং চারিটা পবিত্র নদী আছে। কৃষি-মন্দিরের ভিতর পর্ব্বত-বেদি এবং নদী-বেদি দেখা যায়। ভারতবাসীর পক্ষে পর্ব্বতপূজা, ইত্যাদি বুঝা অতি সহজ। বস্তুতঃ চীনা বিশ্ব-পূজার কোন তত্ত্বই আমাদের অপরিচিত নয়।

পিকিঙ্ নগরে অসংখ্য দেওয়াল এবং পরিখা—কাজেই বিশ্ব-পূজক চীনারা প্রাচীর পরিখাদির দেবতাও কল্পনা করিয়াছে। এই দেবতারও পূজা হইয়া থাকে। কৃষি-মন্দিরের ভিতর এই বিগ্রহ দেখা যায়। চীনা-হৃদয়ে এবং হিন্দুহৃদয়ে যথেষ্ট সাম্য আছে।

এই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দুই জাতির ভিতর আদানপ্রদানের ফলে কতটা উৎপন্ন হইয়াছে সম্প্রতি তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। চীনারা এই সকল পূজাপাঠ বৌদ্ধ নিয়মে করে কি কন্‌ফিউশিয়াসের

দোহাই দিয়া করে তাহাও সম্প্রতি অনুসন্ধান করিলাম না। এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, চীনা জনসাধারণ এবং ভারতীয় জনসাধারণ দুনিয়াকে অনেকটা এক চোখেই দেখিয়া আসিতেছে।

কৃষি-মন্দিরে যাইয়া দেখি এখানে এক প্রদর্শনীর উদ্যোগ হইতেছে। জাপানী দ্রব্য বয়কটের ফলে চীনারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়াছে। তাহারই এক পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। রাস্তায় কয়েকটা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নাচগান চলিতেছে। লোকজনের ভিড় মন্দ নয়—প্যাকৌড়ি তরমুজ ইত্যাদির দোকানও বসিয়া গিয়াছে।

নগর হইতে বহুদূরে পল্লীর ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এইখানে দুইটা প্যাগোডা দেখা গেল। একটার সম্মুখে আসিলাম। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধস্তূপ। তেরটা ছাদ আছে—আকৃতি অষ্টকোণ। ইহার গাত্রে নানা-মুদ্রা সমন্বিত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। সহস্রহস্তবিশিষ্ট সহস্রাক্ষ দেবতার মূর্ত্তিও দেখিলাম। বহুসংখ্যক প্রহরীদেরও আছে। সমস্তটা গিরিমাটির বর্ণে রঞ্জিত—বলা বাহুল্য সংস্কারাভাব। প্যাগোডা মৃত্তিকার ইষ্টকে গঠিত। এই ধরণের প্যাগোডা নূতন দেখিলাম।

বৌদ্ধ প্যাগোডা হইতে অল্প দূরে তাওয়িষ্ট ধর্ম্মীদিগের প্রধান মন্দির। কন্‌ফিউশিয়াস যখন চীনে তাঁহার মত প্রচার করিতেছিলেন লাওট্‌জে তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নূতন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। ভারতবর্ষেও ইঁহাদের সমসাময়িক দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক আবির্ভূত হন—বুদ্ধ ও মহাবীর। বৌদ্ধ, জৈন, কন্‌ফিউশিয়ান এবং তাওয়িষ্ট—এই চারি মতবাদ প্রায় এক সময়ে জগতে দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জৈন এবং তাওয়িষ্ট বেশী প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। অন্য দুইটিই জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যেমন বৌদ্ধ ও জৈনের মন্দির মূর্ত্তি মতবাদ ইত্যাদিতে প্রভেদ বুঝিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য আবশ্যক, চীনেও সেইরূপ কনফিউশিয়ান

ও তাওয়িষ্ট সম্প্রদায়দ্বয়ের পার্থক্য বুঝা সহজ নয়। কালে বহু বৌদ্ধ ও কনফিউশিয়ান অনুষ্ঠান লাওট্‌জের ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

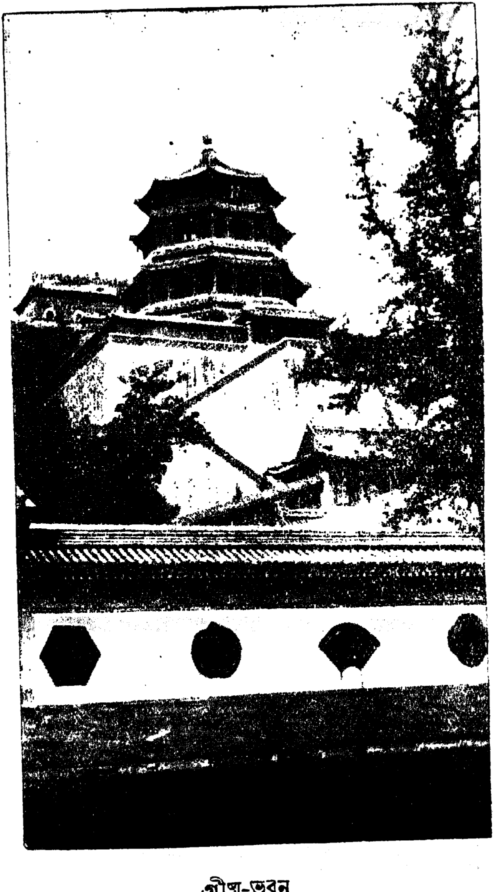
মন্দিরের ভিতর ৩০০ পুরোহিতের বাস। ইহারা অবিবাহিত। মন্দিরের জমিজমা বেশ আছে। দোভাষী বলিলেন—"মাঞ্চু সম্রাট্‌গণ তাওয়িষ্টদিগের জন্য বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া রাখিয়াছেন।"

পুরোহিতেরা চুলের ঝুঁটি মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের টিকি নাই—মাথার সম্মুখ ভাগ কামানও ইহাদের অভ্যাস নয়। উড়িয়া অথবা সরযূপারীণ ব্রাহ্মণগণের চেহারা দেখিতেছি না। চীনের তাওয়িষ্ট পুরোহিতদিগকে শিখসম্প্রদায়ের গুরুগণের অনুরূপ বোধ হইল।

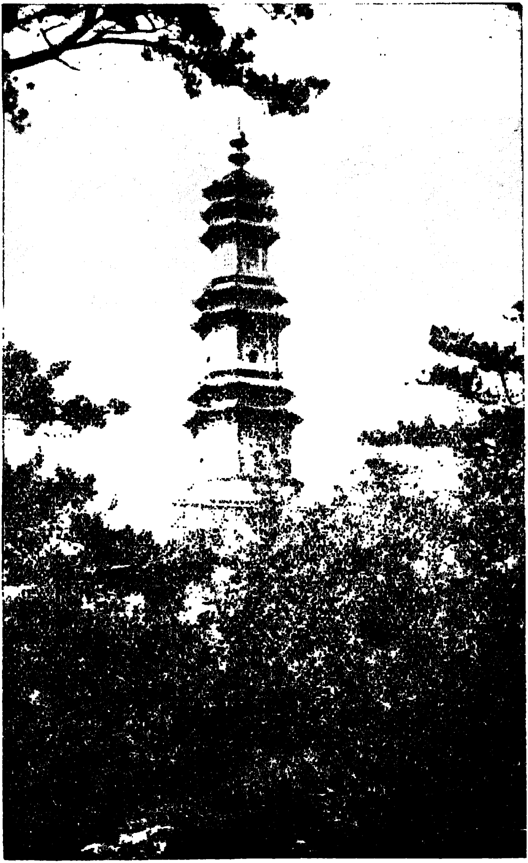
মন্দিরের মধ্যে কাষ্ঠমূর্ত্তি অনেকগুলি দেখিলাম—বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। ধূপদান, বাতিদান ইত্যাদি রহিয়াছে। কাষ্ঠফলকে, দেবতার নামও লেখা আছে।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে অনেকগুলি সৌধ, বাগান ইত্যাদি দেখা গেল। একটা সুন্দর ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চও আছে। প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বস্থিত বারান্দায় শ্রোতৃমণ্ডলীর বসিবার আসন প্রদত্ত হয়। মঞ্চের সম্মুখে একটা গৃহ—ইহাতে পাঠচর্চ্চার বন্দোবস্ত আছে।

কোন মতবাদ যখন প্রথম প্রচারিত হয় তাহার রূপ তখন যেমন থাকে পরবর্ত্তীকালে তেমন থাকে না। সমাজের নানাঘটনার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে। [illegible] মাত্রেরই এই দশা। এই কারণে সুপ্রাচীন চীনাসমাজে যে মন্দিরই দেখি না কেন সকলগুলির মধ্যেই একটা পরিবারগত সাম্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধ, কন্‌ফিউশিয়ান, মুসলমান, তাওয়িষ্ট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদি পরস্পর-প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই তাওয়িষ্ট প্রতিষ্ঠানে আদিগুরু



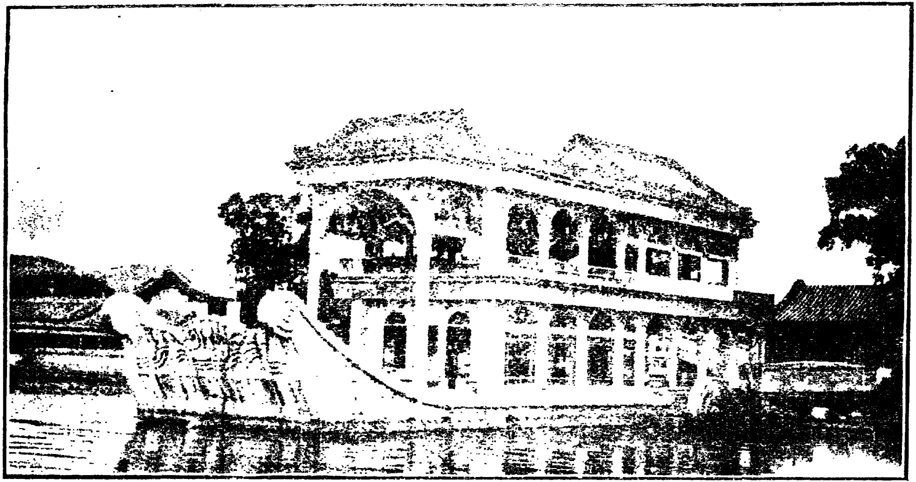
গ্রীষ্ম-ভবন



গ্রীষ্ম-ভবনের প্যাগোডা



পশু-মূর্তির সারি (মিঙ সমাধি-মণ্ডলে)



মর্ম্মর-নৌকা,—গ্রীষ্ম-ভবন

লাওটজের পরিচয় পাইলাম কি না জানি না—চীনের সমাজ বুঝিতে কষ্ট হইল না।

৭। জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর

পৃথিবীর "সপ্ত আশ্চর্য্য" জনক বস্তুর কথা ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। মিশরে পিরামিড দেখিয়া, একটা সাধ মিটিয়াছিল। আজ চীনের "গ্রেটওয়াল্" বা বিরাট প্রাচীর দেখিতে বাহির হইলাম। ইহাও দুনিয়ার একটা বিস্ময়জনক কাণ্ড।

হোটেল হইতে রিকৃশতে রেলষ্টেসনে আসিলাম। লাগিল প্রায় এক ঘণ্টা। পথে একটা শোভাযাত্রা দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—"কন্ফিউশিয়ানধর্ম্মীরা মৃতব্যক্তির সৎকার করিবার জন্য এইরূপ সমারোহ করিয়া থাকে।" একটা প্রকাণ্ড মঞ্চের মধ্যে শব রক্ষিত—বহু লোকে ইহা বহিয়া লইয়া যাইতেছে। নানাপ্রকার কাগজের বাগান এবং মানুষের মূর্ত্তি বহন করিয়া বহুসংখ্যক কুলি অগ্রসর হইতেছে।

ষ্টেসনে পৌঁছিলে মোসাফেরখানার ভৃত্যেরা এক পেয়ালা গরম চা দিল। গরম জলে ভিজান একখানা তোয়ালেও পাইলাম। চীনাদের দস্তুরই এইরূপ দেখিতেছি। রেলে বসা গেল। পিকিঙ্ সহর ছাড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা। পথে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীনের সুপরিচিত ভুট্টা, বজরা, জাওয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্র। অল্প দূরেই সম্রাট্গণের একটা বিলাসভবনের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। দোভাষী বলিলেন—"উহার নাম গ্রীষ্মপ্রাসাদ। ইহা প্রস্তুত করিতে সম্রাটেরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পর্য্যটক মাত্রেই এই প্রাসাদ দেখিতে আসে।" খানিক পরে একটা সমর-বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী দেখিতে পাইলাম। ষ্টেসনে নীল-বসনাবৃত নরনারী, জাপানি শকট, কুল-তরমুজ-ডিম-বিক্রেতা এবং পল্লী-

কুটির ও গ্রাম্যপথ কাহারও চোখ এড়াইতে পারে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ন্যান্-কাও ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পিকিঙ্ হইতে এই স্থান ৩৩ মাইল। ষ্টেসনের নিকটে এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কলযন্ত্র ও আসবাবপত্রের পরিচয় পাওয়া গেল। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটা সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। এই পথে সওদাগরদিগের উষ্ট্রযান অনেক দেখা যায়।

'ন্যান্' শব্দের অর্থ দক্ষিণ, 'কাও' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ। এই পল্লী দক্ষিণ পথ। মঙ্গোলিয়ার পাহাড় হইতে চীনে প্রবেশ করিতে হইলে এই পথেই আসিতে হইত। এই ধরণের আরও কতকগুলি "কাও" বা "পাস্" আছে বটে—কিন্তু ন্যান্কাওই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই পাসের ভিতর দিয়া চীন হইতে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সাইবিরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ ইত্যাদি সকল জনপথে যাওয়া-আসা চলিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপোলো এই পথেই চীনে আসিয়াছিলেন।

ভারতীয় খাইবার পাস, বোলান পাস্ ইত্যাদির নাম শুনিয়াছি। চীনে আসিয়া একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিপথ স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ হইল। ন্যান্কাও ষ্টেসন হইতে ১১ মাইল পর্য্যন্ত এই পাস বা সঙ্কীর্ণ পথ। রেল নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ী চলিতে লাগিল। দুইধারে তরুহীন পর্ব্বতমালা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রকৃতির সৃষ্টিতে "কাও" নিতান্ত সঙ্কীর্ণই ছিল। এঞ্জিনিয়ারদের হাতে পড়িয়া "কাও" বেশ প্রশস্ত হইয়াছে।

দোভাষী বলিলেন—"মহাশয়, চীনের প্রায় সকল রেলপথই বিদেশী এঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। কিন্তু এই যে পথে যাইতেছি ইহা আমাদের খাঁটি স্বদেশী। একমাত্র চীনা এঞ্জিনিয়ারেরা এই রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অথচ এই পথ প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ও বিদ্যাসাপেক্ষ



ড্র্যাগন,—গ্রীষ্ম-ভবন



ঘাস-বাহী চীনা গ্রামিক

বিবেচিত হইয়াছিল। এগার মাইলের মধ্যে স্যান্-কাও হইতে ১৯০০ ফুট্ উচ্চ ভূমিতে আমরা উঠিব!"

কোন কোন স্থানে প্রাচীর বেষ্টিত পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। একটার সম্বন্ধে দোভাষী বলিলেন—"এই নগরে স্যান-কাও পাসের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রহরীর কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। মিঙ্ সম্রাট্‌গণের আমলে এই নগর স্থাপিত হয়।"

এই পথে পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি মনোহর। স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ উচ্চ গিরিশৃঙ্গে দেখিতেছি, কোথাও বা নিম্নতম পাদদেশে দেখা যাইতেছে। তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালায় ইষ্টক-প্রাচীরের গতি সর্পাকৃতি বোধ হয়।

একস্থানে দোভাষী বলিলেন—"এই সহরে একটা সুন্দর মর্ম্মরতোরণ আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিঙ্ সম্রাট্‌গণের আমলে ইহা নির্ম্মিত। বহুসংখ্যক সুন্দর বৌদ্ধমূর্ত্তি এই ফটকে খোদিত দেখিতে পাই। ছয় ভাষায় এবং ছয় প্রকার লিপিতে কতকগুলি বৌদ্ধসূত্রও ফটকগাত্রে অঙ্কিত আছে।"

ফরাসী পণ্ডিতের লিখিত গাইড্‌বুকে দেখিলাম প্রথম সংস্কৃত লিপি এইরূপ :—"সর্ব্ব-দুর্গতি-পরিশোধন-উষ্ণীষধারণী।" দ্বিতীয় সংস্কৃত লিপি :—"সমন্ত-মুখ-প্রবেশ-রশ্মিবিমোলোষ্ণীষ-প্রভা-সর্ব্ব-তথাগত-হৃদয়সমবিরোচন-ধারণী।"

চীনা ভাষায় যে লিপি খোদিত আছে তাহার ইংরেজী অনুবাদ নকল করিয়া দিতেছি :—

"Oh! Admirable! Adoration to the Dharmakaya and to the three jewels. Venerable origin, principal middle and end of all that has shape and appearance, perpetually happy, we .....the thirty-seven Bodhi without

obstacle......sleep and awakening in fact not...the wheel of the Law Nirvana...Our Buddha the union of the priesthood, the victory over the six masters, the deeply beneficent knowledge of the master who answers (abhidharma), longevity, the ensemble of the lotus, the happy gate of the mahabodhi, who increases and sustains a long career, the eight actions to Kapilavastu, to Mokie (Magadha ?), to Va(ranasi)...the kingdom of Sravasti...to establish for the first time a pagoda.

ফটকগাত্রস্থিত মোগল ভাষায় লিখিত মঙ্গলাচরণের ইংরেজী অনুবাদ এই :—

Om Swasti ? May peace and prosperity reign ! He who is gifted with this quality, that has triumphed over colour, shape, corporcity and substance.

He who in the renunciation of illusion from top to bottom [?], before and behind,

And who in the eternal liberation of the ego added to really pure joy,

Has reached the summit before the majestic Dharmakaya, I bow the head.

ভারতমণ্ডল চীনসাম্রাজ্যের উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিমে কিরূপ বিস্তৃত ছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই গিরিপথের লিপিতে আজও তাহা বুঝিতে পারি। "বৃহত্তর ভারতের" ইতিহাস না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হইবে না। এইজন্য সমগ্র এশিয়াকে ভারতের ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানক্ষেত্র করিতে হইবে। সংস্কৃতভাষা, দেবনাগরী অক্ষর এবং বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাট প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী গিরিদুর্গে দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অবশেষে মহাপ্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছিলাম। মুকডেন হইতে



শব-যাত্রা



মহা-দেওয়াল

পিকিঙ্ আসিবার পথে সান্-হাই-কোয়ান ষ্টেসনে বিরাট প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানেও প্রাচীর-ভঙ্গের পরিচয় পাইলাম। ষ্টেসন হইতে মাইলখানেক পদব্রজে যাইয়া একটা ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। ফটকটা দেখিতে দুর্গের প্রবেশ-পথের মত। ফটক পার হইয়া মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে পদার্পণ করিলাম। দোভাষী বলিলেন—"আমরা যে রেলপথে আসিয়াছি তাহা মহাপ্রাচীরের নিম্নস্থিত সুড়ঙ্গের সাহায্যে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে গিয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখুন অদূরে একখানা মালগাড়ী সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইল।"

এইবার মহাপ্রাচীরের উপর উঠিলাম। উচ্চতা প্রায় ২৭ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৩০ ফুট। সাধারণতঃ পার্ব্বত্য সুরকির ইটে প্রাচীর নির্ম্মিত। নিম্ন-ভাগে কোথাও কোথাও প্রস্তর আছে। প্রাচীরের উপরিভাগে বহুসংখ্যক পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ বা প্রহরী-শালা দেখিলাম। এই সমুদয়ে সৈন্যগণ বাস করিত। প্রত্যেক মাইলে এইরূপ প্রহরী-গৃহ তিনটা করিয়া আছে।

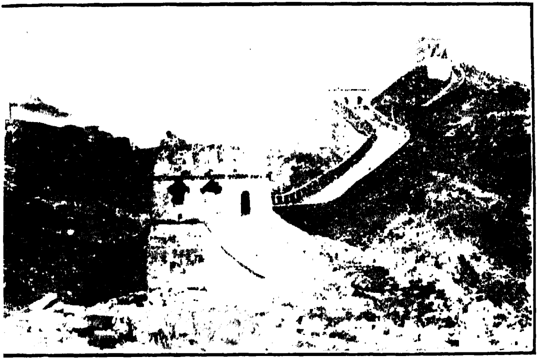
স্যান্কাও পাসের নিকট ভূমি আগা-গোড়া পর্ব্বতময়, কাজেই তরঙ্গায়িত ও সর্পগতি পর্ব্বতশৃঙ্গের শিরোদেশে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীরের প্রত্যেক অংশ হইতে কোন গিরিদুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছি মনে হয়। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের গঠন দুর্গ-দেওয়ালেরই অনুরূপ। সৈন্যগণ সুরক্ষিত থাকিয়া শত্রু ধ্বংস করিবার সুযোগ পায়।

চীনদেশের উত্তরে মঙ্গোলিয়া। প্রাচীনকালে মোগলজাতি দুর্দ্দান্ত ও লুণ্ঠনপ্রিয় ছিল। চীনারা বহুবার তাহাদের উৎপাত সহ্য করিয়াছে। মোগলবংশসম্ভূত চেঙ্গিজ খাঁর দৌরাত্ম্য এশিয়া ও ইউরোপের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ইহাত অল্পকালের কথা। কিন্তু চীনারা চেঙ্গিজ খাঁর বহু পূর্ব্ব হইতেই মোগল উপদ্রব ভুগিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতেই চীনসম্রাট্গণ মোগল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাম্রাজ্যের

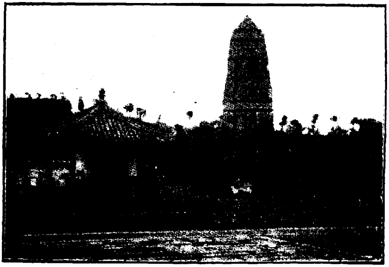
উত্তরসীমায় স্থানে-স্থানে প্রাচীর নির্ম্মাণ-করেন। কোন একজন রাজা বা সম্রাট্ সমগ্র প্রাচীর নির্ম্মাণ করান নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ২১০ সালে স্থু-হুয়াঙ সম্রাট্ সকল চীনা প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। তিনি ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীরগুলি যথারীতি সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করিয়া এক বিরাট প্রাচীর সৃষ্টি করেন। এইজন্য সাধারণ ভাবে চীন সাম্রাজ্যের ঐক্যস্থাপয়িতাকে বিরাট প্রাচীরের প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নর-পতিদিগের আরব্ধকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সান্-হাই-কোয়ানের নিকট প্রাচীর পীতসাগরে মিশিয়াছে—পশ্চিমে মঙ্গোলিয়ার শেষসীমা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। মোটের উপর ২৫০০ মাইল প্রাচীরের দৈর্ঘ্য। সমস্ত চীনদেশটা যেন একখানা প্রাসাদ—সম্রাটের নিজ সম্পত্তি; তাহার এক দিককার বেড়াই এত লম্বা। প্রাচীন কালের রাষ্ট্রশাসন এইরূপ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত নীতি অনুসারেই পরিচালিত হইত।

পঁচিশ শত মাইলের সর্ব্বত্রই পর্ব্বত নাই, কাজেই প্রাচীর বহুস্থানেই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। সকল কেন্দ্রের অংশই সুগঠিত বা বা সুরক্ষিত ছিল এরূপ বলা যায় না। তবে ন্যান্-কাও পাসের সমীপবর্ত্তী অংশ সকল দিক হইতেই গৌরবজনক। যথাকালে দেশরক্ষার জন্য এখানে দুর্গের কার্য্য যেরূপ হইত আজ দেখিবার জিনিষ হিসাবেও এখানে সেইরূপ যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতেছি—এত বড় দেওয়াল প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা ছিল কি? দেওয়াল প্রস্তুত করিতে এবং রক্ষা করিতে যত খরচ পড়িয়াছিল তাহাতে কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইতে পারিত না কি? অধিকন্তু সেনাবিভাগকে সুশিক্ষিত করা যাইত না কি? অথচ এই প্রাচীরের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত দেশ রক্ষা হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল কুব্‌লা খাঁ চীনসাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। আবার সপ্তদশ



মহাপ্রাচীর (৪৩-৫০ পৃষ্ঠা)



বজ্রশীর্ষ প্যাগোডা

(১৬১ পৃষ্ঠা)

শতাব্দীতে মাঞ্চুরাজ চীনের সম্রাট্ হইলেন। ইঁহারা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যখন চীনে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাদিগের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

বিরাট প্রাচীর একটা বিরাট পাগ্‌লামির সাক্ষ্য-স্বরূপ আজ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনতম কালের কোন সময়ে হয়ত ইহার সার্থকতা ছিল। কিন্তু অল্পকালের ভিতরেই উহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য বিংশ শতাব্দীতে ইহার কোন মূল্যই নাই। বরং ইহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করাই কঠিন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল "গ্রেট্ ওয়াল্" বা মহাপ্রাচীরই কালে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। আজকাল ইয়াঙ্কিরা যখন "মন্‌রো-নীতি"র দোহাই দিয়া ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বহির্ভূত করিতে চাহে তখন দুনিয়ার লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারে কি? অথচ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিদের এই "বহিষ্কারনীতি" বা "মহাপ্রাচীর" দুনিয়ায় যথেষ্ট সমাদৃতই হইয়াছিল। প্রাচীর, বন্ধন, আবেষ্টন, নিয়ম, সূত্র, শাস্ত্র, রীতি, নীতি ইত্যাদি যাহাই দেখি না কেন—কোন জিনিষই চিরকালের জন্য নয়। যথাসময়ে ইহাদের মূল্য ফুরাইয়া আসে, তখন এইগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক সময়ে আপনা-আপনিই ভাঙ্গে অথবা বাহির হইতে সামান্য আঘাত পাইলেই ভাঙ্গে। এইরূপে প্রাচীর-গড়া ও প্রাচীর-ভাঙ্গা মানবেতিহাসের বিভিন্ন স্তম্ভ স্বরূপ। প্রত্যেক দেশে বহুসংখ্যক "চীনা-প্রাচীর" উঠিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—আবার উঠিবে আবার ভাঙ্গিবে। হে চীনের বিরাট প্রাচীর, তোমার গড়নে-ভাঙ্গনে দুনিয়াবাসী সংসারের চরমজ্ঞান লাভ করিতেছে—"আজ যাহা সৎ, কাল তাহা অসৎ হইতে পারে। আজ যাহা বিদ্যা, কাল তাহা অবিদ্যা হইতে পারে। আজ যাহা নীতি, কাল তাহা দুর্নীতি হইতে পারে। আজ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া পূজ্য, কাল তাহা অধর্ম্ম জ্ঞানে বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে।"

রাত্রিকালে হ্যানকাও পল্লীতে ফিরিলাম। রেলওয়ে হোটেলে বাস করা গেল। প্রায় আমাদের দেশী ডাকবাঙ্গলার মত এই পান্থনিবাস। হারিকেন লণ্ঠন এবং মোমবাতীর ব্যবহার বহুদিন পরে করিতে হইল। দুইজন ইয়াঙ্কি আজ এইখানে অতিথি—ইঁহারাও পর্য্যটক। একজন বার বৎসর হইতে চীনে আছেন—ক্যাণ্টনে খৃষ্টান বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক —ক্যাণ্টনী উপভাষায় কথা কহিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগী ইন্‌ষ্টি-টিউশনের ভূগোলবিভাগ হইতে ইনি চীনের ভিতর অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। মিঙ্‌ সম্রাট্‌দিগের গোরস্থান

পারস্য, চীন, ল্যাটিন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্র নিতান্ত অনুন্নত। এই সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় ভূগোলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগী ইন্‌ষ্টিটিউশন তাঁহাদের ভূগোল-শাখার সাহায্যে এই সমুদয় অনুন্নত জনপদের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। চীনপর্য্যটক পাদ্রী মহাশয় বিগত বার বৎসর চীনের প্রত্যেক প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। এক্ষণে মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান, তিব্বত-সীমান্ত ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যুন্নান প্রদেশ ইত্যাদি দর্শনে বাহির হইয়াছেন। অন্ততঃ ছয় মাস লাগিবে। এই যাত্রায় ইনি একাকী নন। ইয়াঙ্কিস্থান হইতে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী ইঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবার জন্য চীনে আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের অনুসন্ধান ও পর্য্যটন ভারতবাসীর মধ্যে এখনও আরম্ভ হয় নাই। অবশ্য কথায়-কথায় আমরা তিব্বতপর্য্যটক শরচ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।

ভৌগোলিক মহাশয় মঙ্গোলিয়া-যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকিলেন। আমি অদূরে ১১ মাইল মাত্র সফরের জন্য বাহির হইলাম। গর্দ্দভপৃষ্ঠে যাইবার আয়োজন ছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখিয়া পাল্কী-সদৃশ চেয়ার



জগৎ-প্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর

(৪৭ পৃষ্ঠা)



মিঙ্-সম্রাট্‌দিগের গোরস্থান

(৫১ পৃষ্ঠা)

যান ভাড়া করা গেল। দোভাষী গর্দ্দভই পছন্দ করিলেন। মিঙ্ সম্রাট্-গণের কবর দেখিতে চলিয়াছি। মোগোলদের পর এবং মাঞ্চুদিগের পূর্ব্বে মিঙ্বংশীয় সম্রাট্গণ চীনে রাজত্ব করেন। ১৩৬৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৪৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহঁাদের রাজত্ব কাল। মোগল ও মাঞ্চু-আমলে চীনারা পরাধীন-ভাবে জীবন যাপন করিত—মিঙেরা চীনের স্বদেশী রাজা। এই জন্য চীনা সমাজে ইঁহাদের আদর অত্যধিক। ১৯১১ সালে সুন-ইয়াৎ-সেন প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের ফলে মাঞ্চুদের সিংহাসন-চ্যুতি হয়। তাহার দ্বারা চীনে পরাধীনতা বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে-সঙ্গে প্রজাতন্ত্র-শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীয় রাজগণের শাসন নষ্ট করিয়া বিপ্লবের ধুরন্ধরগণ মিঙ্ সম্রাট্দিগের কবরে স্বাধীনতা-লাভের উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নব্য রিপাব্লিক যেন মিঙ্বংশের ধারাই বহন করিতে চলিল।

প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছি। সুপরিচিত চষা জমি; শাক, আলু তিল, জাওয়ার ও ভুট্টা ছাড়া মাইলের পর মাইল অন্য কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না। বামদিকে ও সম্মুখে অনতিদূরে নীল পর্ব্বতমালা। সম্মুখস্থ পর্ব্বতমালার পাদদেশেই কবরসমূহ অবস্থিত।

দু-একটা পল্লী পথে পড়িল। ইটের ঘর বাড়ী ও প্রাচীর। ইটগুলি রৌদ্রে শুকান আগুনে পোড়ান নয়। দুই-একটা বালুকাময় এবং শীলাখণ্ড-বহুল ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইতে হইল। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে মাল চালান হই-তেছে। শুনিলাম অন্য সময়ে উষ্ট্র-যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

জাপানের যে-কোন স্থানেই যাই না কেন সর্ব্বত্রই দেখিবার বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। পর্য্যটকগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যবসাদারেরা নানাপ্রকার আয়োজন করিয়াছেন। ছবি, ছাপা, হোটেল, সরাই ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গাই প্রচুর। এই হিসাবে জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের সমান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চীনের কোথাও পর্য্যটকগণের

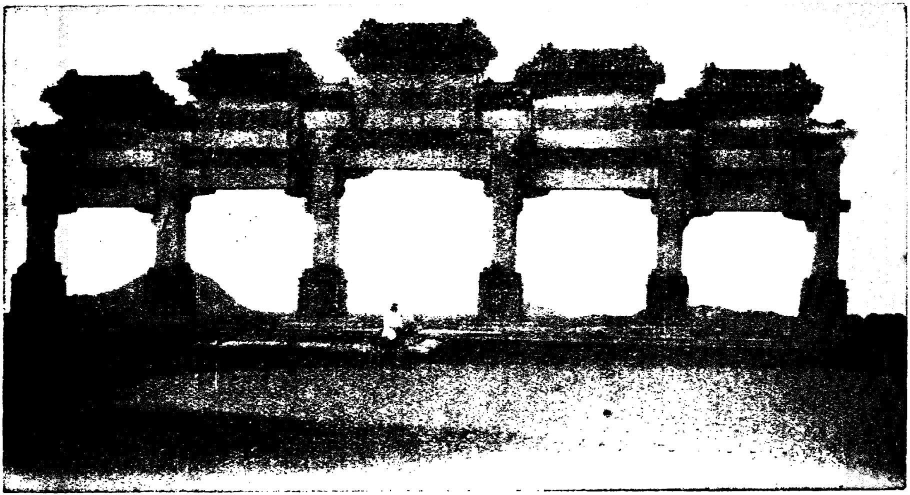
জন্য কোন প্রকার সুবিধা নাই। ছবি ছাপা ইত্যাদি ত' দূরের কথা—অতি রমণীয় দৃশ্যসমূহও যত্নাভাবে সংস্কারাভাবে মলিন রহিয়াছে। সুদূর বিরাট প্রাচীর মিঙ্-কবর ইত্যাদির ত কথাই নাই পিকিঙ্ সহরের মধ্যেই প্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য বস্তুসমূহ লোকজনকে দেখাইবার জন্য কোন আয়োজন নাই। চীনাপ্রদর্শক এবং দোভাষী মহাশয়গণও নিতান্ত অপটু ও কাঁচা লোক।

পাচ ছয় মাইল আসিয়া একটা সুশ্রী তোরণ দ্বার দেখিতে পাইলাম। আগাগোড়া শ্বেতমর্ম্মরে এইটি গঠিত। ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে পাচটা প্রবেশ পথ আছে। ফটকগাত্রে সুন্দর-সুন্দর নক্সা দেখা গেল। ড্রেগন-চিত্রের প্রভাব নাই কোথায়? অধিকন্তু এইখানে দুই সিংহের লড়াই কতকগুলি প্রস্তরগাত্রে দেখিতে পাইলাম। ফটক প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ এবং ৮০ ফুট প্রশস্ত। দ্বিতীয় মিঙ্ সম্রাট্ ইহা প্রস্তুত করেন—একজন আধুনিক মাঞ্চু-রাজ ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। সমগ্র চীনদেশের বাস্তুশিল্পে এই মর্ম্মরতোরণ বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করে।

মর্ম্মর ফটক হইতে আরও পাচ ছয় মাইল দূরে কবরপল্লী পর্ব্বতমালার পাদদেশে। ইহার পর একটা লালবর্ণ ফটক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সকলদিকেই পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতেছি। কিয়ৎকাল পরে একটা দ্বিতল ফটকসদৃশ গৃহের ভিতর কূর্ম্মের উপর স্মৃতিফলক দেখিলাম। ইহাতে প্রথম মিঙ্ সম্রাটের গুণ কীর্ত্তিত আছে। এই গৃহের চারিদিকে চারিটা গোলাকার মর্ম্মরস্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভগুলির গাত্রে বিচিত্র সর্পসদৃশ জন্তুর মূর্ত্তি খোদিত। শিরোদেশে কুক্কুরজাতীয় জীব পথের প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। স্মৃতিফলকের উপর মাঞ্চুসম্রাট্ মিঙ্ বংশীয় নরপতিগণের চরম প্রশংসা উৎকীর্ণ করাইয়াছেন।



মিঙরাজের সমাধি-ফলক



মিঙবংশের গোরস্থান

এইবার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। মিশরে মন্দিরাদির প্রবেশ পথে স্ফিংসের সারি দেখিয়াছিলাম। চীনা মিঙ্ কবরের প্রবেশ পথে প্রায় সেই ধরণের প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহের শ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রথমে দুইটা স্তম্ভ। ইহাদের গাত্রে মেঘ খোদিত হইয়াছে। তাহার পর চারিটা করিয়া সিংহ, মেষ, উষ্ট্র, হস্তী, ইউনিকর্ণ এবং অশ্ব। জন্তুগুলির দুইটা করিয়া উপবিষ্ট দুইটা করিয়া দণ্ডায়মান। তাহর পর চারিজন করিয়া মন্ত্রী (বা ম্যাণ্ডারিন) এবং সশস্ত্র সুসজ্জিত সেনাপতি। মানবমূর্ত্তিগুলি সবই দণ্ডায়মান।

মূর্ত্তীসমূহ সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত—কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ এইগুলিতে লক্ষ্য করিলাম না। সকলগুলিই যেন নিৰ্জ্জীব, নিরেট, স্পন্দন-হীন—কোথাও ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। উষ্ট্র মূর্ত্তিগুলি চলনসই বলা যাইতে পারে।

সিংহমূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে দোভাষী এক কাহিনী বলিলেন। এই জনপদের এক কৃষক কয়েক দিন রাত্রিকালে সিংহের স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয়। তাহার ধারণা জন্মে যে, সিংহের মুখ তাহার ঘরের দিকে বলিয়া তাহার পরিবারে অমঙ্গল ঘটিতেছে। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া সে সিংহগুলিকে ভাঙ্গিতে চেষ্টিত হয়। অবশ্য পুরাপুরি ধ্বংস সাধিত হয় নাই।

আবার কৃষিক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতেছি। খিলান-বিশিষ্ট প্রস্তর সেতুতে দু-একটা স্রোতস্বতী পার হওয়া গেল। অবশেষে প্রাচীর-বেষ্টিত কবরমন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

ফটক, প্রাঙ্গণ, কাঠের কাজ, ইত্যাদি সবই চীনের অন্যত্র যেরূপ এখানেও সেইরূপ। ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত—মর্ম্মরের ব্যবহার প্রচুর দেখিতেছি। চীনের স্বদেশী গৌরব পীত টালি এবং অন্যান্য বর্ণের এনামেলও আছে।

প্রথম প্রাঙ্গণের উপর একটা সুবৃহৎ অট্টালিকার ভিতর সম্রাটের গুণ কীর্ত্তিত রহিয়াছে। ছাদ দ্বিতল। সুদৃঢ় কাষ্ঠস্তম্ভ এই ভবনের বিশেষত্ব।

ইহার পর আর-একটা প্রাঙ্গণ। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত ফুলদান, বাতিদান ইত্যাদি রক্ষিত। ইহার পর শেষ অট্টালিকা। নিম্নতলস্থ পথ দিয়া উর্দ্ধে উঠিলাম। দ্বিতলে একটা স্মৃতিফলক। এই অট্টালিকার পশ্চাতে পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ। ইহাই কবর। সিউলে ও মুক্‌ডেনে এই ধরণের কবরই দেখিয়াছি।

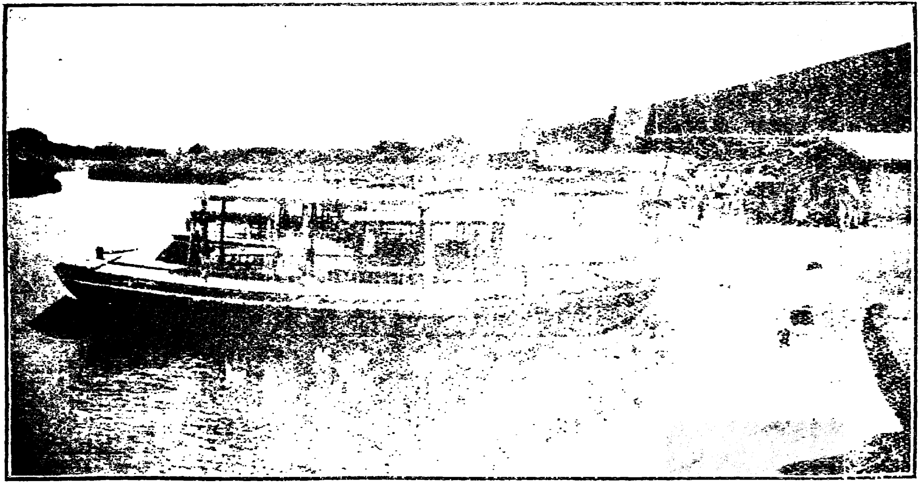
তৃতীয় মিঙ্‌ সম্রাট্ এই কবরে শায়িত। এই কবরের চীনা নামের অর্থ "বিরাট কবর।" সম্রাটের নাম ইয়ুঙ্‌লু। এই ধরণের আরও বারটা কবর এই স্থানে আছে। সকলগুলির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা একই ধরণে বিন্যস্ত।

এই বিরাট কবর সকলগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ১৯১১ সালে সুন-ইয়াৎ-সেন এই কবরেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন করেন।

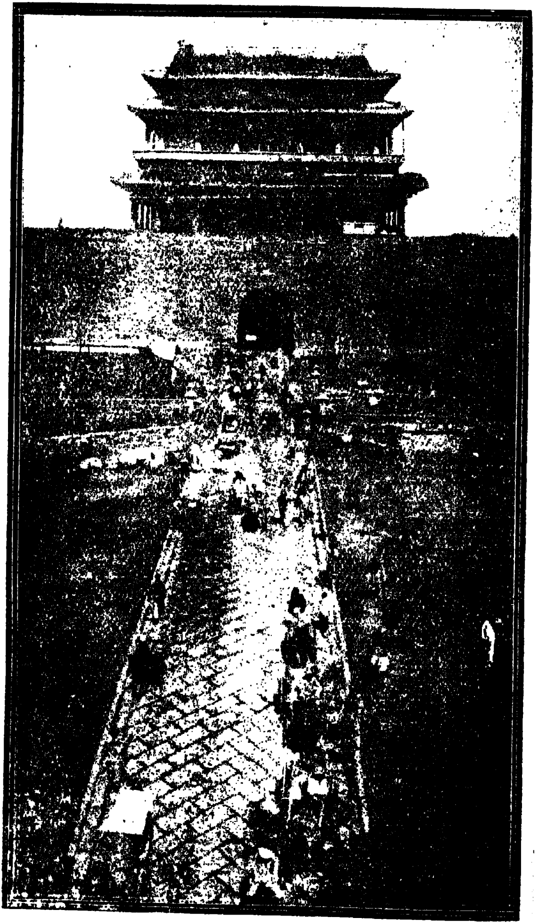
৯। চীনাদের জীবন যাত্রা

পিকিঙ-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যেরূপ গরম, শীতকালে সেরূপ ঠাণ্ডা। শুনিতেছি নদী তখন জমিয়া যায়, সমুদ্রবন্দরেও জাহাজের গতিবিধি স্থগিত থাকে। অথচ ভাদ্রমাসে এত গরম যে পশ্চিমখোলা কামরায় দিবাভাগে বসিয়া থাকা অসম্ভব। ইহার মধ্যে দুএকদিন বৃষ্টি হইয়া গেল—বৃষ্টির পরেই অনেকটা আমাদের কলিকাতার পৌষমাস পাইতেছি।

জাপানে কয়েকটা প্রসিদ্ধ বাগান দেখিয়াছি। পিকিঙে একটা দেখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। চীনা বাগানের অনুকরণেই জাপানী বাগানের উৎপত্তি—সুতরাং জাপানী বাগান দেখা থাকিলে চীনা বাগান দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ চীনের সকল জিনিষই জাপানে



পিকিঙের খাল



আছে—তবে জাপানী হাতে সেগুলি অধিকতর সুন্দর ও লাবণ্যময় দেখিতে পাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান যুগে জাপানী সমাজ জীবন্ত জাতি—এজন্য তাহাদের প্রাচীন বস্তুসমূহ সুরক্ষিত সুসংস্কৃত এবং স্থানে স্থানে সংশোধিত ও সম্মার্জ্জিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু চীনারা বর্ত্তমান কালে মৃতপ্রায় অবসন্নপ্রাণভাবে কোনরূপে দিনপাত করিতেছে। তন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা চীনে আরব্ধ হইয়াছে মাত্র, তাহার সুফল কবে ফলিবে এখনও বলা কঠিন। আর প্রাচীন জীবনের ধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও পঙ্কিল ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভবপর সন্দেহ হয়। অন্ততঃ তাহা দেখিলে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র বুঝা যায়।

মাঞ্চুবংশীয় শেষ সম্রাটের শেষ মন্ত্রী এই উদ্যানের অধিকারী ছিলেন। এক্ষণে ইহাতে রিপাব্লিকের সেনাপতিগণ একটা ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কৃত্রিম পাহাড়, নদী, সরোবর, সেতু, বক্রপথ, "কিওশ্‌ক" বা বিশ্রাম গৃহ ইত্যাদিও আছে।

পিকিঙের রাস্তাগুলি দেখিলে চীনাদিগকে যত অপরিষ্কার মনে হয়, কোন উচ্চ বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের গৃহে প্রবেশ করিলে সেরূপ অনুমান করিবার কারণ থাকে না। ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহ বাহির হইতে অনেকটা কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর মনে হইবে। কিন্তু ফটক পার হইয়া প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিলে আর সে ধারণা থাকে না। স্বাস্থ্য-জ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, পারিপাট্য ইত্যাদি চীনসমাজে যথেষ্টই আছে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের এইরূপ প্রভেদ খানিকটা ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর জাপানীরা চীনা ও ভারতবাসী অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলা যাইতে পারে। বিনা আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য ভোগ জাপানী সমাজে যেরূপ, সেরূপ বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই।

চীনাদের স্বদেশী হোটেল কয়েকটা দেখা গেল। ভারতবর্ষে হোটেলের

রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। গোয়ালন্দ দামুকদিয়া ইত্যাদি ষ্টেশনে ষ্টেশনে কতকগুলি ভাতের দোকান অছে সন্দেহ নাই। তাহাতে শুইবার থাকিবারও ব্যবস্থা হইতে পারে—হইয়া থাকেও। কিন্তু এই ধরণের হোটেলও ভারতবাসীর মজ্জায় বসে নাই—নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কোন ব্যক্তি হোটেলে আহার নিদ্রা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ঘরের আরাম হোটেলে পাওয়া অসম্ভব—ইহাই ভারতবাসীর ধারণা। বলা বাহুল্য ইয়োরামেরিকায় জনগণের ধারণা উল্টা—বরং ঘর অপেক্ষা ক্লাবে হোটেলেই খাওয়া থাকার সুখ বেশী অথচ খরচ অত্যন্ত অধিকও নয়। জাপানে সরাইগুলিও জাপানের খাঁটী স্বদেশী জিনিষ। সরাইয়ে বাস করিতে আসিয়া জাপানীরা গৃহবাসের সুখই ভোগ করে। জাপানীরা দরিদ্র জাতি, ইয়োরামেরিকানদের সমান অর্থব্যয় করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব—ইহাদের অশনবসনাদিও ভারতীয় মাপকাঠিতে উচ্চ অঙ্গের বিবেচিত হইবে না। কাজেই অল্প খরচে সরাইওয়ালীরা অতিথিগণকে গৃহবাসের আরাম প্রদান করিয়া থাকে। যে শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভারতবাসীর গোয়ালন্দের হোটেলে আহারাদি করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর জাপানীদের জন্যই জাপানে সরাইয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অথচ আমরা হোটেলে বাস নরকযন্ত্রণার মত বিবেচনা করি—কিন্তু জাপানী সরাইগুলিকে লোকেরা নিজের ঘর বিবেচনা করে। বস্তুতঃ হোটেল জিনিষটা ভারতবর্ষে বসে নাই। আমরা 'চটি'তে মুদীখানায় ও গাছতলায় রান্না করিয়া, অথবা নৌকার পাটাতনের নীচে উনন ধরাইয়া কিম্বা গরুর গড়ীর ছায়ায় হাঁড়ি চড়াইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। এই বিষয়ে আমাদের চরম আবিষ্কার "ধর্ম্মশালা" নামক পান্থ-নিবাস। আজকালকার "মহৎ আশ্রম" ইত্যাদির নামোল্লেখ এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কারণ এই ধরণের অতিথিশালা আমাদের নিজস্ব নয়—কাজেই চীনা ও জাপানীদের স্বদেশী সরাইয়ের সঙ্গে এই সমুদয়ের তুলনা চলিতে পারে না।

জাপানী ও চীনাদের পায়খানা আমাদের ভারতীয় পায়খানার অনুরূপ। পাশ্চাত্য কমোড্ বা চেয়ারাকৃতি ব্যবস্থা এশিয়ার কুত্রাপি নাই। বড় বড় চীনা হোটেলেও এইরূপই দেখিতেছি। ড্রেনের পায়খানা জাপানেও নাই, চীনেও নাই। এমন কি জলের কলই পিকিঙে আরব্ধ হয় নাই। সুতরাং কলিকাতার বাসিন্দারা মফঃস্বলে দুএকদিনের জন্য বেড়াইতে গেলে দুর্গন্ধময় পায়খানা ও নদী পাতকুয়ার জল দেখিয়া যেরূপ ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা চীনাদের স্বদেশী হোটেলে অথবা বন্ধুগৃহে বাস করিলে ঠিক সেইরূপই ভাবিবেন। বাঙ্গালী জানে যে, কলিকাতার "কলের জল এবং বালাম চাউল" পেটে পড়িলে দরিদ্রের ভবিষ্যৎ শোচনীয় হয়। বাস্তবিকপক্ষে বর্ত্তমান জগতের নূতনতম আরামদায়ক ব্যবস্থাগুলি সবই এইরূপ "জলের কল ও বালাম চাউল।" একবার এইসমুদয়ের মর্ম্ম বুঝিলে আর মফঃস্বলে বাস অসম্ভব হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষে পল্লীসমূহ উজাড় হইয়া যাইতেছে—কে ইহার গতি বন্ধ করিতে পারে? সমস্ত ভারতবর্ষকে কলিকাতার "কলের জল ও বালাম চাউল" না দিতে পারিলে পল্লী-সংস্কার সাধিত হইবে না। সেইরূপ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার যে কোন দেশের কথাই ধরি না কেন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক বার্লিন ইত্যাদির "জলের কল ও বালাম চাউল" সর্ব্বত্রই আমদানি অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপালনের যে-সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে সেগুলি দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িবে—যতদিন ছড়াইয়া না পড়ে ততদিন দুনিয়ার অবশিষ্ট অংশকে ইয়োরামেরিকা মফঃস্বলরূপে ঘৃণা করিবে—ইহা নিশ্চিত। জাপান স্বাধীনভাবে এই-সমুদয় প্রবর্ত্তন করিতেছেন—সুখের কথা। ভারতবাসীর সে ক্ষমতা বা সে সুযোগ নাই—চীনাদের ক্ষমতা আছে কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে স্বাস্থ্য-জ্ঞান এশিয়াবাসীকে ইয়োরামেরিকা হইতেই আমদানি করিতে হইবে সত্য। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোথাও আজকালকার আরাম পাওয়া যাইত না। কিয়োতো, মুক্‌ডেন, পিকিঙ্, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বাগদাদ, কায়রো ইত্যাদি নগরের কুত্রাপি ইয়োরোপের নগরপুঞ্জ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, পানীয় জল ও পায়খানা ছিল না। মধ্যযুগের ইয়োরোপ কোন কোন বিষয়ে এশিয়ার শিষ্য ছিল, গুরু কোন বিষয়েই নয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া এশিয়া ইয়োরামেরিকার শিষ্য, আরও কিছুকাল এই শিষ্যত্ব থাকিবে। নব্য ইয়োরামেরিকার সমকক্ষ হইতে এশিয়ার এখনও দেরি আছে। কাজেই আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে "ছোট মুখে বড় কথা" না বলিয়া বুদ্ধিমানের মতন নীরবে সাধনা করা কর্ত্তব্য।

পিকিঙের বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র দেখা যাইতেছে। এক পেয়ালা করিয়া দুগ্ধহীন চিনিহীন চা পান সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে। কিন্তু সৌজন্য শিষ্টাচারে জাপানীদের স্বভাব যত মধুর, চীনাদের যেন সেরূপ নয়। অতিথি-সৎকারে চীনাদের ধরণ-ধারণ অনেকটা ভারতবাসীর মতন। আমরা মুসলমানধর্ম্মীদিগকে আদব-কায়দা সম্বন্ধে অতিশয় মনোযোগী ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীরা মুসলমানদিগকেও পরাজিত করে। সুতরাং জাপানের মধুরতা চীনে দুর্ল্লভ। আমরা ঘরে লোক আসিলে হুঁকা-কল্কে ও একখিলি পান প্রদান করিয়া থাকি। চীনারা সেইরূপ চা "ইচ্ছা" করিতে বলে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জাপানীদের রকম-সকম দেখিলে অতিমাত্রায় মিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে এইজন্য দাসসুলভ নম্রতার দেশ বিবেচনা করিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করে। আমি পূরবী

লোক—জাপানী ভাবভঙ্গিতে গোলামি না দেখিয়া আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্দ অনুভব করিয়াছি।

চীনাদের ঘরবাড়ীগুলি ভারতীয় ধরণের। একটা উঠানের চারি ভিটিতে চারিখানা গৃহ নির্ম্মিত হয়—উঠানের আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও পবনদেবের স্বাধীন গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারি। খোলার ছাদ—পাথরের মেজে—ইট বা পাথরের দেওয়াল; কাঠের ব্যবহার অল্প। অবশ্য প্রায় গৃহই প্রাচীরবেষ্টিত।

রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম দুই সারি লোক রঙিন পোষাক পরিয়া কোন উদ্দেশ্যে চলিতেছে। কাহারও সঙ্গে নূতন জামা কাপড়, কাহারও সঙ্গে বাক্স পেটারা তোরঙ্গ ইত্যাদি। কয়েক জনে একটা সুবৃহৎ খাট বহিয়া লইতেছে। কয়েকজনের কাঁধে টেবিল, আলমারি, আয়না ইত্যাদির বাঁক। কেহ বা বিছানা বহিতেছে ইত্যাদি। কলিকাতায় কুটুম্বগৃহে "তত্ত্ব" পাঠাইবার দৃশ্য চোখের সম্মুখে উপস্থিত! দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এযে একটা বিরাট শোভাযাত্রা দেখিতেছি। ব্যাপার কি?" দোভাষী বলিলেন—"বরগৃহে কন্যাপক্ষ যৌতুক পাঠাইতেছেন। বিবাহোৎসব দুএক-দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। কন্যাদানের পূর্ব্বে অভিভাবকেরা কন্যার জিনিষপত্র শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।"

চীনে বিবাহপ্রথা পাশ্চাত্য ধরণের নয়—জাপানেও নয়। মোটের উপর ভারতীয় ব্যবস্থাই এই-সকল দেশে দেখিতে পাই। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে চিনে না, দেখেও না—কন্যাও বরকে চিনে না, দেখেও না। অসংখ্য যুবকযুবতীর মধ্যে পরস্পর আনাগোনা এবং ভাববিনিময় নব্য ইয়োরামেরিকার খাস আবিষ্কার। এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতেও আজকালকার "স্বাধীনতা" ছিল না। অনেক

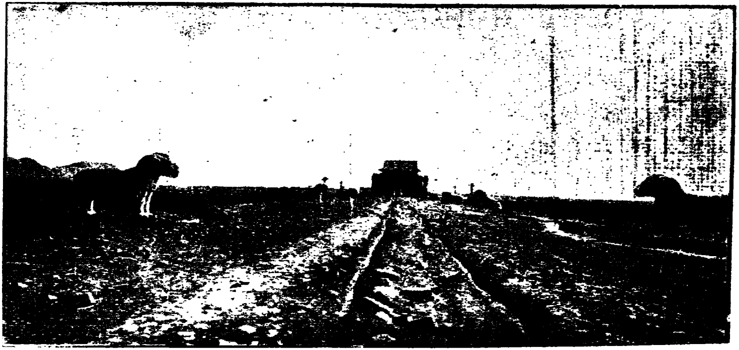
বাঁধাবাঁধির ভিতর বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হইত। বর্ত্তমানকালে স্বাধীন-ভাবে নিজের পছন্দসই স্ত্রী-নির্ব্বাচন ও স্বামী বাছাই জগতের আর কোথাও নাই। চীনেও নাই। এখানে পিতামাতা ও অভিভাবক-গণই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। ঘটক, গণক ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা চীনাসমাজে প্রচলিত আছে। বাপদাদাদের নামধাম চরিত্র ইত্যাদির সংবাদ না লইয়া বরপক্ষ অথবা কন্যাপক্ষ বিবাহে সম্মত হয় না। বিবাহের পর স্ত্রী ও স্বামীর ভবিষ্যৎজীবন সুখময় হইবে কি না তাহাও গণকেরা কোষ্ঠি বিচার করিয়া বলিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং চীনে ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই।

শুনিলাম—পূর্ব্বে বর কন্যাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিত। বিবাহোৎসব বরের গৃহে সম্পন্ন হইত। ইহাতে বরপক্ষের অর্থব্যয় যথেষ্ট—এজন্য আজকাল কন্যাপক্ষ নিজেই স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ বরের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই একমাত্র কন্যাযাত্রীর দল চীনে দেখা যায়—বরযাত্রী হইবার নিমন্ত্রণ চীনা সমাজে আর নাই।

বিবাহবেশে কন্যা পাল্কীতে করিয়া বরের গৃহে উপস্থিত হইলে বর স্বয়ং আসিয়া পাল্কীর দ্বার উন্মোচন করে। এই তাহাদের প্রথম দেখা বা "শুভদৃষ্টি"। তাহার পর উভয়ে যথাস্থানে গমন করিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রজ্বলিত বাতির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসে। এইখানে একজোড়া রাজহংস ও রাজহংসীর সম্মুখে বর জল ঢালিতে থাকে। চীনাদের বিবেচনায় এই পক্ষীযুগল দাম্পত্যপ্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এইজন্য কন্যা পিতৃগৃহ হইতে এই যুগলকে সঙ্গে লইয়া আসে। ইহাদের সম্মুখে বর ও কন্যা পরস্পরের নিকট চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তাহার



চীনা পাল্কী



পশু-মূর্ত্তির সারি (মিঙ সমাধ-মণ্ডলে)

তাহার পর বরের সম্মুখে কন্যা হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে—বরও শেষে কন্যার নিকট হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে। স্ত্রীস্বামীর সাম্য এইরূপে প্রদর্শিত হয়।

চীনাবিবাহের শেষ অনুষ্ঠান পিতৃপুরুষগণের সমাধিমন্দিরের অথবা স্মৃতিফলকের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের পিতা হাঁটু পাতিয়া পূর্ব্বপুরুষগণকে জানাইয়া দেন যে পরিবারের ভিতর এক নূতন ব্যক্তির আমদানি হইল। অবশেষে বর ও কন্যা স্মৃতিফলকের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসে। বিবাহের চারি পাঁচ দিন পরে স্বামী স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরগৃহে যায়—তখন কন্যার পিতা এক ভোজ দিয়া থাকে।

চীনা রমণীর আদর্শ একখানা প্রাচীন চীনাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি "The Spirit of the Chinese People" গ্রন্থে অধ্যাপক কু-হুং-মিঙ্ এই আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন। নব্য ইয়োরামেরিকার নবীনতম সমাজে রমণীর আদর্শ যাহা, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের লোক কু-হুং-মিঙের বিবৃত প্রাচীন আদর্শ সহজেই বুঝিতে পারিবে—যে কোন প্রাচ্য মানবের পক্ষেই ইহা বুঝা সহজ। এমন কি ইয়োরামেরিকার লোকেরাও কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রমণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ ধারণাই পোষণ করিত। সত্যকথা বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্যদেশে বহু নরনারী এই ধরণের রমণীই পছন্দ করিয়া থাকে।

কু-হুঙ্-মিঙের চরম মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—"The chief end of a woman in China is not to live for herself, or for society ; not to be a reformer or to be president of the 'Woman's Natural Feet Society" ; not to live even as a saint or to do good to the world ; the chief end of a Woman in China is to live as a good daughter, a good wife and a good mother."

হার্ভার্ডের জার্ম্মাণ অধ্যাপক মুনষ্টারবার্গ জার্ম্মাণ সমাজে প্রচলিত রমণী-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধ অনেকটা এইরূপ মতই প্রচার করিয়াছেন। জার্ম্মাণেরা রমণীকে প্রধানতঃ "হার্ডস ফ্রাও" বা গৃহকর্ত্রী ভাবে দেখিতে পছন্দ করে। এই হিসাবে আমেরিকার নবীন রমণী-সমাজ জার্ম্মাণ সমাজের বিপরীত।

কু-হুঙ্-মিঙ্ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানা চীনা গ্রন্থ হইতে রমণী-জীবনের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন। হান্-রাজবংশের আমলে প্যান্-কু নামক ঐতিহাসিকের ভগ্নী চাও এই গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকের নাম "নারীর প্রতি উপদেশ" অধ্যাপক কু বলিতেছেন "The Chinese feminine ideal, as it is handed down from the earliest times, is summed up in 'Three Obediences' and 'Four Virtues.'

গ্রন্থকর্ত্রীর মতে চারি প্রকার লক্ষণ সমন্বিতা হইলে নারীকে গুণবতী বলা যায়। এই চারিগুণের নাম—

(১) Womanly character বা নারীসুলভ নম্রতা ও সংযম

(২) Womanly Conversation বা নারী-শোভন শিষ্টাচার

(৩) Womanly appearance বা নারী-শোভন বেশবিন্যাস

(৪) Womanly work বা নারীসুলভ গৃহকার্য্য

আদর্শ রমণীর আর তিন প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"When a woman is unmarried, she is to live for her mother, when married she is to live for her husband and as a widow she is to live for her children." ভারতবাসী এই আদর্শে নিজের মনুর ব্যবস্থাই পাইবে—এবং চীনা জাতিকে, নিজের অন্তরঙ্গ আত্মীয় বিবেচনা করিবে সন্দেহ নাই।

চীনা সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ভারতে ও চীনে এই বিষয়েও ঐক্য আছে।

ইয়োরামেরিকার এবং এশিয়ার সমাজজীবন আগামী ২০, ২৫ বা ৫০ বৎসরের ভিতর কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি না। সমাজ, পরিবার, বিবাহ, রমণীজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন্ আদর্শ শ্রেষ্ঠ তাহাও আলোচনা করিতেছি না। মোটের উপর, এই মাত্র বুঝিতেছি যে, ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও চীনারা এবং ভারতীয় নরনারী একই পরিবারের অন্তর্গত। আমাদের ত্রিশ কোটি লোক এবং চীনের চল্লিশ কোটি লোক বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া একই আদর্শে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে। চীনা ও হিন্দুদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিলে ৭০ কোটি নরনারীকে এক সভ্যতার অন্তর্গত বিবেচনা করিতে বিশেষ কল্পনার আবশ্যক হয় না।

১০। চীন স্বরাজের ভবিষ্যৎ

চীনে আজকাল বিষম রাষ্ট্রীয় গোলযোগ চলিতেছে। ইংরেজি সংবাদপত্রের সাহায্যে যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে প্রধানতঃ তিনটা রাষ্ট্রীয় দলের পরিচয় পাওয়া যায়। মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট্‌দিগের দল প্রথম হইতেই 'স্বরাজ' বা রিপাব্লিক স্থাপনের বিরোধী রহিয়াছে। বিগত তিন বৎসর ধরিয়াই তাহাদের ষড়যন্ত্র চলিতেছে—পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপনের কথা বিশেষ জোরের সহিতই আলোচিত হইতেছে। মাঞ্চুবংশের উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাবও প্রচারিত হইতেছে।

এদিকে 'স্বরাজে'র সভাপতি য়ুয়ান্-শি-কাই প্রজাতন্ত্রশাসনের মুণ্ডপাত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছেন। ইঁহার ক্ষমতা অতি প্রবল—মাঞ্চুপক্ষীয়েরা ইঁহাকে কোন মতেই জব্দ করিতে পারিতেছেন

না। বরং য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের দল কাগজে কাগজে প্রচার করিতেছে—"চীনে প্রজাতন্ত্রশাসন টিকিতে পারে না। আমাদের সমাজে এখনও বহুকাল রাজতন্ত্রশাসনের ব্যবস্থাই আবশ্যক। মাঞ্চুবংশীয় নরপতিগণের আমলে বহুকাল পর্য্যন্ত কুশাসন চলিয়াছে। এই জন্য য়ুয়ান্-শি-কাইকে খোলাখুলি সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হউক। কারণ দেশে এক্ষণে ইঁহার মত সুবিবেচক ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই।" কিন্তু য়ুয়ান্-শি-কাই স্বয়ং প্রচার করিতেছেন—"আমি দেশমাতার নিকট প্রথম হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, চীনে রাজতন্ত্র পুনঃ স্থাপিত হইতে দিব না, প্রজাতন্ত্রশাসনই চীনে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টিত হইব, আমি রাজসিংহাসনে বসিতে চাহি না—আমাকে সম্রাট্ করিবার জন্য আন্দোলনসমূহ আমাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। যদি জবরদস্তি করিয়া আমাকে সিংহাসন প্রদান করা হয় তাহা হইলে আমি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হব। হরিপাব্লিকের ধ্বংস সাধন করা আমার দ্বারা হইবে না।" বলা বাহুল্য য়ুয়ান্-শি-কাই চালে চলিতেছেন। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসেও এইরূপ ধড়িবাজি কয়েকবার দেখা গিয়াছিল। লুই নেপালিয়ান (১৮৪৮-৭০) ও প্রজাতন্ত্রের সভাপতি মাত্র থাকিতে থাকিতে রাজপদ আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সুতরাং য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের চরিত্রে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ চরমপন্থী স্বরাজপক্ষীয়েরা সুন্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে য়ুয়ান্-শি-কাইকে ধনেপ্রাণে মারিবার চেষ্টায় প্রাণপণ ব্রতবদ্ধ। য়ুয়ান্-শি-কাই এই দলের বহু নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিকে আইনের জোরে হত্যা করাইতে পারিয়াছেন। সুন্-ইয়াৎ-সেনের ন্যায় বহু ব্যক্তি দেশ হইতে নির্ব্বাসিতও রহিয়াছেন। তাঁহারা জাপানে, আমেরিকায়, ইয়োরোপে, এবং চীনের ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, জাপানী ও অন্যান্য কনসেশন ভূমিতে বাস করিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন। বলা বাহুল্য এই ষড়যন্ত্রকারীরা

পুরাপুরি প্রজাতন্ত্রশাসনের আকাঙ্ক্ষা করেন। চীনের খাঁটি স্বদেশী পুরাতন মিঙ্‌বংশীয় (১৩৬৮-১৬৪৪) নরপতিগণের সিংহাসনপ্রাপ্তিও ইহাঁদের ইচ্ছা নয়—আবার য়ুয়ান্‌-শি-কাইয়ের সাম্রাজ্যলাভও ইহাঁদের মনোনীত নয়। য়ুয়ান্‌-শি-কাইয়ের অধীনে প্রজাতন্ত্রশাসন বা স্বরাজের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহাই নিবারণ করা ইহাঁদের উদ্দেশ্য। এইজন্য য়ুয়ান্‌কে সভাপতিত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া উপযুক্ত স্বরাজসেবককে কার্য্যভার প্রদান করা ইহাঁদের লক্ষ্য।

সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের দল বলিতেছেন—"য়ুয়ান্‌ একজন বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী চোরস্বরূপ। আমরা যখন মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে বিপ্লব সুরু করি তখন সাম্রাজ্যপক্ষীয় সৈন্যগণের অধ্যক্ষ হইয়া য়ুয়ান্‌ আমাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন—পরে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সম্রাট্‌কে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। পরে আমরা ইহাঁকে প্রজাতন্ত্রশাসনের সভাপতিত্ব প্রদান করি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই য়ুয়ান্‌ মাঞ্চু-সম্রাটের অধিকারসমূহ দখল করিয়া বসিলেন—প্রজাতন্ত্রশাসনের নামগন্ধও আর থাকিল না। চীনে 'স্বরাজ' আজকাল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। তাহাতেও য়ুয়ান্‌ সন্তুষ্ট নন—ইনি নামেও সম্রাট্‌ হইতে ইচ্ছা করেন। এইজন্য নানা কৌশলে দেশের ভিতর রাজতন্ত্রীদিগের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতেছেন। সুতরাং সকল দোষের গোড়া এই য়ুয়ান্‌কে নিধন না করিলে চীনা জনসাধারণের সুখ ও শান্তি হইবে না।"

এদিকে চীনে যে-সমুদয় বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ জুড়িয়া বসিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেক ষড়যন্ত্রের পশ্চাতেই ধুয়া ধরাইতেছেন। ইহাঁরা জানেন যে, স্বরাজই হউক বা রাজতন্ত্রই হউক, য়ুয়ান্‌ই প্রবল হউন বা মাঞ্চুই প্রবল হউন বা শেষ পর্য্যন্ত সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের দলই জয়লাভ করুন—চীন মোটের

উপর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই। প্রত্যেক দলকেই বিদেশী ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইতে হইবেই। কাজেই কোন প্রকার বিপ্লব বা গণ্ডগোল বাধিলে বিদেশীদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। বরং ঘটনাচক্রে দুই চারিবার কোন বিদেশী কন্‌সেশন ভূমিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে প্রভুরা চীনের উপর জুলুম করিবার সুযোগ বেশী পাইবেন। তাহার ফলে চীনের অনেক অংশ চীনাদের হাতছাড়া হইতে থাকিবে। সুতরাং বিদেশীরা "বরের ঘরের পিসী এবং কনের ঘরের মাসী" সাজিতেছেন। দুই দিকেই ইহাঁদের কাঠি বাজিতেছে। তবে সংবাদপত্রের লেখায় বুঝা যায় ইহাঁরা রাজতন্ত্রের দিকেই বেশী ঝুঁকিতেছেন। কিন্তু মাঞ্চু-বংশীয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ইহাঁরা সুখী হইবেন এমনও বুঝা যাইতেছে না।

তবে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে একটা সহজসাধ্য মীমাংসা শীঘ্র ঘটিয়া উঠা কঠিন। আজ যদি ইয়োরোপে মহাকুরুক্ষেত্র না চলিত তাহা হইলে চীনের এই গণ্ডগোলে সকলেই মহা সন্তুষ্ট থাকিতেন—কারণ তখন সকলেই জাহাজ ও সৈন্য লইয়া চীনের বন্দরে বন্দরে লুটপাটের সুযোগ অন্বেষণ করিতে পারিতেন। আর, কোন উপায়ে চীনের ভিতর একবার হস্তক্ষেপ সুরু হইলে এশিয়ার বুকের উপরে জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ, জাপানী ও ইংরেজ শক্তিসমূহের বিরাট কুরুক্ষেত্র চলিত। চীনের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে একটা রফা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আজকাল ঘর সামলাইতেই ব্যতিব্যস্ত। একমাত্র জাপানের হাত খালি রহিয়াছে। চীনে গণ্ডগোল সুরু হইলে জাপান যত লাভবান্ হইবেন ইয়োরোপীয়েরা তাহার শতাংশও পাইবেন না। এইজন্য খৃষ্টান রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু উদ্বিগ্ন বুঝিতেছি।

দেখা যাউক কতদূর গড়ায়—যে কোন মুহূর্ত্তেই একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার

আশঙ্কা করা যাইতেছে। এমনও অসম্ভব নয় যে য়ুয়ান্-শি-কাই স্বয়ংই ওস্তাদিচালে মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট্‌কে সিংহাসন প্রদান করিতে উদ্যত হইতে পারেন। বস্তুতঃ তাহা হইলে য়ুয়ানের চৌর্য্য-অপরাধ ক্ষালিত হয়, রাজতন্ত্রীরাও সন্তুষ্ট হন। এদিকে য়ুয়ানের প্রতাপও প্রকৃত প্রস্তাবে বজায় থাকে। একমাত্র সুনের দল এবং চীনের ও মানবসমাজের হিতৈষীরা দুঃখিত হইবেন।

১১। নব্য চীন

বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতায়" উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে ম্লেচ্ছের নিকটও বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং গুরু ম্লেচ্ছ হইলেও পূজনীয়। গ্রীক পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণের ঋণ গ্রহণ উপলক্ষে বরাহমিহির এই কথা বলিয়াছিলেন। সে খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। তখন বিদেশীর নিকট ঋণ স্বীকার করিতে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইত না। বিধর্ম্মীর শিষ্যত্বগ্রহণও ভারতে নিন্দিত হইত না। বস্তুতঃ সেই যুগে আমাদের সঙ্গে বিদেশিগণের লেনদেন সমানে সমানে চলিত; কাজেই আদানপ্রদানে ও বিনিময়ে আমরা দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতাম না।

কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর হইতে ভারতসমাজে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাশক্তির কার্য্য খানিকটা মন্দীভূত হইয়াছে। পরদেশ ও পরধর্ম্মকে আমরা বিষবৎ বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। পরকীয় সকল পদার্থই সন্দেহের চোখে দেখিতে শিখিয়াছি। কাজেই একদিকে কূপমণ্ডুকত্ব অপরদিকে আত্মাভিমান আমাদের চরিত্রে দেখা দিয়াছে। "আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সকল ক্ষেত্রেই চরম সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—আমরা সেই আর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী, আমাদিগকে বিদেশীরা আবার কি শিখাইতে পারে?"—এই চিন্তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ভারতীয় পণ্ডিতমহলে বিরাজ করিত। অবশেষে ঘটনাক্রমে বিদেশী ম্লেচ্ছরাজগণের অধীনে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আমরা আবার বরাহমিহিরের উপদেশ মানিতে শিখিয়াছি।

দুনিয়ার সকল জাতিই অপরাপর জাতিকে ম্লেচ্ছ বর্ব্বর ও অসভ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীকেরাও করিত—আধুনিক পাশ্চাত্যেরাও করিতেছে—ভারতবাসীও করিত জাপানীরাও করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী ইয়োরোপকে যেরূপ ভাবিত, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানীরাও ইয়োরামেরিকাকে সেইরূপ ভাবিত। কিন্তু শিমনোসেকির যুদ্ধে পরাজিত হইবা মাত্র তাহাদের চোখ ফুটিল। তখন জাপানের দূরদর্শীরা বুঝিলেন "ম্লেচ্ছদিগের নিকটও বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।" এক্ষণে ম্লেচ্ছবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জাপান ভারতবর্ষের দশা এড়াইতে পারিয়াছেন।

চীনেও ভারতীয় এবং জাপানী অহঙ্কার অত্যধিক ছিল। চীনারা ভাবিত—"কন্‌ফিউশিয়াস যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত উপদেশ দুনিয়ার আর কে প্রচার করিতে পারেন? ইয়োরামেরিকার ম্লেচ্ছবর্ব্বরেরা ত নাবালক শিশু মাত্র। আমরা উহাদের গুরুস্থানীয়।" কাজেই কূপমণ্ডুকত্ব এবং আত্মাভিমান উভয় ব্যাধিই চীনাসমাজে প্রচুর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চীনারা ম্লেচ্ছকে তুচ্ছ করিয়াই চলিত। অবশেষে ১৮৯৪।৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া চীন সম্রাট্ বুঝিলেন—"তাই ত! অসভ্য জাপান ম্লেচ্ছবিজ্ঞানে হাত মক্‌স করিতে না করিতেই আমাদের প্রবল শক্তিকে পদানত করিল! তবে কি কন্‌ফিউশিয়াস এবং চীনাপ্রাচীরের বাহিরেও বিদ্যাবুদ্ধি আছে?" জাপানীরা চীনাদের আত্মাভিমান প্রথম ভাঙ্গিয়া দেয়। তখন হইতে ইহারা নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

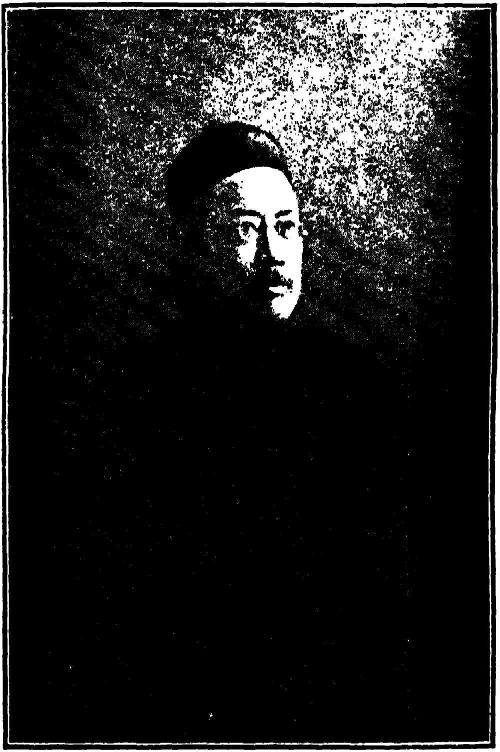
চীনাদের যথার্থ চৈতন্যোদয় হইতে আরও কিছুকাল কাটিয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চীনের দেশভক্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য খড়গ ধারণ করেন। চীনের ভিতর যে-সমুদয় বিদেশী কন্‌সেশন ভূমি এবং অধিকৃত ভূমি রহিয়াছে সেই সমুদয়ে পুনরায় চীনাসাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলনের ধুরন্ধর ছিলেন কুস্তীগির লাঠিয়ালেরা। চীনা-সমাজে দেশী কসরত পালোয়ানী ঘুষাঘুষি (বক্সিং) ইত্যাদির অসংখ্য আখড়া ছিল। সেই-সকল আখড়ার বক্সার খেলোয়াড় বা কুস্তীগিরেরা দলবদ্ধ হইয়া বিদেশিগণকে আক্রমণ করেন। এইজন্য ১৯০০ সালের চীনা স্বদেশী আন্দোলনকে বিদেশীরা বক্‌সার-বিদ্রোহ বলিয়া থাকে। আন্দোলন শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—বিদেশীরা তাহার পর হইতে চীনে আরও ক্ষমতাবান্ হইয়াছে। যাহা হউক, চীনাদের আত্মাভিমান এইবার ষোল আনা ভাঙ্গিয়া গেল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিলেন—"বিদেশিগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা একপ্রকার অসম্ভব। এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত না করিলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে না।" কাজেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা সমাজে নব্য বিদ্যা প্রবর্ত্তনের যুগ আরব্ধ হইয়াছে—সুতরাং নব্য চীনা মাত্র ১৫ বৎসরের শিশু।

এশিয়ায় নব্যভারত দেখা দিয়াছে পরাধীনতার ফলে এবং নব্যজাপানের উৎপত্তি হইয়াছে পরাধীনতার ভয়ে। নব্যচীনের জন্মও পরাধীনতার ভয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাপানের সৌভাগ্য চীনের ঘটিবে বলিয়া আশা নিতান্ত কম। কারণ চীন ইতিপূর্ব্বেই একপ্রকার পরাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার সুযোগ চীনাদের আদৌ নাই—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ইহাদিগকে

সংখ্যাতীত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, পরামর্শ বা উপদেশ ভোগ করিতে হয়।

নবীন চীনের শৈশবকাল চলিতেছে। দেশের ভিতর নানা কেন্দ্রে বিদেশীর বিদ্যাপ্রচারের আয়োজন হইতেছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত জাপানে যে যুগ গিয়াছে চীনে আজকাল সেই যুগ দেখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী জাপানে, আমেরিকায় ও ইয়োরোপে বিদ্যা অর্জন করিতে যাইতেছে। রুশযুদ্ধের পর জাপানের প্রতিপত্তি এশিয়ায় যৎপরোনাস্তি বাড়িয়া যায়। সেই সময়ে এক জাপানেই চীনা ছাত্র ছিল ১৫০০০এরও অধিক। এদিকে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রের আমদানি হইতে থাকে। ইয়াঙ্কি সরকারের বদান্যতা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের "বক্‌সার বিপ্লবের" পর বিদেশীরা চীনসাম্রাজ্যের নিকট অত্যধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার তৃতীয়াংশ চীনসাম্রাজ্যকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু একটা চুক্তি হয়, যে, ঐ টাকার সুদে প্রতিবৎসর উপযুক্ত চীনা ছাত্রদিগকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ইয়াঙ্কিস্থানে পাঠাইতে হইবে। ইয়াঙ্কি ভাবুকতার ইহা এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সেই টাকার সুদে বিগত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া শত শত ছাত্র নানাবিধ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে পারদর্শী হইতেছে। প্রধানতঃ রসায়ন, ব্যাঙ্কিং, এঞ্জিনিয়ারিং, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ এই সকল ছাত্রের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশে ফিরিলে রাষ্ট্রকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইয়াঙ্কিস্থানে থাকিবার সময়ে নানা কেন্দ্রে এইরূপ চীনা ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই সকল যুবক ছাত্রের চরিত্র কখন্ কি আকার ধারণ করে সহজে অনুমান করা চলে না। মাত্র দশ বার বৎসরের আন্দোলন দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা সুকঠিন। এক্ষণে একটা বিরাট এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের সূত্রপাত দেখিতেছি মাত্র। জাপানের মতন কালে



ইয়েন্-ফু (৭১ পৃষ্ঠা)

চীন শক্তিশালী হইবে, কি তুরস্কের মতন ক্ষীণকায় হইবে, বুঝিবার মত উপকরণ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। অন্ততঃ ১৫ , মাত্র পিকিঙে বাস করিয়া বুঝা অসম্ভব।

দুইজন প্রবীণ জননায়কের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁরা চীনাসমাজে নামজাদা লোক। উভয়ের বয়সই পঞ্চাশের উর্দ্ধে। বিংশ শতাব্দীর চীনাজাগরণের বহু-পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁরা পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছগণের নিকট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক জনের নাম ইয়েন্-ফু। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর জনের নাম কু-হুং-মিঙ্। ইনি এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উভয়েই সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

ইয়েন্-ফু য়ুয়ান্ শি-কাইয়ের দলস্থ ব্যক্তি। এইজন্য ইনি আজকালকার তথাকথিত স্বরাজের মন্ত্রণাসভায় একজন সদস্য। কু-হুং-মিঙ্ মাঞ্চুবংশের পৃষ্ঠপোষক। ইনি য়ুয়ান্‌কেও পছন্দ করেন না, সুনকেও পছন্দ করেন না। কাজেই স্বরাজের আমলে ইনি বড়ই দুঃখে জীবন যাপন করিতেছেন। স্বরাজবাদী ইয়েনের মাথায় লম্বা চুল নাই, কিন্তু মাঞ্চুভক্ত কু এখনও টিকি রাখিয়াছেন।

ইয়েন্ বিদেশী সাহিত্য চীনে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন—কু চীনা সাহিত্য বিদেশে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থের চীনা অনুবাদের জন্য ইয়েন্ প্রসিদ্ধ, চীনা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের জন্য কু প্রসিদ্ধ।

ইয়েন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার অনূদিত কোন্ গ্রন্থ চীনে বিশেষরূপে প্রভাবশালী হইয়াছে ? ইয়েন্ বলিলেন হাক্সলে-প্রণীত Evolution and Ethicsএর অর্থাৎ "দুনিয়ার ক্রমবিকাশ এবং মানব চরিত্র" গ্রন্থের অনুবাদ যখন চীনাভাষায় প্রচারিত হয় তখন দেশের লোকেরা

আমাকে ধর্ম্মবিরোধী দেশের শত্রু বলিয়া তিরস্কার করে। চীনা ধর্ম্ম ও সমাজ একটা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিরূপ চীনারা এই গ্রন্থে প্রথম তাহার পরিচয় পায়।" ইয়েন্ হার্বার্ট স্পেন্সারের The Study of Sociology অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান, মণ্টেস্কুর The Spirit of Laws অর্থাৎ "অনুশাসন তত্ত্ব এবং অ্যাডাম স্মিথের The Wealth of Nations অর্থাৎ "জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধির উপায়" অনুবাদ করিয়াছেন। ইয়েন্ বলিলেন—[illegible] অনুবাদ করা বড় কঠিন। আমাদের ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈয়ারি করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। একই চীনালিপি নানাভাবে উচ্চারণ করা যায়। লেখা চোখে দেখিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা পাঠ করিতে শুনিলে সেরূপ বুঝি না। কাজেই কতকগুলি নূতন শব্দ তৈয়ারি করিলেই কার্য্য শেষ হইয়া যায় না। কারণ পাঠকমহলে তাহা বুঝান বিশেষ সহজ নয়।"

পিকিঙে যেদিন প্রথম পৌছি সেইদিন হোটেলের দোকানে দেখি The Spirit of the Chinese People অর্থাৎ "চীনা জাতির স্বধর্ম্ম" গ্রন্থ বিক্রয় হইতেছে। পরদিন রাত্রে গ্রন্থকার কু-হুং-মিঙ্ হোটেলে আসিয়া উপস্থিত। কু বলিলেন—"মহাশয়, আমি রুশ, জার্ম্মাণ, ফরাসী ইংরেজ, জাপানী ইত্যাদি সকল জাতীয় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়াছি। কোন ভারতবাসীর সঙ্গে কখনও দেখা হয় নাই। কাজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিলাম।" আমি বলিলাম—"আমি ইতিমধ্যে আপনার পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিয়াছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করিবার কথা ভাবিতেছিলাম।" ইত্যাদি।

কু বলিলেন—"আমি কন্‌ফিউশিয়াসের শিষ্য। কন্‌ফিউশিয়ান তত্ত্ব জগতে প্রচার করা আমার জীবনের ব্রতস্বরূপ। বিদেশী লেখকেরা চীনা

সাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য প্রায়ই ভ্রমাত্মক। আমি দুএকটা ক্ষুদ্র অনুবাদ করিয়া যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি।” আমি বলিলাম—“এতদিন কন্‌ফিউশিয়াসের নাম মাত্র জানিতাম। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে কন্‌ফিউশিয়াসের দেশে একজন কন্‌ফিউশিয়ান্‌তত্ত্ব প্রচারকের সাক্ষাৎ পাইলাম।” কু বলিলেন—মহাশয়, ইংরেজি-জানা কনফিউশিয়াস-তত্ত্ব-প্রচারক চীনে দুর্ল্লভ। আজকাল যে-সকল চীনাযুবক ইংরেজী জানে তাহাদের প্রায় কেহই চীনের প্রাচীন সাহিত্য জানে না। আবার যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যে পারদর্শী তাঁহারা কেহই ইংরেজি জানেন না। কাজেই আপনার মতন বিদেশীর পক্ষে চীনাসমাজ বুঝা এক প্রকার অসম্ভব।”

বস্তুতঃ পিকিঙে আসিয়া অবধি উপযুক্ত বন্ধুর অভাব যথেষ্ট বুঝিতেছি। একমাত্র ইংরেজিভাষা সম্বল করিয়া চীনে বেড়াইতে আসা নিতান্ত বিড়ম্বনা। কু যাহা বলিলেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

কু বলিলেন—“মহাশয়, চীনের স্বদেশী আবিষ্কার কন্‌ফিউশিয়াসদর্শন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইহা নীরস ও জীবনহীন হইয়া যায়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে চীনে নবযুগ নবজীবন দেখা দেয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কন্‌ফিউশিয়াসের আবির্ভাব—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন—অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ মতের যথার্থ প্রভাব বিস্তার। এই সময় চীনাদের রেণাসাস অর্থাৎ চীনা নবাভ্যুদয় সুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম না আসিলে আমাদের দেশ নিতান্ত কাব্যহীন, শিল্পহীন ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়া থাকিত। ভারতবর্ষকে না জানিলে চীনের যথার্থ জীবন বুঝা অসম্ভব। অথচ ভারতবর্ষের সংবাদ আমরা কিছুই রাখি না।”

কু-হুং-মিঙ্‌ একজন ঘোরতর “স্বদেশী”। রাইন্‌শ্‌ (Reinsch) প্রণীত Intellectual and Political Currents in the Far East

অর্থাৎ "প্রাচ্য-মণ্ডলে নবীন ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থে এই কনফিউশিয়াসভক্তের আশা প্রচারিত হইয়াছে। কু বলিতেছেন—"Confucianism, with its way of the Superior man, little as the Englishman suspects, will one day change the Social order and break up the Civilisation of Europe." অর্থাৎ "ইংরেজ এখনও বুঝিতেছেন না। কিন্তু সময় আসিতেছে যখন এই কন্‌ফিউশিয়াসের বাণীই ইয়োরোপের সমাজ এবং সভ্যতারও যুগান্তর আনিবে। কন্‌ফিউশিয়ধর্ম্মের আদর্শে যে অতি-মানব বা মহাবীর প্রস্তুত হইবেন তাঁহাদের স্পর্শে পাশ্চাত্য সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

চীনের এই বাণী বহু কণ্ঠে এখনও প্রচারিত হইতেছে না, কিন্তু নবচীন শীঘ্রই এই বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধজনপদ

(১) চিলি ও হোনান প্রদেশ

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ নরপতি কণিষ্কের আমলে ভারতীয় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ চীনে আসিয়া বুদ্ধমত প্রচার করেন। তাঁহারা মধ্য এশিয়ার তাতার রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। চীনে তখন হানবংশীয় সম্রাট্ মিংতি রাজত্ব করিতেছিলেন। পিকিঙের ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। রাজধানীর নাম হোনানফু —এই নগরেই চীনে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে জাপানে নারা-হোরিয়ু'জির যে স্থান হইয়াছিল, এই সময়ে চীনে হোনানের সেই স্থান ছিল। আজ চীনে "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান দেখিবার জন্য পিকিঙ্ পরিত্যাগ করিলাম।

পিকিঙ্ নগর চিলি প্রদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৩॥০ কোটি। এই প্রদেশের সংলগ্ন হোনান প্রদেশে হোনানফু নগর অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ২॥০ কোটিরও অধিক। দেখা যাইতেছে যে এই দুই প্রদেশের সমবেত লোকসংখ্যা সমগ্র জাপান অথবা সমগ্র জার্ম্মাণি, অথবা সমগ্র ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। নূতন বাঙ্গলা দেশ বঙ্গ-ভাষী লইয়া গঠিত। এক্ষণে "সপ্ত-কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদকরালের"র প্রিয়ভূমিতে মাত্র ৪॥০ কোটি নর-নারীর বাস। সুতরাং চিলি ও হোনান প্রদেশ যে বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা বড় তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান যুগে এই লোকসংখ্যা লইয়াই চীনাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা। চারি কোটি, পাঁচকোটি, ছয়কোটি মাত্র লোক লইয়া বর্ত্তমান জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই হিসাবে ৪০ কোটি চীনা নরনারীর দেশে সাতটা বা আটটা বড় বড় প্রবল রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে গঠিত হইতে পারে না কি? সমগ্র ইয়োরোপকে কোন এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার জন্য কোন দিন আন্দোলন উপস্থিত হয় না। বিরাট চীনসমাজেও একটা তথাকথিত ঐক্যের নামে আন্দোলন উপস্থিত হইবে কেন? চল্লিশ কোটি নরনারীর সমাজে আদর্শগত ঐক্য, সভ্যতাগত ঐক্য, ধর্ম্মগত ঐক্য ইত্যাদি নানা ধরণের ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যও স্থাপিত হইবে কে বলিল? ইয়োরোপীয় সকল দেশের অভ্যন্তরে কি মোটের উপর একটা "ফাণ্ডামেণ্টাল ইউনিটি" বা মূল গত ঐক্য নাই? ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির ভিতর আদর্শগত, সভ্যতাগত, ধর্ম্মগত ঐক্য ইত্যাদি কম আছে কি? তথাপি ইয়োরোপের লোকেরা ইয়োরোপীয় "ঐক্য ঐক্য" করিয়া মরে না। তাহারা প্রাদেশিক বা "জাতীয়" ঐক্যের জন্যই প্রাণ দেয়। তাহারা জানে ঐক্য একটা উপায় মাত্র, কোন নরসমাজের চরম উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক সমাজের লক্ষ্য ব্যক্তিগণের শক্তিলাভ ও জীবনবিকাশ। যে কয়জন নরনারীর সমবায়ে শক্তি অর্জ্জিত হইতে পারে এবং জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়, সেই কয়জন নরনারী লইয়াই বর্ত্তমান যুগের জাতিগণ রাষ্ট্রগঠন করিয়াছেন। যেন-তেন-প্রকারেণ ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—কোন বিচক্ষণ জাতি এরূপ ভাবেন না। যেন-তেন-প্রকারেণ শক্তিশালী হইতে হইবে তাঁহারা এইরূপ চিন্তাই করিয়া থাকেন।

চল্লিশ কোটি নরনারী সমবেত হইয়া একটা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র জগতে

এখনও গঠন করে নাই। আমেরিকার বিরাট যুক্তরাষ্ট্রেও লোকসংখ্যা মাত্র দশকোটি। এই দশ কোটি লোকের রাষ্ট্রীয় ঐক্যও কতদিন টিকিয়া যাইবে তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক যখন যুক্তরাজ্য প্রথম স্থাপিত হয় তখন লোকসংখ্যা বর্ত্তমানের চতুর্থাংশও ছিল না। গত শতাব্দীতে কতকগুলি বিশেষ কারণে এবং অন্ন সংস্থান, ভাষা, ও শিক্ষা বিষয়ক নানাপ্রকার বাঁধাবাঁধির বিধানে ইয়োরোপ হইতে ইয়াঙ্কিস্থানে লোকের আমদানি হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র নবীন ও শিশুদেশ। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছানুরূপ লোকসংখ্যা বাড়ান সম্ভবপর হইয়াছে। বিদেশ হইতে লোক আমাদানীর আইন যখন তখন বদলান চলিতে পারে। কিন্তু ইয়োরোপ অথবা চীনের মত প্রাচীন ও প্রৌঢ় দেশে লোক-আমদানীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব—এবং আইনের জোরে লোকসংখ্যা কমানও অসম্ভব। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের দশকোটি লোকসংখ্যা দেখিয়া অন্য কোন দশ কোটি লোক রাষ্ট্র গঠনে ব্রতী হইলে সফল হইবে এরূপ বলা চলে না।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র ৪।৫।৬ কোটি মাত্র লোকই এক-একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। চীনাদের সমাজেও এইরূপ বিভিন্ন চীনারাষ্ট্র প্রতাপশালী হইতে থাকিলেই জগতের মঙ্গল। পৃথিবীতে শক্তির কেন্দ্র যত বেশী হইবে ততই মানবসমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে থাকিবে। চীনে শক্তিসাধনার যুগ আসিয়াছে। চীনারা যতদিন তথাকথিত ঐক্যের মোহে থাকিবে ততদিন ইহারা অন্ধভাবে বাজে কাজে সময় নষ্ট করিবে মাত্র। চীনাদের ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ মহাচীন গঠনে নয়—বহুসংখ্যক ছোট বড় মাঝারি স্বাধীন ও শক্তিশালী চীন গঠনে। এই বহুত্ব-বাদ এবং শক্তিকেন্দ্রের মাহাত্ম্য চীনারা বুঝিবে না কি? চীনমহাদেশের হৃদয় হইতে কতকগুলি স্বাধীন প্রাদেশিক-চীন গড়িয়া উঠুক।

ডাহিনে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে পাহাড় দেখিতে পাইতেছি আর

চারিদিকে উত্তরচীনের চিরপরিচিত শস্যশ্যামল প্রান্তর। এই অঞ্চল আগাগোড়া নদী-মাতৃক দেশ। আমাদের উত্তরভারত যেমন সিন্ধু ও গঙ্গা এবং ইহাদের উপনদ উপনদীর ধারাপ্লাবিত জনপদ, চীনের যতখানি দেখিলাম সমস্তটা সেইরূপ নদনদীপ্লাবনে গঠিত ভূখণ্ড। রেলপথে কতবার কত নদী পার হইয়াছি তাহার সংখ্যা সুকঠিন। নদীর স্রোত প্রায়ই অত্যধিক—জল আমাদের বর্ষাকালের পীতাভ কর্দ্দমযুক্ত প্রবাহের অনুরূপ। এরূপ ঘোলাজলের ধারা বেশী দেখি নাই। আমাদের দেশে এই জনপদের দুইটা নদীর নাম জানা আছে। একটার নাম পীহো। পিকিঙ নগর এই নদীর উপর অবস্থিত। অপরটার নাম হোয়াংহো বা পীতনদী। পিকিঙ হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বাহির হইলে এই দুই নদীর শাখা উপশাখা ইত্যাদিরই সহিত সাক্ষাৎ হয়। সর্ব্বত্র রক্তবর্ণ আঠালো মাটির ক্ষেত্র দেখিতে পাই।

সিন্ধু-গঙ্গা-গঠিত আর্য্যাবর্ত্ত যেমন ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, উত্তর অঞ্চলের এই নদী-মাতৃক জনপদও চীনাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। প্রাচীনতম কাল হইতেই এই অঞ্চলে চীনা জাতির সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থানের পার্ব্বত্য মরুদেশ ও অনুর্ব্বর ভূমি হইতে চীনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর ধরিয়া এই চীনা "আর্য্যাবর্ত্তে" মানবসভ্যতার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে।

রেলে বসিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল স্থানের পরিচয় পাইতেছি। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই দেওয়াল-ঘেরা সহর ও তাহার ভিতর দু-একটা প্যাগোডা চোখে পড়িতেছে। এই-সমুদয়ের কোন-কোনটা খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

লো-কু-বিয়া নগরের নিকট একটা নদী পার হইলাম। এই নদীর

উপর একটা প্রস্তর-সেতু আছে। শুনা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল-আমলে মার্কোপোলো যখন চীন পর্য্যটনে আসেন তখন তিনি ইহা দেখিয়াছিলেন। পিকিঙ হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরস্থিত একটা নগরের নিকট নদীর উপর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রস্তর-সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। আরও কিছু দূরে অন্য এক নদীর উপর মাঞ্চুসম্রাট নির্ম্মিত প্রস্তর-সেতু রহিয়াছে।

বৌদ্ধস্মৃতিপূর্ণ পল্লী ও নগরের সংখ্যা গুণিয়া শেষ করা অসম্ভব। একস্থানে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পিত্তলনির্ম্মিত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৭৩ ফুট। পিকিঙ হইতে ৪০ মাইল দূরে বো-বৌ-নগর অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত-গাত্রের অভ্যন্তরে বৌদ্ধসূত্র খোদিত আছে। সুতরাং ভারত"মণ্ডলের" ভিতর দিয়াই যাইতেছি।

বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিহ্নও এই পথে পাওয়া গেল। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং-সিয়াং সিয়েন্ নগরে রাষ্ট্র-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। সেই যুগের একটা প্যাগোডা মাত্র এক্ষণে দণ্ডায়মান। চীনে প্রাচীনতর যুগের স্মৃতিচিহ্ন বহুস্থানেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে আঙ্গুর, নাশপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল বিক্রয় হইতেছে। চীনে আঙ্গুর খুব সস্তা। দুই আনায় একসের পাওয়া যায়। ফল-বিক্রেতারা এবং অন্যান্য ফিরিওয়ালারা প্লাটফর্ম্মে আসিয়া জিনিষ বেচিতে অধিকারী নয়। ইহারা প্লাটফর্ম্মের বেড়ার বাহিরে থাকিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র হৈচৈ হট্টগোলের সীমা থাকে না। ফেরিওয়ালার চীৎকার, দরদস্তুর, মোসাফের-দিগের কলরব ইত্যাদি ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর পাই নাই। এই ধরণের হল্লা ইয়োরামেরিকায় কুত্রাপি নাই, জাপানেও নাই।

চীনের কুলী চাকরবাবর্চি ইত্যাদি শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।

জাপানে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। জাপানীরা আইন জানে এবং নিয়ম মানিয়া চলে। বক্‌শিশ "টিপ্" দরকষাকষি ইত্যাদির উপদ্রব জাপানী সমাজে নাই। কিন্তু চীনাসমাজে ভারতীয় গণ্ডগোল শৃঙ্খলার অভাব অবাধ্যতা মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গাম ইত্যাদি সবই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

বাধ্যতা নিয়মপালন শৃঙ্খলাজ্ঞান ইত্যাদি গুণ সামরিক জীবনে বিকশিত হয়। যে "কর্ম্মক্ষেত্রে Theirs not to reason why" নীতি প্রচলিত, অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তালিম করিবার সুযোগ সৃষ্ট হয়, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে সমগ্র সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠ হইতে থাকে। কিন্তু যে সমাজে এরূপ কর্ম্মক্ষেত্র নাই সেখানে লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মূল্য স্বীকার করে না—সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে জীবন চালাইয়া থাকে—কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক সেবিষয়ে কোন ব্যক্তির সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। ভারতীয় জনগণ বহুকালাবধি সমর-বিভাগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া রহিয়াছে। চীনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আজও নামে মাত্র আছে বটে কিন্তু প্রবল রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবে সমাজে যেরূপ সামাজিক জীবনের অভ্যুদয় হয় তাহার কিছুই নাই। কিন্তু জাপান ৫০।৬০ বৎসরের ভিতর জগতের মধ্যে প্রবলতম সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারের জনগণ যেরূপ শৃঙ্খলাপ্রিয়, স্বল্পভাষী এবং ডিসিপ্লিণের অধীন জাপানের নরনারীও সেইরূপ। জাপানের লোকেরা বহুক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের জন্য ব্যক্তিগত খেয়াল বা মত বা স্বার্থ বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হয়। এই অভ্যাসের ফলে তাহাদের চরিত্রে নিয়ম-পালন গুণ স্বতঃই দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের সঙ্গে ছোটখাট কাজকর্ম্মের সময়ে বিশেষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে ও চীনে দশের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ বর্জ্জন করিবার সুযোগ কখনই উপস্থিত হয় না। কাজেই সকলক্ষেত্রে

ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা, স্বকীয় স্বাধীন মত ও কার্য্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, "কুছপরোয়া-নাই"-ভাব, এক কথায় ডিসিপ্লিন বা নিয়মপালনের অভাব পদে পদে দেখা দেয়। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণের রক্তবর্ণ চক্ষুর ভয়ে এই মহাদেশের সত্তরকোটি নরনারী শৃঙ্খলা ও "ডিসিপ্লিনের" অধীন হয়। স্বাধীনভাবে ইহারা নিয়মনিষ্ঠ হইতে শিখিবে না কি? বিনা বাক্যব্যয়ে স্বদেশী নেতৃবর্গের হুকুম তালিম করিবার সুযোগ ইহাদের কবে জুটিবে?

চিলি-প্রদেশের একটা প্রসিদ্ধ নগর পথে পড়িল। নাম পাও-টিঙ্। পিকিঙ্ ও টিনসিনের পরেই ইহার নাম-ডাক। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীর ও নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে নব্যধরণের সমর-বিদ্যালয় এবং শিল্প-কারখানার প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

পিকিঙ্ হইতে ৩০০ মাইল আসিবার পর হোনানপ্রদেশে পড়িলাম। বহুসংখ্যক নদী ও খাল এই ভূমিকে ধৌত করিতেছে। কৃষিজাত দ্রব্য এবং খনিজপদার্থ উভয় প্রকার ধনই হোনানে উৎপন্ন হয়। উত্তর চীনের বহুস্থানেই কয়লার খাদ আছে।

মাটির দেওয়াল এবং ভুট্টা ও বজরার ক্ষেত্র দেখিয়া বিহারের কথা মনে পড়ে। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর কেরোসিনের কুপী অথবা লণ্ঠন দেখিলে ভারতীয় পল্লীই সম্মুখে উপস্থিত হয়। লোকজনের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারি না—কিন্তু ধরণধারণ সবই আমাদের সুপরিচিত। কলিকাতার বাঙ্গালী যদি পুণার মারাঠাকে এবং মাদুরার তামিলকে নিজের ভাই বলিয়া ডাকিতে পারে তাহা হইলে উত্তর চীনের জনগণকেও ভাই বলিয়া কেন ডাকিতে পারিবে না? মারাঠী এবং তামিল ভাষা না বুঝিয়াও যদি পুণাবাসীকে এবং দ্রাবিড়কে আপনার জন বলিতে দ্বিধাবোধ না করি, তাহা হইলে চীনাদের ভাষা না বুঝিয়া চিলিহোনানের নরনারীকে নিজের

লোক বিবেচনা করিতে দ্বিধা থাকিবে কেন? এই জন্যই মনে হইতেছে যে, হয় চীনারাও বাঙ্গালীর নিজের লোক, অথবা মারাঠা এবং মাদ্রাজীরাও বাঙ্গালীর কেহ নয়। চীনারাও ডাল রুটী তরকারী ভাত খাইয়া জীবন-ধারণ করে। বসনভূষণ কেশ-বিন্যাস ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালীর মত না হইলেও কোন-না-কোন ভারতীয় প্রদেশবাসীর অনুরূপ। তাহার উপর বুদ্ধাবতারের প্রভাব ত আছেই। অধিকন্তু চীনা বৌদ্ধেরাও ভারতীয় শৈব শাক্ত পৌরাণিক তান্ত্রিক ইত্যাদির ন্যায় প্রতিমাপূজক এবং বারমাসে তেরপার্ব্বণের মর্য্যাদারক্ষক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে যদি এক দেশ বিবেচনা করা চলিতে পারে তাহা হইলে সেই এক দেশের মধ্যে চীনকেও টানিয়া লইতে কল্পনার প্রয়োজন নাই। চীন ভারতের একটা প্রদেশ মাত্র। সমগ্র এশিয়াই এক। যদি এশিয়ার ঐক্য অবিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে আগে ভারতের ঐক্য অবিশ্বাস করিতে হইবে।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়ে হোয়াংহো নদী পার হইলাম। প্রবল স্রোতের বেগ দেখা গেল। অন্যান্য নদীর মত এই পীতনদীর জলও যারপরনাই ঘোলা। আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। এইখানে রাত্রি কাটাইতে হইবে। শাখা লাইনের গাড়ীতে কাল পশ্চিমমুখে হোনান-যাত্রা করিব।

একটা চীনা সরাইয়ে রাত্রি যাপন করা গেল। ইহা নিতান্ত ধর্ম্ম-শালার মতন নয়। চীনারা এখানে ঘরের আরামই পায়। বিছানা মশারি ইত্যাদি সরাই হইতেই পাইলাম। সকালে ভারতীয় পায়খানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। স্নানের জল পাওয়া কঠিন। চীনারা স্নানের ধার বেশী ধারে না। জাপানীরা এ বিষয়ে ভারতবাসীর মত, প্রত্যহ স্নান করা তাহাদের অভ্যাস।

(২) চীনের মফঃস্বলে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান

চীনা দোভাষী মহাশয় বড়ই অকর্ম্মণ্য। ইনি কোন মতে ইংরেজিতে কথা বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করেন মাত্র। কিন্তু মিশরে ও জাপানে ইণ্টারপ্রেটার এবং গাইড শ্রেণীর লোকেরা যেরূপ সুদক্ষ প্রদর্শক, চীনে সেরূপ নয়। অথচ পিকিঙের হোটেলের ম্যানেজার নাকি একজন শ্রেষ্ঠ গাইডই দিয়াছেন। ইনি পর্য্যটককে সাহায্য করিতে নিতান্তই অপারগ। বিদে[illegible] সহিত কথাবার্ত্তা বলা এবং দোকানে দরদস্তুর করা ব্যতীত ইঁহার দ্বারা অন্য কোন কার্য্য চলে না। ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া চীনভ্রমণ একপ্রকার বিড়ম্বনা-বিশেষ। চীনা ইতিহাসের কোন তথ্য ইঁহার জানা ত নাইই—স্থান-মাহাত্ম্যও ইনি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। কোন একজন অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী মান্দ্রাজের কোন পল্লীতে যেরূপ অবস্থায় পড়িবে পিকিঙের এই চীনা দোভাষী মহাশয়েরও হোনান প্রদেশে আসিবামাত্র সেই অবস্থা। ফলতঃ পর্য্যটকের অনর্থক অপব্যয়, লোকসান ইত্যাদি সহ্য করিতে হয়। চীনারা সকল কাজেই এইরূপ অপটু কাণ্ড-জ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য। বর্ত্তমানযুগের মাপকাঠিতে ভারতবাসী এবং চীনাজাতি উভয়েই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। জাপানের পর চীনে আসিয়া ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারের মানবচরিত্র হইতে মৃতপ্রায় জাতির জীবনধারণের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। চীনাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার স্বজাতীয়গণের দশা স্মরণ করিলাম। ভারত ও চীন বর্ত্তমান-যুগের পেরিয়া—ইহারা মানবসমাজের সুদক্ষ কর্ম্মক্ষম অঙ্গে কোন দিন পরিণত হইতে পারিবে কি ?

রেল ষ্টেশনের নিকটে দেখি একটা ডোবার জলের মধ্যে নামিয়া চীনা নারীরা কাপড় কাচিতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যধিক—অনাহার ও

অ-বসনের মূর্ত্তি চারিদিকে বিদ্যমান। চীনে ৪০ কোটি নরনারীর বাস শুনিয়া যাঁহারা জগতে "ইয়েলো পেরিল" বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকার আশঙ্কা করেন তাঁহারা নিতান্তই কুসংস্কারে মগ্ন। বর্ত্তমানযুগে যন্ত্র, শিক্ষা, কল, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবে একজন লোক এক হাজার যন্ত্রহীন বিজ্ঞান-হীন শিক্ষাহীন লোকের কার্য্য করে। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও নেপালিয়ানের যুগে বিজ্ঞান যন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব বেশী ছিল না। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষে লোকসংখ্যা অধিক সেই পক্ষের জয়লাভই আশা করা যাইত। কিন্তু একশত বৎসরের মধ্যে রণ-বিদ্যা রণ-নীতি ইত্যাদি আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। ড্রেডনট, জেপেলিন, মেসিন-গান ইত্যাদির কালে একমাত্র শারীরিক বল, নৈতিক চরিত্র, অসমসাহসিকতা, আত্ম-বলিদানের আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগবল, এবং মরিয়া ভাবের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। আধুনিক কলকারখানা শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির অভাবে ৪০ কোটি নরনারী প্রকৃত প্রস্তাবে চারিলক্ষ মাত্র ইয়োরামেরিকান অথবা জাপানীর সমান। কাজেই চীনারা কোন দিন দুনিয়া লুটিতে অগ্রসর হইবে সেরূপ আশঙ্কা করা নিতান্তই পাগলামি। বরং চীনেই দুনিয়ার প্রবল রাষ্ট্রসমূহ আসিয়া জুড়িয়া বসিবে—ইহাই অধিকতর সম্ভবপর। জাপান, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি ফার্ষ্টক্লাস পাওয়ারের প্রত্যেকেই একাকী এই ৪০ কোটি নরনারীর দেশকে যখন তখন সহজে দখল করিতে সমর্থ। এতদিনে চীন এইরূপ বিদেশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িত। কেবল বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছেন বলিয়া চীনের সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই। যদি ফার্ষ্টক্লাস পাওয়ারগণ চীনের ভাগবাটোয়ারা সম্বন্ধে নিজেদের ভিতর একটা চলনসই রফা ও সন্ধি সাব্যস্থ করিয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে চীনের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানা-

বলশী কর্ম্মপটু ও সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যের সম্মুখে ৪০ কোটি নরনারী তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। যাঁহারা লোকসংখ্যার কথা অত্যধিক ভাবে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। যাহা হউক, চীনের নাম মাত্র শুনিয়া যাঁহারা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা প্রচার করিয়াছেন তাহারা চীনের ভিতর প্রবেশ করিয়া চীনাদিগকে স্বচক্ষে দেখিলে মত বদলাইতে বাধ্য হইবেন। বিংশ-শতাব্দীর মাপকাঠিতে চীনাজাতির মূল্য কিছুই নয়—যে-কোন বিজ্ঞানশীল লোক আসিয়া ইহাদিগকে "পাঁচজুতা" লাগাইতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের দখলে আসে তখন ইংরেজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরাসী। ফরাসীবীর নেপোলিয়ানের পরাজয় হইলে ইংরেজ ভারতে অনেকটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিতে সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু আজকালকার দিনে বখরাদার অনেক। কোন এক রাষ্ট্রশক্তি দুনিয়ার যেখানে-সেখানে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন না। কাজেই চীনে কোন একজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হইবে না। আফ্রিকার মতন চীন নানাজাতির দখলে আসিবে—ইতিমধ্যেই তাহার সুত্রপাতও হইয়াছে। অবশ্য ঘটনাচক্রে যদি চীনের কোন নিভৃতস্থান হইতে বিংশ শতাব্দীর চীনা নেপোলিয়ানের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে চীনের মানচিত্র সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। যদি কোন কর্ম্মবীর এক হাতে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসন এবং অপর হাতে কন্‌ফিউশিয়াস ও বুদ্ধদেবের বাণী লইয়া চীনের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে চীনাসমাজে জাপানী "মীজি" বা নবজীবনের যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেই চীন-সংরক্ষক প্রবলপ্রতাপ চীনা-নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইবে কি? যত বিলম্ব হইতেছে ততই বিদেশীয়গণের প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে যে!

চীনের সহরে সহরে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবহৃত হয়—প্রদেশে প্রদেশে ত আছেই। আজ গাড়ীতে বসিয়া মুদ্রা-বিভ্রাটে পড়িলাম। পিকিঙের টাকা বা নোট এই অঞ্চলে চলে না। আমার সঙ্গে যে-সমুদয় নোট রহিয়াছে সেগুলির কোনটাই হোনান প্রদেশে চলিবে না। শাংহাই পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে-গুলি ট্যাঁকস্থ থাকিল। দোভাষী মহাশয়ের গুণপনা এইরূপ। ইঁহার পাল্লায় পড়িয়া টিকেটবিভ্রাটও কম হয় নাই। তাহাতে যথেষ্ট অর্থনাশ হইয়া গেল। ভাবিতেছি—চীনের মফঃস্বল দেখিবার জন্য এই মূল্য দেওয়া যাইতেছে।

রেলে ফরাসীভাষার বিজ্ঞাপন দেখিতেছি—ফরাসীকর্ম্মকর্ত্তা ও পরিদর্শক গাড়ীতে আছেন। রেলের একজন লোকের সঙ্গে দোভাষী মহাশয়ের ঘোরতর বচসা হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর গরম পড়িয়াছে। মরুসদৃশভূমির সকলদিক হইতে গাড়ীর ভিতর ধূলা বালি উড়িয়া আসিতেছে। এক-গ্লাস জল আনিতে যাইয়া দোভাষী বাবর্চির তিরস্কার ভোগ করিলেন। মেজাজ গরম করিয়া বাবর্চি বলিল—"জল দিব না। যা পার কর।" দোভাষী বেকুবের মত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"কি বলিব মহাশয়, দক্ষিণ দেশী লোকেরা বড়ই অহঙ্কারী। আমাদিগকে উত্তরের লোক বলিয়া গ্রাহ্য করিতেই চাহে না!" ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া ফরাসী পরিদর্শককে ডাকা গেল। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে জল পাইলাম। ভারতবর্ষের অবস্থাও এইরূপ নয় কি? গোলামজাতির সকল দোষই চীনাসমাজে দেখিতেছি—অথচ এখানে রিপাব্লিক, স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপিত হইয়াছে! ইহাকে অরাজ বা পর-রাজ বলাই উচিত।

চারি ঘণ্টা রেলে কাটাইলাম। সমস্ত পথে প্রাচীন-ইতিহাসের স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। ভাঙ্গা দেওয়াল, অট্টালিকার স্তূপ, ইট পাথরের রাশি, দুর্গপ্রাচীর সদৃশ নগরপ্রাচীর, প্যাগোডা, স্মৃতি-ফলক

ইত্যাদির আবেষ্টনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। কোথাও গাড়ী হইতে পার্ব্বত্য কন্দরের অভ্যন্তরস্থিত গৃহাবলী দেখা যাইতেছে—কোথাও বা প্রাচীন দেওয়ালের ভিতর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকাময় পর্ব্বতের ভিতর সুড়ঙ্গও কয়েকটা অতিক্রম করিলাম। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বড় বেশী পাইলাম না—চাষ আবাদের লক্ষণও অল্পমাত্র। চারিদিকে মাটির চাপ, দুর্গের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীন জনপদের চিহ্ন বিরাজ করিতেছে। ভূমি সমতল।

রৌদ্র-স্নান ও ধূলি-স্নান উপভোগ করিতে করিতে হোনান ফু ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। একটা চীনা সরাইয়ে অতিথি হওয়া গেল। বহুকাল পরে খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগের সুযোগ পাইলাম। পাতকুয়া হইতে জল তোলাইয়া উঠানে বসিয়া স্নান করা হইল। এক পয়সার চিনি আনাইয়া সরবৎ পান করিলাম। কাটা তরমুজের পীতবর্ণ দেখিয়া লোভ হইয়াছিল, মুখে দিয়া সন্তুষ্ট হইলাম না।

চৌকিসদৃশ কাঠের পাটাতন বা মঞ্চের উপর সরাইওয়ালা একখানা চাটাই বিছাইয়া দিল। ইহাতে শুইয়া দেখিতেছি ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বহুসংখ্যক ছারপোকার শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। ক্রমশঃ একটা তোষক এবং লেপ আসিল। রাত্রিকালে ঠাণ্ডা পড়িবে।

চীনাদের রুচিতে আর বাঙ্গালীরুচিতে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই সরাইয়ে খাদ্যকষ্ট হয় না। পূরাপূরি নিরামিষাশী হওয়া গেল। বেগুনের ঝোল, শসার ঝোল, মাশকলাইয়ের ডাল ভিজান, ধনিয়ার শাক, আদা, শিম ইত্যাদি নানা তরকারি আহার করিলাম। যাঁহারা আমাদের মফঃস্বলে গরমের দিনে সফর করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই তৃপ্তি বুঝিতে পারিবেন। ঠিক বাঙ্গালাদেশের একটি পল্লীকুটীরে যেন স্নানাহারের পর শান্তি উপভোগ করিতেছি।

বিকালে গৰ্দ্দভ-শকটে পল্লীভ্রমণে বাহির হইলাম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বলেন—"গরুরগাড়ী-পাশ না হইলে কেহ গৌড়ীয় পুরাতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না।" চীনে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীদিগের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। গাধার গাড়ীতে আর গো-শকটে কোন প্রভেদ নাই। "বিহারে বিঘোরে চড়িনু এক্কা" কথাটাও কিছু মনে পড়ে। রাস্তার বর্ণনা করা অসম্ভব। গাড়ী এক ধাপ উঠিতেছে, পরক্ষণেই নীচে আছড়াইয়া পড়িতেছে—পেটের নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া যায়। দোভাষীর পরামর্শে এই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম—পরে পদব্রজে চলাই যুক্তিসঙ্গত ভাবা গেল।

কয়েকটা বৌদ্ধমন্দিরের পোড়ো অবস্থা দেখিলাম। বুদ্ধদেবের নাম চীনা ভাষায় ফোবা "ফইয়ো"। ভারতবর্ষকে চীনারা "তিয়েন-চু" বলে। এই শব্দের অর্থ স্বর্গ। চীনাদের বিশ্বাস হ্যান্ বংশীয় সম্রাট মিং-তি স্বর্গে দূত পাঠাইয়া বৌদ্ধপ্রচারকগণকে হোনানে আনাইয়াছিলেন। জাপানীরাও ভারতবর্ষকে "তেন্-জিকু" বা স্বর্গ নামেই ডাকে। ভারতীয় কৈলাস-পর্ব্বত, নন্দনকানন, স্বর্গ-ধাম ইত্যাদিও কি এইরূপ কোন জনপদের নাম হইতে পারে না? শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" গ্রন্থে বৈদিক ভারতের ভূগোল যে ভাবে বুঝান হইয়াছে তাহার ভিতর কিছু সত্য নাই কি?

পল্লীদৃশ্য দেখিয়া আধুনিকের চোখে মধ্যযুগের চিত্র মনে পড়িবে। জাঁতা, ঘানি, ইটের পাজা ইত্যাদি ভারতবাসীর সুপরিচিত। ইটের দেওয়াল এবং ঘরের বাহির দেখিয়া লোকজনকে নেহাত দরিদ্র মনে হয় না। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের চিহ্ন কোথাও নাই।

একটা বিদ্যালয় দেখিলাম। গৃহগুলি সুন্দর ও পরিষ্কার। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ছাত্রেরা প্রাচীন সাহিত্য সমস্বরে মুখস্থ করিতেছে। ইংরেজি ভাষা শিখিবার আয়োজনও আছে। কতকগুলি কাঠের বন্দুক এক

বারাণ্ডায় দেখিলাম। এইগুলি হাতে লইয়া ছাত্রেরা সামরিক ড্রিল শিক্ষা করে।

একটা তাও-ধর্ম্মীদিগের মন্দির দেখিলাম। অন্য এক মন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাট ধ্যানীবুদ্ধ অবস্থিত। তাহার দুইধারে নয়টা করিয়া বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধমূর্ত্তি। চীনে সর্ব্বসমেত ১৮ প্রদেশ—এইজন্য ১৮ মূর্ত্তির সমাবেশ।

সন্ধ্যাকালে ষ্টেশনের সম্মুখে ভারতীয় সন্ধ্যার হাট দেখিলাম। বিচিত্র নরনারীর সমাবেশ—পুরুষের সংখ্যাই বেশী। লোকজনের গতিবিধি দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা কোন বাঁধাবাঁধির ধার ধারে না। সকলেই আপনমনে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করিতেছে। সমাজ-প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশকে কাটিয়া ছাঁটিয়া কোন কৃত্রিম আকার প্রদান করিলে তাহার এক নূতন মূর্ত্তি হয়। চীনে এবং ভারতবর্ষে তাহা দেখা যায় না। এইজন্য ইয়োরামেরিকান এবং জাপানী শৃঙ্খলা চীনেও নাই, ভারতেও নাই। চীনা এবং ভারতীয় ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের নিন্দা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের যন্ত্র-চালিত সভ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই ধরণের চরিত্র পরাজিত হইতে বাধ্য।

রাত্রিকালে সরকারী পুলিশ আসিয়া হোটেলের অতিথিগণের নাম ধাম লইয়া গেল। জাপানে এবং জার্ম্মাণিতেও এই দস্তুর।

খোলা আকাশের নীচে খাটিয়া পাড়িয়া আকাশের তারা গুণিতেছি। আজ বোধ হয় জন্মাষ্টমী। দেশে হয়ত জলবৃষ্টি হইতেছে।

যেন বিন্ধ্যাচলের ধর্ম্মশালায় রাত্রি কাটান যাইতেছে। কেরোসিনের বাতি অথবা মোমবাতির আলো মিটমিট জ্বলিতেছে। উঠানে বসিয়া আহার করিলাম। এক কামরায় চীনাম্যান কালোয়াতী ধরিয়াছেন— হোটেলের বাহিরে কাঠ বাজাইয়া এক ভিক্ষুক তালে তালে গাহিতেছে।

ইহার নাম স্বাভাবিক বৈচিত্র্য, ইচ্ছাসুখ জীবনযাপন, Nature's plenty"। দুঃখের কথা, "প্রকৃতির প্রাচুর্য্যকে বন্ধনের ভিতর না আনিলে শক্তি সঞ্চিত হয় না। বর্ত্তমানকালে ব্যক্তিগতজীবনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ও স্বাভাবিকতা আর থাকিবে না। শৃঙ্খলা, সংযম, বাঁধাবাঁধি, অর্গানিজেশন বা দায়বাঁধন, ডিসিপ্লিন বা নিয়মপালন ইত্যাদির দিকেই মানবসভ্যতার ক্রমিক বিকাশ।

(৩) হোনানে ভারত-মণ্ডল

হোনান সহরের অল্পদূরে চীনের সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। গাড়ীতে বসিয়াই প্যাগোডা দেখিয়া লইলাম। পরদিন বিকালে চেং-চাও জংসনে ফেরা গেল। রিক্শতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। ভারতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জেলার পল্লীগ্রামের উপযুক্ত পথ ঘাট দোকান বাজার। নবজীবনের কোন অনুষ্ঠান চোখে পড়িল না। সুদৃঢ়প্রাচীর-বেষ্টিত নগর। একটা দ্বাদশছাদবিশিষ্ট অষ্টকোণ প্যাগোডা দেখিলাম। এত উচ্চ প্যাগোডা বোধ হয় এই প্রথম দেখা হইল। ইহার চূড়া এবং প্রত্যেক ছাদের কানিশগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু বিরাট অট্টালিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। নগর প্রাচীরের ফটকে উঠিয়া মিঙ্ আমলের একটা লৌহ কামান দেখিলাম।

বর্ত্তমান সহর যাহাই হউক, প্রাচীনকালে এই নগর অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। দীর্ঘাকৃতি প্যাগোডা এবং নগরপ্রাচীরের গঠন দেখিয়া আজও তাহা অনুমান করা চলে। শুনিলাম এই নগর অষ্টম নবম শতাব্দীতে তাঙ্ বংশীয় নরপতিগণের অন্যতম রাজধানী ছিল। হোনান প্রদেশ এইরূপ একাধিক রাজধানী বক্ষে ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বপশ্চিমে সিঙ্গান, তাহার পর হোনান, তাহার পর চেং-চাও, সর্ব্বপূর্ব্বে কাই-ফেঙ। সুঙ্ আমলে অর্থাৎ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাইফেঙ চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাহার পর কুব্‌লা খাঁ মোগলবংশ প্রবর্ত্তন করেন। সেই সঙ্গে পিকিঙে রাজধানী স্থাপিত হয়।

মাঠের ভিতর দিয়া ষ্টেশনে ফিরিতেছি, এমন সময়ে সন্নিহিত পল্লী হইতে বহু-কণ্ঠোত্থিত গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল যেন কোন ভারতীয় গায়কদলের একতান গীত শুনিতেছি। ভাষা বুঝিলাম না—কিন্তু সুর, স্বর, তাল ইত্যাদি যেন পরিচিত বোধ হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে এবং চীনে যে অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকুক না কেন, ইহার দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম ৫০ কোটি নরনারী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।"—জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে এই কথা যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা গেল। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আর একটা বিষয় আছে। এই-সকল জনপদের যে-সমুদয় লোক মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নয় তাহারাও জীবনের নানা আচার-ব্যবহারে বুদ্ধের প্রভাব স্বীকার করিতেছে। এইরূপে জাপানের শিন্তোধর্ম্মী, এবং চীনের তাওধর্ম্মী ও কন্‌ফিউশিয়াসধর্ম্মী সকলেই কোন-না-কোন উপায়ে বুদ্ধধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন। সে দিন ইয়েন-ফু বলিতে-ছিলেন—"চীনারা সকলেই বৌদ্ধ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাহারা ইসলাম অথবা কন্‌ফিউসিয়াসের ভক্ত এমন কি তাহাদের কাজকর্ম্মে এবং চিন্তাপদ্ধতিতেও ভারতীয় মহাত্মার আধিপত্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন। স্বয়ং মাঞ্চুসম্রাট্ হইতে পল্লীর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন।"

খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে বুদ্ধমত চীনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। চাই-ইন নামক একজন দূত মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ তাতার রাষ্ট্রে প্রেরিত হন। তিনি সম্রাট্ মিংতির নিকট দুইজন বৌদ্ধপুরোহিত লইয়া আসেন। একজনের নাম

মাতঙ্গ, অপরের নাম গোভরণ। ইহাঁদের সঙ্গে এক শ্বেত অশ্ব আসে। অশ্বের উপর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আনীত হইয়াছিল। হোনান-ফুনগরের যেস্থানে মৃত্যুর পর অশ্বের কবর দেওয়া হইয়াছিল সেই স্থানে একটি প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম পাই-মা-জু বা শ্বেতাশ্বমন্দির। এই প্যাগোডাই রেল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিক্রমপুরে রাজবাড়ির মঠ, শ্যামসিদ্ধির মঠ ইত্যাদি যে-প্রকার অট্টালিকা দেখিয়া থাকি হোনানের এই প্যাগোডা এবং চীনের অন্যান্য প্যাগেডাগুলি প্রায় সেই ধরণে গঠিত। চেং-চাও নগরে যে প্যাগোডা দেখিলাম, এবং কাই-ফেঙ নগরেও যে লৌহ প্যাগোডা আছে, তাহাদের গঠনাকৃতিও এইরূপ। অর্থাৎ দীর্ঘাবয়ব, শিখর-সমন্বিত হিন্দু-মন্দিরের মূর্ত্তি চীনের প্যাগোডা-রচনায় দেখিতে পাই। স্থূল ও বাহ্য দৃষ্টিতে প্রভেদ চোখে পড়িবে না।

হোনানে বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র সম্রাটগণ ইহার যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। চীনা ভাষায় সংস্কৃত সূত্রসমূহের অনুবাদ প্রচারিত হইতে থাকিল। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হোনান প্রদেশে নানাবংশীয় রাজগণের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে রাজধানীও স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের প্রতি অনাদর কখনও হয় নাই। দুএকবার মাত্র বৌদ্ধ-সমাজকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি পরবর্ত্তীকালে যখন বিদেশীয় মোগলেরা পিকিঙে চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন তখনও বৌদ্ধ প্রভাব চীনে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। মোগলেরা বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হান্‌বংশীয় মিং-তির পর বহু চীন সম্রাট্ এই ভারতীয়, মতবাদের সংরক্ষক হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঙ্‌বংশীয় সপ্তম শতাব্দীর সম্রাট্ তাই-চুঙ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "পশ্চিম-চীনবংশীয় নরপতিগণের আমলে ভারতীয় কুমারজীব চীনে আগমন করেন এবং

চীনা ফাহিয়ান ভারত পর্যটনে আসেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের কথা (৩৯০-৪১০)। ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াঙ্‌বংশীয় বোধিধর্ম্ম নামক দক্ষিণ ভারতীয় ভিক্ষু হোনানে আগমন করেন। তিনি ধ্যানতত্ত্ব চীনে প্রথম প্রচার করিয়াছেন। তাই চুঙের আমলে চীনা ভিক্ষু য়ুয়ান্-চুয়াঙ ভারত পর্যটনে বাহির হন। তিনি ১৬ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের আমল তখন ভারতে চলিতেছিল। য়ুয়ান্-চুয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতেতিহাসের মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আদান প্রদান প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়। হোনান ফুনগরই সেই চীনা ভারতীয় বিনিময়ের প্রধানতম চীনা কেন্দ্র ছিল। তাই চুঙ এই নগরে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্বের সবিশেষ চর্চ্চাই হইত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণই চীনের সকল অঞ্চলে এবং সুদূর কোরিয়া ও জাপান পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রভাবের মণ্ডল বিস্তৃত করেন। এই সময়ে হোনান ফুনগরে কয়েক হাজার হিন্দু পরিবার বাস করিতেন।

য়ুয়ান্-চুয়াঙ হোনানে ফিরিয়া আসিবার পর ই-চিঙ ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। তিনি ২৫ বৎসর বুদ্ধদেবের জন্মভূমি চীনাদের স্বর্গভূমিতে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের ফলেও ভারত-প্রভাব চীনে সবিশেষ ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের গমনাগমনের ফলে চীনের সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ফলতঃ প্রাচীন কন্‌ফিউশিয়াসের মতবাদ নব-ভাবাপন্ন হইয়া যায়। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুঙ্‌রাজগণের আমলে কন্‌ফিউশিয়াস-মতবাদ নূতন আকার ধারণ করে। এই নূতন আকারের গঠনে ভারতীয় ধ্যানতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীতে তাঙবংশীয় নরপতি তাই-চুঙের আমল হইতে পরবর্ত্তী

সুঙরাজগণের আমল পর্য্যন্ত ছয়শত বৎসর ধরিয়া চীনা নরনারীর সমগ্র জীবনে ভারতবর্ষের প্রভাব বিদ্যমান। এই কথা না বুঝিলে মধ্যযুগের চীনা সমাজ বুঝা যাইবে না—আবার ভারতেতিহাসেরও একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতবাসীর পক্ষে এই বিষয়ে গৌরবজনক তথ্যই প্রাপ্ত হইতে পারি। কারণ চীনারা তাহাদের ইতিহাসের এই যুগকে স্বর্গযুগ বা সত্যযুগ বিবেচনা করে। চীনা সমাজে যখন বৃহত্তর ভারতের মণ্ডল বিশেষরূপে বিস্তৃত ছিল সেই সময়েই চীনাদের "অগষ্টান এজ" বা বিক্রমাদিত্যের যুগ বা চরম গৌরবের যুগ,—এ কথা শুনিলে ভারতসন্তান মাত্রই পুলকিত হইবেন।

হোনান হইতে ফিরিবার সময়ে গাড়ীতে বসিয়া "শ্বেতাশ্ব-প্যাগোডা" দেখিতে দেখিতে চীনে এই ভারতীয় প্রভাবমণ্ডলের প্রাথমিক ভিত্তি দেখিলাম। যাঁহারা "বৃহত্তর ভারতের" ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহারা এই প্যাগোডাকে ভারতবাসীর প্রধান বিজয়স্তম্ভ বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই।

তাঙ-আমলের চীনা সাহিত্যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে চেতনা ও আত্মার অস্তিত্ব প্রচারিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অন্তর্য্যামী বিরাট পুরুষের ধারণাও কবিগণ করিয়াছেন। এদিকে কন্‌ফিউশিয়াসের শাস্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও পণ্ডিতগণ এই-সকল অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিতে লাগিলেন। সুঙ-আমলে এই নূতন ব্যাখ্যাপ্রণালীর কার্য্য সবিশেষ হইয়াছিল। অবশেষে বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত কন্‌ফিউশিয়াস-মতবাদ নূতন আকারে চীনে দেখা দিয়াছে। এই নূতন আকৃতিবিশিষ্ট কন্‌ফিউশিয়ান তত্ত্বই (নেও-কন্‌ফিউশিয়ানিজম) আজও চীনাসমাজে কন্‌ফিউশিয়াসের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালের কন্‌ফিউশিয়াস ধর্ম্মীদিগের জীবনে সুঙবংশীয় ব্যাখ্যাকারগণের ভারতীয় ভাবও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

সুঙ্-আমলের যে দার্শনিকের ব্যাখ্যাপ্রভাবে কন্‌ফিউশিয়াস আজ পর্য্যন্ত চীনে পূজা পাইতেছেন তাঁহার নাম চু-সি (Chu-hsi) চুসি-প্রচারিত মতবাদ কেবলমাত্র চীনে নয়, জাপানেও লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন গঠন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এইরূপে নব নব নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থায়ী হইয়াছে। হোনানপ্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে সেই ভারতপ্রভাবের স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান। কাজেই ভারত-ঐতিহাসিকের পক্ষে হোনান প্রদেশ বিশেষ মূল্যবান। কপিলবাস্তু, কুশীনগর, সারনাথ ইত্যাদি যেরূপ ভারতবাসীর নিজের জিনিষ, সেইরূপ চীনের হোনানও আমাদের আপনার বস্তু। হোনানের কথা আমাদের ঘরেরই কথা।

সুঙ-আমলে একজন চীনাদার্শনিক নূতন ধরণের এক রচনা করেন। তাহার নাম "তাই-সু" বা মহাশূন্য। শূন্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা ভারতীয় "শূন্যবাদে"রই চীনা সংস্করণ মাত্র।

তাঙ্ সম্রাটগণ ৬১৮ খৃঃ অঃ হইতে ৯১৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুঙ্-বংশের রাজত্বকাল ৯৬০ হইতে ১২৭৯ পর্য্যন্ত। এই সাড়ে ছয়শত বৎসর কাল ভারতের নানাস্থানে নানাসম্রাট্ রাজচক্রবর্ত্তী ও রাজন্যবর্গের আধিপত্য ছিল। প্রধানতঃ হর্ষবর্দ্ধন, পুলকেশী, ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্রচোল এই যুগের ভারতবীর। বলাবাহুল্য তাঙ্-সুঙ্ আমলের চীনা জাতির কার্য্যকলাপ এবং বর্দ্ধন-চালুক্য-পাল-চোল আমলের হিন্দুজাতির কার্য্য-কলাপ একত্র মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। জলপথে এবং স্থল-পথে হিন্দুরা চীন হইতে কোন্ কোন্ বস্তু আমদানি করিয়াছে তাহার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। মুসলমানধর্ম্ম বিস্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান যে গভীরভাবেই সম্পন্ন হইত তাহার

কোন সন্দেহ নাই। চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে তাহার ইঙ্গিত পাইতেছি, কিন্তু তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ এখনও বাহির হয় নাই।

হোনানের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের নাম সুংশান। ভারতবর্ষে যেরূপ সপ্ত "কুলপর্ব্বত" বিখ্যাত সেইরূপ চীনে পঞ্চ পর্ব্বত বিখ্যাত। হোনানের সুংশান তাহাদের অন্যতম। এই পর্ব্বতে বহু মন্দির ও মঠ আছে। ভারতীয় ভিক্ষু বোধিধর্ম্ম একটি মন্দিরে নয়বৎসর কাল ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেই মন্দিরের নাম শাওলিং জু।

হোনানের পাহাড়ে পাহাড়ে ভারতীয় প্রভাবের বহু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে কেভ-টেম্প্‌ল্‌স্‌ গুহামন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গিরিকন্দরস্থ মন্দিরগুলির অধিকাংশ ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা—তাঙ্‌-আমলের তৈয়ারি মন্দিরও আছে।

মন্দিরের ভিতর বহু বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত—সকলগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। এই বাস্তুশিল্পে এবং স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় গান্ধার-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কীস্থানের খোতানেও এই ধরণের মূর্ত্তিগঠনই দেখিতে পাই। সুতরাং গান্ধার-রীতিতে যদি গ্রীক-প্রভাব থাকে তাহা হইলে মধ্যযুগের সমগ্র এশিয়ায় প্রাচীন ইয়োরোপের স্থাপত্যরীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

তাঙ্‌ নরপতিগণ হোনানের রাজধানী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে প্রাসাদ, মন্দির, বিদ্যালয়, প্যাগোডা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার সাধিত হয়। বাস্তুশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্পেরও যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছিল। হোনান-ফুর নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতকন্দরে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত—ইহা ৮৫ ফুট দীর্ঘ।

তাঙ্‌ এবং সুঙ্‌ বংশদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে এক নরপতি ভারতসম্রাট্‌ অশকের অনুকরণে তাঁহার রাজ্যের ভিতর ৮৪০০০ স্তূপ বিতরণ করিয়াছিলেন

(৯৬০ খৃঃ অঃ)। এইগুলিতে প্যাগোডার আকারে গঠিত স্তূপগাত্রে বৌদ্ধ "সূত্র" খোদিত আছে। তামা ও লোহার মিশ্রণে এই-সমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। চীনের নানাস্থানে আজও ইহাদের কোন-কোনটা চোখে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

চীনের শিকাগো

১। হুপে প্রদেশ

রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত চেঙ্-চাও জংসনের মোসাফেরখানায় কাটাই-লাম। ঠিক যেন মোকামা ষ্টেশনের আবহাওয়া। খোলা মাঠে পড়িয়া রেলযাত্রীরা নিদ্রা যাইতেছে বা উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে। নিকটবর্ত্তী হোটেল দোকানের হাল্লা শুনিতে পাইতেছি। দোভাষী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহারের কি ব্যবস্থা হইবে? চীনা সরাইয়ে ত মাছমাংসের কারবার অত্যধিক।" দোভাষী বলিলেন— "ভাবনা কি? সম্মুখেই মুসলমানের সরাই আছে। মুসলমানেরা হিন্দু আহার্য্য দিতে পারিবে, মুসলমানেরা শূকর খায়না। কিন্তু কন্‌ফিউশিয়ানধর্ম্মীরা আহারে বসিলে কোন বস্তু বাদ দেয় না। কাজেই চীনা মতে মুসলমানের খাদ্যে হিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য এখানে হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতবাসী। হিন্দু নামে যে একটা ধর্ম্মমত আছে তাহা দুনিয়ার কোন লোক জানে না। ইয়োরামেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত ছাড়া পাশ্চাত্যেরা হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এমন কি মিশরীয়, জাপানী ও চীনা জনগণও হিন্দুত্ব নামক "সনাতনধর্ম্মে"র নাম শুনে নাই।

পিকিঙ্ হইতে গাড়ী আসিল। এই গাড়ীতে হ্যান্-কাও যাত্রা করিলাম। সকাল প্রায় দশটা পর্য্যন্ত হোনান প্রদেশেই আছি। পরে হুপে প্রদেশ সুরু হইল। হোনান ও হুপের সীমান্ত প্রদেশ পর্ব্বতময়। উত্তর চীনের শস্যশ্যামল বহুরার প্রান্তর আর দেখিতে পাইতেছি না।

চারিদিকে সবুজ তৃণমণ্ডিত অথবা প্রস্তরময় তরুহীন পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতেছি। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে গিরিদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রদেশ হইতে প্রদেশের আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই পর্ব্বতসমাকুল জনপদ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। গাড়ী হইতে কোথাও কোথাও প্রাচীন দুর্গ-দেওয়ালের অংশ দেখা গেল।

মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিবার পর হইতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে সশস্ত্র সৈন্য দেখিয়াছি। এই অঞ্চলেও দেখিলাম। শুনিতেছি হুপে প্রদেশের পাদ্রী এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের পর্ব্বতে বিহার করিতে আসেন এক ষ্টেশনে কয়েক-জন শ্বেতাঙ্গ গাড়ীতে উঠিলেন।

হুপে প্রদেশের পল্লী-কুটিরগুলি দরিদ্রতর বোধ হইতেছে। খড়ো চালা এবং মাটির দেওয়াল চোখে পড়িতেছে। খোলার ছাদ এবং ইটের দেওয়াল আর দেখিতেছি না। গো-বলদের ব্যবহার চীনের অন্যত্র দেখি নাই—এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শকটের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার ডুলিও কিছু নূতন ধরণের।

পাহাড়িয়া ভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এখন হইতে চারিদিকে ধানের জমি। কোরিয়া ছাড়িবার পর ধান্যক্ষেত্র দেখি নাই। আজ মধ্য চীনের উভয় সীমায় চিরপরিচিত উদ্ভিদের শোভা দেখিতে পাওয়া গেল। উত্তর চীনের সর্ব্বত্র বজরা, ভুট্টা এবং কাঙ্গুনের দৃশ্য বিরাজমান। নদী খাল বিল ইত্যাদি একাধিক পার হইলাম। জল সর্ব্বত্রই ঘোলা। জেলের ডিঙ্গি, ধীবর-পল্লী ও কৃষক-কুটির দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের চিত্র স্মরণে আসে।

খানিক পরে আধুনিক ধরণের কলকারখানাবহুল নূতন অট্টালিকার নগরাংশ দৃষ্টিগোচর হইল। বুঝিলাম হ্যান্‌-কাও সমীপবর্ত্তী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়া হইতে নবীনতম ইয়োরোপ-আমেরিকার আব্‌হাওয়ায়

উপস্থিত হইলাম। অল্প পরে ইয়াংসি-কিয়াঙ্ নদীর ধারে-ধারে চলিতেছি। নদীর উপর ষ্টিমার, সমুদ্রপোত, নৌকা ইত্যাদির গতিবিধি দেখিতেছি। কিনারায় লোহালক্কড়, কাঠ, মালগুদাম ও কার্য্যালয়ের আবেষ্টন। চীনের শিকাগোতে আসিয়া উপস্থিত।

পিকিঙ্ হইতে ৭৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হ্যান্-কাও অবস্থিত ইয়াংসি-কিয়াঙের সমুদ্র-মোহনা হইতে এই স্থান প্রায় ৬০০ মাইল পশ্চিমে। বাঙ্গালীর পক্ষে এলাহাবাদ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে অবস্থিত, শাং-হাই বন্দরের চীনারা হ্যান্-কাওকে চীনের প্রায় সেই অংশে অবস্থিত বিবেচনা করিবে। ইয়াংসি-কিয়াঙ্ চীনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরার্দ্ধকে উত্তরচীন এবং দক্ষিণার্দ্ধকে দক্ষিণচীন বলা হয়। এই নদীকে আমাদের বিন্ধ্য পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে উত্তরচীন দেখা থাকিলে দক্ষিণচীন দেখা হয় না, আবার দক্ষিণচীন দেখা থাকিলে উত্তরচীন দেখা হইল না। দুই চীনের লোকজন, বাহ্যদৃশ্য, প্রাকৃতিক আবেষ্টন বিভিন্ন। ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যও এইরূপই বিভিন্ন। ইয়োরোপ যে হিসাবে এক হইয়াও বহু, ভারতবর্ষও সেই হিসাবে এক হইয়াও বহু, চীনও সেই ধরণেই এক হইয়াও বহু।

হুপে প্রদেশের লোকসংখ্যা আড়াই কোটী। একটা প্রদেশই আধখানা বাঙ্গলা দেশ আর কি! সুতরাং ৪০ কোটী নরনারীর চীন দেখা কার্য্য একটা বিরাট ব্যাপার। হাতীর কান দেখিয়া হাতীর বর্ণনা করিলে একরূপ দৃশ্য মনে আসিবে, তাহার পিঠ দেখিয়া তাহার পরিচয় দিতে হইলে অন্য এক দৃশ্য মনে আসিবে। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

২। কন্‌সেশন-মহাল্লা

হোটেলের কামরায় বসিয়া দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি-কিয়াঙের জল দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হ্যান্‌-কাও নগরে ফরাসী কন্‌সেশনে অবস্থিত। পিকিঙের হোটেলের মত এই হোটেলও ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী জনগণের কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত। চীনারা এখানে বাবুরচি ও খানসামা। দুই জন ভারতবাসীকে কর্ম্মচারী দেখিলাম—একজন পার্শী, অপর একজন গোয়ানিবাসী খৃষ্টান। রাত্রে এক নূতন মাছ খাওয়া গেল। নাম "ম্যাণ্ডারিন" মাছ। ম্যাণ্ডারিন চীনাদের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নাম। ইয়াংসি নদীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাছ বলিয়া ইহাকে শ্বেতাঙ্গরা এই নাম দিয়াছেন।

আমাদের দেশে গাড়োয়ান আর কুলীদিগকে যেমন কোনমতেই সন্তুষ্ট করা যায় না, চীনের প্রত্যেক নগরে ও ষ্টেশনে তাহাই দেখিতেছি। সেদিন কয়েক-জন জাপানী পর্য্যটকও চীনা-সমাজের এই দোষ উল্লেখ করিতেছিলেন।

রিক্‌শতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। হোটেলের আশে-পাশে ফরাসী কন্‌সেশনের ভিতর নানা-প্রকার বিদেশী দোকান, ব্যাঙ্ক, মহাজন-সমিতি ইত্যাদি রহিয়াছে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, আসবাব সবই যেন মার্সেঈএর মত। এই অংশে থাকিলে চীনের কোন নগরে আছি বলিয়া মনে হয় না। সম্মুখে তরুশোভিত সুপ্রশস্ত বাঁধা-পথ। নদীর কিনারায় এই বাঁধ। কলিকাতার চাঁদপাল-ঘাটের নিকট গঙ্গার উপর গড়ের মাঠের রাস্তা যেরূপ, হ্যান্‌-কাও নগরের এই বাঁধও সেইরূপ। ইহা চীনের গৌরব নয়—বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিপত্যের চিহ্ন।

ফরাসী কন্‌সেশন-মহাল্লার দুই ধারে আরও কন্‌সেশন-মহাল্লা রহিয়াছে। একদিকে জার্ম্মান ও জাপানী রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র—অপরদিকে রুশ ও ইংরেজ রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র। কন্‌শেসন-মহাল্লা বা বিদেশী

আধিপত্য-ক্ষেত্রের ভিতর পানীয় জলের কল, নর্দ্দমা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-রক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা আছে।

ইংরেজ কন্‌সেশন চীনা নগরের সংলগ্ন। এইখানে দেখিলাম বহু শিখ সৈন্য পাহারাওয়ালার কার্য্যে নিযুক্ত। লাল-পাগড়ীওয়ালা ভারতীয় প্রহরী পিকিঙের ইংরেজ-মহাল্লায়ও দেখিয়াছি। চীনারা ভারতবাসীকে সাধারণতঃ এইরূপ বরকন্দাজ, দ্বারবান্ ও পাহারাওয়ালা ভাবেই জানে। এই শ্রেণীর লোক হইতে অনেক সময়ে চীনা জনসাধারণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। কাজেই ভারতবাসীর নামে চীনের লোকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে। চীনের যত স্থানে এইরূপ বিদেশী কন্‌সেশন-মহাল্লা আছে সেইসকল স্থানে ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারত-বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

একটা রাস্তায় দেখিলাম তড়িতের বাতিতে রাত্রি গুল্‌জার হইয়া আছে। ইয়োরামেরিকার প্রণালীতে দোকানে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। এই রাস্তার পরেই চীনাদের স্বদেশী নগর। দোভাষী বলিলেন—"রাস্তার উপর যে-সকল বড় বড় গৃহ দেখিতেছেন এইগুলি মাত্র দুই তিন বৎসরের জিনিষ। ১৯১১ সালে বিপ্লবের সময়ে হ্যান্-কাও সহরের প্রায় সকল গৃহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।" চীনের আধুনিক ইতিহাসে হ্যান্-কাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কারণ এইখানেই স্বরাজতন্ত্রীরা মাঞ্চুসম্রাটের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম খড়্গ ধারণ করেন। আজও এই অঞ্চলে স্বরাজবাদিগণের দল অতিশয় প্রবল। চীনের নানা স্থান হইতে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু হ্যান্-কাওবাসীরা এই আন্দোলনে বাধা দিতেছে।

কন্‌সেশন সহরের রিক্‌শ চীনা সহরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনা সহরের রিক্‌শ কন্‌সেশন সহরে আসিতে পায় না। ইহার নাম

"নিজ বাসভূমে পরবাসী।" হোটেল হইতে যে রিক্‌শতে বাহির হইয়াছিলাম, চীনা সহরের সীমান্তে আসিয়া তাহা ছাড়িতে হইল। এইবার চীনা সহরের রিক্‌শতে বসা গেল। দুই সহরের আব্‌হাওয়া, আবেষ্টন, রাস্তা ঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই অঞ্চলে পথগুলি এত সঙ্কীর্ণ যে রিক্‌শ চলাও কঠিন। দোভাষী বলিলেন—"আজকাল এখানে যতটা পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দেখিতেছেন তাহা পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে দেখিতে পাইতেন না।"

নদীর ধারের বড় রাস্তার উপর ব্যবসায়ী-পরিষৎসমূহের গৃহ অথবা কন্‌সালাদির কার্য্যালয়। নদীতে আমেরিকান, জাপানী, চীনা ও অন্যান্য ষ্টীমার এবং জাহাজ ভাসিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অর্ণবযানের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি জগতের আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। হ্যান্‌-কাও এই কারণে জগদ্বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। অপরদিকে হ্যান্‌-কাও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক্‌ হইতেই হ্যান্‌-কাও সহরে আসা-যাওয়া করা যায়। ফলতঃ আন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়েও হ্যান্‌-কাও প্রধানতম কেন্দ্র। এই দুই কারণে বিদেশী বণিক্‌গণ হ্যান্‌-কাও নগরের কন্‌সেশন-মহাল্লাকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে যত্নবান্‌।

বস্তুতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্যই বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ চীন-সম্রাটের নিকট প্রধান প্রধান কেন্দ্রে খানিকটা ভূমি চাহিয়া লইতেন। এই ভূমির উপর তাঁহারা নিজেদের কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত ঘরবাড়ী, জেটি, মালগুদাম ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা পাইতেন। বিদেশীরা সহজে এই-সকল অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চীনসম্রাট্‌ ইঁহাদের কামানবন্দুকের প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নানা সময়ে নানা জাতিকে এইরূপ অধিকার বা Concession বিতরণ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য বাণিজ্যবিষয়ক অধিকার প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় এবং আইন-বিষয়ক অধিকারও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ যে যে নগরের মধ্যে কন্‌সেশন-মহাল্লা আছে সেই-সকল নগরের এই অঞ্চল যথার্থই চীনসরকারের বহির্ভূত। কন্‌সেশন-ভূমিতে এবং পরাধীন ভূমিতে বিশেষ পার্থক্য নাই।

হংকঙ ইংরেজের অধিকৃত পূরা পরাধীন ভূমি। সেইরূপ পোর্ট-আর্থারও জাপান-শাসিত পূরা পরাধীন ভূমি। কিন্তু টিনসিন, হ্যান্‌কাও, শাংহাই ইত্যাদি ৪০।৫০ কেন্দ্রে কন্‌সেশন-ভূমি মাত্র আছে। এই ভূমির উপর কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ সমবেত হইয়া সেই ভূখণ্ডের শাসন করিয়া থাকেন —কিন্তু চীনা সরকারের পক্ষে হংকঙ ও পোর্টআর্থার ইত্যাদি যেরূপ, এই সকল কন্‌সেশন-ভূমিও প্রায় সেইরূপ।

পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের কন্‌সেশন ভূমি নাই। এই সহরের এক অংশে তাঁহাদের সকলের দূত ও প্রতিনিধিগণের জন্য কার্য্যালয়ের উপযোগী স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। এই অংশে বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বাড়ীঘর দেখা যায় না। একমাত্র সরকারী কাছারি এবং দূতগণের বাসগৃহ এই অংশের বিশেষত্ব। পিকিঙ্‌ চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র, এইজন্য বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের কার্য্যালয় এবং বাসগৃহ পিকিঙেই অবস্থিত। ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে, বার্লিনে, তোকিওতে, পারীতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকেন্দ্রে এই ধরণের দূত-ভবন আছে। রাষ্ট্রদূতগণ স্বকীয় সরকারের প্রতিনিধি বা ডেলিগেট-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অতিথিভাবে বাস করেন। এইজন্য দূত-ভবনকে লেগেশন বা প্রতিনিধি-সৌধ বা অতিথিশালা বলা হইয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ড, জাপান, জার্ম্মানি ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিনিধি-ভবন-সমূহকে সাধারণ চোখেই দেখিয়া থাকেন। এইসকল প্রবল দেশে লেগেশন-গৃহগুলির প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধে সভ্য রাষ্ট্রের আতিথ্য আদব-কায়দা যেরূপ হওয়া উচিত তাহার বেশী কিছু করা হয় না। কিন্তু পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের ভবন চীনা-সরকারের কার্য্যালয়-সমূহ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিনিধিগণের জন্য একটা জনপদ স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই জনপদে একটা লেগেশন-সহর বা অতিথি-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ লেগেশন-সহর দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দূত-ভবন অবস্থিত। তোকিওতেও কোন এক স্বতন্ত্র জনপদের মধ্যে সকল রাষ্ট্রদূতের ভবন নাই। কিন্তু পিকিঙে যাহা দেখিয়াছি হ্যান্‌-কাওর কন্‌সেশন-মহাল্লা হইতে তাহাকে পৃথক্ করা কঠিন। কনসেশন-ভূমিতে বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে বিদেশীরা অন্যান্য যতপ্রকার অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন, পিকিঙের লেগেশন-ভূমিতে চীনাসরকারের অতিথিমাত্র হইয়াও তাঁহারা প্রায় সেই-সকল অধিকারই ভোগ করিতেছেন।

৩। হ্যান-ইয়াঙে লৌহ-কারখানা

ইয়াংসি পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রবাহিত। হ্যান্‌-কাওয়ের অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উচাঙ্‌ নগর অবস্থিত। উচাঙ্‌ হুপে প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র। প্রাচীনতম কাল হইতেই উচাঙ্‌ চীনা-সমাজে প্রসিদ্ধ। তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বেও এবং কন্‌ফিউসিয়াসের আমলে এই অঞ্চলের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্যাগোডা, মন্দির এবং অন্যান্য অট্টালিকা

অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে হ্যান্-কাও নগরের মন্দিরগুলি ধূলিসাৎ হইয়াছে; কিন্তু উচাঙের কতিপয় প্যাগোডা দণ্ডায়মান আছে।

এতদিন উচাঙ্ই প্রধান ছিল—হ্যান্-কাও মাত্র একটা ধীবর-পল্লীরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী রাষ্ট্রের কন্‌সেশন এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর ইংরেজেরা সর্ব্বপ্রথম এই আধিপত্য ভোগের অধিকার পান। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে হ্যান্-কাও উচাঙ্কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—এমন কি সমুদ্রবন্দর শাংহাইকেও পরাস্ত করিতে অগ্রসর। জাপানের ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোবে যেরূপ অল্পকালের ভিতর দ্রুত উন্নতির সাক্ষী, মধ্যচীনের হ্যান্-কানও নগরও সেইরূপ।

চীনারা হ্যান্-কাওকে নয় প্রদেশের প্রবেশদ্বার-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকে। চীনের আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যে ইহার মূল্য এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ শিকাগো যেরূপ ইয়াঙ্কিস্থানের বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র, হ্যান্-কাও সেইরূপ চীনের ভিতরকার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। সম্প্রতি হ্যান্-কাও হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত ১৮০০ মাইল বিস্তৃত রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার প্রভাবে হ্যান্-কাও আরও উন্নত হইবে। অধিকন্তু জলপথে সুদূর দেশের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ত আছেই।

হ্যান্-কাও নগরের শিল্পসম্পদও নগণ্য নয়। প্রাচীন ধরণের নানা শিল্প-কারখানা উচাঙ্-হ্যান্‌কাও জনপদে বহু কাল হইতেই আছে। আধুনিক রীতির কলকারখানাও বর্ত্তমান যুগে স্থাপিত হইয়াছে। বয়নফ্যাক্টরি, দিয়াশলাই-ফ্যাক্টরি, তামাক-ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কারবারে বাষ্পের ব্যবহার এবং যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত। এই-সমুদয়ের কোন

কোনটা বিদেশী ধনীদিগের সম্পত্তি—চীনাদের অধীনেও বহুসংখ্যক নব্য-কারবার চলিতেছে। বস্তুতঃ এই-সকল স্বদেশী শিল্পের প্রভাবে বিদেশী দ্রব্যের আমদানি চীনে অনেকটা কমিয়াছে। এই হিসাবে চীনাদের অবস্থা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই।

চীনের মধ্যে একটিমাত্র লৌহ-কারখানা আছে। তাহাও এই জনপদেই অবস্থিত। স্থানের নাম হ্যান্-ইয়াঙ। ইহার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উ (Woo) মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকা হইতে ইনলুলু আসিবার সময়ে আলাপ হইয়াছিল। ইহাঁর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হ্যান্-ইয়াঙে যাত্রা করিলাম।

রুশ-কন্‌সেশনের ঘাটে একটা ক্ষুদ্র ষ্টীমলাঞ্চে বসা গেল। ইহা লৌহকারখানা কোম্পানীর সম্পত্তি। এখান হইতে ১৫ মিনিটে হ্যান্-ইয়াঙে পৌঁছিলাম। প্রথমে ইংরেজ কন্‌সেশনের ঘাট, বাঁধ এবং অট্টালিকা-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। পরে চীনা সহরের ঘাট এবং বাড়ী ঘর দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বত্রই ষ্টীমার, জাহাজ ও নৌকার গতিবিধি দেখিতেছি। যতই চীনা মহাল্লার দিকে অগ্রসর হইতেছি ততই স্বদেশী বণিক-তরণীর সংখ্যা বেশী দেখিতেছি। আমরা গঙ্গার উপর পাটনাই নৌকা, ঢাকাই নৌকা ইত্যাদির সারি দেখিয়া থাকি। ইয়াংসি-বক্ষে সেইরূপ বিভিন্ন চীনা প্রদেশের স্বদেশী নৌকা দেখিলাম। এই সকল "জাঙ্কের" ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নাম আছে।

হ্যান্-কাও হইতে হ্যান্-ইয়াঙ যাইতে হইলে নদীর উপর উজান চলিতে হয়। লাঞ্চে একসঙ্গে দুই কিনারার দৃশ্যই দেখিতে পাইতেছি। ইয়াংসির প্রস্থ এখানে দুই মাইল হইবে। উচাঙের পরে অনতিদূরে পাহাড় দেখা যায়—সহরটা যেন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। পুরাতন নগর-প্রাচীরও দেখা গেল।

ক্রমশঃ অগণিত বণিক্-তরণীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইগুলি হ্যান্-কাওয়ের পারেই দেখিতেছি। চীনের এক প্রসিদ্ধ নদী এই স্থানে ইয়াংসিতে মিশিয়াছে। তাহার নাম হ্যান্। দুয়ের সঙ্গমস্থলে সময়ে সময়ে ৩০,০০০ এমন কি ৪০,০০০ নৌকাও বাঁধা থাকে। ইয়াংসিতে বেশীক্ষণ থাকা নৌকা-সমূহের পক্ষে নিরাপদ নয়। এইজন্য মাঝিরা এই দ্বিতীয় নদীর কূলে কূলে লঙ্গর করিয়া মালবিনিময় করে। এত নৌকা সমবেত হয় যে ৫।৬ মাইল পর্য্যন্ত ইহাদের সারি দেখা যায়। লাঞ্চ হইতে বুঝিলাম যেন এই হ্যান্-ইয়াংসি-সঙ্গমে মাস্তলের জঙ্গল দেখিতেছি। এই বিরাট মাস্তল-জঙ্গল দেখিলেই চীনাদের স্বদেশী আমদানি রপ্তানি পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

হ্যান্-ইয়াংসির সঙ্গমেই লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা অবস্থিত। এইখানে একটা একটা পাহাড়ের উপর পুরাতন মন্দির-সদৃশ অট্টালিকা দেখা গেল। বিপ্লব পক্ষীয় সৈন্যগণ ১৯১১ সালে এই পাহাড়ে এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। হ্যান্ইয়াঙে গোলা-বারুদের কারখানা এবং ইটের কারবারও আছে।

লৌহকারখানা প্রায় বিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল এখানে ২৫০০ শ্রমজীবী কর্ম্ম করে। বিদেশী ওস্তাদ বা অধ্যক্ষ একজনও নাই। প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে জার্ম্মান এঞ্জিনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা যুবকগণ কর্ম্ম করিতেছিলেন। ইহাঁদের নায়কতায় কারখানার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র শিল্প-বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে। রেলের লাইন, সেতুর বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই এই কারখানার উদ্দেশ্য ; এঞ্জিন তৈয়ারি করা হয় না।

কর্ম্মকর্ত্তারা বলিলেন—"আপনাদের সাক্‌চিতে তাতা প্রতিষ্ঠিত যে কারখানা আছে তাহার তুলনায় আমাদের এই কারবার খেলানার

সামগ্রী মাত্র।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যান্-ইয়াঙে এই কারবার খুলিবার কারণ কি ? আশে-পাশে খনি আছে কি ? উ বলিলেন—"উচাঙ্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার খেয়াল বলা যাইতে পারে। এখান হইতে কয়লার খাদ ১০০ মাইল পশ্চিমে এবং লোহার খনি প্রায় ৭০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কাজেই ইহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে কারখানা স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তা বুঝিলেন তাঁহার রাজধানীর সম্মুখে এই নব্য-কারবার খুলিলে উচাঙ্ হ্যান্-কাও জনপদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"

এই কারবার হইতে এখনও লাভ বাহির হয় নাই। আজ ইংরেজের নিকট কর্ত্তারা টাকা ধার লইতেছেন, কাল জার্ম্মানের নিকট ধার লইতেছেন। এক্ষণে জাপানের টাকাই বেশী খাটিতেছে। কাজেই জাপানের প্রভাব ইহা পরিচালনায় বিশেষ লক্ষিত হয়। ইংরেজ জাপানকে এইরূপ অনেক কারণে ইয়াংসি অঞ্চলে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করিতেছেন।

চীনের ভিতর ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজ, আমেরিকান ও জাপানী রাষ্ট্রসমূহ নানা স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণের অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা এই কারখানা হইতে সকল প্রকার সরঞ্জাম খরিদ করিতে বাধ্য। এইরূপ চুক্তি আছে বলিয়া এখানকার মাল পড়িয়া থাকে না। চীনা সরকার এই উপায়ে কারখানাকে "সংরক্ষণ" করিতেছেন। এই চুক্তি না থাকিলে বিদেশী রেল-মহাজনেরা তাঁহাদের স্বদেশ হইতেই লোহালক্কড় আনাইতেন। ভারতীয় রেল-কোম্পানীরা বিলাত হইতেই মাল আনাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তাতার কারখানা বিলাতী কারখানাগুলির প্রতিযোগী হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত।

৪। চীনের নুন-কর ও রাজস্ব বিভাগ

দুইজন ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। একজন আকর-তত্ত্ববিৎ দশ-বার বৎসর কাল চীনের নানা স্থানে খননকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; অপর-জন চীনা সরকারের নুন-কর বিভাগে কর্ম্মচারী।

চীনে কর আদায় করা এক বিষম কাণ্ড। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গবর্মেণ্টের কার্য্য-তালিকা অত্যল্প ছিল। কাজেই অল্প মাত্র কর পাইলেই গবর্মেণ্টের খরচ চলিয়া যাইত। বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এবং জেলা-গবর্মেণ্টগুলি মূল গবর্মেণ্টের অধীনতা বেশী স্বীকার করিতেন না। এদিকে তাঁহারাও জনসাধারণ হইতে অল্পমাত্র খাজনা পাইলে সন্তুষ্ট থাকিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষেও অনেকটা এই অবস্থা ছিল।

চীনে আজও সেই অবস্থা রহিয়াছে। প্রদেশ-সমূহ এক-প্রকার পরস্পর স্বাধীন বলিলেই চলে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে মাল চালান করিতে হইলে ব্যবসায়িগণকে শুল্ক দিতে হয়। সকল প্রদেশ যে এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেই ধারণা জন্মে নাই। অধিকন্তু এক এক প্রদেশে এক এক নিয়ম প্রচলিত। তাহার উপর শুল্ক আদায় হইলে তাহা অনেক সময় সরকারী কোষাগারে পৌছেনা।

এই-সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য চীনা গবর্মেণ্টকে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজ কর্ম্মচারী এক বিভাগের কর্ত্তা—উহা সণ্ট গ্যাবেল বিভাগ। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিতেন—এক্ষণে চীনে রহিয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বিদ্যালয়-স্বরূপ। এখানে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে কর্ম্মচারীরা মিশর, পারস্য, চীন ইত্যাদি দেশে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ কর্ম্মচারীর অধীনে নুন-কর বিভাগে যথেষ্ট শৃঙ্খলা আসিয়াছে—চীনাস্বরাজের ধনাগমও বাড়িয়াছে। চীনাদের আর একটা রজস্ব-বিভাগ ইংরেজের অধীনে বহুকাল হইতে পরিচালিত হইতেছে। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের বণিকগণ সমুদ্রপথে চীনের নানা বন্দরে মাল আমদানী করে। তাহাদের উপর কাষ্টম্ ডিউটি বা শুল্ক বসান চীনাদের রীতি। কিন্তু এই শুল্ক আদায় করিয়া উঠা চীনাদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। এইকারণে ম্যারিটিম কাষ্টম অর্থাৎ সামুদ্রিক শুল্ক-বিভাগ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজের শাসনে আসিয়া শুল্কের পরিমাণ যৎপরনাস্তি বাড়িয়াছে। এই দুই বিভাগে আজকাল প্রায় ২।৩ হাজার ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-শাসিত দেশ; চীনের স্বরাজও কি ব্রিটিশ-শাসিত নয়? আবার শুনিতেছি ভূমি-কর বিভাগও নাকি ইংরেজের হস্তে প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, চীন সরকার যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা ত আদায় করিতেছেন। কিন্তু এই ধন তাঁহার কোষাগারে থাকিতে পায় কি? এবিষয়ে চীনের দুর্ভাগ্য কম নয়। নুন-কর এবং আমদানি-কর উভয় বিদেশী উত্তমর্ণগণের নিকট বন্ধক রহিয়াছে। ১৮৯৪ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে চীনগবর্মেণ্ট পাশ্চাত্য দেশে টাকা ধার লন। তাহার পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার নামক স্বদেশ-সেবকেরা বিদেশীদিগকে চীন হইতে তাড়াইবার আয়োজন করেন। সেই প্রয়াস বিফল হয়। পক্ষান্তরে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ চীন সরকারের নিকট ইণ্ডেম্নেটি বা ক্ষতিপূরণ চাহেন। সেই টাকা দিবার ক্ষমতা চীনাদের ছিল না। কাজেই উহাও ঋণ। তাহার পরে দেশের মধ্যে রেল-প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্যও টাকা অবশ্যক হয়। এই টাকাও বিদেশের উত্তমর্ণগণ হইতেই আসিয়াছে। অবশেষে ১৯১১ সালে

স্বরাজ স্থাপিত হইবার পর শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য বিরাট ঋণ গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকবার টাকা ধার দিবার সময়ে বিদেশীরা যথোচিত জামিন বন্ধক চাহিয়াছেন। চীনের রাজস্ব-বিভাগ চিরকালই অকর্ম্মণ্য। বিদেশীরা বলিলেন "তোমাদের অমুক বিভাগে যত আয় হইবে সবই বন্ধক রাখ। অধিকন্তু ঐ-সকল বিভাগ পরিচালনায় বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর।" চীন সম্মত না হইয়া কি করিবেন?

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়াংসি-বক্ষে

(১) প্রথম রাত্রি—চীনে জাপানী

ইংরেজ কন্‌সেশনের বাঁধ-পথের উপর জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর কার্য্যালয় অবস্থিত। এই খানে ষ্টীমারের টিকেট কিনিলাম। মহা-মুস্কিল। পিকিঙ্‌ হইতে যে নোট আনিয়াছি তাহার উপর শত করা দুই টাকা বাটা দিতে হইল। ইয়োকোহামা স্পেসিব্যাঙ্কের নোট ছিল—তাড়াতাড়ি তাহাদেরই শাখা-কার্য্যালয়ে গেলাম। কিন্তু তাহারাও বাটা না লইয়া টাকা দিবে না।

রাত্রি নয়টার সময়ে রুশ কন্‌সেশনের ঘাট হইতে জাপানী ষ্টীমার ছাড়িল। ষ্টীমারের কাপ্তেন এবং আর দু'একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত জাপানী আর কেহ নাই। খালাসী, বাবুরচি, ম্যাথর ইত্যাদি সকলেই চীনা। জার্ম্মাণ কোম্পানীর জাহাজে ষ্টীমারেও দু'এক জন জার্ম্মাণ থাকেন মাত্র—সেবকেরা সকলেই চীনা। ইংরাজ এবং ফরাসী কোম্পানীর কারবারেও এই নিয়ম। সুতরাং জাপানীরা অন্যান্য ফাষ্টক্লাস পাওয়ারের চালেই চলিতেছেন।

জাপানীরা চীনে স্বদেশী লোকজন হইতে বেশ পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন। চীনের জাপানী ব্যাঙ্কে, লেগেশন-কার্য্যালয়ে, দোকানে ও হোটেলে বিজেতা জাতির ধরণ-ধারণ সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ইয়োরামেরিকার লোকেরা চীনা লোকজনকে যেরূপ ভাবে নেটিভ্‌ বলিয়া থাকে জাপানীরাও ঠিক সেই ভাবে চীনাদিগকে "নেটিভ

বলে। চীনা চাকর, বাবুরচি ও দ্বারবান্‌দিগকে বিদেশীয়েরা যে সুরে "বয়" বলিয়া ডাকে জাপানীরাও ঠিক সেই সুরে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের জীবন যেরূপ চীনে ফরাসী, ইয়াঙ্কি, জার্ম্মাণ, রুশ, ইংরাজ ও জাপানীর জীবন সেইরূপ। সুতরাং যাঁহারা ভারত-বাসীর সঙ্গে ইংরেজের ব্যবহার দেখিয়াছেন তাঁহারা চীনে বিদেশীয়-দিগের আচরণ বুঝিতে সমর্থ হইবেন। আমরা ভারতবর্ষে কোন ইংরেজকে ছোট খাট কাজ করিতে দেখিনা। ইংরেজ জাতির মধ্যে যে মজুর, ম্যাথর, ঝাড়ুদার, মুচি ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর লোক আছে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনা। কোন ইংরেজকে রেল-ষ্টীমারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নে মোসাফির হইতে দেখিয়াছি কি? ইহারা যত নিম্ন পদস্থ লোকই হউক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতবাসীর তুলনায়ও ইহারা উচ্চ, কারণ ইহারা বিজেতা জাতির লোক! বিজিত জাতিকে সর্ব্বদা ইহাদের ক্ষমতা দেখাইয়া চলিতে হয়। তাহা না হইলে ইহাদের "প্রেষ্টিজ" থাকিবে কেন?

ভারতবর্ষে ইংরেজ যে বস্তু ইংল্যাণ্ডে সে বস্তু নহে। সেইরূপ জাপানে জাপানী যে বস্তু, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায় এবং চীনে সেই বস্তু নহে। জাপানীরা স্বদেশে যত বেতনে কর্ম্ম করে এই সকল ভোগভূমিতে ইহারা তাহার চতুর্গুণহারে বেতন পায়। জাপানী মুল্লুকে ভৃত্য জাতীয় লোক আছে কিনা তাহা চীনের জাপানী সমাজ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই। এখানে যে সকল জাপানী চোখে পড়ে তাহারা সকলেই রিক্‌শতে চলাফেরা করিয়া থাকে।

জাপানী ষ্টীমারে চীনা মোসাফিরদিগের জন্য এক ধরণের ফার্ষ্ট-ক্লাশ কামরা আছে—বিদেশীয় ফার্ষ্টক্লাশ প্যাসেঞ্জারদিগের জন্য অন্য এক প্রকার কামরা আছে। বিদেশীয় কামরার মূল্য দিতে হইল ৬০৲

অথচ চীনা প্রথম শ্রেণীর মূল্য মাত্র ১৫৲। এতটা প্রভেদ না থাকিলে চীনারা জাপানী ও অন্যান্য বিদেশীয়গণকে সম্মান ও ভয় করিবে কেন?

জাপান বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নিকট নব্য জগতের সকল বিদ্যা শিখিয়াছে। মাত্র ৫।৭ বৎসর হইল দুনিয়ায় বৃহত্তর জাপানের সূত্রপাত হইয়াছে। বিদেশে সাম্রাজ্য চালাইবার জন্য কোন্ প্রণালীতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য জাপানীরা এক্ষণে তাহাও ইয়োরামেরিকা হইতে শিখিতেছে। সাম্রাজ্য শাসন-নীতি বা ইম্পিরিয়া-লিজম সম্বন্ধে ইংরেজের সমান গুরু জগতে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই জাপান এই সকল বিষয়ে ইংরেজের পথ অনুসরণ করিতেছেন। এই জন্য বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ জাপানী রাষ্ট্রবীরগণের পক্ষে ল্যাবরেটরী স্বরূপ। ভারতে জাপানী পর্য্যটকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

চীনারা সকল বিদেশীয় রাষ্ট্রের উপরই নারাজ। সম্প্রতি জাপানীরা ইহাদের চক্ষুঃশূল। কয়েক মাস হইতে চীনারা জাপানী মাল বয়কট সুরু করিয়াছে। কাজেই চীনা দোভাষী মহাশয় জাপানী ষ্টীমারে বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছেন। প্রথম হইতেই ইনি বলিতেছিলেন "মহাশয় জাপানী কোম্পানীর জিনিষ পত্র ভাল নয়, ক্ষুদ্র ষ্টীমারে অসুবিধায় পড়িবেন।"

বিকাল হইতে মহাবৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ইয়াংসি আজ উত্তাল তরঙ্গের খেলা দেখাইতেছে। যেন সমুদ্রে বাস করিতেছি। এক ঘুমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। ভোরে হুপে প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় উপস্থিত। হ্যাঙ্কাও হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে এক স্থানে লৌহখনি আছে। এই খনির কথাই সেদিন উ বলিতেছিলেন। এইখানে

একটা কারখানা খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বিশেষ চুক্তির প্রভাবে জাপান সরকার এই খনি হইতে সস্তায় লোহা পাইয়া থাকেন। আর ৪০ মাইল পূর্ব্বে একটা নুনের খনির নিকট দিয়া ইয়াংসি প্রবাহিত। শুনিলাম এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়—চারিদিকে পাহাড়—নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জলপথ, তাহার ভিতরেও সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের শিরোদেশ।

হোয়াংহো নদীর খাত অসংখ্যবার স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। তখন সন্নিহিত জনপদের দুর্দ্দশার সীমা থাকেনা। কিন্তু ইয়াংসির মূর্ত্তি মোটের উপর শান্ত।

ইয়াংসি-বক্ষে ৬০০ মাইলের সফরে বাহির হইয়াছি; যেন এলাহাবাদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের লোকজন সমুদ্র হইতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম পর্য্যন্ত জাহাজেই আসিত। এক্ষণে এলাহাবাদের সেই জাহাজ ঘাটের বাঁধের কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে। আজকাল হ্যান্ ইয়াংসি-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিদেশীয় বণিক্‌গণের মানোয়ারি জাহাজও আসিয়া থাকে। একশত বৎসর পর চীনের অবস্থা কি হইবে কে বলিতে পারে?

(২) ইয়াংসি-সমস্যা

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কামরা হইতে দেখি কিনারায় খড়ো চালার পল্লীকুটির ও সবুজ ধানের ক্ষেত। অদূরে অনুচ্চ পাহাড় নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ইয়াংসির জল চীনের অন্যান্য নদনদীর জলের মতনই অত্যন্ত ঘোলা—প্রায় রক্তাভ পীতবর্ণ, বর্ষাকালে কখনও গঙ্গাপদ্মায় এরূপ কর্দ্দমাক্ত গেরুয়া জল দেখি নাই।

চীনাদিগকে পীতাঙ্গ জাতি কেন বলা হয়, চীনে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। ইহাদের বর্ণকে পীত বলিব কি করিয়া? শ্বেতাঙ্গও ইহারা নয়। মোটের উপর ভারতীয় ধূসর রঙের প্রাধান্যই দেখা যায়। তবে নদীর জল পীতাভ সন্দেহ নাই।

হান্‌কাও সমুদ্র হইতে মাত্র ৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ ইয়াংসির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০০ মাইল। চীনারা এই নদীর নামে দীর্ঘ ও প্রশস্ত নদী বুঝিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইয়াংসির উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত বহুদিনের পথ। খানিকটা ষ্টীমারে যাওয়া যায়। তাহার পর আর খানিকটা চীনা নৌকায় গমনাগমন হইয়া থাকে। শুনিতেছি মোটের উপর ১৫০০ মাইল নদীবক্ষে চলাফেরা করিতে পারি। তাহার পর তিব্বতের সীমা। তিব্বতের পার্ব্বত্য ভূমিতে নদীর গতি অতিশয় বক্র এবং প্রস্থ অত্যন্ত অল্প। তিব্বত যেমন সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের জন্মদাতা সেইরূপ ইয়াংসিরও জন্মদাতা।

সকাল নয়টার সময়ে কিউ-কিয়াঙ্‌ সহরে ষ্টীমার দাঁড়াইল। বার ঘণ্টায় ১০০ মাইল আসিয়াছি। নদীর দক্ষিণ দিকে এই নগর। কতকগুলি নূতন নব্য অট্টালিকা দেখা গেল এখানে পয়াঙ্‌ হ্রদের ধারে ধারে একটা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে পয়াঙ্‌ হ্রদের জল ইয়াংসিতেও কিছু মিশিয়াছে। শীতকালে নাকি পয়াঙের ও জল শুকাইয়া যায়। কিন্তু অন্য ঋতুতে হ্রদে ষ্টীমার যাতায়াত করে।

ষ্টেসনের নিকটেই বিদেশীয় কন্‌সেশন মহাল্লা দেখিতে পাইলাম। ইয়াংসি নদীর ধারে ধারে এইরূপ দশ বার বন্দরে বিদেশীয় রাষ্ট্রের ভোগভূমি স্বরূপ বাণিজ্য-কেন্দ্র আছে। ইয়াংসিকে লইয়া বিদেশীয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চীনের উর্ব্বরতম ভূমিখণ্ড ইয়াংসির দুই কিনারায় দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইয়াংসি প্রক্ষালিত প্রদেশ

সমূহে সর্ব্বসমেত বিশ কোটি নরনারীর বাস। এই অঞ্চলে ব্যবসায় করিতে পারা এক প্রকার হাতে হাতে লক্ষ্মীলাভ নহে কি? এইজন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা এবং মনোমালিন্য কম উপস্থিত হয় না। ইংরেজ ও ফরাসী—বিশেষভাবে ইংরেজই ইয়াংসি-মাতৃক দেশে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি জাপানের দৃষ্টি এই অঞ্চলে পড়িতে সুরু করিয়াছে। জাপানে ও ইংল্যাণ্ডে ইয়াংসি লইয়া গণ্ডগোল বাধা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নয়।

কিউ-কিয়াঙ্ অনেক দিনের সহর। তাঙ্ আমলেও ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। পশ্চাতে যে পাহাড় শ্রেণী দেখিতেছি উহা চীনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তাঙ্ ও সুঙ্ বংশীয় নরপতিগণ এই অঞ্চলের পোর্সলেন বাসন পছন্দ করিতেন। আজ ত এই শিল্প কিউ-কিয়াঙে বেশ চলিতেছে। বহুসংখ্যক মন্দির ও প্যাগোডা এই জনপদে দেখিতে পাওয়া যায়।

চীনের সর্ব্ববৃহৎ হ্রদের নাম টংটিঙ্। উহা হ্যান্‌কাও হইতে প্রায় ১৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইয়াংসিতে এই হ্রদের জলও পড়িয়াছে। ইয়াংসি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রবাহিত কিন্তু ইহার গতি সরল রেখার মতন নয়। পার্ব্বত্য ভূমির প্রভাবে ইহাকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া চলিতে হয়—কয়েক শত মাইল দক্ষিণে চলিবার পর কয়েক শত মাইল উত্তরে ইহার গতি, পুনরায় হয়ত খানিক দূর দক্ষিণে গতি এই কারণেই ইয়াংসির দৈর্ঘ্য এত বেশী। ইহার প্রস্থ কোথাও বেশী নয়। দেড় দুই মাইলের কমই সর্ব্বত্র; কোথাও কোথাও নাকি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য গলিমাত্র নদীর খাত।

দুই কিনারায় যেখানে যেখানে আবাদ দেখিতেছি সেই খানেই ধানের ক্ষেত চোখে পড়ে। কোরিয়া পরিত্যাগ করিবার পর ভুট্টা

বজরার ভূমি শত শত মাইল ধরিয়া দেখিয়াছি। এক্ষণে ধান্য মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ইয়াংসি চীনকে প্রায় দুই সমান ভূখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর চীনের প্রধান খাদ্য রুটি—দক্ষিণ চীন ভাতের মুল্লুক। উত্তরের লোকেরা ভাতও খাইয়া থাকে।

ইয়াংসির প্রায় সকল অংশেই পাহাড়ের দৃশ্য চোখে পড়ে। দ্বিপ্রহরে একটা প্রাচীর রক্ষিত পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র নগর দেখিলাম। হুপে প্রদেশের পর কিয়াংসি প্রদেশে চলিতেছি। কিউ-কিয়াঙ্ এই প্রদেশেরই রাষ্ট্র-কেন্দ্র। সন্ধ্যাকালে অনেকটা উত্তর-পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সময়ে আন্-হুই প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র আন্-কিঙ্ নগরে ষ্টীমার থামিল।

দোভাষী মহাশয় চীনা খান্সামাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মগ্ন থাকিতেছেন। ইংরেজিভাষী এক ব্যক্তিও ষ্টীমারে পাইতেছিনা। সহযাত্রী মাত্র একজন। ইনি ইংরেজি জানেন না। পোষাকে বুঝিলাম চীনা। দোভাষীর সাহায্যে ইহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। ইনি বলিলেন "মহাশয়, নিতান্ত বাধ্য হইয়া জাপানী ষ্টীমারে যাইতেছি।"

পরিচয়ে জানিলাম চীনা সহযাত্রী উচাঙের অধিবাসী। হুপে-প্রদেশের শাসন কর্ত্তার সাহায্য করা ইহাঁর কার্য্য। দশবৎসর হইল জাপান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। তোকিওর ওয়াসেদা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাঁর শিক্ষালাভ হইয়াছিল। ইনি জাপানীতে কথা বলিতে ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেও পারেন।

ম্যাণ্ডারিণ মাছের ঝোল এবং ভাত আহার করা গেল। উত্তর চীনে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে পাইতাম। দক্ষিণে খেজুর পাইতেছি।

অন্ধকার পক্ষ চলিতেছে—চাঁদের বাহার নাই। এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাজেই "পরে কি যামিনী তারার মালা?"

(৩) ৪০ কোটি নরনারীর ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ চীনের লোক সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি, উত্তর চীনেও লোক সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি। পৃথিবীতে এক মাত্র ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা দশ কোটি; অন্যান্য ফার্ষ্টক্লাস পাওয়ারের লোক সংখ্যা হয় ৫ কোটি, না হয় ৬ কোটি। সুতরাং লোক সংখ্যা অনুসারে যদি রাষ্ট্রের চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ করা যায় তাহা হইলে উত্তর চীনে দুইটা বৃহত্তম ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার এবং দক্ষিণ চীনে দুইটা ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারের উপকরণ আছে। অর্থাৎ চীনা-সমাজ হইতে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের সমান চারিটা সুবৃহৎ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে আর যদি জাপান, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করি, তাহা হইলে ৭।৮টা প্রবল চীনের মালমশলা এই জনপদে আছে। অবশ্য মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কীস্থান এবং মাঞ্চুরিয়া খাঁটি চীনের বাহিরে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাঁটি চীন ভাঙ্গিয়া যদি ইংল্যাণ্ড জাপানের মতন সাত আটটা স্বাধীন চীনারাষ্ট্র প্রস্তুত করা যায়, অথবা বৃহত্তর চীন সাম্রাজ্য হইতে দশ বারটা এশিয়াটিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে তাহা হইলে মানব-সভ্যতার ক্ষতি হইবে না। বরং অনেক বিষয়ে উন্নতি হইবারই সম্ভাবনা। এক্ষণে যেখানে একটি মাত্র পিকিঙ্ দেখিতেছি সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক পিকিঙ্ দেখিতে পাইব। পূর্ব্বে ইয়োরোপের একমাত্র চিন্তা-কেন্দ্র ও কর্ম্মকেন্দ্র ছিল রোম। তাহার স্থানে আজ কাল বহুসংখ্যক রোম দেখিতেছি। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির উৎপত্তিতে রোমের প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইয়োরোপের মধ্যে সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ চীন সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে এশিয়ার বার্লিন, প্যারিস, ভিয়েনা, জেনেভা, হেগ্ ইত্যাদি গড়িয়া উঠিলে পুরাতন পিকিঙের পদমর্য্যাদা খানিকটা কমিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু

এশিয়ার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক শক্তিশালী নরনারীর উদ্ভব স্বতঃই হইতে থাকিবে।

ইয়োরোপীয় সমাজে ধর্ম্ম, সভ্যতা ও বিদ্যা মোটের উপর এক। নানা প্রকার ঐক্য সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র অঞ্চলে ১২।১৪ টা স্বস্বপ্রধান পূরা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থান আছে। চীনারাও ধর্ম্মে, সভ্যতায় এবং জাতিতে ঐক্য বিশিষ্ট হইয়াও বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকিলে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিবে কেন? রাষ্ট্রের সীমার সঙ্গে ধর্ম্ম, জাতি বা বিদ্যার সীমার সামঞ্জস্য কোন দিনই জগতে দেখা যায় নাই অধিকন্তু চীনারা এক লিপি ব্যবহার করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাদের ভাষা প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন। কাজেই বহুবিষয়ে ঐক্য বিশিষ্ট থাকিয়াও ইয়োরোপে যদি একাধিক "জাতীয়তা" "স্বাদেশিকতা" "ন্যাশান্যালিটি" ইত্যাদির বিকাশ স্বাভাবিক বিবেচিত হয় তাহা হইলে বুদ্ধ-কন্‌ফিউশিয়ান মতাবলম্বী মঙ্গোলিয় জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক "নেশন" বা রাষ্ট্রের গঠন অস্বাভাবিক বিবেচিত হইবে কেন?

প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, যীশুখৃষ্ট, বেকন, দেকার্ডে লাইব্‌নিজ, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইত্যাদির পসার পেট্রোগ্র্যাডেও আছে ম্যাড্রিডেও আছে। নবীনতম এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রবর্ত্তকগণ পেট্রোগ্র্যাডেও সমাদৃত হন, ম্যাড্রিডেও সমাদৃত হন। খৃষ্টান মন্দির পেট্রোগ্র্যাডেও আছে ম্যাড্রিডেও আছে। অনুবাদের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের কবিগণ ইয়োরোপের অন্যান্য সকল দেশেই পূজা পাইতেছেন। তথাপি পেট্রোগ্র্যাডের রুশেরা ম্যাড্রিডের স্পেনিষদিগকে বুঝে না। লিভারপুলের নরনারীগণ বুকারেষ্টের জন সমাজকে বুঝিতে পারে না। সেইরূপ বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-পুরাণ আসামেও প্রচলিত, সিন্ধু-গুজরাতেও প্রচলিত, কোচিন ত্রিবাঙ্কুরেও প্রচারিত। বাঙ্গালার নব্য ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে—

পঞ্চনদের চরক সমগ্র ভারতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের গুরু। দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য্য আর্য্যাবর্ত্তেও অবতাররূপে পূজা প্রাপ্ত হন। একই কালিদাস সমগ্র হিন্দুস্থানে আদর্শ কবি। তথাপি কোচিনত্রিবাঙ্কুরের কথা কয়জন আসামবাসী বুঝিতে পারে? মহারাষ্ট্রের হৃদয় কয়জন পূর্ব্ববঙ্গবাসী জানে? পঞ্চনদের কয়জন নেতা তামিল নরনারীর হৃদয় বুঝিতে সমর্থ? সেইরূপ দিল্লীর মুসলমান কায়রোর মুসলমানকে বুঝে না। তিহারাণের মুসলমান দিল্লীর মুসলমানকে বুঝে না! সেইরূপ বৃহত্তর চীনের সর্ব্বত্র একই কন্‌ফিউসিয়াস, একই বলাওট্‌জে, একই বুদ্ধ পূজা পাইতেছেন। তথাপি মুক্‌ডেনের কথা ক্যাণ্টনবাসী বুঝিতে পারে না। লাসার বৃত্তান্ত পিকিঙের কর্ত্তারা জানেন না। খোতানের সংবাদ শাংহাইয়ের লোক রাখেনা। মঙ্গোলিয়ার লোকেরা ইয়াংসি-বৃত্তান্ত বুঝিতে অসমর্থ।

বস্তুতঃ প্রাকৃতিক আবেষ্টন এবং ভাষার প্রভেদ জনপদে জনপদে এত বেশী যে অন্যান্য সকল প্রকার ঐক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। অনেক সময়ে এক ভাষাভাষী সমাজও দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমা স্থির করিবার সময়ে একমাত্র সভ্যতা, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদির দোহাই বেশী না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যতখানি স্থান একত্র হইলে রাষ্ট্রের শক্তি পুষ্ট হইতে পারে ততটুকু স্থানকে ঐক্যগ্রথিত করিতে পারিলেই কার্য্য চলিয়া যায়। জগতের ভিতর অশেষ বৈচিত্র্য আছে, সেগুলিকে অস্বীকার করা মূর্খতা। চীনারা তাহাদের ৪০ কোটি নরনারীর ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে যাইয়া একটা তথাকথিত ঐক্যের মোহে অন্ধ থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বহুসংখ্যক চীন যদি স্বাধীনভাবে গড়িয়া না উঠে, বহুসংখ্যক চীন পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিব ইহা সুনিশ্চিত। মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া,

তিব্বত ইতি পূর্ব্বেই অনেকটা চীনের হাত ছাড়া হইয়াছে। খাঁটি চীনের অভ্যন্তরেই কন্‌সেশন মহাল্লা বিদেশীয় Sphere of influence প্রভাবমণ্ডল এবং পরকীয় Sphere of interest বা স্বার্থ-মণ্ডল এবং হংকঙ্, চিংতাও, পোর্ট আর্থার ইত্যাদি পূরা পরাধীন মুল্লুক এত বেশী যে স্বাধীনতা কুত্রাপি নাই বলিলেই চলে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের ঐক্যও অন্তর্হিত হইয়াছে। বোধ হয় বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবসানেই চীনের বুকের উপর বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের তাণ্ডব সুরু হইবে।

(৪) বিপ্লব-কেন্দ্র

নান্-কিঙ্

দ্বিতীয় দিবস দ্বিপ্রহরে নান্-কিঙ্ পৌঁছিলাম। ইংয়াসি এইখানে অনেকটা উত্তর ঘেঁষিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ পয়াঙ্ ছাড়িবার পর হইতে নদীর গতি বরাবর উত্তর-পূর্ব্বে। নান্-কিঙ্ হইতে ইয়াংসি দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। আরও ২৪ ঘণ্টা পরে কাল দ্বিপ্রহরে শাংহাই পৌঁছিব।

চীনা সহযাত্রী মহাশয় এইখানে নামিয়া গেলেন। নান্-কিঙ্ হইতে রেলে শাংহাই যাইবেন। মাত্র ৪.৫ ঘণ্টার পথ। শাংহাই হইতে নান্-কিঙ্ আসিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া সম্প্রতি ষ্টীমার ত্যাগ করিলাম না।

নান্‌কিঙ্ চীনাদের দ্বিতীয় পিকিঙ্। এই শব্দের অর্থও "দক্ষিণ রাজধানী।" ১৯১১ সালে রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পর স্বরাজ প্রবর্ত্তকগণ নান্-কিঙ্‌কেই রাষ্ট্রকেন্দ্র করিতে চাহিয়াছিলেন। নান্-কিঙ্ই সর্ব্বপ্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রও ছিল। শেষ পর্য্যন্ত পিকিঙের জয় হইয়াছে। পরে স্বরাজ প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি কাইয়ের আধিপত্য ভোগের বিরুদ্ধে চরমপন্থী বিপ্লববাদীরা যখন পতাকা উত্তোলন করেন তখন তাঁহারা নান্‌কিঙ্‌কেই

স্বরাজকেন্দ্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন দুই টুক্‌রা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তাহা হইলে উত্তরচীন য়ুয়ানের অধীনে রাজতন্ত্রের অন্তর্গত থাকিত। দক্ষিণ চীন পুরাপুরি স্বরাজের অন্তর্গত হইত। এই গৃহবিবাদকে অনেকটা ইয়াঙ্কিস্থানের "সিবিল ওয়ার" এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক চরমপন্থীরা কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহাদের নেতা ছিলেন সুন্‌-ইয়াৎসেন এবং সেনাপতি হোয়াঙ্‌-সিঙ্‌। উভয়েই এক্ষণে চীন হইতে নির্ব্বাসিত। সুন্‌ জাপানে আন্দোলন চালাইতেছেন, হোয়াং ইয়াঙ্কিংস্থানে ঘুরিতেছেন।

য়ুয়ানের দল নানা কৌশলে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যাঙ্কারগণ হইতে শাসন কার্য্য চালাইবার—জন্য ৩৭॥০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সুন্‌ এবং হোয়াঙ্‌ এই ঋণ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের দল প্রচার করিল যে য়ুয়ান্‌ জনসাধারণের মত না লইয়া বে-আইনিভাবে এই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার ফলে প্রথম হইতেই রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। যদি বিদেশ হইতে য়ুয়ান টাকা না পান তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এই বুঝিয়া সুনের অনুচরবর্গ নানা দেশে ঋণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। এখনও ইহারা য়ুয়ানের নূতন ঋণ গ্রহণের পথে কণ্টক বিকীরণ করিতেছেন।

বিলাতী সমাজেও এইরূপ দেখা গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজায় প্রজায় যে দ্বন্দ্ব চলিত তাহাতে রাজা বিদেশীয় টাকার সাহায্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ফরাসী নরপতি চতুর্দ্দশ লুই বিলাতী দ্বিতীয় চার্লস্‌কে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। ফ্রান্সের টাকা পাইয়া চার্লস্‌ ইংরেজ জন সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ বা পার্ল্যামেন্টকে অগ্রাহ্য করিতেন। এইজন্যই পার্ল্যামেন্ট সভায় আহ্বান

না করিয়াই তিনি যথেচ্ছভাবে শাসন চালাইতেন। তাঁহার টাকার অভাব ছিল না এইজন্য প্রজাবর্গ তাঁহাকে শীঘ্র জব্দ করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত জনগণ যখন হইতে ফরাসীর শত্রু ওলন্দাজ উইলিয়মের সাহায্য পাইল তখন হইতে ইংল্যাণ্ডে রাজ-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকিল। বর্ত্তমান স্বরাজান্দোলনে সুনের দল য়ুয়ান্‌কে ষ্টুয়ার্ট চার্ল্‌সের ন্যায় দেশদ্রোহী বিদেশভক্ত বিবেচনা করিতেছেন। ফরাসীর সাহায্যে ষ্টুয়ার্টেরা যেরূপ অনেকদিন পর্য্যন্ত যথেচ্ছাচার করিতেছিলেন, আজ বিদেশীয় বণিকগণের সাহায্যে য়ুয়ান সেইরূপ যথেচ্ছাচার করিতেছেন; সুতরাং বিদেশীয় বণিকগণকে ধ্বংস না করিলে চীনে প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপিত হইবে না।

কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণকে ধ্বংস করা সুনের পক্ষে অসাধ্য। কাজেই তিনি বণিকগণের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট কাঁদিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য টেলিগ্রামের ফল হয় নাই। চীনা ষ্টুয়ার্ট বিদেশীয় অর্থ-প্রভাবে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগই করিতেছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের The China Year Book গ্রন্থের Finance অধ্যায় হইতে চরমপন্থী স্বরাজ-বাদিগণের প্রয়াস বিবৃত হইতেছে। Dr. Sun took the extreme step of telegraphing to the Governments and peoples of the foreign powers denouncing the Government * * * of concluding the loan in a high-handed and unconstitutional manner. He asserted that so long as the Peking Government was kept without funds there was a possibility of a compromise between it and the people being effected, whereas a liberal supply of money would probably precipitate a terrible and disastrous conflict. "In the name and for the sake of humanity which civilisation

holds sacred, I therefore appeal to you to exert your influence with a view to preventing the bankers from providing the Peking Government with funds which at this juncture will assuredly be utilised as the sinews of war"

বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ দেখিলেন যে, চীনে প্রজাতন্ত্রই হউক বা রাজতন্ত্রই থাকুক তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বরং ঋণ দানের সর্ত্ত এরূপ যে তাহার প্রভাবে চীনের নানা শাসনবিভাগে বিদেশীয় কর্ম্মচারীবর্গের প্রভাব স্থাপিত হইবে। য়ুয়ান্ সাক্ষীগোপাল মাত্ররূপে বিদেশীয়দিগের কথায় উঠিবেন বসিবেন। চীন প্রকারান্তরে বিদেশীয় হস্তেই থাকিবে। তাঁহাদের এক মাত্র ভাবনা ছিল যে নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি বাড়িয়া যাইবে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যুক্তি ও পরামর্শ হইয়া গেল। তাহার পর ইঁহারা দুর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া য়ুয়ানের ঋণ পত্র এবং খাজনা বন্ধকি গ্রহণ করিলেন।

ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রের সভাপতি উড্রো উইলসন্ প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে য়ুয়ান্ যে সর্ত্তে বিদেশীয়গণের অর্থ গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে না। অনেক সময়ে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবেন। এই বুঝিয়া তিনি ইয়াঙ্কি ব্যাঙ্কারগণকে ঋণদান হইতে বিরত রাখিলেন। কিন্তু ইংল্যণ্ড, জার্ম্মাণ, রুশিয়া, ফ্রান্স ও জাপান এই পাঁচ রাষ্ট্র য়ুয়ানের সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। The China Year Book হইতে ইয়াঙ্কিরাষ্ট্রের মত উদ্ধৃত হইতেছে "The conditions of the loan touched the independence of China, and * * * the American Governmet might in certin eventualities be

led to the necessity of forcible initerference, not only in the financial but also in the political affairs of China"

সুনের মতে চীনে প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে বিদেশীয় ঋণ প্রধানতম অন্তরায়। উইল্‌সনের মতে চীনাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পথে এই ঋণ বিশেষ কণ্টক স্বরূপ। কাজেই য়ুয়ান চীনা সমাজে একসঙ্গে যথেচ্ছ রাজতন্ত্র এবং পরাধীনতা আমদানি করিয়াছেন বলিতে হইবে। ফরাসী দেশেও বিপ্লবের যুগে এইরূপ য়ুয়ান্‌শিকাইয়ের উদ্ভব একাধিকবার হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৭০ সালের ঘটনায় চরমপন্থী স্বরাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পাইয়াছেন।

নান্‌কিঙের পরেও ইয়াংসির দুইধারের পাহাড় অথবা ধানের ক্ষেত এবং পল্লীকুটির দেখিতেছি। পরদিন প্রত্যূষে কিয়ৎকালের জন্য ইয়াংসির সুপ্রশস্ত রূপ দেখিলাম। খানিকটা পসার বিস্তৃতি যেন দেখা গেল। তাহার পরেই সঙ্কীর্ণ খাল সদৃশ নদীর ভিতর পড়িলাম। ক্রমশঃ শাংহাই দৃষ্টিগোচর হইল। দুই কিনারার জেটি, কারখানা, চিমনি, আফিস ইত্যাদি দেখিয়া নিউইয়র্ক বন্দরের কথা মনে আসিল। শাংহাই বন্দরের নিকট ইয়োকোহামা যেন নিষ্প্রভ। কোথায় চীন আর কোথায় শাংহাই। শাংহাইয়ের প্রবেশ পথেই ভাবিতে লাগিলাম চীন ছাড়াইয়া আসিয়াছি, যেন ইয়োরামেরিকার কোন পোতাশ্রয়ে উপস্থিত। প্রাসাদতুল্য, ব্যাঙ্ক, কনসাল-গৃহ, হোটেল ইত্যাদি বিদেশীয় কন্‌সেশন মহাল্লায় অবস্থিত। বাঁধপথে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, মটরকার অহরহ চলিতেছে। নদীতে জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা অগণিত। বিরাট বিদেশীয় নগরের ভিতর দিয়া এক চীনা হোটেলে আসিলাম। সন্ধ্যার সময়ে নদীরধারে "ইডেনগার্ডেন" সদৃশ বাগানে বসা গেল। এখানে

চীনাদের প্রবেশ নিষেধ। আগাগোড়া কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষাও শাংহাইকে জাঁকজমকপূর্ণ বোধ হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নানা কথা

(১) এশিয়ায় খৃষ্টপ্রভাব

বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রমণ্ডল ইয়োরামেরিকার ভোগভূমি। পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জের আধিপত্য একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়। জ্ঞান-রাজ্যে এবং সভ্যতামণ্ডলেও ইহাদের প্রভাব জগদ্ব্যাপী। জাপানীরা রাষ্ট্রীয়হিসাবে পূরা স্বাধীন বটে; কিন্তু জ্ঞান-বিকাশে ইহারা ইয়োরামেরিকারই অধীন। আবার চীনারা এখনও পূরাপূরী পরাধীন হয় নাই সত্য; কিন্তু প্রায় সকল বিষয়ে ইয়োরামেরিকার সাম্রাজ্য চীনের পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে।

পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারক হইয়া বিদেশে আসেন। ইহার ফলে খৃষ্টধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আনুষঙ্গিক ভাবে আরও অন্যান্য বহুবিধ ফল উৎপন্ন হয়। পাদ্রীরা প্রত্যেকে নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাতনপন্থী এবং উদীয়মান শিশুসমাজ সমূহে নবীন জগতের বার্ত্তা প্রচার করেন। খৃষ্ট-প্রভাব বা পাদ্রী-প্রভাব অতিশয় ব্যাপক ভাবে এই সকল দেশে দেখা দেয়। তাহাকে "পাশ্চাত্য সভ্যতার" প্রভাব বলা যুক্তি-সঙ্গত।

দুনিয়ায় বোধ হয় এমন কোন জনপদ নাই যেখানে ইয়োরামেরিকার এই সকল পাণ্ডার আড্ডা দেখা যায় না। স্বদেশীয়

সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এইসকল প্রচারকেরা সর্ব্বত্র কর্ম্মকেন্দ্র বা প্রভাবমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া বসেন। স্থানীয় নরনারীগণ ইহাদিগকে যে চোখেই দেখুক না কেন, ইহাদের কর্ম্ম প্রণালী মোটের উপর সর্ব্বদা প্রশংসাযোগ্য। বহু পাদ্রীই অসাধারণ চরিত্রবত্তা ও কর্ম্ম-কৌশলের অবতার স্বরূপ।

জাপানীরা পাদ্রী মহাশয়গণের ঋণ কথনই শোধ করিতে পারিবেনা। চীনেও দেখিতেছি খৃষ্ট প্রচারকগণের কার্য্য বিশেষরূপেই সম্মানার্হ। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানিই যদি এশিয়ায় নব জীবনের কারণ হয় তাহা হইলে পাদ্রীদিগকে জাপান ও চীনের শিক্ষাগুরু বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা পরাধীনতার সূত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে সুতরাং এখানে পাদ্রী-প্রভাবের পরিমাণ কত তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন। তথাপি ভারতবর্ষেও পাদ্রীদের কার্য্যতালিকা সুদীর্ঘই বিবেচিত হইবে। পাদ্রীরা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা যে প্রণালীতেই করুন না কেন ইঁহারা যে দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইয়োরামেরিকাকে ছড়াইতেছেন তাহা অস্বীকার করিবে কে?

চীনে আসিয়া দেখিতেছি এখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সংবাদপত্র প্রত্নতত্ত্ব ভৌগোলিক অনুসন্ধান ইত্যাদি সবই প্রথম প্রথম একমাত্র পাদ্রীদেরই কার্য্যের অন্তর্গত ছিল। এইসকল খৃষ্ট প্রচারকেরাই চীনকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়োরামেরিকায় যত খৃষ্টান সম্প্রদায় আছে প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি-কেন্দ্র চীনে বহুকালাবধি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর জগতের রাষ্ট্রবীরগণ চীন লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই জন্য খাঁটি বৈজ্ঞানিকগণ চীনের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদি গভীর ও বিস্তৃতরূপে আলোচনা

করিতেছেন। কিন্তু এতকাল একমাত্র পাদ্রীরাই এই সকল কার্য্যে "বিশেষজ্ঞ" ছিলেন।

শাংহাইয়ের "খৃষ্টান-সাহিত্য-প্রচার পরিষদের" ভবনে যাইয়া দেখি কর্ম্মকর্ত্তারা কেহ ৩৫ বৎসর, কেহ ৪০ বৎসর, কেহ বা ৫০ বৎসর কাল চীনে কাটাইয়াছেন। সকলেই চীনা ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ—এখনও চীনা পণ্ডিতের সাহায্যে কেহ কেহ চীনতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন।

এই পরিষদের (Christian Literature Society) প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রায় ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী। চীনা ভাষায় মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা মন্দ নয়। অধিকন্তু বহু উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থের সস্তা সংস্করণ চীনা পাঠকগণের জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে। খাঁটি খৃষ্টান গ্রন্থ এবং ধর্ম্ম পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার গ্রন্থ প্রকাশও পরিষদের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইহাঁদের তালিকায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব হইতে ব্যবসায় ও ধনবিজ্ঞান পর্য্যন্ত কোন বিভাগ বাদ পড়ে নাই।

পরিষদের সম্পাদক রিচার্ড প্রায় ৪২ বৎসর কাল চীনে বাস করিতেছেন। ইহার উদ্যোগে শেন্সি প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইনি তাহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। রিচার্ড চীনে একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি।

ইনি বহু গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট্ কুবলাখাঁর আমলে চিউ-চাঙ্-চুন (১২০৮-১২৮৮) একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। রিচার্ড তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যযুগের এশিয়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং নৃতত্ত্ব কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের নাম A Mission to Heaven

ইহার ভূমিকায় প্রচারিত মত পণ্ডিত মহলে গ্রহণীয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না—কিন্তু চীনা গ্রন্থের অনুবাদ পাঠযোগ্য।

রিচার্ডের আর একখানা পুস্তক পাঠ করিলাম। নাম The New Testament of Higher Buddhism. মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। ইহাতে মহাযান প্রবর্ত্তক অশ্বঘোষের The Awakening of Faith বা শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ আছে। রিচার্ড বলিতে চাহেন—গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত হীনযান মতে আর অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন প্রচারিত মহাযান মতে কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নাই। বুদ্ধের প্রায় ছয়শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টমত প্রচারিত হইবার সময়ে মধ্য এশিয়ায় মহাযান মতের সূত্রপাত হয়। সুতরাং মহা যান মত বৌদ্ধ বা ভারতীয় ধর্ম্ম নয়, উহা খৃষ্ট মতেরই প্রাচ্য শাখা। বলা বাহুল্য রিচার্ডের এই কথা শুনিবামাত্র ভারতীয় পণ্ডিতগণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন।

(২) নবীন চীন

চীনে যে কয়খানা ইংরেজী দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্র চলিতেছে তাহাদের কোনটা ইংরেজের সম্পত্তি, কোনটা ইয়াঙ্কির সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষায়ও সংবাদ পত্র আছে। সেগুলি ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণের স্বার্থে পরিচালিত।

চীনাভাষায় পরিচালিত দৈনিক পত্রের সংখ্যা ২০০। ইহাদের কোনকোনটার ২০।৩০ হাজার কপি মুদ্রিত হয়। একজন সংবাদ প্রচারকের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম চীনা সম্পাদকগণের জন্য একটা Associated Press কোম্পানী আছে। এই ব্যক্তি উহার কর্ম্মকর্ত্তা। ইনি প্রত্যেক চীনা পত্রে শাংহাই হইতে সমগ্র চীনের সংবাদ দেন।

চীনের অতি অল্প সংখ্যক যুবক ইয়োরোপ অথবা আমেরিকা হইতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়াছে। জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনাদের সংখ্যা দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক ছিল। এক্ষণে জাপান চীনের চক্ষুঃশূল। চীনারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির অত্যাচার সম্বন্ধে কোন কথা বলেনা;—কিন্তু জাপানের বিস্তার সহ্য করিতে নিতান্তই নারাজ। কাজেই আজকাল চীনের কোন লোক জাপানে সন্তান পাঠায় না। ইংরেজিজানা যে সকল লোকের সঙ্গে দেখা হইতেছে তাহাদের অধিকাংশই চীনের খৃষ্টান বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়াছে। আমাদের দেশে এন্ট্র্যান্স পাশ করা ছাত্রের বিদ্যা যতখানি ইহাদের বিদ্যা তদ্রূপ। ইংরেজিতে কথা বলিতে পারা ইহাদের একটা বিশেষ গুণ বিবেচিত হয়।

ইংরেজি শিখিবার জন্য চীনের লোকেরা যারপর নাই চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষে শাসন কর্ত্তারা দেশ শাসনের জন্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কাজেই ইংরেজ আমলের প্রথম হইতেই একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারণে জনগণকে স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয় নাই। কিন্তু চীনের জনসাধারণ একটা বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ লাগিয়া গিয়াছে। ইহারা বুঝিয়াছে যে সর্ব্বপ্রথমে এই ভাষা দখল না করিলে বর্ত্তমান যুগের বিদ্যাসমূহ স্বদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবেনা।

শাংহাইয়ে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজি ব্যাকরণ, ইংরেজি সাহিত্য, উচ্চারণ বানান, অনুবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়-পাঠ্য Composition বা Grammar পুস্তকের নানা অধ্যায় এইরূপে মাসিক পত্রের আকারে প্রকাশিত

হইতেছে। ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা ভারতীয় সমাজে সুপ্রচারিত করিবার জন্য হয়ত এই প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে। চীনারা ইংরেজি ভাষাকে যে চোখে দেখিতেছে ভারতবাসীর সে চোখে দেখিবার আবশ্যক হয় নাই। ইংরেজি চীনাদের পক্ষে ইয়োরামেরিকার প্রবেশ-দ্বার স্বরূপ। আমরা বিনা আয়াসেই, বোধ হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কেবল ইংরেজি-দ্বারের সাহায্যে ইয়োরামেরিকায় প্রবেশ করিতে চাহিনা। উহার বিস্তৃততর ও গভীরতর পরিচয় লাভের জন্য ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাদ্বয় আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা ভারতবর্ষে দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে।

একটা প্রকাণ্ড ছাপাখানা দেখিলাম। সহরের বাহিরে ইহা অবস্থিত। নাম Commercial Press। একাধিক চীনা মাসিক পত্র এইখানে ছাপা হয়। বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক পাঠ্য পুস্তকও এই ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সহরের ভিতরে কোম্পানীর দোকান দেখা গেল। বিরাট কার্য্যালয়। তোকিওর মারুজেন কোম্পানীর কথা মনে পড়ে। কমার্শ্যাল প্রেসে অধিকতর মূলধন খাটিতেছে।

চীনারা ভারতবর্ষকে অশিক্ষিত কনষ্টেবল, দ্বারবান্ ও গুণ্ডার দেশ বলিয়া জানে। আর শুনিলাম—চীনা সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিয়া জনগণের সম্মুখে জাতীয় অধঃপাত ও দুরবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে।

চীনাদের বিবেচনায় এশিয়ার মানচিত্রে ভারতবর্ষ এক বিশাল কালিমাস্তূপ। জঘন্য ও ঘৃণ্য জীবনের পরিচয় দিতে হইলে উহারা ভারতবাসীর কথা উত্থাপন করে। অথচ আমরা ভারতবর্ষকে আজও জগদ্গুরু বলিয়াই জানি।

যুবক চীনের এক সম্মিলন-কেন্দ্র দেখিলাম। সভ্যসংখ্যা প্রায় এক হাজার। প্রতিষ্ঠানের নাম World's Chinese Students' Federation বা বিশ্ব-চীনাছাত্র-পরিষৎ। জগতের যত স্থানে চীনা ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতেছে সকলকে এক কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মিলিত করিবার জন্য ইহার উৎপত্তি। শাংহাইয়ে এই পরিষদের প্রধান কার্য্যালয়। সাধারণ ক্লাবের কার্য্যপ্রণালী এইখানে দেখা গেল। বেশীর ভাগ বুঝিলাম দু'একটা বিদ্যালয় পরিষদের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। বলা বাহুল্য ইয়াঙ্কিস্থানে চীনা ছাত্রদের যে সুবৃহৎ পরিষৎ আছে তাহার সঙ্গে এই পরিষদের যোগ ঘনিষ্ঠ।

আমেরিকা-প্রবাসী চীনা ছাত্রেরা চীনা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন। এইজন্য "বিজ্ঞান" নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। শাংহাই হইতে উহা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ সমূহ আমেরিকা হইতে আসিয়া থাকে। প্রধানতঃ অনুবাদ এবং গৌণতঃ মৌলিকরচনা এই পত্রিকায় স্থান পাইতেছে। বৎসর খানেক হইল কাগজ বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন চীনে এই নূতন নয়। কয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণি-প্রবাসী চীনাছাত্রেরা প্রথম উদ্যম করে; পরে জাপান-প্রবাসী ছাত্রেরাও এদিকে নজর দেয়; কিন্তু অর্থাভাবে তাহাদের কার্য্য সফল হয় নাই। আজকাল ইয়াঙ্কিস্থানে যে সকল চীনা ছাত্র আছে তাহাদের মাসিক বৃত্তি প্রচুর। কাজেই এই কাগজ টিকিয়া যাইতে পারে। বিশ্ব-চীনাছাত্র-পরিষদের সম্পাদক বলিলেন "বিজ্ঞান প্রচারের জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিষৎও আছে। তাহার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে।"

১৮৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের নিকট পরাজিত হইবার পর চীনের মোহ নিদ্রা কাটিয়াছে। সুতরাং নব্যশিক্ষার প্রচার চীনা সমাজে

মাত্র ২০ বৎসরের ব্যাপার। প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত দশ বৎসরে কার্য্য কিছু বেশী হইয়াছে। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর এই আন্দোলন দ্রুত গতিতে চলিতেছে। নিম্ন বিদ্যালয়, মধ্যবিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠানই চীনে নিতান্ত শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। স্বরাজের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট যুয়ান্ শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। তাহার লক্ষ্য সেনা বিভাগের পুষ্টি-করা। ফলতঃ শিক্ষার আন্দোলন যথোচিতরূপে পুষ্ট হইতে পারে নাই। এই কারণে স্বরাজ পন্থীরা যুয়ানের উপর নারাজ। তাঁহারা ডাক্তার সুন্‌কেই পছন্দ করেন। সুনের দৃষ্টি শিক্ষা প্রচারের দিকে বেশী ছিল।

গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুল-কলেজ ছাড়াও চীনাদের বহু বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক প্রদেশেই একটা করিয়া প্রাদেশিক শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি প্রদেশকে নানা জেলায় বিভক্ত করিয়া শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। শাংহাইয়ে কিয়াংসু প্রদেশের শিক্ষাসমিতি দেখা গেল। ইহাই চীনের সর্ব্বপুরাতন প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি। বয়স মাত্র দশ বৎসর। দুই তিন বৎসর হইল দশ এগার প্রদেশের শিক্ষা-সমিতি তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের এক সমবেত বৈঠক বা কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে চীনে সমর-শিক্ষা এবং চীনা ভাষার ঐক্য বিধান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হয়। কিয়াংসু প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি একখানা শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানা পুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছে।

ফু-তান কলেজ (Fuh-tan) শাংহাইয়ের একটা বে-সরকারি চীনা কলেজ। যুবক চীনে ইহার গৌরব অনেক। সেনাপতি লি-হুং-চাঙের



সেনাপতি লি হং-চাঙ্

(১৩৬ পৃষ্ঠা)



চীনের সাগরদীঘি

(১৫৯ পৃষ্ঠা)

স্মৃতি রক্ষার্থ একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে সম্প্রতি এই কলেজের কার্য্য চলিতেছে। কলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে ভারতীয় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক পড়ান হয়, বুঝিতে পারা গেল। সকল বিদ্যাই ইংরেজি ভাষায় শিখান হইতেছে। চীনা ভাষা ও সাহিত্য প্রত্যেককেই শেষ পর্য্যন্ত গৌণভাবে শিক্ষা করিতে হয়। জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষাও ছাত্রগণকে শিখান হইয়া থাকে। কলেজের প্রেসিডেন্ট লী ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। ইহাঁকে ছোকরারা খুব খাতির করে।

প্রায় তিনশত ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেই বাস করিতেছে। কোন কোন ঘরে প্রায় পনের জনের স্থান দেখিলাম। বৎসরের দশ মাস কাল ইহারা এখানে থাকে। বিদ্যালয়ের বেতন এবং বোর্ডিংয়ের খরচ পত্র সর্ব্বসমেত দেড়শত টাকা।

একজন ইংরেজ আসিয়া ছাত্রগণকে "বয়স্কাউট্" আন্দোলনে দীক্ষিত করিয়া গেলেন। দীক্ষা বেশ সমারোহের সহিত হইল। ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমি স্বদেশের সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব।" ইংরেজ শিক্ষক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছাত্রের মাথায় টুপি পরাইয়া দিলেন। তাহার পর দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউটদিগের জুত্রকটা ক্ষুদ্র পরীক্ষা করা হইল। কাঠ, কুড়াল, জল, দিয়াশলাইয়ের বাক্স ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার পর সেনাপতি হুকুম করিলেন—"জল গরম করিতে থাক।" সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-সময়ের মধ্যে যে দলের জল ফুটিল তাহার জয় হইল।

একজন জার্ম্মাণ সেনাপতি ছাত্রদিগকে সমর-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রিন্সিপ্যাল বলিতেছেন, "আমাদের দেশ সরকারী সেনা-বিভাগের দ্বারা রক্ষা করা অসম্ভব। চীনের সুশিক্ষিত

ছাত্রবৃন্দ যদি সমর-বিদ্যায় পণ্ডিত না হয় তাহা হইলে দেশের উদ্ধার নাই।" অধ্যাপকগণের মধ্যে সকলেই ইয়াঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

(৩) চিত্রে চীনের ইতিহাস

তিনখানা বৃহদাকার সচিত্র গ্রন্থ "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষেদে" উপহার পাঠান গেল। শাংহাইয়ে আসিবার পূর্ব্বে এগুলি চোখে পড়ে নাই।

প্রথম পুস্তকের নাম Ars Asiatica-এর অন্তর্গত। ইহাতে প্রাচীন চীনের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ফরাসী ভাষায় বিবরণ প্রদত্ত। মূর্ত্তিবিদ্যায় চীন ও ভারতের সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পুস্তকের নাম Paintings of Tang, Sung and Tuan Dynasties, খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চীনা চিত্র-কলা এই গ্রন্থে নিদর্শন সহ বিবৃত হইয়াছে। চীনের এই যুগই চীনা সভ্যতার স্বর্ণ-যুগ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে প্রথম প্রবেশ করে; কিন্তু সপ্তম-শতাব্দীতে তাঙ্ আমলেই চীনে যথার্থ বৌদ্ধ-প্লাবন আরব্ধ হয়। এই যুগের সর্ব্বপ্রথম স্মরণীয় ঘটনা—হুয়েন্থসাঙের "স্বর্গ"-ভ্রমণ। ভারতবর্ষকে চীনারা স্বর্গ বলিয়া জানিত। তাহারপর হইতে পাঁচ শত বৎসর কাল চীন প্রকৃত প্রস্তাবে বৃহত্তর ভারতের প্রভাবমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। চীনের পুরাতন কন্‌ফিউশিয়ান ধর্ম্মও এই যুগে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া নবরূপ গ্রহণ করে। বর্ত্তমান কালে চীনা সমাজে যে কন্‌ফিউশিয়ান মতবাদ দেখিতেছি, তাহার সূত্রপাত এই ভারতীয় প্রভাবের আমলেই সংঘটিত হইয়াছিল। অধিকন্তু এই যুগের চীনা

দার্শনিকগণ জাপানী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের সাহায্য করেন। এই কারণে ভারতেতিহাসের বর্দ্ধন-পাল-চোল-অধ্যায়, চীনের তাঙ্-সুঙ্-য়ুয়ান (মোগল) আমল এবং জাপানী সভ্যতার নারা-কামা-কুরা-কিয়োতা পর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের একসঙ্গে আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় পুস্তকের নাম Imperial City of Peking. ইহাতে পিকিঙ্ নগরের প্রসিদ্ধ প্রাসাদ, মন্দির, প্যাগোডা, প্রাচীর ইত্যাদির সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। জাপান গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত জাপানী বিশেষজ্ঞগণ এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে চীনা, জাপানী এবং ইংরেজি ভাষায় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম মোগল নরপতি কুব্‌লা খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিকিঙে চীনের রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর মোগল, মিঙ্ এবং মাঞ্চুবংশীয় চীন সম্রাটগণ সকলেই পিকিঙে রাষ্ট্রকেন্দ্র রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের দিল্লী, জাপানের কিয়োতো এবং ইয়োরোপের রোম অপেক্ষা চীনের পিকিঙ্ কম "বনিয়াদি" নয়। সাত শত বৎসরের এই মহানগরী ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা প্রবাহ ও কর্ম্ম ধারার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই কারণে মধ্য যুগের এশিয়া বুঝিবার পক্ষে পিকিঙের বাস্তুশিল্প এক প্রধান সহায়।

আমাদের দেশে সিনলজি (sinology) চীনতত্ত্ব এখনও সুপ্রচারিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা চীন মহাদেশের নানা স্থানে অতি মূল্যবান্ তথ্য পাইবেন সন্দেহ নাই। এই তিনখানা চিত্র-পুস্তকে চীনা সমাজের দুই হাজার বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই চিত্র সমূহকে চীনা ইতিহাসের এক এক পৃষ্ঠা স্বরূপ গ্রহণ করা চলিতে পারে।

প্রত্নতত্ত্বের দিক্ ছাড়িয়া দিলেও গ্রন্থসন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি ভারতবর্ষে আদৃত হইবার যোগ্য। কারণ চীনা সুকুমার শিল্পের পরিচয় আমাদের শিল্পীসমাজে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি

চীনে বসিয়া লেখাপড়া করিবার সুযোগ অতি অল্প। পিকিঙে জনসাধারণের জন্য লাইব্রেরী নাই বলিলেই চলে। ইংরেজ পণ্ডিত মরিসন চীনতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ। তাঁহার নিজ গৃহে (synological) চীন-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থালয় আছে। যাঁহারা চীন লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে ইনি সাদরে অভিবাদন করেন। পিকিঙের কোন কলেজে অথবা পরিষদে একটা চলনসই লাইব্রেরীও নাই। এদিকে পিকিঙে চীনা পণ্ডিতগণের সাহায্যে উপকৃত হওয়া কঠিন। কারণ তাঁহারা সকলেই আমাদের কাশী বা নবদ্বীপের পণ্ডিতের মতন। ইহাঁরা কোন বিদেশীয় ভাষাও জানেন না—আর স্বদেশের বাহিরেও যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে তাহাও জানেন না। অথচ চীনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই সকল গোঁড়া পণ্ডিতবর্গেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু পিকিঙে আজও মধ্য যুগের চীনা-সমাজ ও আদবকায়দা রক্ষিত হইতেছে। জাপানের স্বদেশী-হৃদয় বুঝিবার জন্য তোকিও ছাড়িয়া কিয়োতোতেই আড্ডা গাড়া উচিত। সেইরূপ চীনাদের চীন বুঝিবার উদ্দেশ্যে এই দেওয়াল-বহুল মহানগরীর কোন "নেটিভ" বা স্বদেশী-পাড়ায় আস্তানা খুঁজা কর্ত্তব্য।

শাংহাইয়ে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের ছায়া মাত্র দেখিতে পাইতেছি—চীনের নামগন্ধও এই নব্য চীনের বারোয়ারি তলায় পাইবার

জো-নাই। খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা ইত্যাদি সবই স্বচ্ছন্দে চলিতেছে। কিন্তু কলিকাতার ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী অথবা লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম হইতে চীনতত্ত্ব যতখানি বুঝিতে পারি, শাংহাইয়ের রাস্তায় ঘাটে তাহার অধিক বুঝিনা। সকল প্রকার নব্য যুগের সুযোগই এখানে আছে। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার সুযোগও পাইতেছি। কিন্তু চীনের আত্মাকে বুঝিবার জন্য চীনা পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া বড়ই কঠিন। এখানে যেসকল চীনা ধুরন্ধরগণের সঙ্গে দেখা হইতেছে তাঁহারা দুনিয়ার আর সকল সংবাদই জানেন কেবল চীনের কোন তথ্যই জানেন না। ভারতবর্ষে এই ধরণের পণ্ডিতগণকে "নব্য বাবু" সম্প্রদায় বলা হইত। সুখের কথা এই বাবুর দল ভারতবর্ষে কমিয়া আসিতেছে। চীনা বাবুদের দল এক্ষণে বাড়িতেছে। হয়ত পঁচিশ বৎসর পরে চীনারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে ইয়োরামেরিকা হইতে প্রত্যাগত যুবক-মহলে পাশ্চাত্য সম্মোহনের নেশা পূরা মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। দেখা যাউক, যথার্থ স্বদেশী আন্দোলন চীনাসমাজে কবে সুরু হয়।

শাংহাইয়ে বড় বড় পুস্তকের দোকান কয়েকটা আছে। জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত চীন বিষয়ক গ্রন্থ প্রায় সবই এখানে পাওয়া যায়। একমাত্র ইংরেজি ভাষা জানা থাকিলে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিত মহলে চলাফেরা করা অসম্ভব। তাহা ইয়োরামেরিকায় থাকিবার সময় বেশ বুঝিয়া ছিলাম। জাপানে এবং চীনে আসিয়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি। একমাত্র ইংরেজের চোখে দুনিয়াকে বুঝিতে গেলে সংসারের চতুর্থাংশও বুঝা যায় না। অথচ আমরা একশত বৎসর কাল এইরূপে একচোখো ভাবে অথবা কলুর চোখঢাকা বলদের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

শাংহাইয়ের "রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি" সমগ্র চীনে একমাত্র পণ্ডিত-পরিষৎ। ইহাঁদের গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়াম নিতান্তই দরিদ্র। সম্পাদক কুলিঙ্‌ বলিলেন,—"মহাশয়, ব্যবসায়-কেন্দ্রে লোকেরা বিদ্যা চর্চ্চার জন্য টাকা খরচ করিতে চাহে না। অথচ ঘোড়দৌড়ে, ব্যাণ্ডে, থিয়েটারে অর্থ-ব্যয় যথেষ্ট হইতেছে।" মিউজিয়ামে চীনা পাখীর সংগ্রহ মন্দ নয়। লাই-ব্রেরীতে দু'একজন ফরাসী পাদ্রী বসিয়া প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন।

সোসাইটির সভাপতি বৃটিশ কন্‌সাল-জেনারাল। ইঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। বিশ বৎসর ধরিয়া ইনি চীনে, ইংরেজ-দৌত্য বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। কন্‌ফিউশিয়ান ধর্ম্ম ইহাঁর কিছু কিছু জানা আছে। ইহাঁর মতে ইয়োরোপীয় কোন "সিনলগ" বা চীনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতই চীনা সাহিত্যে সুপণ্ডিত নন। ইনি বলিলেন,—"ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে Legge অগ্রণী। কিন্তু তিনি সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির ধার ধারিতেন না। চীনা ভাষা কথঞ্চিত আয়ত্ত করিয়া ছিলেন মাত্র। কাজেই তাঁহার অনুবাদসমূহ পাঠ করিয়া প্রাচীন চীনের মর্ম্মকথা আয়ত্ত করা যায় না। আজকাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Giles বিলাতে চীনতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। তিনি বেশ সহজে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি চীন'দর্শনের গূঢ় বা গভীর তত্ত্বসমূহ প্রচার করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

কুলিঙ্‌ একদিন ফরাসী-শাংহাইয়ের শেষ সীমায় লইয়া গেলেন। এখানে সিকাওয়ে পল্লী অবস্থিত। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে এই জনপদে একজন চীনা খৃষ্টানের উদ্যোগে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসারলাভ করে। ফরাসী "জেসুট" সম্প্রদায়ের অন্তর্গত খৃষ্টানেরা তখন এইখানে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। আজ এই পল্লীকে যেসুট-পল্লী বলিলেই চলে। আগাগোড়া সকল লোকই খৃষ্টান। পাদ্রীগণের তত্ত্বাবধানে সিকাওয়েতে

কতকগুলি সদনুষ্ঠান চলিতেছে। ভূমিকম্প-পরীক্ষালয়, গ্রহণপর্য্যবেক্ষণাগার, মিউজিয়াম, গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। লোকালয়ের বাহিরে বলিয়া এগুলি পর্য্যটকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। আর একমাত্র পাদ্রীদের, জন্যই বোধ হয় প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত।

অনাথ বালক-বালিকাদিগের জন্য চিত্রবিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। কাঠের কাজ ছাত্রেরা অতি সুন্দর শিখিয়াছে। চীনের নানাস্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ প্যাগোডা আছে সেইগুলির ফটোগ্রাফ দেখিয়া ছাত্রগণ কাঠের "মডেল" বা নকল-বাস্তু প্রস্তুত করিয়াছে। একজন চীনা কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—"স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্ব-মেলায় এইরূপ আঠারটা প্যাগোডা পাঠান হইয়াছে। মূল্য রাখিয়াছি সর্ব্বসমেত সোয়ালক্ষ টাকা।"

অনাথাশ্রমের সঙ্গে একটা ছাপাখানাও দেখা গেল। এখানে চীন বিষয়ক নানাগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইতেছে।

রিচার্ডের খৃষ্টান-সাহিত্য-প্রচার-পরিষদে যাওয়া-আসা করিতেছি। এখানকার লাইব্রেরীও মন্দ নয়। সোসাইটির লাইব্রেরীতে জাপান বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ নাই—সাধারণ সাহিত্যও নাই। রিচার্ডের লাইব্রেরীতে এই সবও আছে।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণ কাহিনীর ন্যায় ঐতিহাসিকগণের আদরণীয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ইতালীয় ব্যবসায়ী চীনে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। সমগ্র মধ্য-এশিয়া পার হইয়া পিকিঙে আসেন। পরে জলপথে ভারতবর্ষ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মার্কো পোলো ভারতীয় পণ্ডিত-মহলে সুবিদিত।

মধ্যযুগের এশিয়া সম্বন্ধে অনবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস এতদিনে প্রথম দেখিতেছি। আমরা ভারতবর্ষে

মোগল শব্দে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জনগণকে বুঝিয়া থাকি। অনেক সময়ে এমন কি মোগল শব্দকে মুসলমান শব্দেরই প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মঙ্গোলিয়া আজও বৌদ্ধ-প্রধান—বৃহত্তর ভারতেরই প্রভাব খ্যাপন করিতেছে। মধ্যযুগেও বৌদ্ধধর্ম্মই মোগলজাতীয় নর-নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। মোগলবংশীয় কুব্‌লা খাঁ চীনের সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনিও একজন পাকা বৌদ্ধ। অথচ ইহাঁর আত্মীয় বাবর-আকবর-ঔরংজেব খাঁটি মুসলমান। কুব্‌লা খাঁ এবং বাবর উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ তৈমুর ও চেঙ্গিজ। কাজেই মঙ্গোলিয়া এবং মোগল জাতির বৃত্তান্ত চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ের ইতিহাসেই অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। Tule-সম্পাদিত Travels of Marco Polo পাঠ করিয়াছেন অনেকেই ভারতে।

(৫) দুইজন চীনা জন-নায়ক

চীনারা স্বদেশী-শাংহাইয়ে বাস করিতে চাহেনা। পয়সাওয়ালা লোকেরা হয় ফরাসী মহাল্লায়, না হয় বারোয়ারি মহাল্লায় আসিয়া বস-বাস করিতেছে। এই কারণে বিদেশীয় মহাল্লাগুলির আয়তন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। চীনারা নিজেদের স্বরাজকে বিশেষ নিরাপদ বিবেচনা করে না। বিদেশীয় শাসনের অধীনে থাকিলে তাহাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা পাইবে ইহাই তাহাদের ধারণা। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর লোক বিদেশীয় মহাল্লায় আসিয়া বাস করে। ইহারা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের আসামী বা "ফেরার," ইংরেজিতে যাহাকে "পোলিটিক্যাল রেফিউজি" বলে, ইহারা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। চীনা-স্বরাজে পদার্পণ করিলেই ইহাদের জেল-বাস অথবা গুপ্তহত্যা

অথবা মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত। অথচ শাংহাইয়ের বিদেশী পাড়ায় থাকিয়া ইহারা চীন-সরকারের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আন্দোলন চালাইতেছে।

যে সকল রুশ রুশিয়ায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালাইলে নির্য্যাতিত হন তাঁহারা সমীপবর্ত্তী কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে পলাইয়া আসেন। এইখানে রুশ-সরকার তাঁহাদের উপর গুপ্তচর রাখেন মাত্র—কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রকে এই সকল লোক ধরাইয়া দিতে অনুরোধ বা আদেশ করিতে পারেন না। আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীরা এই সুবিধা ভোগ করে। সেইরূপ যাঁহারা ইংরেজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে চাহেন তাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করিয়া থাকেন।

চীনারা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্য বেশী দূর যায় না। কারণ চীন মহাদেশের ভিতরেই কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে—যথা হঙ্কঙ, পোর্ট আর্থার ইত্যাদি। এই সকল স্থান হইতে চীন-সরকার কোনো চীনা ষড়যন্ত্রকারীকে পাকড়াও করিতে পারেন না। হ্যান্‌কাও, শাংহাই ইত্যাদি স্থানের কন্‌সেশন মহাল্লাগুলিতে চীন-সরকারের ক্ষমতা এখনও কাগজে কলমে কিছু আছে সত্য। সুতরাং ইচ্ছা করিলে এই সকল কেন্দ্র হইতে চীনা ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধরিয়া আনিতে চীন-সরকার অধিকারী। কিন্তু বিদেশীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব এত বেশী যে, চীনের কন্‌শেসন মহাল্লাগুলিকে চীনের বহির্ভুক্ত বলিলেই চলে। কাজেই শাংহাই সহরটা চীনাদের পক্ষে সকল ষড়-যন্ত্রের কেন্দ্র। ইয়োরোপের এইরূপ এক সহর সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের জেনেভা। নানা প্রকার ইয়োরোপীয় বিপ্লববাদী জেনেভায় আড্ডা গাড়িয়া থাকেন। ইয়াঙ্কিদের যুক্তরাষ্ট্র এই হিসাবে দুনিয়ার লোকের বিপ্লবকেন্দ্র।

পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানকার ষড়যন্ত্রকারীরা ইয়াঙ্কিস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন নাই।

চীনের নানা স্থানেই দেখিলাম নাপিতেরা ঘরে আসিয়া চুল কাটিয়া যায়। অবশ্য পাশ্চাত্য ধরণের চুলকাটিবার দোকানও আছে। কিন্তু জনসাধারণের চুলছাটাই ভারতীয় ধরণেই হইয়া থাকে। রাস্তায় রাস্তায় চলিতে চলিতে দেখিতেছি, লেপ-তোষক তৈয়ারি করিবার ধুম পড়িয়াছে। শীত আসিতেছে। আশ্বিন মাস। তুলা ধুনাইয়ের কল আমাদের সুপরিচিত। ধূনাই করিবার প্রণালী এবং ধূনাইয়ের আওয়াজও আমাদের খাঁটি স্বদেশী।

এক প্রকার মানুষ-টানা গাড়ী দেখিতেছি। ইহাতে একটি মাত্র চাকা। চীনের সহরে ও পল্লীতে রাস্তাগুলি এত সঙ্কীর্ণ, যে রিকৃশ চালানোও যাইতে পারেনা। পল্লীগ্রামের বাহিরে রাস্তা নাই বলিলেই চলে। এইজন্য এক-চাকার গাড়ী উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার দুই ধারে মাল রাখা বা মানুষ বসানো যায়। ইংরেজি নাম হুইল-ব্যারো।

শাংহাইয়ে আসিয়া অবধি একটা নূতন শব্দ অত্যধিক শুনিতেছি। উহা Compradore। শাংহাই বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানকার ব্যবসায়গুলি প্রধানতঃ বিদেশীয় ধনিগণের অধীন। অধিকন্তু চীনাদের সঙ্গে বিদেশীয়ের লেন-দেন অহরহ চলিয়া থাকে। কাজেই দোভাষী স্বরূপ চীনা-কর্ম্মকর্ত্তা না থাকিলে কি চীনা, কি বিদেশীয় কোন ধনীর কার্য্যই চলেনা। এইরূপ চীনা কর্ম্মকর্ত্তাকে "কম্প্রাডোর" বলা হয়। শাংহাইয়ের বড় লোক বলিলে কম্প্রাডোর শ্রেণীর লোক বুঝায়। আমাদের দেশে কোম্পানীর আমলে এইরূপ দোভাষী কর্ম্মকর্ত্তা অনেক ছিল। তাহাদিগকে মুৎসুদ্দি অথবা দালাল বলা হইত।

ভারতীয় কম্প্রাডোরগণের মধ্যে অনেকেই নামজাদা ও পয়সাওয়ালা লোক হইয়াছিলেন।

একজন প্রবীণ চীনার সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি কোনো বিদেশীয় ভাষা জানেন না। বারোয়ারী মহাল্লায় একটা সুন্দর গৃহে বাস করিতেছেন। কিন্তু ইহার চাল-চলন, পোষাক, আদব-কায়দা ইত্যাদি সবই প্রাচীন ধরণের। মাঞ্চুসম্রাট্‌গণের আমলে ইনি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বিপ্লবের পর ইনি স্বরাজের অন্তর্গত চীন ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি প্রাচীন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। তবে মাঞ্চু-টিকি ইহাঁর মাথায় দেখিলাম না।

একজন বন্ধুর সাহায্যে ইহাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইলাম। দোভাষী মহাশয়ের দ্বারা শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ভাববিনিময় অসম্ভব। প্রবীণ কর্ম্মচারী নিজে বৌদ্ধ এবং বলিলেন—"বৌদ্ধমতই চীনের সমাজে প্রবল।" ইনি ভারতীয় শৈব ধর্ম্মের নাম শুনিয়াছেন। দু'একটা শিবমূর্ত্তিও ইহাঁর চোখে পড়িয়াছে। ইনি বলিতেছেন—"চীনা বৌদ্ধ মূর্ত্তি এবং হিন্দুদের শিবমূর্ত্তি অনেকটা এক প্রকার বোধ হয়।" বস্তুতঃ ভারতবর্ষেও শৈব এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির সাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট। কন্‌ফিউশিয়াসের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী চীনা ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ভারতীয় ধর্ম্মের তুলনা করা গেল। আমি বলিলাম—"দুই দেশেই ধর্ম্মচিন্তা অনেকটা এক ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। চীনা-চিত্ত এবং ভারতীয়-চিত্ত এক প্রকার। তাহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযান শাখা দুই সমাজকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। কিন্তু মহাযান মতের প্রবর্ত্তন না হইলেও চীনাদিগকে হিন্দুর আত্মীয় বিবেচনা করা কঠিন হইত না।"

বর্ত্তমান যুগের হিন্দুরা যখন কালীপূজা করে তখন অন্যান্য দেবদেবীর কথা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া যায়। আবার যখন বিষ্ণুপূজা করে তখন অন্যান্য দেবদেবীর নাম মনে রাখেনা। পূজার সময়ে পূজা প্রাপ্ত দেবতাই হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবদেবীর মধ্যে সেরা বিবেচিত হন। চীনা বৌদ্ধদিগের চিন্তা-প্রণালীও এইরূপ। প্রবীণ কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন—"চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আমাদের বৌদ্ধ পূজাপদ্ধতিতে হিন্দু ধরণের বিচার প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিতে পারি। আমরা যখন যে বিগ্রহের আরাধনা করি তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। কাজেই দেবতার শ্রেণী-বিভাগ চীনা সমাজে এক প্রকার নাই বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক দেবতাই পূজার সময়ে "সর্ব্বাগ্রগণ্য।"

আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি পূরাপুরি নব্যতন্ত্রের লোক। বাড়ী ঘর, আসবাব পত্র, বৈঠকখানা, পোষাক ইত্যাদি সবই আধুনিক। কিন্তু ইনি বলিতেছেন—"এশিয়ার গৌরব চিত্তের উৎকর্ষে। ইয়োরামেরিকা বাহ্য জগতে উন্নত হইয়াছে সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের জনগণ নৈতিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এশিয়ার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক এশিয়াবাসীর কর্ত্তব্য।"

ইনি ১৯০৪ সালে একবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীনের মাঞ্চু সম্রাট্ তিব্বত-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কতিপয় চীনা মন্ত্রীকে লর্ড কার্জ্জনের দরবারে পাঠান। এই ব্যক্তি তখন চীনের পররাষ্ট্র বিভাগে মন্ত্রী ছিলেন। নাম তাঙ্-শাও-ই। পরে ইনি মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে যোগদান করেন। বিপ্লববাদী-দিগের মধ্যেও ইনি চরমপন্থী। য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের কর্ত্তামি ইহার অভিপ্রেত নয়। তবে হোয়াং-শিঙ্ অথবা সুন্-ইয়াৎ-সেনের পন্থা

অনুসরণ করিয়া দেশত্যাগ করা ইহাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঙ্-রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আর যোগদান করেন না—এক্ষণে ব্যবসায়ে সময় কাটাইতেছেন।

ইনি আট মাস ভারতবর্ষের নানা স্থানে কাটাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর একবার যাইবার ইচ্ছা ছিল। যাওয়া হয় নাই। ইনি বাঙ্গালী সমাজে এবং দক্ষিণ চীনের সমাজে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলিলেন। আমাদের ছেলেরা যেরূপ, "ডাণ্ডাগুলি খেলে চীনের ছেলেরাও নাকি অবিকল সেই খেলা খেলিয়া থাকে। বঙ্গীয় পল্লী কুটিরগুলি দেখিয়া ইনি দক্ষিণ চীনের কথাই স্মরণ করিতেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ইহাঁর আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানা গ্রন্থ ইনি উপহার পাইয়াছিলেন ; সেইগুলি আলমারি হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। সংস্কৃত সঙ্গীত দর্পণও দেখিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুঙ্ যুগের রাজধানী

(১) হ্যাং-চাও

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক চীনতত্ত্বে স্যামুয়েল কুলিঙ্ বলিলেন—"মহাশয়, কয়েক দিন ছুটি পাওয়া গিয়াছে। বাহিরে বেড়াইয়া আসা যাউক। চলুন চীনাদের "সিটি অব হেভন" দেখিয়া আসি।" হ্যাং-চাও শব্দের অর্থ স্বর্গ-নগর।

শাংহাই হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই নগর অবস্থিত রেলে আসিয়া বসিলাম। ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারেরা রেলপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। রেলকোম্পানী আগাগোড়া বিদেশী।

কুলিঙ্ বলিলেন—"যাত্রীরা ৩০।৪৫ মিনিট পূর্ব্ব হইতেই গাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে! আর বসিবার শ্রীই বা কি! দেখিতেছেন না কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গ কেহবা বেঞ্চের উপর টেবিলের উপর পা তুলিয়া বীভৎসভাবে বসিয়াছে। নূতন আরোহীরা বসিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে অথচ ইহাদের হুঁস নাই। ইহারা কি ভদ্রতা জানে না? অথচ অন্যান্য অনেক বিষয়ে চীনাদের সৌজন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।"

ষ্টেশনে ষ্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী অথবা সৈন্য দেখিতেছি। কুলিঙ্ বলিলেন—"য়ুয়ান্-শি-কাই সর্ব্বদা স্থন্-ইয়াৎ-সেনের দলের ভয়ে আশঙ্কিত। যে কোন মুহূর্ত্তেই তাঁহার বিরুদ্ধে চরম প্রজাতন্ত্রীদিগের বিপ্লব বাধিয়া উঠিতে পারে। রেলপথগুলি এই জন্য সুরক্ষিত করার দিকে য়ুয়ানের বিশেষ লক্ষ্য।"

কুলিঙ্ ইংরেজ পাদ্রী। একবার বিলাত যাইবার পথে ভারত ভ্রমণ ইহাঁর ঘটিয়াছে। চীনেই প্রায় সারা জীবন কাটিল। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চীনে শ্বেতাঙ্গদিগের কি দুর্দ্দশা ছিল তাহার বৃত্তান্ত ইহাঁর মুখে শুনিতে পাইলাম। কয়েকবার চীনারা ক্ষেপিয়া শ্বেতাঙ্গদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। কুলিঙ্ দু'একবার ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"তখন চীনারা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই স্বদেশী ভাষায় 'হোয়াইট্ ডেভিল' বলিয়া গালি দিত। এখনও কোন কোন সময়ে আমাদিগকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়।"

শস্যশ্যামলউর্ব্বর ক্ষেত্র ও নদীমাতৃক জনপদ চারিদিকে দেখিতেছি। কোথাও তুলার ক্ষেত, কোথাও বা ধানের জমি। তুঁতের গাছ দেখিয়া পোলু পোষা এবং রেশমশিল্পের আন্দাজও করিতেছি। কুলিঙ্ বলিলেন—"এই অঞ্চলে খাল, বিল, পুকুর ও নদী অপর্য্যাপ্ত। নৌকাপথে গমনাগমন সর্ব্বদাই সম্ভব। অবশ্য আপনি বাঙ্গালী, আপনার চোখে এই সুজলা সুফলা ভূমি নূতন বোধ হইবে না।" পল্লীতে পল্লীতে পাতি হাঁসের পাল দেখিতে পাইলাম—ছিপে মাছ ধরিবার বাতিকও অনেক চীনা সমাজে আছে।

চীনের যেখানেই যাই প্রাচীর বেষ্টিত নগর আছেই। এইপথেও এইরূপ এসব দেখা যাইতেছে—দুই চারিটা প্যাগোডাও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

বৎসর পঞ্চাশেক পূর্ব্বে এই অঞ্চলে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। মাঞ্চু সম্রাট্‌গণের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। বিপ্লবের নায়ক নিজকে যীশু খৃষ্টের সহোদর বলিয়া পরিচয় দেন। সেই ঘটনাকে তাই-পিঙ্ হাঙ্গামা বলা হইয়া থাকে। তাই-পিঙ্ শব্দের

অর্থ মহা শান্তি। বিপ্লব-বীর চীনে শান্তি স্থাপনের জন্যই যেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মাঞ্চু সেনাপতি লি-হুং-চাঙ্ সেই বিপ্লবের অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। এইজন্য সেনাপতির যথেষ্ট খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। এমন কি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটা মন্দির পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯১১ সালের বিপ্লব-বীরেরা অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বিপ্লব বীরগণকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই জন্য সেই বিপ্লবের ধ্বংস সাধনকারী সেনাপতি নব্য প্রজাতন্ত্র বাদীদিগের চক্ষুঃশূল। তাঁহারাই মাঞ্চু-সহায়ক লি-হুং-চাঙ্কে স্বজাতিদ্রোহী বিবেচনা করেন। কাজেই স্বরাজের আমলে সেনাপতির মূর্ত্তি ও মন্দির যার-পর নাই লাঞ্ছিত হইতেছে। মন্দিরের ভূমিতে এবং অট্টালিকা সমূহে সেদিন একটা কলেজ দেখিয়াছি। সেনাপতির মূর্ত্তি এখনও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই। তবে একবার ইহা ধূলিসাৎ করিবার হুজুগ উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যারপর হ্যাংচাও পৌঁছিলাম। পাশ্চাত্য ধরণের হোটেল এখানে একটাও নাই। শুনিলাম অল্প কয়েকদিন হইল একটা বড় নূতন হোটেল খোলা হইয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য রীতির ব্যবস্থাও আছে। সেইটাতেই অতিথি হওয়া গেল। চীনাদের হট্টগোল এবং অপরিচ্ছন্নতা পুরামাত্রায়ই বিরাজ করিতেছে।

হোটেলে একজন রুশের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি চীনা চিত্র-শিল্পের সংগ্রাহক। নাম স্ট্রেল্নীক। ইহাঁর প্রণীত Chinese Pictorial Art গ্রন্থ কমার্শ্যাল প্রেস হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। হ্যাংচাও অঞ্চলে প্রাচীন চিত্র সম্পদের নূতন নমুনা সংগ্রহ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে একখানা সুবৃহৎ চিত্র হস্তগত হইয়াছে। কাল কিছুদূরে যাইয়া আরও কিছু সংগ্রহ করিবেন।

চিত্র সংগ্রহ বাতিক থাকিলে কালে লাভবান্ হওয়া যায়। ষ্ট্রেল্‌নীক ১৯০০ খৃষ্টাব্দের "বক্‌সার" হাঙ্গামার সময়ে চীনাদের নিকট বহুদ্রব্য সস্তায় একপ্রকার বিনামূল্যে পাইয়াছিলেন। সেইগুলি গতবৎসর স্যুইডেন গবর্মেণ্টের নিকট অসম্ভব চড়া দামে বিক্রয় করিয়াছেন। সেই সংগ্রহের কিয়দংশ তাঁহার পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছে।

ষ্ট্রেল্‌নীক বহুকাল চীনে আছেন—স্বদেশে ফিরিতে চাহেন না। চীনা খাওয়া-দাওয়া সবই রপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীন ছাড়িয়া বাহিরে থাকিতে ইনি কষ্ট বোধ করেন।

রাত্রিকালে মশার উপদ্রবে ঘুম হইল না।

(২) মধ্য যুগের চীন

ষ্ট্রেলনীক বলিলেন—"মহাশয়, একবৎসরের মধ্যে এই সহরের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে দেখিতেছি। অবশ্য কয়েক বৎসর হইল সকল প্রকার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসরও বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা দেখি নাই।" কাশীর বাঙ্গালীটোলায় যেরূপ সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলি চীনের সকল সহরেই সেইরূপ। তবে এখানকার ঘরগুলি দ্বিতল অপেক্ষা উচ্চ নয়।

হ্যাংচাওয়ের গৌরবযুগ একজন বিদেশীর পর্য্যটকের বিবরণ হইতে বর্ণিত হইতেছে। ইয়াঙ্কির যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-কন্‌সাল ক্লাউড প্রণীত Hangchow পুস্তিকায় প্রকাশ যে—এই ভেনিস সদৃশ ব্যবসায়বহুল ধনী সহরে বার হাজার সাঁকো ছিল। লেখক বলিতেছেন :—

Fiar Odoric who visited China during the first quarter of the fourteenth century (1324-1327) wrote of it as follows :—'Departing thence I came into the city

of Cansay (Hangchow) a name which signifieth the city of Heaven, and it is the greatest city in the whole world, so great indeed that I should scarcely venture to tell of it, but that I have met at Venice people in plenty who have been there. It is a good hundred miles in compass, and there is not in it a space of ground which is not well-peopled. And many a tenement is there which shall have ten or twelve households comprised in it. And there lie also great suburbs which contain a greater population than even the city itself. This city is situated upon lagoons of standing water with canals, like the city of Venice, and it hath more than 12000 bridges on each of which are stationed guards guarding the city on behalf of the Great Kaan. But if any one should desire to tell all the vastness and great marvals of this city, a good quire of stationary would not hold the matter I trow. For it is the greatest and noblest city and the finest for merchandise that the whole world containeth. "এত সমৃদ্ধ নগর জগতে আর নাই।"

ইতালীয় ফ্রায়ার ওডোরিক মোগল আমলে চীনে আসিয়াছিলেন। এই যুগেই মার্কো পোলো চীনে বহুকাল বাস করেন। এমন কি সম্রাট্ কুবলা খাঁ তাঁহাকে নানা রাজকীয় কর্ম্মের ভার প্রদান করিতেন। মার্কো পোলো কিয়ৎকালের জন্য হ্যাংচাও নগরের শাসনকর্ত্তাও ছিলেন।

মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, এই নগরের বড় রাস্তা "was wide enough for nine carts to travel abreast, and was level as a ball room floor." অর্থাৎ এত চওড়া ছিল যে নয় খানা গাড়ী পাশে পাশে চলিতে পারিত। পোলো বলেন—You must know also that the city of Kinsay has some 3000 baths, the water of which is supplied by springs. They are hot baths, and the people take delight in them frequenting them several times a month, for they are very cleanly in their persons. They are the finest and largest baths in the world; large enough for 100 persons to bathe together. "এই সহরে কম্‌সে কম ৩০০০ স্নানাগার আছে,—প্রত্যেকটায় একসঙ্গে ১০০ লোক নাইতে পারে" এই সকল বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাত শত বৎসরে চীনের চূড়ান্ত অধোগতি হইয়াছে বলিতে হইবে। কেন না স্নানকরা কাহাকে বলে আজ কালকার চীনারা তাহা জানেই না বলা যাইতে পারে। মধ্য-যুগের এশিয়া দেখিয়া ইয়োরোপীয় পর্যাটক তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই এশিয়াবাসীকে অকর্ম্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন, সংসারানভিজ্ঞ বিবেচনা করেন নাই। রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে এশিয়াবাসীকে তাঁহারা দুর্ব্বল অথবা নিন্দনীয় ভাবিতেন না। ভারতবর্ষে গৌড়, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি দেখিয়াও মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়গণ এশিয়াবাসীর স্বাস্থ্যজ্ঞান, নগর শাসন, শিল্পগৌরব এবং বাণিজ্যৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। এশিয়ার নরনারীগণ কেবলমাত্র মালা জপিতে পটু এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনায় পারদর্শী এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যগণ জগতে রটাইয়াছেন।

মার্কো পোলো এবং ফ্রায়ার ওডোরিক এই দুইজন ইতালীয় পর্য্যটক মোগলযুগের হ্যাংচাও দেখিয়াছেন। তখন হ্যাংচাও একটা প্রাদেশিক নগরমাত্র ছিল—চীনের রাজধানী তখন পিকিঙে। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ কুব্লা খাঁ সুঙ্ বংশীয় শেষ নরপতিকে পরাস্ত করিয়া হ্যাংচাও দখল করেন। দেড়শত বৎসরকাল হ্যাংচাও সুঙ্ বংশের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে রাজধানী প্রবর্ত্তিত হয়।

তাঙ্ বংশীয় নরপতিগণের লোপ হইলে চীনসাম্রাজ্যে দুর্দান্ত মোগলদিগের আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর চীনের অধিকাংশই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। সুঙ্ বংশীয় সম্রাটেরা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণদিকে সরিতে বাধ্য হন। প্রথমে ন্যান-কিঙ্ পরে হ্যাংচাও নগর ও তাঁহাদের রাজধানী হয়। শেষ পর্য্যন্ত হ্যাংচাও নগরও মোগল সম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়।

(৩) তাইপিঙ্-বিপ্লব

চীনমহাদেশের ভিতর জলপথে গমনাগমনের বহু সুযোগ দেখিতেছি। মহা প্রাচীরের মতন চীনে একটা মহা খালও আছে। পিকিঙে তাহার কিয়দংশ দেখিয়াছি। হ্যাংচাওয়ে তাহার কিয়দংশ দেখিতেছি। এই খানেই ইহার দক্ষিণ অন্ত। টিনসিনের উত্তরসীমা হইতে এই পর্য্যন্ত ৯০০ মাইল। এক এক অংশ এক এক সময়ে কাটা হইয়াছিল। মধ্য অংশ সর্ব্বপ্রধান। বোধ হয় খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার খনন কার্য্য সমাধা হয়। হ্যাংচাওয়ের নিকটবর্ত্তী অংশ সুঙ্ আমলের কীর্ত্তি। পিকিং-টিনসিন অঞ্চলের অংশ মোগল আমলে কাটা হয়।

কুলিঙ্ বলিলেন—"রেল ষ্টেসনের নিকটে প্রাচীন নগর-দেওয়াল দেখিতেছেন। উহা এখনও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই। তাইপিঙ্-বিপ্লবের

সময়ে এই দেওয়াল বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?" উত্তর পাইলাম—"লোকেরা সহর ছাড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু দেওয়ালের জন্য বাহিরে যাইতে পারে নাই। প্রায় ৬০০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।" তাইপিঙ্-হাঙ্গামা ভারতের সিপাহী হাঙ্গামার প্রায় সমসাময়িক।

Cloud প্রণীত পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—"It is stated that fully four-fifths of the inhabitants were massacred or committed suicide, while the remainder were driven from the city. The Grand Street with its splendid rows of magnificent shops was one long stretch of charred debris, among which were the mangled remains of thousands of men, women and children. The canals were so full of the bodies of those who had committed suicide during the first few days of the reign of terror that those latter wishing to end their existence could not find sufficient water in which to drown themselves. * * * Added to these dire calamities the people were stricken with famine, and the few remaining inhabitants decimated by disease and starvation.

তাইপিঙ্-হাঙ্গামায় হ্যাংচাও আগাগোড়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। দোকান বাজার সৌধ মন্দির ইত্যাদির গৌরব এক্ষণে ভগ্ন স্তূপে পরিণত। কাজেই আজকাল যে হ্যাংচাও দেখিতেছি উহা স্থঙ্ রাজধানীর ছায়া মাত্রও নয়, এবং এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নগর-স্মৃতিও

নয়। বিগত ৫০ বৎসরের দুঃখ দারিদ্র্য আজকালকার জঘন্য গলিপথে এবং দুর্গন্ধময় কুটিরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

ডাণ্ডিতে বাহির হইলাম। বাজারের পণ্য দ্রব্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। বাঁকে করিয়া মালবহা চীনের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ইত্যাদি ধাতুশিল্পীরা আদিম প্রণালীতে কার্য্য চালাইতেছে। তুলা ধুনাইয়ের আওয়াজ এখানে ওখানে শুনিতে পাইতেছি। গলিতে গলিতে সোনালি অক্ষরে খোদিত বিজ্ঞাপনের কাষ্ঠ দেখিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেছি। দোকানগুলি বাহির হইতে অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, কিন্তু বহু লক্ষ টাকার মূলধন কোন কোন কারবারে খাটিতেছে। এখানে রেশমের কারবার প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কালেও এই অঞ্চলের রেশমশিল্পীদিগের আদর ছিল। অনেক স্থানে প্রস্তর সেতুর উপর দিয়া খাল পার হইলাম।

(৪) চীনের "সাগর দীঘি"

সহরের পশ্চিম দেওয়াল ও ফটক হইতে বাহির হইবার পর অদূরে মেঘাচ্ছন্ন পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই একটা বিলসদৃশ জলাশয়ের দক্ষিণ কিনারা দিয়া যাইতে লাগিলাম। উহাই চীনের সাহিত্য প্রসিদ্ধ "সি-হু" বা পশ্চিম হ্রদ। কথিত আছে যে, তাইপিঙ্‌-বিদ্রোহের সময় বহুসংখ্যক হ্যাংচাওবাসী এই হ্রদের মধ্যে ডুবিয়া মরিয়াছিল। মৃতদেহ এত জমিয়াছিল যে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত হ্রদের ভিতর এই সমুদয়ের উপর পদব্রজে চলা যাইত।

প্রাচীনতম কাল হইতেই এই হ্রদ বা সরোবর চীনা সমাজে প্রসিদ্ধ। বিলাতে Lake District যেমন ইংরেজিসাহিত্যে অমর থাকিবে, হ্যাংচাওয়ের "সি-হু"ও সেইরূপ চীনাসাহিত্যে অমর রহিয়াছে। এই সরোবরকে

নানা উপায়ে সুরক্ষিত ও সুশোভিত করিবার জন্য প্রত্যেক বংশের নরপতিগণ এবং প্রদেশ শাসকেরা যত্ন লইয়াছেন। হ্রদের জল যাহাতে শুকাইয়া না যায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রাসাদ, মন্দির, চা-গৃহ, সরাই, প্রমোদালয়, নাচঘর, ইত্যাদির আবেষ্টনে এই হ্রদের সন্নিহিত জনপদ নিতান্তই মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। সুঙ আমলের ১৫০ বৎসর কালই (১১২৭—১২৮০) চীনা "পশ্চিম হ্রদে"র স্বর্ণযুগ-সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার "সাগরদীঘি" "মহীপালদীঘি" ইত্যাদি কৃত্রিম সরোবর সমূহেও নবম দশম শতাব্দীতে চীনের এই প্রাকৃতিক হ্রদের সমান গৌরবই প্রকটিত হইয়াছিল। দক্ষিণভারতেও এই সময়ে সাগর সদৃশ দীর্ঘিকা খনন করা হইতেছিল। ভারতের পাল-সেন-চোলযুগে এবং চীনের তাঙ্-সুঙ্ আমলে এশিয়াবাসী নরনারীর অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য, সাংসারিক সুখভোগ এবং বিলাস কামনা অল্প ছিল না। মানবজীবনকে সকল উপায়ে সুখময় করিবার কৌশল শৈববৌদ্ধবৈষ্ণবকন্‌ফিউশিয়ানের বেশ জানা ছিল। "নলিনী-দলগতজলমতিতরলম্। তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্" ইত্যাদি সুর এশিয়াবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে রহিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বনবাসকেই শ্রেয় জ্ঞান করা এশিয়াবাসীরা একমাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করে নাই।

"সি-হু" সরোবরে কতলোকের কত টাকা "জলে ফেলা" হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইয়োরামেরিকার লোকেরা আজকাল আল্পসে বেড়াইতে গিয়া যেরূপ অপব্যয় করিয়া থাকেন সেই ধরণের অপব্যয় এশিয়ার লোকও করিতে জানিত। 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়াই এশিয়া মারা গেল এ কথা বলা চলেনা। একজন চীনা কবি এই সাগর-দীঘিতে সান্ধ্যবিলাসের পর নিম্নলিখিত কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইংরেজি অনুবাদ নকল করিয়া দিতেছি :—

"My wine-cup is only half-empty ;—
Half drunken, still lingers the flavour.
In my chair from the lakeside returning,
My cheeks from the wine's fire still burning,
Are cooled by the Spring time's Sweet Zephyr
From the west I come to Lone Mountain
Where shades of darkness are fast falling ;—
Half dreaming, halfwaking, I sing of pleasures,
And tho' [illegible] full half the measures.
I still hear softest voices calling.
I remember still sweet Pear-Blossom town,
And cling to its invisible fragrance.
Alas ! How quickly the day has flown !
Life's hours, most truly, are not man's own.
How charming is the life of vagrance !"

বৌদ্ধ-প্রভাব প্লাবিত চীনা সমাজের একজন রাজ কর্ম্মচারী এইরূপ বিলাস কামনা করিতেছেন। যাঁহারা জার্ম্মাণ দার্শনিক শোপেন হোয়ারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ভারতীয় জাতি এবং এশিয়ার সভ্যতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা এই কবিতা পাঠ করিলে বিস্মিত হইবেন। কারণ তাঁহাদের একটা কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে এশিয়ার লোকেরা 'পেসিমিষ্ট', দুঃখবাদী এবং ধনজনযৌবন হইতে দূরে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে!

খানিক পরে একটা ভাঙ্গা প্যাগোডা দেখিতে পাইলাম। বনজঙ্গলের মধ্যে ইহা অবস্থিত। অনতিদূরে একটা মঠ এবং স্মৃতি-ফলকের

চৌয়ারি। এইখানে ডাণ্ডি হইতে অবতরণ করা গেল। কুলিঙ্ বলিলেন—"ঠিক যেন একটা ইণ্ডিয়ান ধ্বংশাবশেষ দেখিতেছি।" বিক্রমপুরের "রাজাবাড়ির মঠ," "সামসিদ্ধির মঠ" ইত্যাদি যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত। প্যাগোডা শব্দ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় না—কিন্তু প্যাগোডা জাতীয় মন্দির, টাওয়ার, স্মৃতিস্তম্ভ বা মনুমেণ্ট ভারতীয় হিন্দু বৌদ্ধ জনপদে অসংখ্যই আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন স্তম্ভগুলি প্রায় সবই অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে, চীনের সর্ব্বত্রও প্যাগোডাগুলির অবস্থা সেইরূপ।

অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এই পঞ্চতল ইষ্টকনির্ম্মিত প্যাগোডা অবস্থিত। পাহাড়ের নাম অনুসারে ইহাকে Thunder Peak বলা হয়। এই "বজ্রশীর্ষ" প্যাগোডা স্থঙ্ আমলে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কুলিঙ্ বলিলেন—"একখানা একখানা করিয়া ইট পল্লীবাসীরা লইয়া যাইতেছে। এইগুলি ভাঙ্গিয়া চীনের জমিতে ছড়াইয়া দিলে কৃষকেরা প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে পারে।" পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ অত্যুৎকৃষ্ট সার। ক্রমশঃ প্যাগোডার অস্তিত্ব লোপ পাইবে সন্দেহ হইতেছে।

সরোবরের আশে পাশে প্রাচীন কালে কতিপয় মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেগুলির কোন কোনটা এখনও জীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। চীনের বৌদ্ধমহলে সকলগুলিই অতিশয় প্রসিদ্ধ।

একটা মঠের কর্ত্তারা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে "সার্টিফিকেট" দিয়া থাকেন। প্রত্যেক বর্ষের তৃতীয় মাসে ভিক্ষু ও পুরোহিতগণ সার্টিফিকেট লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুযায়ী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিজ্ঞা ত্রিবিধ —(১) "নস্যপান

করিব না” (২) “স্ত্রী সংসর্গ করিব না” (৩) “আমিষ ভক্ষণ করিব না”। এই তিন প্রতিজ্ঞার চিহ্ন স্বরূপ মঠাধ্যক্ষ ভিক্ষুর কপালে তিনটা তিলকের দাগ লাগাইয়া দেন। এখানকার সার্টিফিকেট পাইলে বৌদ্ধেরা সেগুলাকে চীনের সর্ব্বত্র পরিচয় পত্র এবং পাশপোর্ট স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারে।

কয়েকটা প্রস্তর সেতুর সাহায্যে হ্রদের নানা স্থান অতিক্রম করিতে করিতে কিনারায় আসিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা দাঁড়াইল। প্রাচীর বেষ্টিত একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম ইহা একটা উদ্যান বিশেষ। চীনা উদ্যানের সকল বস্তুই এখানে দেখিতেছি। কৃত্রিম পাহাড় ও স্রোতস্বতী, বাঁশের ঝাড়, খাল, আরাম গৃহ ইত্যাদি সবই আছে। হ্রদের দৃশ্য গৃহগুলি হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। নির্জ্জন বসবাসের পক্ষে এই স্থান রমণীয়। শুনা যায় কোন কোন কবি এইরূপ উদ্যানে আসিয়া বাস করিতেন। প্রাচীন যুগের সম্রাট এবং ওমরাওগণও এই ধরণের বাগানবাড়িতে সময় কাটাইতে ভাল বাসিতেন। আজকালও যে সকল টুরিষ্ট সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নন তাঁহারা ডাল রুটি বিছানা আসবাব সঙ্গে লইয়া এইসকল স্থানে বাস করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্যোন্নতির ইচ্ছা করিলে এই সরোবর কূলে আড্ডা গাড়া চলিতে পারে। একটা ঘর হইতে দেখিলাম হ্রদের উপর নৌকাবক্ষে চীনারা বিহার করিতেছে। কেহ কেহ ছিপে মাছ ধরিতেছে, কেহ কেহ বা শুইয়া আরাম উপভোগ করিতেছে।

প্রমোদ কাননের পর বহু পল্লীগৃহ দেখিতে দেখিতে একটা কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার চীনা চটি, সরাই, দোকান ও বাজার দেখিয়া একটা তীর্থক্ষেত্রের দৃশ্য মনে পড়িল। বস্তুতঃ হ্যাংচাও অঞ্চলে এই স্থানই বৌদ্ধ জনগণের

সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। প্রাকৃতিক দৃশ্যও এখানে মনোরম; খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এইস্থানে মন্দির মঠাদি সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়।

কথিত আছে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার পোষা বানর সঙ্গে লইয়া এই পথে যাইতেছিলেন। হঠাৎ বানর তাঁহাকে ছাড়িয়া পাহাড়ের নানা কন্দরে এবং তরুবর সমূহের ভিতরে লুকাচুরি খেলিতে লাগিল। ভিক্ষু ভাবিলেন—"বানরটা তাহার স্বভূমি পাইয়াছে বোধ হয়। এই জন্যই তাহাকে এরূপ চঞ্চল দেখিতেছি। এই পার্ব্বত্য জনপদ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে আমদানি। তাহা না হইলে বানরের মন এত শীঘ্র ভুলিত না।" অবশেষে তিনি চীনের এই ভারত ভূমিতে মঠ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মঠ বহুবার বহুকারণে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু সম্রাটগণ বহুবার ইহার সংস্কার সাধনও করিয়াছেন। তাই পিঙ্ বিদ্রোহীদিগের হস্তে ইহার শেষ নির্য্যাতন হইয়াছিল। তাহার পর পুনরায় সংস্কার করা হইয়াছে। আজও নানাগৃহে মিস্ত্রী মজুরেরা কর্ম্ম করিতেছে দেখিলাম।

এখানকার একটা প্রস্তর সেতু সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিক্ষু চীনা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ইংরেজি অনুবাদ Cloud এর পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।—

Of stony fragment the lofty bridge is made—
A winged rainbow caught in a cleft of jade,
To open the sparkling waters eastward flowing.
Westward, terrac'd hill to misty hazes fades
The miralces by ancient deities wrought,
This shrine of Buddha with power is fraught

To guard ; and tha' human hands may shed
On his puren ame, is this chisled tablet brought lustre.

পাহাড়ের এক অংশে কতকগুলি গহ্বর আছে। এই সমুদয়ের ভিতর পাথর কাটিয়া মূৰ্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। মূৰ্ত্তিগুলি বৌদ্ধ। ইহাদের সুবিস্তৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। যে দুএকজন পুরোহিতের সঙ্গে এখানে দেখা হইল তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ বলিলেই চলে। চীনালিপি পর্ব্বতগাত্রের নানাস্থানে দেখিলাম। এগুলি পাঠ করাইবার লোক পাওয়া গেল না। কুলিঙ্‌ একস্থানে দুই তিনটা অক্ষর পড়িয়া বলিলেন—"ইহাতে ভারতবর্ষের নাম লেখা আছে। আর কিছু বুঝিতেছি না। ভারতবর্ষের নাম তিয়েন্‌-চু।

পৰ্ব্বতকন্দরসমূহ হইতে অদূরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুপরিচিত বৌদ্ধ মূৰ্ত্তিত্রয় বিরাজিত। একটা গৃহে ৫০০ বুদ্ধ-শিষ্যের কাষ্ঠমূৰ্ত্তি দেখা গেল। কিন্তু ইঁহারা কে বা কোন জাতীয় লোক তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। মূৰ্ত্তিগঠনে কারিগরেরা প্রত্যেকটায় কথঞ্চিৎ বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। পোষাক-বৈচিত্র্য, মুখ-ভঙ্গী-বৈচিত্র্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৈচিত্র্য, ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে তিব্বতী, মঙ্গোলিয়, ভারতীয়, চীনা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় জনগণের প্রতিকৃতি আন্দাজ করা চলিতে পারে। কিন্তু করিয়া লাভ নাই। শিল্পীরা বিভিন্ন সমাজের বৈচিত্র্য অনুসারেই এই সকল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে ৫০০ বৌদ্ধ প্রচারকগণের মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা অৰ্দ্ধেকেরও বেশী ইহা সহজেই অনুমান করা অন্যায় নয়। কিন্তু খাঁটি ভারতীয় মুখশ্রী অথবা পোষাক কোন মূৰ্ত্তিতেই দেখিলাম না। তবে খাঁটী ভারতীয় মূৰ্ত্তিই বা কিরূপ? শুনিলাম একটা নাকি মার্কো পোলোর মূৰ্ত্তি। ইহা অসত্য না হইতেও পারে—কিন্তু ইতালির বণিকের চেহারা কোথাও পাইতেছি না!

(৫) সি-হু-পরিক্রমা

পর্য্যটক মাত্রেই পশ্চিম হ্রদের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তটা "প্রদক্ষিণ" করিয়া যান। কাশী পরিক্রমা, ব্রজ পরিক্রমা ইত্যাদির মত চীনের সিহু-পরিক্রমাও প্রসিদ্ধ। সিহু-মাহাত্ম্যের বর্ণনায় কেহ ৭২টা দর্শনীয় বস্তু, কেহ বা ৩৬টা কেহ বা মাত্র ১০টা উল্লেখ করিয়াছেন। কবি গায়ক লেখক ইত্যাদির প্রভাবে সেইগুলি চীনা সমাজে সুপরিচিত। বৃন্দাবনে না যাইয়াও অনেক বৈষ্ণব সকল কুঞ্জ-বনের সংবাদ রাখেন। পশ্চিম হ্রদে না আসিয়াও চীনারা এখানকার সকল মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিতে সমর্থ। শুনিলাম প্রসিদ্ধ মাঞ্চু সম্রাট এই জনপদের প্রধান প্রধান দশটী দর্শনযোগ্য দৃশ্য তালিকাবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পর হইতে "দশ দৃশ্য" সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে। সেই সম্রাট একাধিকবার হ্যাংচাও দর্শনে আসিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার রাজত্বকাল।

কোথাও বা পর্ব্বতের শোভা কোথাও বা জলের শোভা দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কোন স্থান হইতে প্রাতঃসূর্য্যের অরুণ কিরণ অথবা অস্তাচলগামীর মরীচিমালা দেখা প্রশস্ত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের গৌরবে সিহু জনপদ অতুলনীয়। এতদ্ব্যতীত মন্দির মাহাত্ম্য, সৌধ-মাহাত্ম্য, উদ্যান মাহাত্ম্য ইত্যাদি মানব প্রদত্ত গৌরবও এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

হ্রদের পশ্চিম ধার দিয়া যাইতে যাইতে পল্লীগৃহ ও বাজার দেখিতেছি। কতকগুলি সুন্দর প্রমোদভবন অতিক্রম করিয়া একটা প্রসিদ্ধ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন স্বদেশ ভক্ত বীরবরের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দির নির্ম্মিত। উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহাকে An unswer-

ving guardian to the heir-apparent, a loyal-to-the-end Minister, the ever loyal Protector of his country, অর্থাৎ চরম স্বদেশ সেবকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেশভক্তের নাম, য়া কেই। ইনি সুংরাজগণের সেনাপতি ছিলেন। মোগলেরা একে একে উত্তর চীনের সকল নগর এবং এমন কি রাজধানী পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলিলে সুঙবংশের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। একজন যুবক নরপতি অতিকষ্টে হ্যাংচাওয়ে পলাইয়া আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে যুবক য়া-ফাইয়ের সঙ্গে যুবক নরপতির সাক্ষাৎ হয়। য়া-ফাই সেনাপতির পদে বৃত হইয়া মোগলদিগকে বহুযুদ্ধে পরাস্ত করিতে থাকিলেন। নেপোলিয়ানের মত তাঁহার উপর বিজয়লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ছিল। কিন্তু সুঙবংশের এক কুলাঙ্গার দেশদ্রোহী প্রধান মন্ত্রী য়া-ফাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কৌশলে এই কুচক্রী য়া-ফাইকে হ্যাংচাওয়ে ফিরাইয়া আনিল। ফলতঃ তাঁহার অধিকৃত জনপদসমূহ পুনরায় মোগলদিগের হস্তগত হইল।

আর একবার য়া-ফাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। কিন্তু মোগল সেনাপতির ঘুস খাইয়া চীনের ভবানন্দ য়া-ফাইকে বিশ্বাসঘাতকতা দোষের জন্য স্বদেশে ফিরাইয়া আনিল। মোগলেরা যথেচ্ছাভাবে দেশ অধিকার করিতে লাগিল। এদিকে মন্ত্রী নিষ্ঠুরভাবে য়া-ফাইয়ের হত্যা করাইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সমাজে সত্যকথা রটিয়া গেল। তখন নূতন সুং নরপতি য়া-ফাইয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য সবিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে পিশাচ মন্ত্রীর লৌহমূর্ত্তিও স্থাপিত হইল। ইহার উপর দর্শকগণ প্রস্রাব করিয়া থাকে। স্বদেশ দ্রোহীর প্রতি চীনারা এই ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে। মন্দিরে যাইয়া দেখি লৌহমূর্ত্তিটা বারোয়ারি পায়খানার মত জঘন্য অবস্থায়

রহিয়াছে। যে কথাটা আমরা তিরস্কার স্বরূপ অথবা অলঙ্কারিকভাবে বলিয়া থাকি তাহা চীনা সমাজে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতেছে। ইহা দেখিয়া বর্ত্তমান কালের চীনারা স্বদেশভক্ত হইতে শিখে।

(৬) প্যাগোডা

সরোবরের দক্ষিণ কিনারায় বজ্রশীর্ষ প্যাগোডা দেখিয়াছি। পশ্চিম কিনারায় পর্ব্বতের উপর আর একটা প্যাগোডা দেখিলাম। ইহার পার্শ্বে একজন পাদ্রী চিকিৎসকের বাসভবন এবং বিদ্যালয় অবস্থিত। প্যাগোডা সপ্ততল—পতনোন্মুখ ভাবে রহিয়াছে। কুলিঙ্ বলিলেন "বিলাতে এইরূপ অট্টালিকা হয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত না হয় শীঘ্রই সংস্কৃত করা হইত।" প্যাগোডার পাদদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে সমস্ত হ্রদের দৃশ্য এবং তাহার পর হ্যাংচাও নগরের পূর্ণ বিস্তৃতি অতিশয় সুন্দর দেখাইল।

প্যাগোডাহীন পল্লী বা সহর চীনে নাই বলিলেই চলে। হ্যাংচাওয়ে আরও দুইটা আছে। সহর হইতে দক্ষিণে কয়েক মাইল যাইয়া দেখিয়া আসিলাম। নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে এই দুইটা অবস্থিত। প্রথমটা ক্ষুদ্র কিন্তু গাত্রে সুন্দর বৌদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। নদী এবং পর্ব্বতের দৃশ্য অতি রমণীয়। নদীর উপর নৌকার চলাচল দেখিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। এই অঞ্চলে কাঠের ব্যবসায় খুব বেশী বোধ হইতেছে। কুলিঙ বলিলেন—"চীনের কোন পাহাড়ে একটাও গাছ দেখিতে পাইবেন না। জ্বালানি কাঠের জন্য চীনারা পাহাড় গুলিকে পুরাপুরি নির্ব্বৃক্ষ করিয়া ফেলিয়াছে।"

সহরের দক্ষিণ ফটক হইতে প্রায় চার মাইল দূরে আসিয়া সুবৃহৎ প্যাগোডা দেখিতে পাইলাম। এই ষট্‌কোণ সৌধ ১৩ তল বিশিষ্ট।

ভিতরে সিড়ি দিয়া সর্ব্বোচ্চ ছাদে উঠা যায়। প্রত্যেক তলের ছাদ এবং প্রাচীর সুচিত্রিত। স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ লিপিও দেখিলাম।

প্যাগোডা প্রস্তরময়—কিন্তু আগাগোড়া কাঠের বারান্দা আছে। প্রত্যেক বারান্দায় তিনটা করিয়া জানালা। প্রস্তর প্রাচীরের গাত্রে খিলান দেখিতে পাইলাম। কুলিঙ্ বলিলেন—"এই ধরণের খিলান চীনা গৃহে দেখা যায় না। ভারতীয় মুসলমান রীতির আমদানি বোধ হইতেছে।"

এই প্যাগোডা দশম শতাব্দীতে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্যাগোডার মত এইটাও বহুবার ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বারই নূতন সৌধ প্রস্তুত হইয়াছে। আর যে বস্তু দেখিতেছি উহা তাইপিঙ বিদ্রোহীদিগের ধ্বংশ সাধনের পর নির্ম্মিত।

প্যাগোডার সঙ্গে মঠও আছে। এখানকার গৃহগুলি সুরক্ষিত বোধ হইতেছে। চীনের প্রাচীন অট্টালিকা সমূহ কোথাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা নাই দেখিয়াছি। এইটা দেখিয়া প্রীত হইলাম।

চীনা মহাদেশে প্রায় ২০০০ প্যাগোডা আছে। কোনটা চতুষ্কোণ কোনটা গোলাকার, কোনটা ষট্‌কোণ, কোনটা বা অষ্টকোণ। ৫, ৭, ৯, ১১ বা ১৩ তলা সাধারণতঃ দেখা যায়। ২, ৪, ৬, ৮, ১০ বা ১২ তলা বিশিষ্ট প্যাগোডা নাই বলিলেই চলে। প্রাচীনতম অট্টালিকা আদিম অবস্থায় কোথাও আছে কিনা সন্দেহ—সবই বোধ হয় পুনর্গঠনের ফল। North China Branch of the Royal Asiatic Society's Journal, 1915 পত্রিকায় কুলিঙের Chinese Pagodas নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। একজন ফরাসী পণ্ডিতের পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার উপকরণ সংগৃহীত। সেদিন সিকাওয়ে জেসুট অনাথ আশ্রমে কতকগুলি প্যাগোডার কাষ্ঠমডেল দেখিয়াছি। এই সমুদয়ের ফটোগ্রাফ সহ কুলিঙের প্রবন্ধ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে।

(৭) চীনাদের নামকরণ

চীনা নরনারীর নাম কিরূপ হয় তাহা ভারতবর্ষের লোকেরা জানে না বলা যাইতে পারে। আমরা কন্‌ফিউশিয়াসের নাম শুনিয়াছি। কিন্তু ইহা চীনা নামের ল্যাটিন সংস্করণ। এতদিন পর্য্যন্ত একমাত্র হুয়েন্তসাঙ অথবা যুয়ানচুয়াং আমাদের শিক্ষিত মহলে পরিচিত ছিলেন। তিন চারি বৎসর হইল আরও দুইটা চীনা নাম ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে— সুন-ইয়াৎ-সেন ও য়ুয়ান্-শি-কাই। কিন্তু এই দুই নামের মধ্যে পদবী বা বংশোপাধি কোনটা তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। চীনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে চীনা নামের পারিবারিক অংশ এবং ব্যক্তিগত অংশ আমার জানা ছিল না।

আমরা ভারতবর্ষে নামের প্রথম অংশকে ব্যক্তিগত এবং শেষ অংশকে পারিবারিক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ইয়োরামেরিকারও দস্তুর এইরূপই। 'রমেশচন্দ্র দত্ত' বলিলে আমরা যেরূপ বুঝি, সুন-ইয়াৎ-সেন এবং য়ুয়ান-শি-কাই এই দুই শব্দেও সেইরূপই বুঝিতেছিলাম। একজনকে 'সেন মহাশয়' অপর জনকে 'কাই মহাশয়' বলা আমাদের অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যেন 'সেন' এবং 'কাই' দুইটা পদবী। ইয়োরামেরিকার লোকেরাও চীনাদের নামোল্লেখ করিতে যাইয়া ঠিক এইরূপই করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ভুল। চীনারা পদবী বা বংশোপাধি প্রথমে উল্লেখ করে তাহার পর ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার করে। সুতরাং চীনা স্বরাজের এই দুই ব্যক্তিকে সুন্ মহাশয় এবং য়ুয়ান মহাশয় রূপে অভিহিত করা উচিত।

আমাদের রীতিতে চীনা নাম লিখিতে হইলে বলিব 'ইয়াৎ-সেন-সুন' 'শি-কাই-য়ুয়ান্' ইত্যাদি। সেইরূপ কু-হুং-মিঙ্‌কে বলা উচিত হুং-মিঙ্-কু; তাঙ্-শাও-ই কে বলা উচিৎ শাও-ই-তাঙ্।

চীনা ভাষায় অর্থহীন শব্দ একটাও নাই। বাস্তবিকপক্ষে আমরা যাহাকে শব্দ বলিয়া থাকি চীনাভাষায় সেই বস্তু নাই। চীনা ভাষা চিত্রমূলক। ইহা কানে শুনিয়া বুঝিবার জিনিস নয়—চোখে দেখিয়া বুঝিতে হয়। চিত্রকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন 'নাম' দেওয়া হইয়া থাকে—কিন্তু চীনের সর্ব্বত্র এক চিত্রে একই "বস্তু" বুঝা যায়।

চীনে ১৮টা প্রদেশ। এই প্রদেশগুলি যে সমুদয় চিত্রের সাহায্যে অঙ্কিত হইয়া থাকে সেইগুলির অর্থ আছে বলা বাহুল্য। এই কারণে কোনো প্রদেশের নাম করিবামাত্র তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা অবস্থান বুঝিতে পারা যায়।

সি=পশ্চিম। যথা সি-হু (পশ্চিম হ্রদ)

শেন্ সি—প্রদেশ পশ্চিম সীমান্ত (শেন্=সীমান্ত)

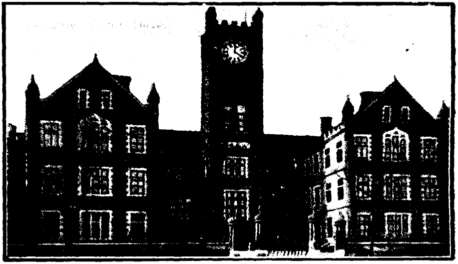
শান্-টুঙ্—প্রদেশ পর্ব্বতের পূর্ব্ব (টুঙ্=পূর্ব্ব)

কোয়াঙ-টুঙ „ প্রশস্ত পূর্ব্ব (কোয়াঙ=প্রশস্ত)

কোয়াঙ-সি „ প্রশস্ত পশ্চিম

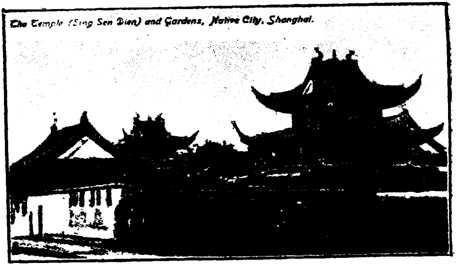
হু পে „ হ্রদের উত্তর (হু=হ্রদ যথা সি-হু, পে=উত্তর যথা পে-কিঙ—উত্তর রাজধানী)

হু-নান্ প্রদেশ হ্রদের দক্ষিণ (নান্=দক্ষিণ যথা নান-কিঙ=দক্ষিণ রাজধানী)



শাংহাই বন্দরের শুল্ক-গৃহ

(১২৮ পৃষ্ঠা)



স্বদেশী শাংহাইয়ের মন্দির

(১৭১ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

চীন-তত্ত্বে হাতেখড়ি

(১) শাংহাইয়ে সাতমাস।

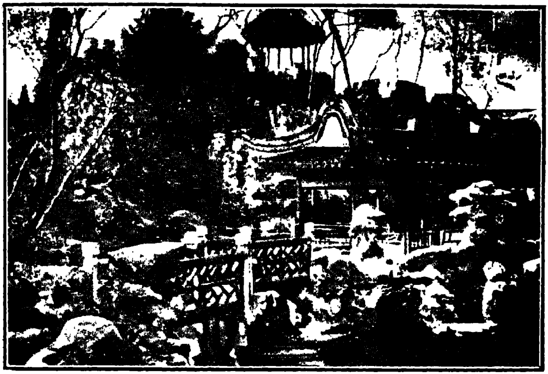
হ্যাং-চাও হইতে আসিয়া অবধি শাংহাইয়েই আছি। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাতমাস কাটিতে চলিল। এই সাত মাস চীনের বাহিরে বাস করিয়াছি বলিলেই চলে। থাকা হয় ফরাসী হোটেলে। জিনিষ পত্র কিনিতে যাই হোয়াইট য়্যাওয়ে লেড্‌-ল কোম্পানীর বাড়ীতে— পুস্তকাদি ক্রয় করি কেলীওয়ালনশের দোকানে। বেড়াইতে যাই কোম্পানীর বাগানে—"সেখানে চীনাদের প্রবেশ নিষেধ"। দেখা সাক্ষাত হয় পাদ্রী রিচার্ড অথবা এশিয়াটিক সোশাইটীর কুলিং্‌ সাহেবের সঙ্গে। আর রাস্তায় ঘাটে দেখিতে পাই ইয়াঙ্কি, জাপানী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, সুইস, জার্ম্মাণ, রুশ, ইংরেজ, আর চীনা রিক্স কুলী এবং আমাদের স্বদেশভায়া ভারতীয় দ্বারবান বরকন্দাজ বা পাহারাওয়ালা। কোনো চীনা পর্য্যটক কলিকাতার চৌরঙ্গীপাড়ায় বাস করিয়া ইডেন-গার্ডেন এবং ধর্ম্মতলার মোড় পর্য্যন্ত চতুঃসীমার মধ্যে যত খানি বাঙ্গালা দেশ দেখিতে পাইবেন সম্প্রতি ততখানি চীন লইয়া সন্তুষ্ট আছি।

শীত আসিল শীত চলিয়া গেল। গত বৎসর নিউইয়র্কের বষ্টন ওয়াশিংটনের শীত হজম করিয়া এবার শাংহাইয়ের শীতকে ছেলেখেলা মাত্র ভাবিলাম। দুইদিন মাত্র বরফ পড়িয়াছে—পিকিঙে অবশ্য খুবই বেশী—ঐ অঞ্চলের নদী সমুদ্র সবই জমিয়া যায়। শাংহাইয়েও হোটেলের সকল কামরাতে আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে। কাজেই শীত

সত্যসত্যই কতখানি "রপ্ত" হইয়াছে তাহা আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় এখন হইতে অল্প শীতেই বেশী কাতর হইব। ইহা একপ্রকার গরীবের ঘোড়া রোগ। এদিকে আজ ৮ই এপ্রিল অর্থাৎ চৈত্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহেই অসহ্য গরম বোধ হইতেছে। দেখিতেছি জীবনযাত্রার পুরাতন মাপকাঠি আর বজায় রাখা অসম্ভব। মাত্র দুই বৎসরেই এত পরিবর্ত্তন। ১৯১৪ সালে ঠিক এই তারিখে বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম। তবে বেশী চিন্তিত হইবার কারণ নাই। শাস্ত্রের বচন আছে—"শরীরের নাম মহাশয়—যা সওয়াবে তাই সয়"।

এই কয়মাসের জীবন আর কিছুই নয়, কেবল বই ঘাঁটা। সুতরাং হ্যাংচাওয়ের পর হইতে পর্য্যটন-কাহিনী আর নাই। চীনের পুরাতন ও নবীন জীবন সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে মাত্র।

একদিন বৃদ্ধ রিচার্ড বলিলেন—"ওহে শাংহাইয়ের দুএকটা ক্লাবে যাওয়া আসা করিতে ইচ্ছা কর? সম্প্রতি এক সভার কিছু বড় রকমের আয়োজন আছে"। আমি বলিলাম—"আপত্তি কি?" তাহার পর এক নিমন্ত্রণ চিঠি পাওয়া গেল। এখানকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ইংরেজ হোটেলে "শনিবার মজলিসে"র এক অধিবেশন; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পয়সা দিয়া খানা খাইয়া থাকেন। আমার পয়সা রিচার্ড দিলেন। প্রায় দুই তিন শত ইংরেজ ও ইয়াঙ্কি উপস্থিত। পরে বক্তৃতা—বক্তা একজন ইয়াঙ্কি। ইনি শান্তির আন্দোলনের পাণ্ডা। বক্তৃতা হইল—"ওহে চীনা ভাই সকল, তোমরা আমাদের ভাই, আমরা তোমাদের ভাই। ইয়োরামেরিকানেরা তোমাদের বন্ধু, তোমরা ইয়োরামেরিকানদের বন্ধু। এই পৃথিবীতে উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান নাই—প্রাচ্য-প্রতীচ্য পার্থক্য নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম সব এক। কিপ্লিঙ দুই চারি লাইন লিখিয়া



সাংহাইয়ের একটি দৃশ্য

(১৭১ পৃঃ)



সাংহাই বন্দরের একটি দৃশ্য

এশিয়ার ও ইয়োরামেরিকার মনোমালিন্য বাড়াইয়াছেন। সে কথায় তোমরা কান দিও না। তোমরা সকল বিষয়েই আমাদের সমান। পরজাতি বিদ্বেষ পরধর্ম্ম বিদ্বেষ ইত্যাদির যুগ চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা সমগ্র মানবজাতির এক ধর্ম্ম, এক আশা, এক কর্ত্তব্য প্রচার করিতেছি। চীন তুমি ইয়োরামেরিকার সমান।”

আমি ভাবিতে লাগিলাম এই জন্য চীন ইয়োরামেরিকার সমান বলিয়াই বোধ হয় চীনের কুত্রাপি চীনাদের কর্তৃত্ব নাই—সর্ব্বত্রই ইয়োরামেরিকানদের আধিপত্য ও চোখ্‌রাঙ্গানি। এই জন্যই বোধ হয় চীনে এতগুলি কন্‌সেসন্‌ মহাল্লা—যেখানে চীনারা নিজ বাসভূমে পরবাসী! বিদেশী-শাসিত শাংহাইয়ের বারোয়ারি তলায় দাঁড়াইয়া কোন বিদেশী লোক চীনাদিগকে এই ধরণের স্তোক বাক্য বলিয়া যাইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। চীনারাও কি এতই বেকুব যে এই ধরণের সাম্য ও মৈত্রীর কথা শুনিয়া গলিয়া যাইবে?

শনিবারের মজলিশ চীনাদের সঙ্গে ইয়োরামেরিকানদের মেলা মেশা করাইবার জন্য সৃষ্ট। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া খানা খাইবার ব্যবস্থা আছে। সেদিনকার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বক্তৃতায় বহুসংখ্যক চীনা যুবক উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলেই বিদেশ প্রত্যাগত।

সুখের কথা ভারতবাসীকে কোন লোক এই ধরণের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য শিখাইতে আসেন না। আসিলেও তাঁহারা “কল্কে পান না।” কারণ ভারত সন্তান মর্ম্মে মর্ম্মে জানে যে, বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসী কোন হিসাবেই ইয়োরামেরিকানদের সমান নয়, ভারতবর্ষের লোক প্রায় সকল বিষয়েই দুনিয়ার অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল। যতদিন

ভারতবাসী হৃদয়ে হৃদয়ে এই কথা জপ করিবে ততদিন ভবিষ্যতভারত গঠনের আশা বিনষ্ট হইবে না। ভরসা আছে যুবক ভারত কোন দিন বেকুবি করিয়া সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির কুহকে মজিবে না।

আর এক দিন শনিবার-মজলিশে খানা খাইলাম। সে দিন শান্তির ও সাম্যের কথা ছিল না। কয়েকজন পাকা ইয়াঙ্কি ডাক্তার আসিয়া বক্তৃতা করিলেন। ইঁহাদিগকে আমেরিকার ধনকুবের রকাফেলার প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠান হইতে চীনে পাঠানো হইয়াছে। চীনের নানা স্থানে ইঁহারা চিকিৎসা বিদ্যালয় হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করিবেন। টাকা আমেরিকা হইতেই আসিবে। ইয়াঙ্কিরা টাকা সাহায্য করিয়া করিয়া চীনকে একপ্রকার কিনিয়া ফেলিয়াছে বলিলেই হয়। এত দান হজম করিয়া কি পিঠের শিরদাঁড়া খাড়া রাখা যায়। তাহার উপর দাতা আসিয়া যখন মাঝে মাঝে শুনাইয়া যান—ওরে ভিক্ষুক—আমরা তোদের অন্ন দিতেছি। তোরা আমাদেরই সমান বটে! ওরে মূর্খ—আমরা তোদের জন্য পাঠশালা, কলেজ, শিল্পবিদ্যালয় গ্রন্থাগার খুলিয়া দিতেছি। তোরা আমাদেরই সমান। ওহে মৃতপ্রায় ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত চীনা সমাজ, তোমরা বর্ত্তমান যুগের আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে শিখ নাই। আমরা তোমাদের রাস্তা-ঘাট নর্দ্দমা খাল বিল জঙ্গল ইত্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা আমাদেরই সমান!" ইহার নাম "মরার উপর খাঁড়ার ঘা।"

এইত গেল একধরণের বন্ধুত্ব—তাহার উপর ব্যবসায় বাণিজ্য রাষ্ট্র শাসন, খাজনা আদায়, সেনাব্যবস্থা, রণতরীনির্ম্মাণ ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগের পরামর্শ দাতা, উপদেষ্টা, এবং হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ত আছেনই। অধিকন্তু এই সকল বন্ধু কোন এক বা দুই জাতির লোক নন। দুনিয়ার সকল জাতিই চীনের বন্ধু! এই বন্ধু-প্রপীড়িত দেশের জর্জ্জরিত

অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছি। পূরা পরাধীনতা অপেক্ষা বোধ হয় চীনের অবস্থা অধিক কষ্টকর।

মাঝে মাঝে চীনা ভাষায় সম্পাদিত সংবাদ পত্রের ইংরেজি অনুবাদ বিদেশীয় সংবাদ পত্রে বাহির হয়। সেগুলির ধুয়া এইরূপ "তবে কি চীন আর স্বাধীন নাই?" "তাহা হইলে আমাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলা যায় কি করিয়া?" "দেখিতেছি চীনের স্বাধীনতা একটা শব্দ মাত্র" "এইবার চীন তবে পরহস্তগত হইতে চলিল," "এই ধরণে আমাদের রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালিত হইল বিদেশীয়েরা শীঘ্রই আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিবে বুঝিতেছি" "চীনের নাম-মাত্র স্বাধীনতাও আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

শনিবারের মজলিশে একদিন শ্রীযুত উ-টিংফাঙ্ সভাপতি ছিলেন। চীনের বাহিরে দুইজন চীনার নাম জগৎপ্রসিদ্ধ সুন্-য়াৎ-সেন এবং য়ুয়ান্ শী-কাই। এই দুইজনের পরেই আর দুই জন চীনা বিখ্যাত তাঁহাদের নাম দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই কিন্তু তাঁহাদের নাম জানে না এরূপ লোক বোধ হয় চীনে নাই। একজনের নাম তাঙ্-শাওই, আর একজন ডাক্তার উ-টিং-ফাঙ। উ মহাশয় আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কিউবা দ্বীপে এবং স্পেন পর্ত্তুগালে চীন-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র দূত ছিলেন। ইয়াঙ্কি স্থান সম্বন্ধে ইনি একখানা ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পেন্‌সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহাকে এল্, এল্, ডি উপাধি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইনি ডাক্তার উ নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন "ডাক্তার ভাণ্ডারকার" বলিলে স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ভিন্ন অন্য কোন ভাণ্ডারকার বুঝায় না সেইরূপ "ডাক্তার উ" চীনে উ নামের এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক।

মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিবার প্রয়াসে তাঙের ন্যায় উ ও সুন্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঙ্‌ সেই সময়ে মাঞ্চু সম্রাটের প্রীমিয়ার বা মন্ত্রি প্রধান ছিলেন। উও সাম্রাজ্যেরই কর্ম্মচারী ছিলেন। বিপ্লবের পর য়ুয়ান যখন সুনের দলকে কাবু করে, তাঙ্‌ এবং উ তখন য়ুয়ানের পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অথচ বৃদ্ধ বয়সে ইহারা সুনের মত চরম পন্থী হইয়া দেশত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। কাজেই শাংহাইয়ের বারোয়ারিতলায় বিদেশীয় রক্ষণাবেক্ষণের আশ্রয়ে উভয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য য়ুয়ানের চোখ এড়াইয়া ইহারা নিশ্চিন্ত-ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন না। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হয়। উ প্রায়ই সভা-সমিতিতে সভাপতি হইয়া থাকেন কিন্তু তাঙ্‌ একদম বাক্য বন্ধ করিয়াছেন কেবলমাত্র একটা চীনা ব্যাঙ্কের পরি-চালনায় নিযুক্ত আছেন।

উ প্রণীত "America Through the Eyes of an Oriental Diplomat" গ্রন্থে বৃদ্ধের রসিকতা বেশ বুঝা যায়। কথা বার্ত্তায় আসর গুলজার করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। বৃদ্ধ বলিয়া স্বদেশী সকলেই ইঁহাকে খাতিরও করে। অধিকন্তু ইনি একজন পয়সাওয়ালা লোক।

উ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে বাপু থিয়জফির কিছু খবর রাখ? আমি ভাবিতেছি যুদ্ধের পর একবার মাদ্রাজে যাইব।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"তীর্থ ভ্রমণে নাকি?" উচ্চ হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক ধরিয়াছ। আমি আজকাল আত্মা, পরকাল, পরজন্ম ইত্যাদির আলোচনা করিতেছি। মৎস্য মাংস ভক্ষণ বন্ধ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা হয় তোমাদের বুদ্ধের আদর্শে পাহাড়ে যাইয়া নির্জ্জন বাস করি।" উ একটা দুঃখের কথা বলিলেন। ইনি চীনা যুবক সমাজে আহার-সংস্কারের আন্দোলন

তুলিয়াছিলেন। মাছ মাংস বর্জন করানো ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ইনি একটা হোটেল পর্য্যন্ত খুলিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হইয়া যায়। নিরামিশ হোটেলে খরিদার ত জুটীতই না, অধিকন্তু একদিন রাত্রিকালে দুষ্ট লোকেরা হোটেলে আগুন লাগাইয়া দেয়। "তাহার পর হইতে আমি কিছু দমিয়া গিয়াছি। তবে এক কথা—দুনিয়ার সকল সংস্কারের আন্দোলনেই, প্রবর্ত্তক ও পথপ্রদর্শকগণের এই দুরবস্থা হইয়া থাকে।"

একদিন একটা বয়ন-কারখানা দেখিলাম। চীনারা মালিক, তত্ত্বাবধায়কও চীনা। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা যুবকেরা চাকরী পাইতেছে না—এদিকে তাহারা কেহই প্রথম হইতে ৩০০।৪০০৲ টাকার কমে চাকরি করিতে রাজি নয়। অথচ বিদ্যায় ইহারা হাতী ঘোড়া নয়। কেবল আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছে বলিয়া আত্মগৌরব বেশী। দেশের লোক ইহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করে। স্বদেশীয় ভাষায় ও সাহিত্যে প্রায় কাহারও দখল নাই। আর তিনচার বৎসর মাত্র বিদেশ বাসের ফলে কতখানি আধুনিক বিদ্যাই বা অর্জ্জিত হইতে পারে? ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে যে সকল ছাত্র বিদেশে পাঠানো হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই জাপানী বিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল। বিদেশে উচ্চতম বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত। কিন্তু চীনারা সামান্য মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যই বিদেশে যাইয়া থাকে।

কাজেই ইয়োরামেরিকার চীনা ছাত্রদের সংখ্যা গণনা করিয়া চীনের ভবিষ্যৎ বিচার করা উচিৎ নয়। আমাদের দেশের একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। যে সকল ভারতীয় ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন্, ইণ্টারমিডিয়েট অথবা বি এ, বি এস্ সি পাশ করিবার পর আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসর মাত্র কাটাইবার সুযোগ

পায় তাহারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কতখানি আয়ত্ত করিতে পারে? সেই পরিমাণে আধুনিক বিদ্যার জোরে বর্ত্তমান ভারতে নেতৃত্ব করা চলে কি? চীনের অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। মাথাওয়ালা লোকেরা প্রায় কেহই নব্য বিদ্যার ধার ধারেন না। আর নব্যবিদ্যা যাহাদের পেটে পড়িয়াছে তাহারা সকলেই অর্ব্বাচীন শিশু বা যুবক; আর সেই বিদ্যার পরিমাণও অতি অল্প মাত্র।

কলিকাতার এক প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বিগত ত্রিশ বৎসরে যতগুলি আধুনিক বিদ্যাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী বাহির হইয়াছে চীন সাম্রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে বোধ হয় ততগুলি চীনা যুবক বা প্রৌঢ়ব্যক্তি স্বদেশে অথবা বিদেশ হইতে বর্ত্তমান যুগের বিদ্যাগুলি আয়ত্ত করিবার সুযোগ পান নাই। কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইল বোধ হয়। কিন্তু বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনাদের বিদ্যা এত অল্প এবং সংখ্যা এত কম যে অনুমান প্রায় ঠিক।

অবশ্য, সেনাবিভাগ, রণতরী বিভাগ, ব্যাঙ্কিং, ব্যবসায়, রাসায়ণিক শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিদ্যা চীনা সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে—সেগুলি ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটে না। বিগত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া চীনের নগরে নগরে নব্য কলেজও স্থাপিত হইতেছে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা হয়। কিন্তু এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষা দখল করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য বেশী সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ। আমাদের মত চীনাদেরও প্রধান সমস্যাই শিক্ষাসমস্যা। রামমোহন রায়ের আমলে প্রতীচ্য সভ্যতা এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ভারতে যতখানি ছিল চীনে মাত্র ততখানি দেখিতেছি।

এদিকে চীনারা প্রায়ই দুঃখ করে—"য়ুয়ান-শী-কাই নব্যশিক্ষিত লোক চাহেন না। কারণ তাঁহারা স্বরাজপন্থী হইতে শিখে। তাহারা

য়ুয়ানের যথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্য পছন্দ করিবে না।" আমাদের দেশেও কোন কোন রাজা, নবাব, তালুকদার ও জমিদার সম্বন্ধে এই ধরণের অভিযোগ মাঝে মাঝে শুনা যায়। তাঁহারা নাকি বলেন, "প্রজারা রাইয়তেরা শিক্ষিত হইয়া উঠিলে অবাধ্য হইয়া পড়িবে, আর সেলাম করিবে না ইত্যাদি।" যাহা হউক, য়ুয়ান্-শী-কাইকে চীনারা শিক্ষা বিস্তারের শত্রু বিবেচনা করিতেছে। ইনি একমাত্র সেনা বিভাগে টাকা খরচ করিতে ব্যস্ত। বিদেশ ফেরত যুবকগণকে ইনি আদৌ কোন রাষ্ট্রকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহেন না। ফলতঃ যে দিকেই তাকাই—চীনের বর্ত্তমান অবস্থাকে নব্য জাপানের শৈশবাবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। জাপানের সৌভাগ্য কাজেই চীনে ঘটিবে বলিয়া আশা করিতে পারি না। চীনকে সকল বিষয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জুড়িদার বিবেচনা করাই সঙ্গত।

চীনারা কুস্তী, পালোয়ানি, স্পোর্টস্, ব্যায়াম ইত্যাদিতে নজর দিতেছে। ফিলিপিনো, জাপানী এবং চীনাদের বার্ষিক ব্যায়াম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোনবার তোকিওতে কোনবার ম্যানিলায় কোনবার চীনের কোন নগরে এই প্রতিযোগিতা প্রদর্শিত হয়। পর পর দুইবৎসর চীনারা জয়লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সর্ব্বত্র নগরে নগরে এই ধরণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যুবক চীন শারীরিক উৎকর্ষের দিকে বেশ ঝুঁকিয়াছে। "বয়স্কাউট্‌স্" আন্দোলনও ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতেছে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় এই সকল ক্ষেত্রেও উদ্যোগী এবং তত্ত্বাবধায়কগণ হয় ইংরেজ, না হয় ইয়াঙ্কি, না হয় জার্ম্মাণ। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালে ইয়োরামেরিকা সকল বিষয়েই এশিয়ার গুরু, জাপানও একথা শীকার করিতে বাধ্য।

(২) বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তর ভারত

বাঙ্গালী কলিকাতার চীনা বাজার হইতে চীন দেখিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমরা চীনাদিগকে মুচি ও চর্ম্মকারের জাতি বলিয়া জানি। কেহ কেহ হয়ত চীনাজাতিকে পাকা ছুতার বলিয়া জানেন। চীনে আসিয়া এই ধারণার প্রতিশোধ পাইতেছি। চীনারা আমাদিগকে কুলীর জাতি বলিয়া জানে। ভারতবর্ষ কোন্ দেশের নাম? যে দেশে কুলী বাস করে। অবশ্য চীনারা ভারতবর্ষ শব্দটা জানে না। ইহারা আমাদিগকে "ইন্দো" বলিয়া ডাকে। ভারতীয় প্রতিশব্দ "হিন্দু" অথবা "হিন্দুস্থানী"। এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ "কুলী" "বরকন্দাজ," "পাহারাওয়লা" ইত্যাদি। ভারতবাসী যেমন "সাহেব" বা "ইংরেজ" শব্দ ব্যবহার করিলে বুঝিয়া থাকে "রাজা" বা "রাজার জাতি," সেইরূপ চীনারা "ইন্দো" শব্দে অশিক্ষিত কুলী বুঝিয়া থাকে।

এই কথাটা ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। কেননা ভারতবর্ষে আমরা স্বজাতিকে দুনিয়ার গুরু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ভারত-সন্তান সম্বন্ধে ইয়োরামেরিকানদের ত কথাই নাই, জাপানীদের ধারণাও ত ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারেরই উপযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক এমন কি গলিত নখদন্ত মুমূর্ষু দীন হীন চীনা সমাজের নিকৃষ্ট কুলীও যে কোন ভারত-বাসীকে কুলী-সন্তান মাত্র বিবেচনা করে। ইহাদিগকে কেহ শিখায় নাই চোখের সম্মুখে যাহা দেখে তাহা দেখিয়া আপনা আপনি শিখিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে একজনও উপযুক্ত ভারত-প্রতিনিধি কোথাও যদি থাকিতেন তাহা হইলে "কুলীর দেশ" অপবাদ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইত। ভারতমাতা স্বদেশের বাহিরে কেবল মাত্র ভিখারী অশিক্ষিত মজুর পাঠাইয়াছেন। এই মজুর বা কুলী সমাজই বর্ত্তমানযুগে বৃহত্তর

ভারত গঠন করিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষ কুলীর "বাথান" বিবেচিত হইবে না কেন? ভারতবর্ষ যদি ভারতবাসীর হইত তাহা হইলে দুনিয়ার স্থানে স্থানে ভারত প্রতিনিধি, ভারতীয় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় কারবার দেখিতে পাইতাম। একথাটা দেশে বসিয়া যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমেরিকায়, জাপানে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চীনে, বুঝিলাম।

কয়েকজন ধনী পার্শী মহাজনের কারবার শাংহাইয়ে আছে। কিন্তু পার্শীরা আইনতঃ ভারতসন্তান হইলেও অন্য কোন হিসাবে ভারতসন্তান-রূপে পরিচিত কিনা সন্দেহ। ইহারা যখন যে দেশে থাকেন তখন সেই দেশের লোক হন। সাধারণতঃ ইহাদিগকে ভারত প্রতিনিধি বিবেচনা না করাই ভাল। পার্শীরা দুনিয়ার নানা বন্দরে উচ্চাঙ্গের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে বৃহত্তর ভারত কথঞ্চিৎ জাতিতে উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের বহুসংখ্যক উচ্চ-শিক্ষিত "করিতকর্ম্মা" অথবা ধনবান্ হিন্দু ও মুসলমান প্রবাসী হইতে আরম্ভ না করিলে ভারতমাতার কলঙ্ক ঘুচিবে না। কালেভদ্রে একবার জগদীশচন্দ্র কয়েকটা ল্যাবরেটরীতে উচ্চতম অঙ্গের গুণপনা দেখাইতে আসিলে ত্রিশ কোটি নরনারীর অথবা পাঁচকোটি বাঙ্গালীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না।

অবশ্য স্বদেশের সম্মান দুনিয়ায় বাড়িল কি কমিল রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ইত্যাদি মণীষীগণের তাহা লক্ষ্য করিবার হয়ত বা অবসর নাই। ইঁহারা নিজ নিজ শক্তির চরম অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইলেই ইঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় মনে করেন। তাহাতেই হয়ত দেশবাসীর সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহারা ব্যক্তিগত ভাবে যশস্বী হইতেছেন অথবা দুনিয়ার পূজা লাভ করিতেছেন শুনিলেই সমগ্রদেশেরই

গৌরব বৃদ্ধি হইল বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক স্বদেশ সেবক আছেন যাঁহারা এই শ্রেণীর মণীষিগণের অথবা অন্যান্য কর্ম্মবীরের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা নানা উপায়ে নানা সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন কৃতীব্যক্তিকে গৌরবার্হ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের জানা আবশ্যক যে ভারতসেবার জন্যই ভারতের বাহিরেও যোগ্য লোকের সময় ও পরিশ্রম লাগানো কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ হইতে দুনিয়ায় এত দিন হাজারে হাজারে, এমন কি লাখে লা· কুলী আসিয়াছে। আজ কাল দুইচারিদশ গণ্ডা ছাত্র আসিতেছে। এক্ষণে এক নূতন আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা দেশের নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের অনেকের প্রবাসী হওয়া আবশ্যক। চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ, উকীল, ব্যারিষ্টার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, পালোয়ান, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানসেবী, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বয়স্ক ও প্রবীণ লোককে দেশপর্য্যটনে বাহির হইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশেই সপরিবারে চির জীবন কাটাইতে হইবে। এইরূপ চিরপ্রবাসী ভারতীয় গুণিগণের সংশ্রবে আসিলে দুনিয়ার লোক ভারতবর্ষকে নূতন চোখে দেখিতে শিখিবে।

অনেক ভাবিতে পারেন দুনিয়ায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য লোক ভারতে বেশী আছেন কি?" ভারতবর্ষে থাকিতে এই-কথাটা আমার মনেও অনেকবার উঠিয়াছিল। স্বচক্ষে দুই বৎসর জগৎ দেখিয়া বুঝিতেছি যে, ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক যে-কোন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সমগ্র এশিয়ার যে কোন নগরে উচ্চতম ব্যক্তির সঙ্গে সমান ভাবে টক্কর দিতে পারেন, তোকিও হইতে কায়রো পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভারতবাসী নায়কপদে বৃত হইবার যোগ্য। জাপানীরা ফার্ষ্ট ক্লাশ

পাওয়ারের লোক স্থতরাং অবনত ভারতবাসীকে তুচ্ছ করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ইহারাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে যে, যে সকল বিদ্যায় ভারতবাসী এখনও মাথা চালাইতে অধিকারী এবং সুযোগ পাইয়া থাকে সেই সকল বিদ্যায় জাপানীয়া আমাদিগকে হঠাইতে পারিবেন না। আর কোরিয়া, চীন, পারশ্য, ও মিসর এই কয়দেশের সর্ব্বত্রই ভারত-সন্তান বিনাবাক্যব্যয়ে গুরুরূপে সম্মানিত হইবেন। অধিকন্তু এই সকল দেশের লোকেরা হিন্দু, অর্থাৎ ভারতবাসীকে নিজের আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসিয়া থাকে।

এই গেল এশিয়ার কথা। তার পর ইয়োরামেরিকা। যতদিন দেশে ছিলাম ততদিন এই সকল দেশের লোকজন সম্বন্ধে কি অসম্ভব ধারণাই না ছিল! ইহাদিগকে অদ্ভুত জীব বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। চোখে আঙ্গুল দিয়া কেহই বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই যে এই সমুদয় জাতীয় লোকও ভারতবাসীর মতই রক্তমাংসেরই মানুষ; আমাদের যতগুলি দুর্ব্বলতা আছে ইহাদেরও ঠিক ততগুলি দুর্ব্বলতা আছে, এবং ইহাদের সকলেই প্রতিদিন নূতন নূতন আবিস্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করেন না।

অবনত মৃতপ্রায় জাতিকে অচেতন ও সম্মোহিত রাখিবার প্রয়াস বিদেশীয়েরা নানা ভাবে করিয়াছেন। দুঃখের কথা এক শতাব্দী ধরিয়া আমাদের স্বদেশ বাসীরা বিদেশে ভ্রমন করিয়াও বিদেশীয়গণের সম্মোহন মন্ত্রেরই সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের চোখের ঠুলী খুলিয়া দিতে চেষ্টিত হন নাই। এই সকল বিষয়ে অনেক লেখা যায়, সম্প্রতি অনাবশ্যক। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা সকলেই নোবেল প্রাইজ পান না। সকলেই বড় বড় আবিষ্কার করেন না সকলেই চরিত্রবান

কর্ম্মবীর নন সকলেই স্বার্থত্যাগী পরহিতব্রত মানব সেবক নন। রামাশ্যামাই অধিকাংশ, মধ্যমশ্রেণীর লোক অল্পসংখ্যক এবং নিউটন ক্রুপ্ জগদীশ চন্দ্রের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায় সুতরাং এক বঙ্গদেশেই উপযুক্ত ভারত প্রতিনিধি বহুসংখ্যক আছেন। তাঁহাদিগকে পর্য্যটক বা প্রবাসী করিবার ব্যবস্থা করিলে পাঁচবৎসরের মধ্যে দুনিয়ার বাজারে বাজারে ভারতীয় প্লাবন সৃষ্ট হইতে পারে। স্বদেশ সেবকগণের এদিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

জগতে ভারতীয় বন্যা প্রবাহিত না হইলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত বীরগণ এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এমন কি ১৯০৫ সালে যুবক ভারতের জন্মের পরও ভারত সমাজে এই তত্ত্ব প্রচারিত হয় নাই। বোধ হয় আজকাল অনেকেই "বিশ্ব শক্তির সদ্ব্যবহার" করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে অগ্রসর হইতেছেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবার পূর্ব্বে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে আশা করি।

(৩) হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম

একদিন লাইব্রেরীতে বসিয়া কুলিঙ্ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "অধ্যাপক জাইল্‌সের একখানা নূতন বহি বাহির হইয়াছে। দেখিয়াছেন কি? কয়েক মাস হইল লণ্ডনে "হিব্বার্ট লেক্‌চারসের" অন্তর্গত চীনের ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। সেগুলি Confucianism and its Rivals নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।" কুলিঙ্ বলিলেন "না, শুনি নাই ত!" আমি বলিলাম—"জাইল্‌সের রচনা খুব প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁহার মতন প্রাচীন চীনতত্ত্বজ্ঞের গ্রন্থে যেরূপ গভীরতা ও পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক

তাহা ত পাইলাম না।” কুলিঙ্ বলিলেন “ঠিক তাই—ইহার লেখা বেশ পরিষ্কার কিন্তু নিতান্ত ভাসা ভাসা। চীন সম্বন্ধে ইনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—সবই এই ধরণের। আর এক কথা জাইল্‌স্ কখনও অন্যান্য গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেন না। ইনি বড় অহঙ্কারী। আমার বিশ্বাস তাঁহার এই নূতন গ্রন্থের কোন পাতায় ফুট নোট বা ঋণ স্বীকার নাই।”

আমি বলিলাম “কিন্তু বইখানা পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইতেছিল যে প্রাচীনতম চীনা ধর্ম্মে আর প্রাচীনতম ভারতীয় ধর্ম্মে প্রভেদ বড় অল্প। এতদিন যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে লেখকগণ প্রাচীন চীনকে অন্যান্য সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের জীবনধারা যেন খানিকটা সৃষ্টিছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর কন্‌ফিউশিয়াস সেই জীবনধারার সাক্ষ্যস্বরূপ যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকেও এই গ্রন্থকারেরা চীনাদের অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জাইল্‌সের গ্রন্থেও এই মতই দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তিনি প্রাচীন চীনা ধর্ম্মের যে বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেখিতেছি যে প্রাচীন বৈদিক ও পারসীক অর্থাৎ ইণ্ডু-ইরাণীয় সাহিত্যে বিবৃত ধর্ম্মজীবন অনেকাংশে প্রাচীন চীনা ধর্ম্মজীবনেরই অনুরূপ। নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে প্রাচীন চীনাদিগকে ইণ্ডু-ইরাণীয় “আর্য্যগণের” সামিল করা যায় না। কিন্তু দেখিতেছি, চিত্ত-তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মচিন্তা ইত্যাদির হিসাবে এই তথাকথিত আর্য্য এবং তথাকথিত মঙ্গোলিয়া জাতিদ্বয় একগোত্রের অন্তর্গত। কন্‌ফিউসিয়স-সম্পাদিত শী-কিঙ (Shi-King বা Book of Odes) অর্থাৎ “প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে” যে সকল অনুষ্ঠান বিবৃত আছে

সে গুলির জুড়ি ভারতীয় বেদব্যাস সঙ্কলিত বৈদিক গ্রন্থে এবং পারসীক জারাথুষ্ট্রা সঙ্কলিত অবেস্তা-গ্রন্থে অনেক পাই। কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ ও লক্ষ্য করা যায় সত্য—কিন্তু মোটের উপর আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, জীবন যাত্রা প্রণালীর বিচার করিলে প্রাচীনতম এশিয়ার হিন্দু, পারসীক ও চীনাজাতিত্রয় এক বংশেরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। এশিয়াবাসীর চিত্ত এই তিন সমাজে অনেকটা একই প্রণালীতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

কুলিঙ্ এক বিরাট চীনা-বিশ্বকোষ রচনায় নিযুক্ত আছেন। ইনি বলিলেন—"চীনের সঙ্গে পারস্য অথবা ভারতবর্ষের তুলনা করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই বলিলেই চলে। ফরাসী পণ্ডিত লা কুপারি (La Couperie) প্রণীত গ্রন্থে চীনের উপর পারস্যের প্রাচীনতর বাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার পুস্তকের নাম Western Origin of Chinese Civilisation। আজকাল কেহ কেহ সেই বাবিলনের সঙ্গে প্রাচীন চীনের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পারস্যের আর্য্যজাতি বা ইরাণবংশীয়দিগের সঙ্গে চীনাদের সংশ্রব আগে আলোচিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বোধ হয় কোন চীনতত্ত্বজ্ঞই আলোচনা করেন নাই। একমাত্র বৌদ্ধ ভারতের কথা চীনতত্ত্বজ্ঞেরা জানেন। বৈদিক ভারত অর্থাৎ ভারতে আর্য্যোপনিবেশের যুগ কোন সিনলগের (চীনতত্ত্বজ্ঞের) চিন্তায় স্থান পায় নাই।"

আমি বলিলাম—"কোন কোন পণ্ডিতের মতে আমাদের ভারতীয় দ্রাবিড় জাতি পারস্যের প্রাচীনতম সুমেরীয় (বাবিলনীয় ও আসিরীয়) জাতির জ্ঞাতি বা কুটুম্ব। সুতরাং লা কুপারির মত যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে প্রাচীন চীনের সভ্যতায় দ্রাবিড়

উপকরণ আছে। অধিকন্তু আমি বলিতে চাহি যে পরবর্ত্তী কালে বিকাশপ্রাপ্ত তথাকথিত "আর্য্য" সভ্যতার অঙ্গপ্রতঙ্গও চীনা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন চীনের জীবন বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ দ্রাবিড় ভারত ও দ্রাবিড় (সুমেরীয়) পারস্যের তথ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, এবং দ্বিতীয়তঃ আর্য্য ভারত ও আর্য্য পারস্য অর্থাৎ ইণ্ডইরাণীয় জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। চীনকে নিতান্ত খাপছাড়া এবং অন্যান্য জাতি হইতে পুরাপুরি সম্বন্ধহীন বিবেচনা করা চলিতে পারে না।"

কুলিঙ্ বলিলেন—"চীনের সঙ্গে অন্যান্য জাতিপুঞ্জের সংশ্রব সম্বন্ধে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ঐতিহাসিকগণ চীনকে একঘরে করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।" আমি বলিলাম "কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্থ তাঁহার ছাত্রগণকে এইকথা বার বার বলিয়া থাকেন। আমি তাঁহার মুখেও কয়েকবার এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার Ancient History of China গ্রন্থের স্থানে স্থানে নিজ মতের বিপরীত কথা ইঙ্গিত না করিয়া পারেন নাই। ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য—কিন্তু চীনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের আদান প্রদান বিষয়ে বহু অনুমান এবং আন্দাজ যুক্তিহীন বিবেচিত হইবে না।"

কুলিঙ্ বলিলেন—"বৌদ্ধ ভারতের পূর্ব্বেকার ভারতীয় জীবনে আর প্রাচীনতম প্রাক্ কনফিউশিয় চীনা জীবনে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিতেছেন। এই বিষয়ে আপনি আমাদের সোসাইটিতে একটা গল্প করিতে প্রস্তুত আছেন কি? হয়ত এবিষয়ে অনেকে ক্রমশঃ দৃষ্টি দিতে পারেন।" আমি বলিলাম—"বৈদিক ভারত সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না আর চীনতত্ত্বে সবে হাতে খড়ি হইতেছে।

কাজেই আমার পক্ষে এই কার্য্য সহজ নয়। কেবল অনুমানের জোরে একটা বক্তৃতা করিতে দাড়ানো বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।"

তারপর বৌদ্ধ ভারত এবং বৌদ্ধ চীন ও জাপানের কথা উঠিল। আমি বলিলাম—"আপনারা চীনে ও জাপানে যাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছেন, বর্ত্তমান ভারতে তাহাই হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নামে চলিতেছে। জাপানের নগরে, পল্লীতে, মন্দিরে ও কুটিরে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি এবং যে সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠান রীতিনীতি, পূজা পদ্ধতি দেখিয়াছি, এবং চীনের নানা স্থানেও যে সমুদয় ধারণা, চিন্তা ও "কুসংস্কারে"র পরিচয় পাইতেছি সেগুলিকে লোকেরা বৌদ্ধ বলে কেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। চীনা ও জাপানীরা যদি বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইবার অধিকারী হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রত্যেক লোকই বৌদ্ধ। অথচ আমাদিগকে কেহই বৌদ্ধ বলিয়া জানে না। সকলেই বিবেচনা করে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে বলিতে বাধ্য যে জাপানী ও চীনা বৌদ্ধেরা ভারতবাসীর মতনই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব বা শাক্ত বা শৈব অর্থাৎ হিন্দু, অথবা ভারতীয় শৈব, বৈষ্ণব শাক্ত, সৌর ইত্যাদি জনগণ বৌদ্ধ। ভারতীয় কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তারা, কালী, ইত্যাদির ভাই ও বোন সকল চীনে ও জাপানে বৌদ্ধ দেবদেবী নামে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। দেখিয়া ভাবিতেছি বর্ত্তমান এশিয়ায় ২০কোটি ভারতবাসী, (মুসলমান বাদে) ৪০কোটি চীনা এবং ৭কোটি জাপানী সকলেই হিন্দু।"

এই সঙ্গে বলা আবশ্যক হইল যে "হিন্দু" শব্দটা বড় গোলমেলে। কোন ভারতীয় ভাষায় এই শব্দের স্থান নাই—কোন সংস্কৃত গ্রন্থে

বোধ হয় এই শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাইবে না। অথচ ভারতবাসীর ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দ জাতি (race) বাচক —ধর্ম্ম বাচক নয়। ভারতবর্ষের যে কোনো লোককে বিদেশীয়েরা হিন্দু বলিত। ঘটনাচক্রে এক্ষণে ইহা একটা ধর্ম্মের নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনই কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে আসে না, আসেও নাই। কোন এক প্রচারক অথবা কোন এক দেবতার নামে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই। যদি নিতান্তই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে ইহারা বলিবে —"আমাদের ধর্ম্মের নাম "সনাতন ধর্ম্ম"। কুলিঙ্‌সাহেবকে বলিলাম —"আমি এই হিসাবে চীনা ও জাপানী বৌদ্ধ এবং ভারতীয় হিন্দু-গণকে হিন্দু বলিতেছি—অর্থাৎ এই ৬০।৭০ কোটি নরনারী সকলেই সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করে। বস্তুতঃ চীনাদের ধর্ম্মের নাম "তাও" ধর্ম্ম এবং জাপানীদের ধর্ম্মের নাম "শিস্তো" ধর্ম্ম। এই দুই পারিভাষিক শব্দের যে অর্থ আমাদের "সনাতন ধর্ম্ম" শব্দেরও সেই অর্থ। "পন্থা," "মার্গ," "মিচি" (জাপানী) "তো" (চীনা ও জাপানী) 'তাও' ইত্যাদি শব্দে যে অর্থ বুঝা যায় চীনা জাপানী ও ভারতবাসী সেই অর্থে তাহাদের ধর্ম্মের নাম ব্যবহার করে। ইহারা সকলেই সনাতন পথের পথিক, যে পথে প্রকৃতি চলিতেছে যে পথে বিশ্ব ঘুরিতেছে যে পথে আবহমানকাল ধরিয়া সংসারের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে সেই পথের নিয়মগুলি আলোচনা করাই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, তাও-দর্শী চীনা এবং শিস্তো-মার্গী জাপানী ধর্ম্ম চর্চ্চা বিবেচনা করিয়া থাকে। বৈদিক যুগের যাগ-যজ্ঞ হইতে বর্ত্তমান চীন জাপান ভারতের ষষ্ঠীমঙ্গলচণ্ডী পূজা পর্য্যন্ত সবই সেই "তাও" বা সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত।

(৪) এশিয়াবাসীর চিত্ত

কুলিঙ্ কয়েক দিন বার বার বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্য একটা প্রবন্ধ পাঠ করুন।" মহা বিপদে পড়া গেল। দুনিয়ার সকল রাজ্যে বক্তৃতার হুজুগ এড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত চীনে আসিয়া ধরা পড়িলাম! অগত্যা রাজি হইতে হইল। প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া দেখি আধ ঘণ্টা ছাড়া দশ আধ ঘণ্টায়ও বক্তব্য শেষ হইবার নয়। আধঘণ্টার জন্য লিখিত গল্প ছোটখাটো একখানা গ্রন্থে পরিণত হইতে চলিল।

মাত্র এক অধ্যায়ের কিয়দংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভায় পাঠ করা গেল। কেবল মাত্র ইংরেজরা উপস্থিত, অন্তজাতীয় লোক দেখা গেল না। বলা বাহুল্য গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হইয়া গিয়াছে। তাহার সারাংশ ডায়েরিতে দিবার প্রয়োজন নাই। তবে এশিয়াবাসীর চিত্ত সম্বন্ধে আমার "হাইপথেসিস" বা অনুমান লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বৌদ্ধ প্রভাবে এশিয়ায় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছি একথা সুবিদিত। আমি বলিতে চাহি যে এশিয়ার ঐক্য আরও গভীর এবং আরও দীর্ঘকাল-ব্যাপী। জাপানের সমগ্র সভ্যতা চীন হইতে গৃহীত বলিলেই চলে। সুতরাং জাপানের বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক, চীনা জীবনে এবং ভারতীয় জীবনে ঐক্য বন্ধনের সূত্র চারি প্রকার (১) দ্রাবিড় (২) আর্য্য (৩) বৌদ্ধ (৪) তান্ত্রিক। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক উপকরণের আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। দ্রাবিড় ও আর্য্য উপকরণের লেনদেন এখনও সুস্পষ্ট নয়। অধিকন্তু শারীরিক গঠন, রক্তসংমিশ্রণ ভাষা প্রয়োগ ইত্যাদির প্রমাণে চীন ও হিন্দুস্থানের সাদৃশ্য বা সংযোগ

আদৌ নির্দ্ধারিত করা চলে না। যে শাস্ত্রে আকৃতি বিষয়ক ঐক্য সাদৃশ্য বা সামীপ্য আলোচনা করা হয় তাহাকে শারীরিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology বা Somatology) বলে। কিন্তু নৃতত্ত্বের আর এক বিভাগ আছে তাহার নাম Cultural বা সভ্যতা-তত্ত্ব। মানুষের মানসিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ইত্যাদি সকল প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, লেনদেন, রীতিনীতি আলোচনা করা এই বিভাগের কার্য্য। প্রাচীন চীনে এবং প্রাচীন ভারতে প্রচলিত পূজাপাঠ, সংস্কার বা কুসংস্কার, প্রকৃতি সমালোচনা, পিতৃ-যজ্ঞানুষ্ঠান, ইত্যাদি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে সভ্যতা-তত্ত্বের হিসাবে এই দুই জনপদের মানব জীবন এক। সুতরাং ঐতিহাসিক বা প্রত্ন-তাত্ত্বিক এবং শারীরিক নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণাভাব সত্ত্বেও প্রাচীনতম চীনে ও ভারতে মানসিক বা সভ্যতা বিষয়ক ঐক্য অনুমান করা চলিতে পারে।

এই চিত্তগত (মানসিক, নৈতিক) ঐক্য প্রাচীনকালে এত বেশী ছিল যে, পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা যদি চীনে ও ভারতে আদান প্রদান সাধিত নাও হইত, তথাপি প্রায় একই কালে মহাযান (বা তথাকথিত বৌদ্ধ) ধর্ম্মের অনুরূপ ধর্ম্মপ্রণালী উভয় সমাজে দেখা দিতে পারিত। চীনারা এবং ভারত সন্তান একপ্রকার চিত্ত লইয়া জগতে আসিয়াছিল তাহারা একই আদর্শে দুনিয়ায় দৃষ্টিপাত করিত, বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে বুঝা পড়া করিবার জন্য উভয়ে একই প্রণালী অবলম্বন করিত। কাজেই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফলে উভয় সমাজেই অবতার বাদ, দেবদেবীর আরাধনা, মূর্ত্তি পূজা, শক্তিপূজা আপনা আপনিই দেখা দিত। ঘটনাচক্রে এশিয়ার চিন্তাধারা এক ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক বা দেবতার নামে পরিচালিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি বা দেবতার নাম বুদ্ধ। আজ কাল ভারতবর্ষে বুদ্ধের নাম

সুপ্রচলিত নাই, চীনে এবং চীনের পরিশিষ্ঠ স্বরূপ জাপানে বুদ্ধের নাম অতি সাধারণ। তথাপি ভারতে এবং চীনে ও জাপানে সংস্কারগত, রীতিনীতিগত অর্থাৎ চিত্তগত ঐক্য ও সাদৃশ্য পুরাপুরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নামে হিন্দু এবং চীনা (ও জাপানী) নরনারী একই দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতত্ত্ব, আচারতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া আসিতেছে।

Chinese Religion Through Hindu Eyes: A Study in the Tendencies of Asiatic Mentalityর কয়েকটা প্রবন্ধ শাংহাইয়ের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে ছাপা হইয়া গেলে একদিন একজন পাদ্রী আসিয়া হোটেলে দেখা করিলেন। তিনি বলিলেন—"মহাশয় আমি এখানকার International Institute (ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট) এর পরিচালক। প্রায় ৪০ বৎসর হইতে চীনে আছি। আমি আমেরিকান্। চীনাদিগকে নানাভাবে নব্য বিস্তায় এবং আধুনিক চিন্তাপ্রণালীতে দীক্ষিত করিবার জন্ম আমি আজীবন চেষ্টা করিতেছি। সম্প্রতি কয়েকবৎসর হইল ইয়াঙ্কি ও চীনা বন্ধুগণের অর্থ এবং অন্যান্য সকল জাতির আনুকূল্যে এই ইনষ্টিটিউট খাড়া করিতে পারিয়াছি। কোন ধর্ম্ম বিশেষের নিন্দা করা আমার প্রতিষ্ঠানে চলিতে পারে না। অধিকন্তু কোন রাষ্ট্র-বিশেষের বিপক্ষে কোন প্রকার মত প্রচার করাও এই ইনষ্টিটিউটে নিষিদ্ধ। আমি স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রী—কিন্তু দুনিয়ার সকল ধর্ম্ম আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। আমেরিকার ইউনিটেরিয়ল সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতহিতৈষী। আপনি বোধ হয় Cuthbert Hall, Sunderland, Wendle ইত্যাদি পাদ্রীগণের নাম শুনিয়াছেন। ইহাঁরা ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার সময়ে শাংহাইয়ে ভারতবর্ষের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিচালকের নাম গিল্‌বার্ট রীড (Reid)। রীড্‌ সাহেব শেষ পর্য্যন্ত কাজের কথা পাড়িলেন। আমি বলিলাম—"মহাশয়, আমার দ্বারা বক্তৃতা করা হইবে না।" ইনি বলি-লেন—"আমরা বক্তৃতা চাহিও না। আমার ইন্‌ষ্টিটিউটে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজী জানা লোক বিরল। সুতরাং বক্তৃতা করিলে কেহই বুঝিবে না। আপনি যে ধরণের প্রবন্ধ শাংহাইয়ের 'ন্যাশন্যাল রিভিউ' কাগজে ছাপিতেছেন, অবিকল তাহা ইন্‌ষ্টিটিউটে পাঠ করিলেও আমাদের শ্রোতৃমণ্ডলীর উপকার হইবে না। আমি ঠিক যেন কলেজের একটা ক্লাস চালাইয়া থাকি। গল্প, প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ইত্যাদি একসঙ্গে চলিতে থাকে। আমি চীনাভাষায় এই সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছি। যে উপায়ে চীনা-সমাজে নূতন নূতন দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার ইচ্ছা বাড়িতে পারে, আমি সেই উপায় অবলম্বন করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কি আপনি আমাকে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে বলিতেছেন? তাহা আমার দ্বারা অসম্ভব। আমি নিজের জন্য যাহা কিছু লিখিয়া যাইতেছি, তাহা হইতে আপনার কার্য্যোপযোগী কিছু পাইলে বাছিয়া লইতে পারেন।" শেষ পর্য্যন্ত ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে কয়েক দিন বক্তৃতা বা আলোচনা করিতে হইল। একদিন উটিংফাঙ আর একদিন তাঙশাওই সভাপতি হইয়াছিলেন। ইংরেজীতে আমি দুই মিনিট তিন মিনিট কথা বলিয়া গেলে রীড্‌ সাহেব তাহার চীনা অনুবাদ প্রচার করিতেন। এই এক অভিনব অভিজ্ঞতা। সভায় কোন কোন দিন দুই এক জন পার্শী ও পাঞ্জাবী উপস্থিত হইতেন।

রীড্‌ সপরিবারে ইন্‌ষ্টিটিউটে বাস করেন। বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইবে। স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা সকলেই অমায়িক। ভারতবাসী শাংহাইয়ে

পদার্পণ করিলে একবার ইনষ্টিটিউটে আসিতে পারেন। এখানে সহৃদয় বন্ধু পাওয়া যাইবে। বিদেশে বন্ধুলাভ সৌভাগ্যের কথা।

বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ ক্রমশঃ চীনা প্রতিষ্ঠান হইতে আসিতে সুরু করিল। ভাবিলাম, এইবার চীন পরিত্যাগ করিতে হইবে দেখিতেছি। শাংহাইয়ের "ফু-তান" কলেজের অধ্যক্ষ লী আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ইঁহার কলেজ শাংহাইয়ের চীনা-মহলে এবং চীনের সর্ব্বত্র নামজাদা। বিদেশফেরত যুবক কেহ কেহ এখানে অধ্যাপক। লী বলিলেন—"মহাশয়, ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চশ্রেণীতে বক্তৃতা করুন, অথবা অধ্যাপনায় নিযুক্ত হউন।" আমি বলিলাম—"মহাশয়, মাসুল খরচ করিয়া এতদূর আসিয়াছি কি গলাবাজি করিতে? আমার পরে অনেক ভারতসন্তান চীনে আসিবেন, জানিয়া রাখুন। চীনের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা না করিলে ভারতবাসীর চলিবে না। বহুসংখ্যক উচ্চ-শিক্ষিত লোক ভারতবর্ষ হইতে চীনে আসিয়া ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত কাটাইয়া যাইবেন। সেই সময়ে চীনেও ভারত-তত্ত্ব বেশ প্রচারিত হইতে থাকিবে। আমি কয়েক দিনের জন্য মাত্র আসিয়াছি। এই দিন কয়টা যদি বক্তৃতার ধাক্কায় কাটাইতে হয়, তাহা হইলে চীন-পর্য্যটনের খরচ উঠিবে কি?" লম্বাচৌড়া বোলচাল শুনিয়া লী মহাশয় কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

পিকিঙের বিখ্যাত "চিঙ হুয়া" কলেজের অধ্যক্ষ চুর-মহাশয় এক পত্র লিখিলেন যে, পিকিঙে যাইয়া ভারতীয় সভ্যতার আলোচনা করিতে হইবে। এই কলেজ আমেরিকার টাকায় পরিচালিত হয়। চীন হইতে যে সকল ছাত্রকে প্রতিবৎসর আমেরিকায় পাঠানো হইয়া থাকে, তাহাদের নিম্ন ও মধ্য শিক্ষা এই কলেজে সম্পন্ন করা হয়। ইহাকে "ছাত্র-বাছাই" কলেজ বলা চলিতে পারে। "বক্সার" বিপ্লবের ক্ষতিপূরণস্বরূপ

চীনারা জাপানী, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ ও ইয়াঙ্কি জাতিকে প্রচুর অর্থ দান করিতে বাধ্য হয়। ইয়াঙ্কিরা সেই টাকা পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই, চীনের উন্নতিকল্পে খরচ করিবার জন্য চীন সরকারকে টাকার কিয়দংশ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই টাকাকে Indemnity money বা ক্ষতি-পূরণের টাকা বলা হয়। সেই অর্থের কিয়দংশ চিঙ-হুয়া কলেজের জন্য খরচ করা হইয়া থাকে, কিয়দংশ আমেরিকায় চীনা ছাত্রের উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য খরচ করা হয় ইত্যাদি। চুর মহাশয়কেও লী মহাশয়ের মতন পত্রপাঠ বিদায় করিলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা গেল। যাহা হউক, চীনারা ভারততত্ত্ব বুঝিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যাইতে পারিলাম।

অন্যান্য ভারতবাসীর ত কথাই নাই—রবিবাবুর নামও চীনা সংবাদ বা মাসিকপত্রে প্রচারিত হয় নাই। ইয়াঙ্কিস্থানে লেখাপড়া শিখিবার সময়ে চীনা ছাত্র-ছাত্রীর কেহ কেহ রবিবাবুর সংস্পর্শে আসিয়াছিল। কিন্তু কোন চীনা-কাগজে ভারতীয় কোনো ব্যক্তির নাম ছাপা হয় নাই। ক্রমশঃ হইতে থাকিবে। প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক কারখানাবিষয়ক সংবাদ এক চীনা ইংরেজী মাসিকে সাদরে গৃহীত হইল। ইহাই বোধ হয় ভারত-বর্ষ সম্বন্ধীয় প্রথম তথ্য। অধিকন্তু রবিবাবুর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর নাম এক-খানা চীনা মাসিকে প্রকাশিত হইয়া গেল। শাংহাই, নান্‌-কিঙ বা পিকিঙ নগরের কোন কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক কর্ম্ম গ্রহণ করিলে অতি সহজে ভারত তত্ত্ব চীনে আলোচিত হইতে পারিবে, ভারতেও চীনতত্ত্ব স্থায়িভাবে দাঁড়াইয়া যাইবে।

(৫) চীনা ও জাপানী সমাজের আব্‌হাওয়া

জাপানে প্রথম সাতদিনের মধ্যেই যতগুলি জাপানী "আটপৌরে" শব্দ দখল করিতে পারিয়াছিলাম, চীনে আট মাস থাকিয়াও তাহার অষ্টমাংশ

চীনা শব্দ আয়ত্ত হইল না! সত্য কথা, এখন পর্য্যন্ত একটিও চীনা শব্দ জানি না। এমন কি, জল বা ভাত ইত্যাদির প্রতিশব্দও রপ্ত হয় নাই। বড়ই বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণও নাই।

ভারতবর্ষে কত সহস্র ইংরেজ দেড়শ' দুশ' বৎসর ধরিয়া যাওয়া আসা করিতেছেন—কত শত ইংরেজ পণ্ডিত বসবাস করিতেছেন। বহু ইংরেজ আজীবন ভারতবর্ষেই দিন কাটাইতেছেন। তথাপি ভারতবর্ষের আব্-হাওয়া হইতে ইংরেজ ব্যক্তি বা পরিবার ও সমাজের উপর কোন প্রভাব পড়িয়াছে কি?

মৃতপ্রায় বা মড়া জাতির আব্হাওয়া হইতে দুনিয়ায় কোন প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে না, পড়িতে পারে না। অবনত জাতিকে লোকেরা স্বভাবতই কুকুর বিড়ালের মত দেখিয়া থাকে, এই সকল জাতির নরনারী গোটা মানুষ নয়, আধখানা মানুষ। কাজেই ইহাদের হাসিকান্না কিরূপ, ইহাদের নাচগান কিরূপ, ইহাদের লেনদেন কিরূপ, ইহাদের সৌজন্য-শিষ্টাচার কিরূপ, তাহা শীঘ্র শীঘ্র বিদেশীয়ের নজরে পড়ে না।

জাপানের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম, আর চীনাদিগকে প্রথম হইতেই কু-নজরে দেখিয়া আসিতেছি, একথা বলিতে পারি না। বরং পক্ষপাত যদি থাকে, তাহা চীনাদিগের দিকেই আছে। চীনা লোক-জনকে যতটা আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারি, তুলনায় জাপানীদিগকে ততটা আত্মীয় বিবেচনা করিতে পারি নাই। তথাপি চীন আমাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিল না। কিন্তু আজ যদি চীনারা ইয়াঙ্কি যুক্ত-রাষ্ট্রের সমান একটা শক্তিশালী অগ্রগামী জাতি হইত, তাহা হইলে চীনা হাঁচি, চীনা কাসি, চীনা বদমায়েসি হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা শিল্প, চীনা আদবকায়দা, "চীনা খৃষ্টধর্ম্ম," "চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম," চীনা শাসনপ্রণালী পর্য্যন্ত সবই দুনিয়ার অলিতে গলিতে প্রসিদ্ধ হইত। তখন তিনদিন মাত্র

পিকিঙে বাস করিতে না করিতেই খাঁটি চীনা হইয়া পড়িতাম। বিলাতে পদার্পণ করিতে না করিতেই ভারত-সন্তানের গলার আওয়াজ ইংরেজের অনুরূপ হইয়া পড়ে না কি? ইয়াঙ্কিস্থানের নিউইয়র্ক বন্দরে জাহাজ লাগিবার পূর্ব্বেই নাকি-সুরে আমরা কথা বলিতে অভ্যস্ত হই না কি? বিজিত জাতির আব্‌হাওয়া এবং বিজেতা জাতির আব্‌হাওয়া দুই ভিন্ন পদার্থ। এই প্রভেদ না বুঝিয়া মানবচরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে।

বিগত নবেম্বর মাসে (১৯১৫) একদিন দেখি, বাঁধের উপরকার বড় বড় ব্যাঙ্ক, হোটেল ও আফিসগুলি সাজাইবার ধূম পড়িয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় যুদ্ধে ইংরেজপক্ষীয়গণের একটা বড় রকম জয়লাভ হইয়া থাকিবে। তার পরদিন দেখিলাম, শাংহাইয়ের জাপানীরা মহা-উল্লাসে চলাফেরা করিতেছে। সকলের বেশভূষা অতি জমকালো। কাগজে পত্রে দেখা গেল, আজ নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কিয়োতো নগরে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই অভিষেক-যজ্ঞ দেখিয়া পাশ্চাত্যেরা কিছু থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, জাপান আজকাল সকল বিষয়ে ইয়োরামেরিকার অনুকরণ করিতেছে—"করনেশন"-কাণ্ডও পাশ্চাত্য রীতিতেই অনুষ্ঠিত হইবে। অথচ অভিষেক-ভূমির প্রথম খুঁটিগাড়া হইতে আমীরওমরাও-গণের চপ্‌ষ্টিকের সাহায্যে বিদায়-ভোজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য খাঁটি প্রাচ্য-রীতিতে সম্পন্ন করা হইল।

জাপানী অভিষেকপ্রথা অন্যান্য দেশীয় মুকুট-গ্রহণ হইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ জাপানী অভিষেককে করনেশন বা মুকুটধারণ উৎসব বলা উচিত নয়। সম্রাট্ কোন শুভদিনে তাঁহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে জানাইয়া দেন যে, তিনি তাঁহাদের পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক রাষ্ট্রকর্ম্মে দীক্ষিত

হইতেছেন। এইরূপ জানান বা পরলোকে সংবাদপ্রেরণের নাম জাপানী অভিষেক। বর্ত্তমান অভিষেকও মান্ধাতার আমলের এই নিয়মানুসারে পরিচালিত হইল।

জাপানী অভিষেক-যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে চাউল ব্যবহারের বিধি আছে। এই চাউল অতি পবিত্র—নাম "ধর্ম্ম-তণ্ডুল" দিতে পারি। যে সে জমি হইতে যে-সে প্রণালীতে উৎপন্ন চাউলের দ্বারা 'ধর্ম্ম-তণ্ডুলের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। শুনিলাম, প্রথমতঃ জাপানের দুইটা জেলা এই চাউল উৎপন্ন করিবার জন্য মহাসমারোহের সহিত উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেই দুই ধর্ম্মজেলার মধ্যে স্থানে স্থানে খানিকটা জমিও যথারীতি উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছিল। এই সকল "ধর্ম্মক্ষেত্রে"র উপরে মন্দিরজাতীয় ধর্ম্মগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সকল কৃষক এই ধর্ম্মক্ষেত্র চষিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমাদের চড়ক, গাজন, গম্ভীরা এবং অন্যান্য উৎসবের "সঙ্কল্প"কারী "ভক্ত" বা "সন্ন্যাসীর" মতন দীক্ষিত করানো হইয়াছিল। ভূমিতে যে সার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও যে-সে সার নয়। উহা একপ্রকার "নৈবেদ্যের" অঙ্গবিশেষ। তাহার পর ধান্যরোপণ—সেও এক বিরাট্ "বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা"র অভিনয়। তাহাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে চর্ব্ব্যচোষ্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জাপানী নৃত্যগীতবাদ্যেরও যথোচিত আয়োজন ছিল। চাষীরা আবাদের সময়ে এবং "ধান্য-কর্ত্তনে"র সময়ে ধর্ম্মস্নান দ্বারা চিত্তকলেবর পবিত্র করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে ধর্ম্মভূমিতে পদার্পণ করিত। এমন কি, খন্তা, কোদাল, খুরপি, ধামা, বস্তা, চট, বাসনকোসন. সবই পবিত্র উৎসবের নিয়মানুসারে যথাবিধি "শোধন" করিয়া লইতে ভুল হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের জন্য বসিয়া না থাকিলেও "ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার" হওয়া যায়।

(৬) চীন ও ভারত-সন্তান

চীন সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ। ভারতসমাজে চীনের কোন কথাই প্রচারিত নয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বোধ হয়, নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য ছাড়া ভারতবাসী চীনের আর কিছু জানেন না।

প্রথমতঃ আমরা জানি যে, চীন একটা দেশের নাম—কোন লোকের নাম নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই দেশে ইয়াংসিকিয়াঙ্ নামে একটা নদী আছে। এই দেশের কোন পাহাড়ের নাম আমরা জানি কি না, বলিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, পিকিঙ এই দেশের রাজধানী অথবা একটা বড় সহর। কিন্তু মানচিত্রে দেখাইতে হইলে বোধ হয়, ক্যান্টন বন্দরের নিকট হইতে অঙ্গুলি সরাইতে আরম্ভ করিব।

এখনই একটা কথা উঠিবে যে, ছাত্রবৃত্তি অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বালকেরা চীনের ভূগোল শিখিয়া থাকে। তাহারা চীনসম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানে। অন্ততঃ "টংটিঙ, পয়াঙ্ চীনদেশে" ইহা ত সকলেরই জানা। বক্তব্য এই যে, পরীক্ষা দিবার কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মানুষের যতখানি বিদ্যা থাকে, তাহার দুই বৎসর পরে ততখানি বিদ্যা থাকে না। অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি কিম্বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আমরা যতটা ভূগোল-শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া থাকি, বি-এ, বি-এস্-সি ক্লাসে উঠিতে উঠিতে তাহার দশমাংশও মনে রাখি না। কাজেই যখন প্রবীণ লেখক, জননায়ক অথবা মোড়ল দাঁড়াইয়া যাই, তখন চীনদেশের হ্রদ অথবা পেচিলি উপসাগরের নাম স্মরণে থাকে না।

চতুর্থতঃ, একজন চীনা লোকের নাম জানি। এই নামটা বোধ হয় বহুকাল পর্য্যন্ত মনে থাকে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙের (অথবা

চুয়ান-চাঙ্‌) গল্প বাল্যকালেই একজন টিকিধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেয়। যদিও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনারা নিশ্চয়ই টিকি রাখিত না! চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের আমলে ফাহিয়ান ভারত পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় যে, আমাদের চিন্তায় ফাহিয়ান অপেক্ষা হুয়েন্‌সাঙের কথা বেশী স্থান পাইয়া থাকে।

চীনা ভূগোল ও ইতিহাসের বিদ্যা আমাদের এই পর্য্যন্ত। শেষে একদিন ১৯১১ সালে হঠাৎ এক চীনা নাম দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। আজকালকার সংবাদপত্রের যুগে সেই নাম ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতারও কর্ণগোচর হইয়াছে। সুন্‌-ইয়াং-সেনের কথা বলিতেছি। বোধ হয়, য়ুয়ান শী-কাইয়ের নাম আমাদের বেশী লোক জানে না।

যাহা হউক, হুয়েন্‌-সাঙের পর আমরা সুন্‌কে পাইয়াছি। মাঝে মাঝে কল্পনার আশ্রয় লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, "চীনকে কন্‌ফিউ-শিয়াসের দেশ বলিয়া কয়জন ভারতবাসীর জানা আছে? দুনিয়ার লোকেরা কিন্তু চীনকে কন্‌ফিউশিয়াসের দেশ বলিয়াই জানে।" ভাবিতে ভাবিতে স্থির করা গেল যে, কন্‌ফিউশিয়ান নামটা ভারত-সমাজে সুবিদিত নয়। অনেকে অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন—কিন্তু ইহা কি বস্তু, পাহাড়ের নাম, না দেবতার নাম, সে সম্বন্ধে ধারণা বোধ হয় অস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের গ্রাজুয়েটগণকে লইয়া বর ঠকানো প্রশ্ন সুরু করিলে রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। ইয়োরামেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গণকে এই ধরণের বর ঠকানো প্রশ্ন করা হয়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা ফেল মারেন।

আমরা মহম্মদ সম্বন্ধে যতই অজ্ঞ থাকি না, প্রয়োজন হইলে অন্ততঃ একটা পূর্ণ বাক্য রচনা করিতে পারি। যথা—"মহম্মদ * * * করিয়াছিলেন"। সেইরূপ "যীশুখৃষ্ট * * * করিয়াছিলেন।"

কিন্তু "করিয়াছিলেন" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক কন্‌ফিউশিয়াস সম্বন্ধে একটা গোটা 'সেণ্টেন্স' রচনা করিতে আমরা কয়জনে পারি? কাজেই "কন্‌ফিউশিয়াস কে, অথবা কি?" এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিব, "কন্‌ফিউশিয়াস কন্‌ফিউশিয়াস!"

এরূপ অজ্ঞতা লজ্জাজনক আদৌ নয়। সে দিন রীড্ সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন—"মহাশয়, আপনার দেশ সম্বন্ধে আমি এতখানি মনে রাখিয়াছি যে, আপনি ব্রহ্ম-দেশের অধিবাসী নন।" বস্তুতঃ তিনি ইন্‌ষ্টিটিউটে আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ছাপিবার সময়ে আমাকে একবার বোম্বাইয়ের লোক, একবার মান্দ্রাজের লোক এবং একবার "বেঙ্গলের" লোক বলিয়া জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। আমেরিকার কোন কোন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিতেন—"মহাশয়, 'বেঙ্গলে'র রাজধানী কলিকাতা? না, কলিকাতার রাজধানী বেঙ্গল?" আর কয়েক দিন হইল, একজন ইংরেজ অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"মহাশয়, ভারতবর্ষের 'ঠাকুর' কি মধ্য যুগের লোক, না প্রাচীন যুগের লোক?" অধ্যাপক মহাশয় দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইনি "মিষ্টিক" নামে পরিচিত এবং চীনা মিষ্টিক সাহিত্যের সেরা গ্রন্থ 'তাও-তে বিঙ্' ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

ধরিয়া লইলাম যে, কন্‌ফিউশিয়াস শব্দটা ভারতবর্ষের কোন কোন মহলে কথঞ্চিৎ পরিচিত। অতএব চীনের তিনটা ভৌগোলিক নামে এবং তিনটা ঐতিহাসিক নামে ভারতবাসীর চীনা "বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ। আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, আজকাল আমাদের লোক-সাহিত্যে নিম্নলিখিত পদটা সুপ্রচলিত।

"সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

অর্থাৎ আমরা ছেঁড়া চটে শুইয়াও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিয়া থাকি যে,

আমরা চীনাদের গুরু—চীনারা আমাদের শিষ্য—ভারতবর্ষ চীনা বৌদ্ধগণের স্বর্গভূমি।

চীন সম্বন্ধে এই সাত দফা জ্ঞান মাত্র, আমাদের উচ্চশিক্ষিত মহলে অনেকের সম্বল। বিশেষজ্ঞগণের কথা বলিতেছি না। অথবা যাঁহারা ম্যাক্স্‌মুলার সম্পাদিত Sacred Books of the East গ্রন্থমালার হিন্দু ছাড়া অন্যান্য জাতীয় গ্রন্থ ঘাঁটিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। অথবা যাঁহারা তিব্বত, নেপাল এবং কাশ্মীর পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য অন্বেষণে আসিয়া হিমাচলের অপর পারের অবস্থাও কল্পনায় আনিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। এই সাত দফা জ্ঞান লইয়াই চীনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। চীনতত্ত্বের অ, আ, ক, খ, চীনেই সুরু করিয়াছি বলিতে বাধ্য।

ভারতবাসীর পক্ষে চীনা মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহলোদ্দীপক। বস্তুতঃ চীনে মুসলমান আছে, এই তথ্যটা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের জানা নাই বলিতে পারি। এই কারণে চীনাদের খাঁটি স্বদেশী কন্‌ফিউশিয়াস অথবা ধারকরা বুদ্ধাবতার বা "ফো" ভারত সন্তানের দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট করে না। সত্য বলিতে কি, চীনের বৌদ্ধসমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজকেই যেন বেশী আত্মীয় মনে হইতেছে। কন্‌ফিউশিয়াস নিতান্ত অজানা বস্তু, বুঝিতে সময় লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বুদ্ধ আমাদেরই আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও, শিষ্যের দেশে আসিয়া পরধর্ম্মী মুসলমানকে অধিকতর আপনার ভাবিতেছি কেন? বোম্বাইয়ে পার্শী এবং মুসলমান সহ যাত্রী জাহাজে ছিলাম—পার্শী অপেক্ষা মুসলমানকে অধিকতর নিজের বোধ হইয়াছিল। অথচ পার্শীরা ধর্ম্ম-হিসাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরই জ্ঞাতি ও কুটুম্ব। মুসলমান সহযাত্রীরা যখন মক্কায় যাইবার জন্য অর্দ্ধপথে নামিলেন, তখন কয়েকবার ইচ্ছা হইয়াছিল, মক্কা

দেখিয়া যাই। তাহার পর মিশরে যখন মুসলমানদিগকে দেখিলাম, তাহারা "হিন্দ্"বাসীকে পাইয়া যেন কোলাকুলি করিতে আসিল। আমিও তাহাদিগের সঙ্গে যেন নিজের সহরেই বাস করিতেছিলাম। কায়রো ছাড়িতে সত্য সত্যই কষ্ট হইয়াছিল। মিশরীয় মুসলমানরা ভারতীয় মুসলমানের কোন সংবাদই রাখে না—কিন্তু 'হিন্দী'কে পাইয়া তাহারা ঘরের ছেলেকে পাইয়াছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে পারসীক মুসলমানের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা। মুসলমানের নাম বিদেশে যেখানেই শুনিয়াছি, সেইখানেই ঘরোয়া লোকের কথা মনে পড়িয়াছে। অন্য কোন জাতি বা ধর্ম্মের নরনারীকে এইরূপ ভাবিতে পারা যায় নাই—ইহা সত্য কথা। জাপানে আসিয়া বৌদ্ধ দেখিলাম—বুঝিলাম, আমাদেরই কয়েক ঘর যজমানের সংস্পর্শে আসিয়াছি। চীনেও সেইরূপ শিষ্যবাড়ীতেই রহিয়াছি। কিন্তু এখানে মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র হৃদয়ের যে তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, শাক্যসিংহের উপাসক চীনা জাপানী বৌদ্ধগণকে দেখিয়া সে তন্ত্রী বাজিল না কেন?

চীনা মুসলমান আমার ধর্ম্ম কি, জানে না। কথোপকথনের পর বুঝিতে পারে যে, আমি মুসলমান নহি—কিন্তু মুসলমানের দেশ হইতে আসিয়াছি। মিশরীয় মুসলমানদিগের আদব-কায়দা ভারতীয় মুসলমানী রীতিনীতি হইতে যথেষ্ট পৃথক্। এমন কি, মিশরের মুসলমান হয় ত ভারতের মুসলমানকে স্বধর্ম্মী বলিয়া না চিনিতেও পারে। কিন্তু তাহারা একজন অ-মুসলমানকেও মুসলমানের দেশের লোক বলিয়া আত্মীয় বিবেচনা করে। এই ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধনে মুসলমানেরা এশিয়াকে সত্য সত্যই ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আর আমি পার্সীকেও ইচ্ছানুরূপ আত্মীয় ভাবিতে পারিলাম না—

এবং বৌদ্ধকেও যথেষ্ট আপনার ভাবিতে পারিতেছি না কেন? দুনিয়ার যে কোন লোককে আপনার করিয়া লইতে পারা যায়; অবশ্য সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চীনের, পারস্যের এবং মিশরের মুসলমানকে যেরূপ বিশেষ ভাবে আপনার ভাবিয়াছি, সেই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা কি? বোধ হয় এই যে, ভারতবর্ষ (অত বড় দেশটার চতুঃসীমা মনে থাকে না—কেবল বাঙ্গালা দেশটার কথাই বলি), অথবা বাঙ্গালা দেশ কেবল হিন্দুস্থান নহে, মুসলমান-স্থানও বটে। ইহা পার্শীস্থানও নহে এবং বৌদ্ধস্থানও নহে। ইতিহাসের নজির আনিলে "হিন্দু, পার্শী, জৈন, ইসাহি, শিখ, মুসলমান" সকলের স্থান—এই হিন্দুস্থান। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চিন্তায় ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান-স্থান। জন্মিয়া অবধি বাঙ্গালী হিন্দু ডাহিনে মুসলমান-বন্ধু এবং বামে মুসলমান-বন্ধুর সঙ্গে খেলা করে। আবার মুসলমান-শিশুও ডাহিনে হিন্দু-সখা এবং বামে হিন্দু-সখার সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর বাজারে, দোকানে, হাটে, গোচারণ-মাঠে, কৃষিক্ষেত্রে, পরবে মেলায়, ধর্ম্মকর্ম্মে, "উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে শ্মশানে" হিন্দুর সাহচর্য্য মুসলমান করে, মুসলমানের সাহচর্য্য হিন্দু করে। হিন্দুর রক্তের সঙ্গে মুসলমানের নিঃশ্বাস মিশিয়া আছে—মুসলমানের রক্তে হিন্দুর নিঃশ্বাস লক্ষিত হয়। এই সাহচর্য্য, সহবাস এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুশ্ছেদ্য। এই মায়া কাটাইয়া উঠা রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

বৌদ্ধেরা হিন্দু এবং হিন্দুরা বৌদ্ধ। পার্শীরা বৈদিক এবং বৈদিকেরা পার্শী। মাথা খাটাইয়া, দর্শনালোচনা করিয়া, ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য দেখাইয়া এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের আবিষ্কারে কি হৃদয়ের টান, মায়ার শৃঙ্খল সৃষ্টি করিতে পারে? চোখে না দেখিতে না দেখিতে অতি প্রিয়জনও অন্তরের বাহির হইয়া যায়—তাঁহার স্থান আর এক জন দখল করিয়া বসে, বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে মুসলমান

যে ভাবে বসিয়াছে, বৌদ্ধ সে ভাবে বসিবে কোথা হইতে? আবার এই জন্যই বঙ্গীয় মুসলমানও তাইগ্রিস বা নাইল নদের ধার অপেক্ষা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের ধারেই মরিতে চাহে।

(৭) "সিনলজি"র (চীনতত্ত্বের) এক পর্ব্ব

কয়েক বৎসর হইল, চীনা-মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ইংরেজীতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় বোধ হয় কোন রচনা নাই। ইংরেজীতে এই বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ দেখি নাই। পাদ্রী Broomhall প্রণীত Islam in China গ্রন্থে চীনা-মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত আছে। বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধেও তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চীনা-ভাষায় মুসলমানী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থই আছে। Johnston প্রণীত Buddhist China. Edkins প্রণীত Chinese Buddhism. Eital প্রণীত Chinese Buddhism. Hackmanu প্রণীত Buddhism as a Religion, এবং জাপানী Nanjio Bunyiu প্রণীত A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, the sacred Canon of the Buddhists in Ghina and Japan ভারতবর্ষে সুপরিচিত। চীনা ভারত-পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তও বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা আছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থমালার কয়েক খণ্ডে এই সকল বৃত্তান্তের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার কথা। বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক Lloyd প্রণীত The Creed of Half Japan

উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু জাপানী চিত্র-সমালোচক ওকাকুরা প্রণীত The Ideals of the East (নিবেদিতার ভূমিকাসহ) সকলের পড়া আছে। Beal প্রণীত Buddhist Literature in China বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানা বিরাট্ গ্রন্থ দুই বৎসর হইল অক্‌সফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্‌স্-ফোর্ডে থাকিবার সময়ে একদিনে ভিন্‌সেণ্টস্মিথের ভারতেতিহাসের তৃতীয় সংস্করণ এবং সেই গ্রন্থ বাহির হইতে দেখি। বোধ হয়, এত দিন উহা ভারতীয় পণ্ডিতমহলে সুপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য প্রায় ৫০৲। এই জন্য ভাবিতেছি যে, হয়ত এখনও অনেকে তাহা চোখে দেখেন নাই। গ্রন্থের নাম The Gods of Northern Buddhism. লেখক শ্রীযুক্তা A. Getty. এই পুস্তকের পাতা উল্টাইলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক (অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের) হিন্দুমাত্রই বুঝিবেন যে, তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্মে এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে এক চুলও প্রভেদ নাই। এই গ্রন্থে ফরাসী পণ্ডিত Demiker লিখিত ভূমিকার ইংরেজী অনুবাদ আছে। ইঁহারা কেহই চীনা জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের (অর্থাৎ ভারতীয় মহাযান ধর্ম্মের) সঙ্গে হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মের তুলনা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।

চীনে এবং জাপানে নিম্নলিখিত দেবতাগুলি বৌদ্ধ:—নাগ, গরুড়, কুবের, লোকপাল, মহাকাল, মারীচি, হারিতী, যম ইত্যাদি। জাপানীরা ব্রহ্মাকে "বোতেন" বলে, অগ্নিকে "খাতেন" বলে, ইন্দ্রকে "থাইসক" বলে, কুবেরকে "বিশমন" বলে, যমকে "এম্মা" বলে, গণেশকে "শোদেন" বলে, লক্ষ্মীকে "কিচিজোতেন" বলে, সরস্বতীকে "বেন্তেন" বলে, কার্ত্তিককে "তাইগেনসুই" বলে, কালীকে "কারিতীমো" বলে এবং বুড়া-শিব বা রুদ্রকে "কুদো" বলে। এই সমুদয় দেবদেবী জাপানে বৌদ্ধ।

চীনের খাস আবিষ্কার কন্‌ফিউশিয়াসের মতবাদ। তাহা প্রাচীনতম চীনাসাহিত্যে নিবদ্ধ। কন্‌ফিউশিয়াস সেই সাহিত্যের সঙ্কলনকর্ত্তা বা "ব্যাস"। কন্‌ফিউশিয়াসকে চীনা বেদব্যাস বলা চলিতে পারে। এই "চীনা বৈদিক" সাহিত্যকে ইংরেজীতে "চাইনীজ্ ক্লাসিক্স" বলা হয়। সেইগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া Legge প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। প্রকাশক Trubner & Co., London.। বলা বাহুল্য, প্রাচীনতম চীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে সেই গ্রন্থমালা দেখিতেই হইবে। এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত শী-কিঙ্ (She-King or Book of Poetry) পাঠ করিলে অনেক সরস কবিতার সংস্পর্শে আসিতে পারি। কন্‌ফিউশিয়াস প্রাচীন সাহিত্য সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মাত্র একখানা প্রাদেশিক ইতিহাস তাঁহার লিখিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। তবে তাঁহার কথোপকথন "উপদেশামৃত"রূপে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। সেইগুলিকেও ক্লাসিকের অন্তর্গত বিবেচনা করা হয়। পরবর্ত্তী কালে এই সমুদয়ের ব্যাখ্যা, টীকা, ভাষ্য ও সমালোচনাই কন্‌ফিউশিয়ান মতবাদের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণও নানাভাবে নানা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমাদের বৈদিক সাহিত্য যুগে যুগে যেরূপ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, চীনা ক্লাসিক সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ সেইরূপ। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান যুগে বৈদিক সাহিত্য-সম্বন্ধে যেরূপ নানা কথা বলিয়া থাকেন, চীনা কন্‌ফিউশিয় সাহিত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা মুনির নানা মত চলিতেছে।

চীনসন্তান এখনও তাঁহাদের স্বধর্ম্ম ও জাতীয় সাহিত্য বিদেশীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে ভাবে স্বদেশের অতীতকে বর্ত্তমান আলোচনা-প্রণালী অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে যত্ন

লইতেছেন, চীনে সেইরূপ কোন আয়োজন দেখিতেছি না। পিকিঙে থাকিতে শ্রীযুক্ত কু-হুঙ্-মিঙের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। একমাত্র তিনিই বোধ হয়, চীনা ধর্ম্ম ও সাহিত্য বর্ত্তমান জগতে ইংরেজি ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক ব্যাখ্যার মিল নাই। কিন্তু তিনি একাকী এবং তাঁহার রচনার পরিমাণ এত অল্প যে, খাঁটি স্বদেশী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা বাজারে সম্মানিত হইতে পারে না। কু-প্রণীত The Universal Order or Conduct of Life এবং Higher Education কন্‌ফিউশিয়ান "কথামৃতে"র দুইটি ক্ষুদ্র কণামাত্র।

চীনের আর একটা খাঁটি স্বদেশী বস্তু "তাও"-ধর্ম্ম (Taoism)। ইহার প্রবর্ত্তক লাওট্‌জে (Lao-tsze)। তিনি কন্‌ফিউশিয়াসের সমসাময়িক, বয়সে বড় ছিলেন। উভয়েই আমাদের শাক্যসিংহের প্রায় সমসাময়িক। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাও-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতভেদ অত্যধিক। এই ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থের নাম "তাও-তে-চিঙ্" (Tao-te-ching)। ইহার একাধিক ইংরেজী অনুবাদ আছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ চীনাদের "গীতা" স্বরূপ। আমার ধারণা এই যে, ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদাদি দার্শনিক সাহিত্যের যে স্থান, চীনা ক্লাসিকে তাও তে-চিঙের সেই স্থান। প্রাচীন চীনা-জীবন ও সাহিত্যের এক অংশ কন্‌ফিউশিয়াসের সঙ্কলনে নিবদ্ধ রহিয়াছে—অপর অংশ লাওট্‌জে-কথিত তাও-তে-চিঙ্ ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই দুই অংশের এক দিক্ দেখিলে প্রাচীন চীন বুঝা হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই দুই অংশকেও পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমি বলিতে চাহি যে, প্রাচীন বৈদিকেরা যেমন "ঋত"-পন্থী ছিলেন,

প্রাচীন চীনারা সকলেই সেইরূপ "তাও"-পন্থী। সেই তাও-ধর্ম্মের ইতিহাস, কাব্য, কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্কলনকর্তা ছিলেন কন্‌ফিউশিয়াস, এবং তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব. মেটাফিজিক্‌স্ বা মিষ্টিক অংশ লাওট্‌-জের নামে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কথা আমার চীনাধর্ম্ম-বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থের স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছি।

Parker প্রণীত Studies in Chinese Religion গ্রন্থে লাওট্‌জে, তাও-তে-চিঙ্ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কূটতর্কের সমালোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত Legge প্রণীত Religions of China এবং Giles প্রণীত Religions of Ancient China ও Confucianism and its Rival গ্রন্থদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

চিকাগোর The open Court পত্রিকার সম্পাদক Carus তাও-তে-চিঙের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহাকে চীনা অধ্যাত্মবাদের প্রচারক বলা যাইতে পারে। ম্যাক্‌স্‌মুলার সম্পাদিত art গ্রন্থমালার Text of Taoism (Legge অনূদিত) সহজেই অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। এই গ্রন্থমালায় Text of Confucianismও আছে, বলা বাহুল্য।

চীনা ধর্ম্মের আলোচনায় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক De Groot বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে। আমাদের অথর্ব্ববেদে যে সমুদয় ভূতুড়ে কাণ্ডের পরিচয় পাই, চীনাধর্ম্মে এবং সমাজেও সেই সমুদয়ের যথেষ্ট ছড়াছড়ি ছিল এবং আছে। চীনা সমাজের সেই দিক্ দেখিতে হইলে De Groot প্রণীত গ্রন্থাবলী ঘাঁটা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাঁহার Religion in China গ্রন্থ সুলিখিত। সহজে অনেক কথা বুঝান আছে। এই গ্রন্থের শিরোনামার বিশদ বিবরণ এই— **Universism: A Key to the Study of Taoism and Con-**

fucianism আমি Universism এর নাম দিয়াছি। The Cult of World Forces অর্থাৎ বিশ্বশক্তির আরাধনা। প্রাচীন চীনে এবং বৈদিক ভারতে এই সূত্রে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা ভারতবর্ষে যেমন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি দিকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারি করি, চীনারাও আবহমানকাল সেইরূপ করিয়া আসিতেছে। স্থানমাহাত্ম্য, কালমাহাত্ম্য, ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদি সবই চীনা সমাজের প্রাচীনতম কন্‌ফিউশিয়ান সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতায়", এবং ভোজের "যুক্তি-কল্পতরু" ইত্যাদি গ্রন্থে গৃহনির্ম্মাণ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপলক্ষে সেই সকল জ্যোতিষিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তাহাকে ইংরেজীতে Geomancy বলে। চীনা পারিভাষিক Fungshui (ফুঙ্=বায়ু, শুই=জল) অর্থাৎ সেই বিদ্যার নাম "জলবায়ু-বিদ্যা"। আমি ইহাকে আধুনিক Climatologyএর আদিম অবস্থা বিবেচনা করিতেছি। Groot এর পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে এই সকল সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য তাঁহার The Religious System of China: Its ancient forms, evolution, history, and present aspect, manners, customs and social institutions connected therewith গ্রন্থ চীনা ধর্ম্মের বিশ্বকোষস্বরূপ ঘাঁটা আবশ্যক। বিরাট গ্রন্থ—মূল্য প্রায় ৭০৲। এই সকল লৌকিক আচার ও ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য ফরাসী Dori প্রণীত Researches into Chinese Superstitionsও দেখা উচিত। ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি জাপানী পণ্ডিত Suzuki প্রণীত History of Chinese Philosophy প্রকাশিত হইয়াছে। চীনাধর্ম্মের প্রসঙ্গে এই দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থও দেখা যাইতে পারে। চীনা দর্শনসম্বন্ধে আর কোন ইংরেজী

গ্রন্থ আমার চোখে পড়ে নাই। সুজুকির পুস্তক অতি ক্ষুদ্র। ইহার Outlines of Mahayana Buddhism ভারতে প্রসিদ্ধ।

সুজুকির পুস্তিকায় কন্‌ফিউশিয়াসের যুগ হইতে পরবর্ত্তী তিন চারি শত বৎসরের চীনা চিন্তাধারার পরিচয় পাই। অর্থাৎ শাক্যসিংহের কাল হইতে অশোক মৌর্য্য পর্য্যন্ত ভারতের সমসাময়িক চীনা দর্শন বুঝিতে পারি। এই সে-দিন আর একখানা পুস্তিকা বাহির হইল—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকাশক। তাহাতে প্রাক্‌কন্‌ফিউশিয়া যুগের চীনা জীবনের চিত্র আছে। এই পুস্তকে দর্শনের ইতিহাস প্রদত্ত হয় নাই—পরন্তু কন্‌ফিউশিয়াসের আমল পর্য্যন্ত চীনারা কোন্ আদর্শে পরিবার সমাজ ইত্যাদি পরিচালনা করিত, তাহার বিবরণ আছে। পুস্তকের নাম Chinese Moral Sentiments before Confucius, লেখকের নাম Rudd ; রচনা প্রাঞ্জল—গ্রন্থকারও সহৃদয়। সহজে প্রাচীন চীন বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তিকা অতি উৎকৃষ্ট প্রবেশিকা।

চীনা দর্শনসম্বন্ধে ফরাসীভাষায় বোধ হয় বহু আলোচনা আছে। ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ শাংহাইয়ের এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। অতি সামান্যই বলিতে হইবে। পেট ভরে না। প্রবন্ধাবলীর নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) The Chinese Sophists--লেখক Forke.

(২) Wang-Chung and Plato on Death and Immortality—Forke.

(৩) Mencius and Some other Reformers of China—Macklin.

(৪) Siun King the Philosopher—Edkins.

(৫) The Character and Writings of Meh-tsi—Edkins.

(৬) The Naturalistic Philosophy of China—Balfour.

(৭) The Ethics of the Chinese—Griffith.

(৮) Tu-li or Precious Records—Clarke.

(৯) Chinese System of Family Relationship and its Aryan affinities—Kingsmill.

(১০) Militant Spirit of the Buddhist Clergy in China—Groot.

হিন্দু দার্শনিক চীনে না আসিলে চীনাদর্শনের পুনরুদ্ধার শীঘ্র হইবে না।

(৮) এশিয়ায় পশুধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্ম

চীন-তত্ত্ববিষয়ক ইংরেজী রচনার বিবরণ দিতে যাইয়া প্রথমেই চীনা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে কিন্তু আমি কোন জাতির তথাকথিত ধর্ম্ম-চিন্তা বা ধর্ম্মকর্ম্ম বা ধর্ম্ম ভাবকে সেই জাতির গোড়ার কথা কিম্বা আসল কথা বিবেচনা করি না। বরং ধর্ম্মবিষয়ক তথ্যসংগ্রহ সর্ব্বশেষে করাই যুক্তিসঙ্গত—অনেক সময়ে এই সকল তথ্যসংগ্রহ না করিলেও কোন সমাজকে বুঝিতে কষ্ট হয় না। এইরূপই আমার মত। বস্তুতঃ এইজন্য ইয়োরামেরিকায় পর্য্যটনকালে মুখ্যভাবে কোন দিন কোন গির্জ্জা বা বাইবেল-সাহিত্যের আলোচনায় সময় দিই নাই। লোকেরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিতে অভ্যস্ত, সেই দিকটা এক প্রকার বাদ দিয়াই দুনিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অথচ কোন জাতির যথার্থ ধর্ম্ম আমার দৃষ্টির বা পর্য্যালোচনার বহির্ভূত রহিয়াছে, সে কথা বলিতে পারি না।

দুনিয়ার সকল মানুষই প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পশু। সুতরাং মানবের পশুত্বই সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। যে শাস্ত্রে কীট পতঙ্গ মৎস্য

পক্ষি-শৃগাল-কুকুর-বিড়ালের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার নাম জুওলজি (zoology)। মানুষ সম্বন্ধে কোন কথা বুঝিতে হইলে সেই জুওলজি বিদ্যার অন্তর্গত তথ্যই গোড়ার কথা। সেই তথ্যসমূহের চরম কথা বংশ-বৃদ্ধি, সন্তানোৎপাদন, শরীররক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। শুদ্ধ কথায় যাহাকে বিবাহ বলে এবং যাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সকল কথাই মানুষের প্রথম কথা। কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সেই দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন এই—"অমুক জাতির পশুধর্ম্ম কোন্ রীতিতে পরিচালিত হইতেছে—হইতেছিল এবং হইবে?"

মানব সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা তাহার অন্নবস্ত্র ভরণপোষণ বা জীবনধারণের কথা। খাওয়াপরা, বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি কার্য্যের জন্য কোন সমাজ কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছে, করিয়াছে এবং করিবে, সেই সমুদয় অবগত হওয়া পর্য্যটক, অনুসন্ধিৎসু, পাঠক অথবা মানবতত্ত্ববিদের দ্বিতীয় কার্য্য। এই সকল তথ্য যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহার নাম Economics বা ধন-বিজ্ঞান বা বৈষয়িক শাস্ত্র।

মানব সম্বন্ধে তৃতীয় কথা তাহার আত্মরক্ষা বা জীবন-সংগ্রামের কথা। প্রতিমুহূর্ত্ত দুনিয়ার সকল মানুষই নানা প্রতিকূল শক্তির দৌরাত্ম্যে জীবন-নাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। অবশ্য প্রত্যেক শক্তির ও জাতির জীবনপুষ্টির উপযোগী অনুকূল শক্তিও সংসারে বহুবিধ রহিয়াছে। মানুষ এই আবেষ্টন হইতে প্রতিকূলগুলিকে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা অনুকূল উপা-দানগুলি স্বকীয় বিকাশের জন্য সংগ্রহ করিতে তৎপর। যে শাস্ত্রে এই সমুদয় প্রয়াসের আলোচনা থাকে, তাহার নাম সমর-বিজ্ঞান, রণনীতি, অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যা, যন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি।

এই তিন শ্রেণীর তথ্যকে মোটের উপর এক জাতীয়ই বলা চলিতে

পারে। মানবের পশুত্ব হইতেই এই তিন প্রকার কার্য্যাবলী এবং তথ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তথ্যগুলির তালিকা দেখিয়া বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানব নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ওহে সভ্যতম মানবসন্তান—তুমি পশু, ইহাই তোমার জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধীয় গোড়ার কথা। এই পশুত্ব হইতে খানিক দূর উঠিয়া (অথবা পশুত্বকে খানিকটা চাপিয়া ও ঢাকিয়া রাখিয়া অথবা ইহার উপর অল্পাধিক চূণকাম করিয়া) তুমি মানুষ সাজিয়াছ। আবার এই মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব বস্তুটিকে ঘষিয়া মাজিয়া তুমি দেবত্বের ইঙ্গিত পাইতে চেষ্টিত আছ। সেই দেবত্ব কি বস্তু, তাহার কল্পনা নানাভাবে সুরু হইয়াছে—এখনও তাহার কূলকিনারা পাওয়া যায় নাই—কোন দিন যাইবেও না বোধ হয়।

যাহা হউক, মানবের মনুষ্যত্ব বা "মানবধর্ম্ম" দেখা যাউক। এই সম্বন্ধে প্রথম কথা, মানুষের রাষ্ট্রীয় শাসন বা সমাজগঠনের কথা। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পশুধর্ম্ম পালন করিবার জন্য মানুষ দল বাঁধিয়া বসবাস করে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য পশুগণ সেই ধরণের দল বাঁধে না, অন্ততঃ দল বাঁধিবার জন্য স্থায়ী কোন প্রকার আয়োজন তাহাদের মধ্যে বেশী নাই। এইখানে পশুত্বের পরবর্ত্তী সোপান মানবত্বের আরম্ভ। সুতরাং কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার শাসনপ্রণালী ও সমাজ-ব্যবস্থাবিষয়ক তথ্যসংগ্রহ আবশ্যক। যে শাস্ত্রে এই সমুদয় তথ্য আলোচিত হয়, তাহার নাম রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বা হিন্দু পারিভাষিক শব্দ অনুসারে অর্থশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র।

যদি বলি, এই চারি প্রকার তথ্য ছাড়া মানুষ সম্বন্ধে আর কোন তথ্যসংগ্রহ অনাবশ্যক, তাহা হইলে বোধ হয় ভুল হইবে না। মানব-জীবনে এই সমুদয়ের অতিরিক্ত যে সকল তথ্য আছে, সে গুলির ভিত্তি এইখানে। যৌনসম্বন্ধ, খাওয়াপরা, লড়াই করা এবং দল-বাঁধা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য অবলম্বন করিয়াই মানুষ অন্যান্য

যাহা কিছু করিয়া থাকে। ইয়োরামেরিকায় বেড়াইবার সময়ে আমি এই চতুর্ব্বিধ তথ্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—প্রাচীন মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া নব্য ভারতের নবীনতম সমাজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার যে কোন জাতিকেই বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন, কেবল এই চতুর্ব্বিধ তথ্য আলোচনা করিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, অথচ এই সমুদয়ের মধ্যে ধর্ম্মনামক কোন পারিভাষিক শব্দের চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু আমি বলিব, এই তথ্যগুলি বুঝিলেই যে কোন জাতির চরম ধর্ম্ম বুঝা যাইবে। আমাদের সুপরিচিত পারিভাষিক শব্দ অনুসারে এইগুলিকে "ধর্ম্মশাস্ত্র", "অর্থশাস্ত্র" এবং "কামশাস্ত্রের" অন্তর্গত বলা যায়। "ধর্ম্মশাস্ত্রে" আধ্যাত্মিক আলোচনা থাকে না—তাহা "মোক্ষশাস্ত্রের" অন্তর্গত। আমরা চলতি ভাষায় যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা পারিভাষিক "ধর্ম্মশাস্ত্রে"র অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বস্তুতঃ এই চারি প্রকার তথ্যের অতিরিক্ত মানুষের জীবন সম্বন্ধে আর কয়টা তথ্য আছে? ভাষা এবং চিন্তাশক্তি। মানুষ কথা বলিতে পারে—এবং সেই কথার মধ্যে তাহার ভাব বা চিন্তা বা ধারণা বা মত প্রকাশ করে। ফলতঃ সাহিত্য সৃষ্ট হয়। অতএব কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার চিন্তাগুলি অর্থাৎ সাহিত্যটা দেখা আবশ্যক, এই সাহিত্য বলিলে সেই জাতির কাব্য, নাট্য, গল্প, হাস্য ও নীতি ধর্ম্ম যাহা কিছু সবই বুঝা হইল।

অধিকন্তু সাহিত্য অর্থাৎ ভাষা-নিবদ্ধ চিন্তাই মানুষের একমাত্র চিন্তা নয়। মানুষের মনোভাব চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যেও প্রকাশিত হইয়া থাকে—একমাত্র ভাষায় নয়। কাজেই মানুষের চিন্তাসম্বন্ধীয় তথ্য অন্বেষণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র এবং ভাস্কর্য্যও দেখা আবশ্যক। এক্ষণে সাহিত্যের সঙ্গে চিত্র ও ভাস্কর্য্য মিলাইয়া সকলকে যদি সুকুমার শিল্প বা

কলা নাম দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ তথ্য ব্যতীত মানবসম্বন্ধে এক পঞ্চম তথ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহার নাম চিন্তা—সেই চিন্তার সাক্ষী কলা বা সুকুমার শিল্প।

মানুষ চিন্তা করিতে পারে—এই জন্য তাহাকে মানব বলিতে চাহ বল—অথবা দেবতা বলিতে চাহ বল। নানা বস্তু সম্বন্ধেই মানুষ চিন্তা করিয়া থাকে—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, দৃশ্য অদৃশ্য কোন পদার্থই তাহার চিন্তার বহির্ভূত নয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, আদর্শস্থানীয়, অনুসরণযোগ্য, বর্জ্জনীয়, প্রত্যাখ্যানযোগ্য ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ই মানুষের চিন্তার অন্তর্গত। ভূতুড়ে কাণ্ড হইতে জীবনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত দুনিয়ার সকল তথ্যই এই উপায়ে মানবীয় কলায় স্থান পাইয়াছে।

জগতের সকল দেশেই দেখিতে পাই যে, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" জাতীয় কার্য্য ও চিন্তাসমূহকে ধর্ম্ম নাম দেওয়া হয়। পরমেশ্বর, দেবদেবী, ভূত-পেত্নী, পরলোক, জন্মান্তর ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষ কি ভাবে এবং কিরূপ আচার অনুষ্ঠান করে, সেইগুলি দেখিয়া তাহার ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত করা হয়। এই পারিভাষিক অর্থে বেদ, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি শ্রেণীর গ্রন্থাবলী ধর্ম্মগ্রন্থ এবং রঘুবংশ, প্যারাডাইজ লষ্ট, ফাউষ্ট ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ নয়। এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই ধর্ম্মশব্দ সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহার সমালোচনা সম্প্রতি অনাবশ্যক। তবে বক্তব্য এই যে, কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে তাহার এই তথাকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, উপাসনা-তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব না জানিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। এই জাতীয় চিন্তা বা কার্য্য মানব-জীবনের আড়ম্বর অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তোলে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার যথার্থ জীবনের শতাংশ স্থানও অধিকার করে না।

সুতরাং সিনলজি বা চীনতত্ত্বের আলোচনায় এই ধরণের তথাকথিত

ধর্ম্মতত্ত্ব বাদ দিলেও, মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। বস্তুতঃ কোন ইংরেজ যখন ফরাসী দেশে বেড়াইতে যান, অথবা ফরাসী যখন জার্ম্মাণ দেশে পর্য্যটন করেন, তখন ইঁহারা ফরাসী ও জার্ম্মাণ রমণীর কুসংস্কারগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করেন না, অথবা ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির গির্জ্জার তালিকা লিপিবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হন না! কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা একবার এশিয়ায় পদার্পণ করিলেই হয় archæologist অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অথবা anthropologist অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিৎ (লোকাচার তত্ত্ববিৎ) হইয়া দাঁড়ান। সমগ্র এশিয়া ইঁহাদের চিন্তায় মরা মানুষের দেশ সুতরাং fossil বা জীবাশ্ম অন্বেষণে ইঁহারা তৎপর হন। ইঁহাদের চিন্তায় এখানে জীবন্ত জাতির কোন নিদর্শন নাই—যাহা কিছু আছে, তাহা অর্দ্ধ সভ্য আদিম মানবের অপরিণত চিন্তা ও কর্ম্ম মাত্র। এই ধারণায় তাঁহারা এশিয়াবাসীর দেব-দেবী, ভূতপেত্নী, পরকাল, জন্মান্তর ইত্যাদি ঘাঁটিতে লাগিয়া যান। ম্যাক্সমূলারের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত বলিতে কি এক শত বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য জগৎকে এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। এই জন্য মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান সম্বন্ধে তথাকথিত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় যত আছে, অন্য কোন তথ্য বিষয়ক গ্রন্থ তাহার সহস্রাংশও নাই। মিশর-তত্ত্ব, ভারত-তত্ত্ব, ইসলাম-তত্ত্ব, চীন-তত্ত্ব ইত্যাদি-সমগ্র এশিয়া-তত্ত্বই ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতগণের চিন্তায় প্রত্নতত্ত্ব বা শব-তত্ত্ব বা অস্থিকঙ্কাল-তত্ত্ব বা কবর-তত্ত্ব (necrology) ইত্যাদির সামিল। জীবনতত্ত্বের (Biology) নিয়মানুসারে এশিয়াবাসীর জীবন কেহ কখনও আলোচনা করিতে অগ্রসর হন না।

এই কারণে যে সকল তথ্য না জানিলেও চীনকে বুঝিতে কষ্ট হয় না, এক মাত্র সেই সমুদয় তথ্যই বেশী আলোচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। অর্থাৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বদেশীয় সমাজবিষয়ক যে সমুদয় তথ্যের

আলোচনায় সময় কাটানো অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চীনে আসিয়া একমাত্র সেই দিকেই সকল অধ্যবসায় প্রয়োগ করেন। ইহা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যদিগের সর্ব্বপ্রধান কুসংস্কার।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পপোত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য-দিগের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের পর যন্ত্রবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহার ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি—ধনাগমের এই তিন উপায়েরই যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ইয়োরামেরিকার পারিবারিক জীবন, সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীও একদম বদলাইয়া গিয়াছে। এত অধিক এবং এত জটিল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, আজকাল কোন পাশ্চাত্য নরনারী এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার অবস্থা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। অথচ সমস্তই মাত্র একশত বৎসরের কথা।

এই একশত বৎসরের মধ্যে এশিয়ার (জাপান ছাড়া) কুত্রাপি স্বাধীনভাবে নব নব আবিষ্কার সাধিত হয় নাই, পরন্তু এশিয়া ইয়োরা-মেরিকার ভোগভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাও সেই বাষ্পপোত-প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এশিয়ার মোটা কথা এই যে, এশিয়াবাসী মাত্রেই ইয়োরামেরিকান মাত্রের দাস। কাজেই পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যকে স্বভাবতই তুচ্ছ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

দরিদ্রবালক অধ্যবসায়ের ফলে যখন সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হন, তখন তাঁহার শৈশব ও যৌবনের দারিদ্র্য অনেক সময়েই মনে থাকে না। যদি কিছু মনে থাকে, তাহা সুখস্মৃতিই বোধ হয়। ইহা অতি স্বাভাবিক। কাজেই বাষ্পপোত আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকার জনগণ কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহা কখনও কোন ঐতিহাসিকের স্মরণে আসে

না। আসিলেও চিত্তাকর্ষক কাহিনীমাত্ররূপে সেই কথা আজকাল সমাদৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃদ্ধা এশিয়ার বর্ত্তমান দাসীত্ব ও দারিদ্র্য ছাড়া ইয়োরামেরিকাকে দেখাইবার আর কি আছে?

মানুষের স্মৃতিশক্তি বিশেষ প্রখর নয়। একশত দুইশত বা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল, তাহা মনে আনা বড়ই কঠিন— বিশেষতঃ মনে রাখিয়াও বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চীনতত্ত্ব ও ভারততত্ত্বকে প্রত্ন-তত্ত্বে ও ধর্ম্ম-তত্ত্বে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। এইজন্য আমাদের দাস্য ও দারিদ্র্য ভুলিয়া সময়ে সময়ে ইতিহাসের পাতা উল্টানো আবশ্যক বোধ করি। যুগে যুগে এশিয়া এবং ইয়োরামেরিকার জীবন তুলনা করা যাউক। কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এশিয়াবাসী নরনারী এবং ইয়োরামেরিকান নরনারীর পশুধর্ম্ম কিরূপ ছিল, অথবা মানবধর্ম্ম কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। যে প্রণালীতে এই আলোচনা চলিতে পারে, তাহা "কম্পারেটিভ্ ক্রনলজি" (কালানুসারে সমালোচনা) এবং "কম্পারেটিভ্ হিষ্টরি" (তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস) এই দুই বিদ্যার অন্তর্গত। দুঃখের কথা, প্রাচ্যজগতের সঙ্গে প্রতীচ্য জগতের তুলনা এই ধরণে এখনও কোন পণ্ডিত করিতে অগ্রসর হন নাই। যদি হইতেন, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, ভারত-তত্ত্ব কোন দিনই প্রত্ন-তত্ত্ব, মরা-তত্ত্ব, জীবাত্ম-তত্ত্ব, কবর-তত্ত্ব বা তথা কথিত ধর্ম্ম-তত্ত্বমাত্র ছিল না। সেইরূপ চীন-তত্ত্বও কোনদিন আর্কিওলজি, নেক্রলজি, বা লোকাচার-তত্ত্ব মাত্র ছিল না!

বাষ্প-পোতের আবিষ্কার যত দিন হয় নাই, ততদিন এশিয়ার লোক এশিয়ার বাহিরের লোকের সঙ্গে সকল কার্য্যেই টক্কর দিয়াছে। কৃষি, শিল্প, রাষ্ট্রশাসন, যুদ্ধবিদ্যা, জ্ঞানবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, রসায়ন, অস্ত্রশস্ত্র, দুর্গ-নগর-গঠন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পল্লীব্যবস্থা কোন বিষয়েই এশিয়া

ইয়োরামেরিকার পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং ইয়োরোপকে চিরকাল এশিয়াবাসীর আক্রমণের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতে হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের পারসীক আক্রমণের দিন হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নরনারী যুগে যুগে এশিয়ার প্রভাব সহ্য করিয়া রহিয়াছে। আজ একশত বৎসর মাত্র ধরিয়া পাশ্চাত্যেরা এশিয়ায় যে আস্ফালন করিতেছেন, সেই আস্ফালন এশিয়ার মুসলমান এবং বৌদ্ধ তাতারজাতি পুরাপুরি একহাজারেরও অধিক বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে করিয়াছেন। রুশিয়া, মধ্য-ইয়োরোপের আধখানা, স্পেন পর্ত্তুগাল পর্য্যন্ত এশিয়ার সীমা বিস্তৃত ছিল। কোন কোন সময়ে ভূমধ্য-সাগরকে ইয়োরোপের সাগর না বলিয়া এশিয়ার হ্রদ বলা চলিত। একদিন এশিয়াবাসীর পশুধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম লইয়া বিরাট্ ইতিহাস রচিত হইবে।

(৯) ভারতবাসীর মাসী বাড়ী

চীন ভারতসন্তানের মাসী—ভারতমাতা চীনাদের মাসী। চীনা এবং ভারতবাসী মাসতুত ভাই। চীন যে ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠা ভগ্নী, তাহা দেশে থাকিতে অল্পাধিক কল্পনা করিতাম মাত্র, সত্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। চীনের যতই বেশী দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি, বাস্তবিকই ইনি ভারতবর্ষের ভগ্নী। ভারতের যতগুলি দোষগুণ, সবই এই চল্লিশ কোটি নরনারীর দেশে মজুত রহিয়াছে। জাপানও সকল বিষয়েই চীনের সিংহল দ্বীপস্বরূপ—একটা জের বা পরিশিষ্ট মাত্র। কাজেই চীনসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য জাপানসম্বন্ধেও অবিকল তাহাই প্রযোজ্য। একমাত্র প্রভেদ এই যে, জাপান শীঘ্র মরিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু চীন

তাঁহার কনিষ্ঠার পথ অনুসরণ করিয়া ভগ্নী-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেও অগ্রসর।

যখন দেশ ছাড়িয়াছিলাম, তখন কাণে বাজিতেছিল—“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক’ তুমি।” সত্যই এমন দেশ কোথাও পাই নাই! ভাবিয়াছিলাম, কবির বচন বুঝি সার্থক। অবশেষে চীনে উপনীত হইয়া দেখি—“একি হইল! ভারতের একটি জুড়ি খুঁজিয়া তবে পাওয়া গেল?”

বারমাসে তের পার্ব্বণ, ভারত ছাড়া আর কোথায় আছে?—এই চীন দেশে। নদীপূজা, পাহাড়পূজা, গাছপূজা, জানোয়ারপূজা, সহরপূজা, গ্রামপূজা, ইটপাটকেলপূজা, দেওয়ালপূজা, জমিপূজা, আকাশপূজা, দুনিয়াপূজা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় আছে?—এই চীনদেশে। কৃষিকার্য্যের পূর্ণ নির্ভরতা, পল্লীজীবন, কুটির-শিল্প, অনশন, অর্দ্ধাশন, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া ও অকালমৃত্যু ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় আছে?—এই চীনদেশে! ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যের সম্মান, বৈধব্য ও সতীত্বের সম্মান, সন্ন্যাস ও যোগধ্যানের সম্মান ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় আছে? —এই চীনদেশে। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, স্বামীত্ব, পত্নীত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির আদর্শ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই [illegible] চীনদেশে। বিংশ শতাব্দীতেও স্ত্রীপুত্র-সমন্বিত পরিবারের মহিমা অটুট রাখিবার জন্য প্রয়াস চলিতেছে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। রাজাকে “অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি নির্ম্মিতা” বিবেচনা করা হয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। সেই সঙ্গে পল্লী-সমাজেরও স্বায়ত্তশাসন রক্ষা প্রাপ্ত হয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে? —এই চীনদেশে। দারিদ্র্যকেও দুঃখ বিবেচনা করা হয় না ভারতবর্ষ ছাড়া

আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা দ্বারা সংযম পালনের আয়োজন সৃষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে? —এই চীনদেশে? কথায় কথায় মনুর বচন আওড়ানো হয়—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। স্মৃতিশাস্ত্রের অথবা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভাষ্য তস্যাপি টীকা রচিত হয়—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। বিবাহ না করা পাপ বিবেচিত হয়—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। ডাকের বচন, খনার বচন, হাঁচি, টিক্‌টিকি, পঞ্জিকা, তিথিনক্ষত্র সুপ্রচলিত ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। সুবৃহৎ মহাদেশে কোটি কোটি নরনারী বাস করিয়া অগণিত অনৈক্য সত্ত্বেও নিজেদের ঐক্য সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্ এরূপ দেখা যায়, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। "মায়ের ভায়ের এমন স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?"—একথা সত্য-সত্যই ধর্ম্মভাবে বিশ্বাস করা হয়—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রচালিত যুগের দৈবদুর্ব্বিপাক এড়াইয়া উন্নত হইবার সম্ভাবনা নাই—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশের?—তাহাও এই চীনদেশের। অসংখ্য নৈরাশ্যের কারণ সত্ত্বেও লোকেরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া থাকে, আশাভরা আহ্লাদে—ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশে?—এই চীনদেশে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেহই এখন পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে চীনের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা আমার কথা বুঝিবেন না। চীনারাও বুঝে না। ইহারা কখনও ত ভারতবর্ষ দেখে নাই। তাহা ছাড়া আমাদের মতন চীনারাও চীনকে একমেবাদ্বিতীয়ং দেশ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। উহারা অনেক সময়ে মাথা নাড়িয়া বলে—"উহুঁ—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক' তুমি।" চীনা ভাষায় চীনদেশের নাম

"চুঙ্-হুআ" (Middle Kingdom) অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যস্থল বা কেন্দ্র"! আর এক নামের অর্থ Central Glory বা কেন্দ্র গৌরব অর্থাৎ দুনিয়ার সেরা। এই জাতি শীঘ্র কি ভারতবর্ষকে চীনের ভগ্নী বিবেচনা করিতে রাজী হইবে? আমি একাকী মজা দেখিতেছি। চীনে ভারতবাসী মাত্রেই অনেক মজার জিনিষ পাইবেন। এই মজা পাশ্চাত্যেরাও পাইতেছেন না, চীনারাও শীঘ্র পাইবেন না। ভারতবাসী একবার তাঁহার অথর্ব্ববেদ, উপনিষৎ, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, বীজগণিত, দর্শন-সংগ্রহ, ভক্তিযোগ লইয়া চীনে হাজির হইলেই বুঝিবেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা চীনতত্ত্ব আদৌ বুঝেন নাই। হিমালয়ের অপর পারের সকল "বিদ্যা"য় ও "কলা"য়ই মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ ভারতবর্ষ বিদ্যমান।

অনেক সময়ে চীনারা বলিয়া থাকে—"ভারতবর্ষের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া আমাদের লেনদেন বহুকাল হইয়াছিল। এইজন্য কোন কোন বিষয়ে হয়ত' সাদৃশ্য বা সামীপ্য দেখিতে পাইবেন।" আমি বলি—"বৌদ্ধতত্ত্ব আমদানি করিবার জন্য চীনাদের ভারতবর্ষে আসিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বুদ্ধের নাম চীনে শ্রুত হইবার পূর্ব্বেই চীনারা আমাদের মাসতুত ভাই ছিল।" যাহা হউক, চীনে আসিয়া বহুসংখ্যক ভারতবাসী মজা দেখিতে আরম্ভ না করিলে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। সম্প্রতি একাকী নীরবে হাসিতেছি। বৃদ্ধ কনফিউসিয়াস এবং বৃদ্ধতর লাওট্জের ঝুলিতে কেবল ভারতীয় "সংহিতা"কার সমূহেরই উনিশ বিশ দেখিতে পাইব, এত বড় মজার কথা স্বপ্নেও কখনো ভাবিয়াছি কি? অতএব যাঁহারা মজা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সপরিবারে চীনে আসুন। ভারতীয় গণিতবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, যোগতত্ত্ব ইত্যাদির ঐতিহাসিকগণ এখানে অমূল্য তথ্য পাইবেন।

তথাকথিত ধর্ম্মতত্ত্বের তরফ হইতে চীনকে ত একরকম আয়ত্ত করিয়া

লইয়াছি। কিন্তু সাধারণ সাহিত্য, কাব্যশিল্প ইত্যাদির দিক্‌টা কিছুই বুঝিতেছি না। বলিতে কি, একখানাও পুস্তক হস্তগত হইল না, যাহার সাহায্যে চীনাত্মার সাহিত্যমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি!

Morgan প্রণীত Wenli Styles and Chinese Ideals গ্রন্থে চীনা গদ্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ নমুনা ইংরেজীতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা সন্তোষজনক নয়। ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন—"It is hoped that many, who can read only the English part, will find delight and information in the essays dealing with the philosophy, art, education, religion and general culture of the people" বস্তুতঃ ইহা নামজাদা চীনা সাহিত্য বীরগণের রচনা হইতেই সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই গুলিই পাঠ করিলে মনে হয়, চীনারা বড় গম্ভীর ও নীরস জাতি। রচনাপ্রণালী নিতান্ত আড়ষ্ট, লেখার সহজ সরল গতিভঙ্গী পাই না। যাহা হউক, চীনা গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন আর কোন ইংরেজী পুস্তকে দেখি নাই।

চীনা কবিতার একখানা সঙ্কলন পুস্তিকা দুই তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে। ইহা Wisdom of the East গ্রন্থমালার অন্তর্গত। পুস্তিকার নাম A Lute of Jade (being selections from the classical poets of China). লেখক Ganmer-Byng. ইহাতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে—এবং প্রত্যেক কবিতার প্রথমে কবি অথবা রচনা সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা আছে। এতদিন এই পুস্তিকাই বোধ হয় চীনা কাব্যের একমাত্র নিদর্শন-গ্রন্থ ছিল। কয়েক দিন হইল Budd প্রণীত Chinese Poetry নামক আর একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। অবশ্য Legge অনূদিত She-king বা Book of Odes বহুকাল হইতেই সুপ্রচলিত।

Cranmer-Byngএর পত্তানুবাদ মন্দ নয়—তাঁহার ব্যাখ্যায়ও চীনের মর্ম্ম বুঝিবার প্রয়াস আছে। কিন্তু সবগুলিই আমাদের Gitanjali এর সুরে বাঁধা—যেন বিরাট্ চীনা-সমাজ হইতে একটি ক্ষীণকান্না করুণ ফল্গু মাত্র বাহির হইয়াছে। আর কোন ধারা কি চীন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় নাই?

Porter প্রণীত A Hundred Verses from old Japan (Clarendon Press, Oxford) সচিত্র পুস্তিকায় একশত ক্ষুদ্র জাপানী প্রেম-সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ আছে। ইহার ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—"The predominating feature, the under-current that runs through them all, is a touch of pathos, which is characteristic of the Japanese." ইনি জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব বাহির করিয়াছেন, "প্যাথস্" বা করুণ স্বর। সেইরূপ Cranmer-Byngও চীনা-সাহিত্যে এই ধরণেরই এক রস বাহির করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"It is for this reason that a quietism is to be found in Chinese poetry ill appealing to the unrest of our day." অর্থাৎ শান্তিনিষ্ঠা, নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি চীনা-চিত্তের বিশেষত্ব। আর যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতের হৃদয় খুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও প্রচার করিয়া থাকেন যে, মুক্তি, বৈরাগ্য এবং সংসার হইতে পলায়ন, হিন্দু-সমাজের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সমগ্র এশিয়াই একসুরে বাঁধা।

কিন্তু আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানি যে, পাশ্চাত্যেরা কেবলমাত্র এক-দিকটা দেখিয়াছেন—তাঁহারা পূর্ণ-ভারত বুঝেন নাই—বুঝিতে ইচ্ছাও বোধ হয় করেন নাই। কারণ ভারতবর্ষের লোকও পাশ্চাত্যগণের মতই করিতকর্মা, গতিশীল, সংসারধর্মে আগ্রহান্বিত এবং দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বি-

প্রার্থী ছিল বা আছে, এ কথা তাঁহাদের কানে ভাল লাগে না। তাই আমার সন্দেহ হইতেছে যে, চীনা-সাহিত্যের অনুবাদকগণও খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রাচ্য-জগতের তথাকথিত শান্তিপ্রিয়তা, মুক্তিলিপ্সা, কর্ম্মবৈরাগ্য এবং দুঃখবাদ ইত্যাদির নিদর্শনগুলি প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক, যতখানি চীনাকাব্য দেখিলাম, ততখানিতে ভারতাত্মার বিকাশই দেখিতেছি। কিন্তু চীনা কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ মোটের উপর আন্দাজ করিতে পারিতেছি না।

জাইল্‌স্ প্রণীত Chinese Literature গ্রন্থে চীনা-সাহিত্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাতেও কবিতার অনুবাদ অনেক আছে। এই গ্রন্থ ম্যাকডোনেল প্রণীত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" অপেক্ষা বেশী তথ্য-পূর্ণ। এই গ্রন্থ সকলকে একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেই হইবে। ইহাতে গদ্যপদ্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

Wylie প্রণীত Notes on Chinese Literature প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। চীনা-ভাষায় প্রথম হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। Aufrechtএর Catalogus Catalogorum গ্রন্থে সংস্কৃত পুঁথির তালিকাসমূহের বিশ্ব-কোষ পাই। তাহাতে কোন গ্রন্থের সূচী বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামোল্লেখ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ওয়াইলি প্রণীত চীনা-সাহিত্যের তালিকা-গ্রন্থে যতখানি বিশদ বিবরণ শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে চীনাদের পূর্ব্বাপর সকল প্রকার চিন্তাধারা সহজে বুঝিতে পারি। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, ধর্ম্ম ইত্যাদি কোন বিষয়ই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্জ্জিত হয় নাই। এই পুস্তক কাছে না রাখিলে চীনতত্ত্বে প্রবেশ হইল না বলিব।

(১০) চীনসম্বন্ধে গ্রন্থ-পঞ্জী

সম্প্রতি চীনতত্ত্ব-বিষয়ক আরও কতকগুলি ইংরেজী গ্রন্থের নাম করিয়া যাইতেছি। চীন সম্বন্ধে জানি এত অল্প যে সাপ ব্যাঙ মাথামুণ্ডু ইংরেজীতে যাহা পাই, তাহাই পড়িতে লাগি। বাদবিচারে বা সমালোচনায় সময় কাটানো অনাবশ্যক।

অধমতারণ Story of Nations গ্রন্থমালায় গরু খুঁজিয়াও পাওয়া যায়। চীনের ইতিহাসও আছে। লেখক Douglas। ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য, আর একখানা ইতিহাসের বই দেখিতেছি, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইয়াঙ্কির পাদ্রী Gowen প্রণীত এই Outline History of China গ্রন্থে মান্ধাতার আমল হইতে সুন্ ইয়াৎ-সেনের বিপ্লব পর্য্যন্ত সকল কথা পাইতেছি। প্রবীণ-বয়স্ক হইলেও, চীনতত্ত্বে হাতেখড়ির জন্য কোনো ভারতবাসী ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর পাইবেন না। Gilesএর China and the Manchus (Cambridge) পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় নামেই বুঝা যাইতেছে। ইহাতেও সুনের আমল পর্য্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। জাইলেসের The Civilisation of China এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Hirthএর The Ancient History of China. ইহা আমাদের Vincent Smithএর Early History of India গ্রন্থের ন্যায় অন্ততঃ তথ্যের জন্য গৃহ-পঞ্জিকা-স্বরূপ ব্যবহারযোগ্য। তবে ইহাতে চীনা সত্য-যুগের (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০) কথা হইতে খ্রীঃ পূঃ ২২১ পর্য্যন্ত কালের বৃত্তান্ত আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের মৌর্য্যযুগ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁহারা হার্থের এই গ্রন্থে সব পাইবেন। ইহাতে অবশ্য কংফিউসিয়াস্ এবং লাওৎসের

কাহিনী স্থান পাইয়াছে—কিন্তু প্রথম চীনা নেপোলিয়ানের (শি-হুয়াংতি) টিকি মাত্র দেখিতে পাইতেছি। অর্থাৎ "চন্দ্রগুপ্ত আসিতেছেন"—এই কথার পরেই কোন ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থের যবনিকা পতন হইলে, ভারত-সম্বন্ধে যাদৃশী বিদ্যা জন্মিবে, এই জার্ম্মাণ চীনতত্ত্বজ্ঞের গ্রন্থে চীন-সম্বন্ধেও তাদৃশী বিদ্যা সঞ্চিত হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্তের শতবৎসর পূর্ব্বেকার তথ্যও জানা নাই বলা চলিতে পারে। আর চীনা জাতির ইতিহাসে সুপ্রাচীন কালের তথ্যও পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনা লইয়া সন তারিখ সমন্বিত ভারতীয় ইতিহাস রচনা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। কিন্তু চীনা চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত, অকাট্য প্রমাণের বলে ইতিহাস রচনা করা যায়। হার্থ সেই ইতিহাসের প্রবর্ত্তক।

হার্থের একখানা পুস্তকের নাম China and the Roman Orient-প্রাচীন কালের প্রাচী প্রতীচ্য সংমিশ্রণের চিত্র ইহাতে আছে। যাঁহারা চীনের কথা জানিতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন, তাঁহাদেরও ইহা পাঠ করা চলিতে পারে। হার্থের আর একখানা গ্রন্থ আছে। উহা প্রত্যেক ভারতৈতিহাসিকের অবশ্য পাঠ্য। নাম Chau-Jukua: his work on the Chinese and Arab Trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chufanchi. Translated from tbe Chinese and annotated দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এশিয়ায় সমুদ্রবাণিজ্য কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক চীনা রাষ্ট্রের এক কর্ম্মচারী "চু-ফান-চি" নামক গ্রন্থে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম চাও-জু-কুয়া। হার্থ এবং রক্‌হিল সেই গ্রন্থের সটীক অনুবাদ করিয়াছেন। হার্থ মুদ্রিত গ্রন্থাবলী আমি [illegible] করিয়াছি। নিউইয়র্কে [illegible]

কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হার্থের নিকট চীনতত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ বলিতেছিলেন—"যুদ্ধ থামিলে জার্ম্মাণিতে আসিও—আমি অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিতেছি—সেখানে চীনতত্ত্বে পণ্ডিত করিয়া দিব।"

উইলিয়াম্‌স্‌ প্রণীত The Middle Kingdom দুই খণ্ডে বিভক্ত। আমাদের Imperial Gazetteer of India গ্রন্থমালার India নামক চারি খণ্ড গ্রন্থে যে সমুদয় তথ্য আছে, Williams-এর গ্রন্থদ্বয়ে চীনসম্বন্ধে সেই সমুদয় তথ্য পাওয়া যায়। ইহা অভিধানস্বরূপ ব্যবহারযোগ্য। অনেক কথা আছে। চীনের নাম, "দুনিয়ার মধ্য বা কেন্দ্রস্থল।" ইহা চীনাদেরই ধারণা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"গোপাল, পৃথিবীর মধ্যস্থল কোথায় তোমাকে আবিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।" গোপাল ভাঁড় বোধ হয় ভূগোলে সুপণ্ডিত ছিলেন না—কাজেই চীনের নাম জানিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যথারীতি সভা আহূত হইয়াছিল—বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌, গণিতকার, নৈয়ায়িক ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন—জরীপ করিবার যন্ত্র, ফিতা, হাতুড়ি, মুগুর, খুঁটা ইত্যাদি সবই মহা সমারোহের সহিত সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর গোপাল বিশেষ প্রাজ্ঞ অথবা ভূগোলবিদ্যা-মহার্ণব হইয়া, সভার এক স্থানে খুঁটা গাড়িতে সঙ্গীকে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐস্থলই জগতের কেন্দ্র! সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার প্রমাণ কোথায়?" গোপাল বলিলেন—"আমার ভুল যদি হইয়া থাকে, সে প্রমাণের ভার আপনাদের হাতে! আপনারা দুনিয়া জরীপ করিতে থাকুন। দেখা যাউক, আমার গণনা সত্য কি না।" চীনারা এই ধরণেই বোধ হয় নিজের দেশকে সমস্ত দেশের সেরা বিবেচনা করিত। মধ্য রাজ্য, [illegible] পরিভাষায় চীনারা একটা বিশেষ নাম সৃষ্টি করিয়া। চীন দেশের চীনা নাম "চুংকুয়ো"।

"চীন" নামের উৎপত্তি হইয়াছে চীনা চন্দ্রগুপ্ত বা নেপোলিয়ানের আমল হইতে। আমাদের চন্দ্রগুপ্ত যেমন মৌর্য্যবংশীয় ছিলেন, সেইরূপ চীনের শি-হুয়াংতি "চীন"বংশীয় ছিলেন। "চীন" একটা প্রদেশ বা জেলা (বা সেই প্রদেশের অধিবাসী বা সেই জেলার অধিবাসী) বংশের নাম। শি-হুয়াংতির পূর্ব্বে চীনাদেশটা নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় শি-হুয়াংতি সমগ্র দেশে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। ইহা খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২২১ সালের কথা। তাহার পূর্ব্বে চীনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। শি-হুয়াংতি যত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্বকীয় সাম্রাজ্যের "চীন" নাম প্রদান করা অন্যতম। চীনারা সেই চীন-শি-হুয়াংতির পুত্র বলিয়া গৌরব বোধ করে।

রাজবংশের নামে চীনারা পরবর্ত্তী কালেও গৌরব বোধ করিয়াছে। চীনের হ্যান্ রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ২১০—খৃষ্টীয় ২২০) এবং তাঙ্ রাজবংশ (খৃষ্টীয় ৬১৮—৯০৫) ঠিক আমাদের মৌর্য্য, গুপ্ত, বর্দ্ধন, পাল ও চোল-বংশের মত বিখ্যাত। চীনারা অনেক সময়ে আপনাদিগকে Sons of Han অর্থাৎ হ্যান-সন্তান এবং Sons of Tang বা তাঙ্-সন্তান বলিয়া পরিচিত করে। এইরূপে তাহাদের দেশের নাম "হ্যান্" এবং "তাঙ্" হইলেও হইতে পারিত। এই নিয়ম অনুসরণ করিলে বাঙ্গালা দেশের নাম কোন সময়ে "পাল" কোন সময়ে "সেন" হইতে পারিত। বিক্রমাদিত্যের ভারতকে "গুপ্ত" বলা চলিত। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ নামটাই ত "ভরত" হইতে উৎপন্ন। সুতরাং বলিতে পারি যে, চীনের মতন ভারতের নামও কোন সুপ্রসিদ্ধ বীর-বিশেষ হইতে প্রাপ্ত। তবে শি-হুয়াংতির বাপদাদার নাম জানা আছে, আর ভারতের বংশলতিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কুলজি-পুঁথি সংরক্ষক ঘটকগণের অথবা পুরাণ-কারের কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে।

"শি-হুয়াংতি" নামটারও অর্থ আছে। শি—প্রথম। হুয়াংতি—সম্রাট্। চীনানেপোলিয়ান যুক্তরাষ্ট্র চীন গঠন করিয়াই সদর্পে প্রচার করিলেন—আমার পূর্ব্বে চীনে কোন সম্রাট্ হন নাই। আমিই এই দেশের প্রথম "রাজচক্রবর্ত্তী।" বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাতন ইতিহাসের নজির বাহির করিতে চেষ্টিত হন নাই। বিশেষতঃ এই বীর-পুরুষ আবালবৃদ্ধ কন্‌ফিউশিয়ান পণ্ডিতগণের ধ্বংস সাধন করিয়া স্বকীয় বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সটীক সভাষ্য কন্‌ফিউ-শিয়-সংহিতার বিরাট স্তূপ অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনে সত্যসত্যই কিছুকালের জন্য সমাজ নির্ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিতহীন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই প্রবলপ্রতাপ বীরপুরুষের আমলে "চীন"শব্দ সমগ্র দেশের নাম হইল।

আমাদের দেশে অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যে চীনশব্দের উল্লেখ দেখিয়া "সুপ্রাচীন"কালে ভারতবাসীর সঙ্গে চীনাদের লেনদেন সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হন। জানা উচিত যে, চীন নামটা খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২২১ সালের পূর্ব্বে চীনা-সমাজেই সুপ্রচলিত ছিল না। সুতরাং মৌর্য্য ভারতের পূর্ব্বে চীন-নাম আমাদের দেশে আমদানি হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। শি-হুয়াংতি আমাদের অশোকের সমসাময়িক। চীনে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, এই শি হুয়াংতি নাকি আমাদেরই মৌর্য্যবংশীয়! তাহা হইলে দেখিতেছি যে, সকল দিক্ হইতেই চীনারা আমাদের মাসতুত ভাই। তবে দুঃখের বিষয়, মৌর্য্যভারতের নামদাত্রী চন্দ্রগুপ্ত জননী মুরার বংশবৃত্তান্ত এখনও অজ্ঞাত।

চীনের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া Howarth প্রণীত History of the Mongols নামক মঙ্গোলিয়া বা তাতার জাতির ইতিবৃত্ত ঘাঁটা অত্যাবশ্যক। মধ্যযুগের এশিয়া বুঝিবার পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বেশী নাই। গ্রন্থ সুবিশাল—ইহাতে ইয়োরোপের উপর বৌদ্ধ

মাঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের এবং এশিয়ার অন্যান্য জনপদের সংস্রব সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মে। ভারতে মোগলেরা মুসলমান—কিন্তু চীনে মোগলেরা বৌদ্ধ। আমাদের আকবর আর চীনাদের কুব্লা খাঁ একই বংশের সন্তান। এই সূত্রে চীনে ও ভারতে কতখানি ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে, আলোচনা চলিতে পারে। মধ্যযুগের এশিয়ার কথা উত্থাপিত হইলে Yule সম্পাদিত Travels of MarcoPolo কেহই বাদ দিতে পারেন না।

চীন-সম্বন্ধে এক বিরাট্ গ্রন্থের নাম করিতেছি। চীনের এক বৃটিশ কন্সাল Werner ইহার সম্পাদক। তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রবর্ত্তিত "সমাজ-বিজ্ঞানের" নিয়মানুসারে চীনদেশ সম্বন্ধে সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তথ্যসমূহ Chinese Sociology নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চীন-সম্বন্ধে আধুনিক কালে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, Werner সকল গ্রন্থ হইতে পাতা কাটিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের রচনা, ইহাতে এক পংক্তিও নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের তথ্য-শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বন করিয়া তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রয়োজনীয় অংশগুলি সাজাইয়া গিয়াছেন মাত্র। ফলতঃ এই গ্রন্থ যাঁহার নিকট আছে, তাঁহার আর কোনো গ্রন্থ পাঠ করিবার আবশ্যক হয় না। ইহা চীনতত্ত্বের মহাভারত—যাহা নাই এই গ্রন্থে, তাহা নাই আর কোন গ্রন্থে। কারণ ইহা চীন-বিষয়ক ২০০ ইংরেজি, জার্ম্মাণ ও ফরাসী গ্রন্থ আর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং ৭০০ চীনা গ্রন্থ হইতে অত্যাবশ্যক "কাটিং" বা উদ্ধৃতাংশের "বিশ্বকোষ"। মূল্য প্রায় ৮০৲। এ এক বিচিত্র গ্রন্থ। কাটিংয়ের বিশ্বকোষ অন্য কোন বিষয়ে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

চীনের মহাপ্রাচীরের মতন চীনা বুদ্ধুস্নায় শিরও জনস্বপ্রাসিদ্ধ।

দুনিয়ার শিক্ষিত-মহলে ভারতবর্ষের নাম করিলে অন্ততঃ "নির্ব্বাণ" ও বেদান্ত সকলেরই মনে আগে আসে। সেইরূপ চীনের কথা পাড়িলেই, চীনা চিত্রকলা এবং চীনের বাসন সম্বন্ধে তারিফ করা সভ্যসমাজে একটা ফ্যাশন। চীনারা নিজেও সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চীনাসমাজে অসংখ্য "সমজদার", সমালোচক ও সংগ্রাহকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আমরা কবি, লেখক, চিত্রকর, স্থপতি ইত্যাদির নাম যত পাই, কাব্য-সমালোচক, শিল্প-সমালোচক ইত্যাদির নাম তাহার শতাংশও বোধ হয় পাই না। কিন্তু চীনে সকল প্রকার শিল্পের সমালোচনা যথেষ্ট হইত। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে হইতেছে। সন তারিখ-সমন্বিত রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বৃত্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যে অতি বিরল। কিন্তু চীনারা চিরকালই ঐতিহাসিক তথ্য-সঙ্কলনে সিদ্ধহস্ত।

Laurence Binyon প্রণীত Painting in the Far East ভারতে সুবিদিত। কিন্তু Fenollosa প্রণীত Epochs of Chinese and Japanese art বোধ হয় পাঠক-সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। মাত্র দুই তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে। ইহাতে জাপানের কথা বেশী আছে—ফেনোলোসা জাপানে অধ্যাপক ছিলেন। আলোচনা ঐতিহাসিক—সুকুমার শিল্পের তরফ হইতেও সমালোচনা আছে। মূল্য প্রায় ৩০৲। লেখক দর্শনাধ্যাপক ছিলেন—কাজেই জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস ইহাতে আছে। গ্রন্থের শিরোনামার বিশদ ব্যাখ্যা An Outline of East Asiatic Design: হ্যাভেল ও কুমারস্বামী কাওসন এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথের সঙ্গে [illegible] ভারতীয় সুকুমার শিল্পের পরিচয় যেরূপ দিতেছেন, ফেনোলোসায় এশিয়ার চীনজাপানী শিল্পের সেইরূপ পরিচয় পাই। এই ব্যাখ্যা [illegible] কি না সে কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু চীনা শিল্পের সর্ব্ব-বিখ্যাত সমজদার ও প্রচারকের নাম Bushell। মিশর সম্বন্ধে Petrie যেরূপ প্রসিদ্ধ, চীনা সম্বন্ধে ইনি সেইরূপ। বুশেল প্রণীত নাতিবৃহৎ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ Chinese Art পাঠ করিয়াই চীনাশিল্পের পরিচয় লোকেরা পাইয়া থাকে। কুমারস্বামীর The Arts and Crafts of India and Ceylon গ্রন্থে যত প্রকার শিল্পতথ্য বিবৃত হইয়াছে, বুশেলের গ্রন্থেও তত প্রকার তথ্যের বিবরণ পাই—প্রচুর পরিমাণে।

চীনের বাসন (পোর্সলেন) সম্বন্ধে বুশেলের দুইখানা পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুইখানাই চীনা গ্রন্থের অনুবাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে Hsiang Yuan Pien নামক একজন প্রসিদ্ধ চীনা সংগ্রাহক ও সমজদার বহু পুঁথি, বাসন ও চিত্র সংগ্রহ করিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বুশেল তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম "Chinese Porcelain—Sixteenth Century Coloured Illustrations with Chinese Ms. Text by Hsiang Yuan Pien. Translated and annotated টীকা এবং ভূমিকা মূল্যবান্।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে Chu Yuen নামক চীনা সংগ্রাহক ও সমালোচক "Tao Shuo" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার ইংরেজি অনুবাদ ও ভূমিকা টীকাসহ বুশেল কর্ত্তৃক Chinese Pottery and Porcelain নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইখানা গ্রন্থই অবশ্য পাঠ্য।

চীনের বাসন সম্বন্ধে একটা কথা ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। চীনা তত্ত্বজ্ঞেরা এই বাসনগুলি কেবল বাসনভাবে সমাদর করেন না। চীনারাও করিত না। সমগ্র চীনা সভ্যতার অন্যান্য আদর্শের সঙ্গে এই বাসন প্রস্তুতকরণের সামঞ্জস্য ছিল। কাব্য রচনা, মূর্ত্তি গঠন, চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীত-কলার ন্যায় বাসন-নির্ম্মাণ একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প বিবেচিত হইত। চীনা

জীবনধারার লক্ষ্য ও গতি বুঝিবার জন্য বাসন-তত্ত্ববিদেরা এই কারণে চীনা দর্শনের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদের দেশে যেমন আকাশ-প্রদীপ, "পুণ্যি-পুকুর", গোকালব্রত, তুলসীগাছ পূজা ইত্যাদির কবিত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চীনের বাসন সম্বন্ধেও কবিত্ব এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ও মূর্ত্তি বুঝিবার জন্য যেরূপ সাধনা আবশ্যক, সেরূপ সাধনা লইয়া অগ্রসর না হইলে নাকি বাসন-মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। যাক্, সে অনেক কথা।

চীনা চিত্র-সমালোচকগণের প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। বার্লিনের The Ostasiati:che Zeitschrift নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ষড়ঙ্গ" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতীয় চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গসম্বন্ধে আলোচনা আছে। বাৎস্যায়নের "কামসূত্র" (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬৭০ ? ২০০ খৃষ্টীয় ?) গ্রন্থে এই ষড়ঙ্গ-তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ পাই। চীনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক সিয়েহোর (Hsieh Hoএর) মতেও ষড়ঙ্গই চিত্রকলার "লক্ষণ"। কিন্তু তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। বাৎস্যায়ন সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মত সন তারিখ নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু তিনি চীনা-সমালোচকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চীনা ষড়ঙ্গ-তত্ত্ব ভারতীয় ষড়ঙ্গ-তত্ত্বের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল কি ? এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। ভারতীয় ষড়ঙ্গের বিশদ আলোচনা Modern Review (October 1915) পত্রে বাহির হইয়াছে।

চীনা চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ সেদিন এখানকার কমার্শ্যাল প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম Chinese Pictorial Art লেখক Strehlneek রুশ। ইনি শিল্পীও নহেন, সাহিত্যিকও নহেন, সমজদারও নহেন—ইনি ব্যবসাদার। ইঁহার সঙ্গে হ্যাং-চাও নগরে প্রথম

দেখা হইয়াছিল—পরে শাংহাইয়ে ইঁহার গৃহে সংগৃহীত দ্রব্যাদি কয়েকবার দেখিয়াছি। পুস্তকের মধ্যে চীনা সমালোচকগণের মত মূলসহ অনূদিত হইয়াছে। ইনি বহুকাল হইতে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। যথেষ্ট ধনাগমও হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থে বিবৃত চিত্রগুলি সমস্তই সুইডেনের ষ্টক্‌হলম নগরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ক্রয় করিয়াছেন।

প্রাচীন চীনা দ্রব্যের সংগ্রহ এবং ক্রয়বিক্রয় একটা বড় রকমের ব্যবসায়-বিশেষ। মিশরে এই ধরণের ব্যবসায় আরও বড়। চীনের বড় বড় সহরে এইরূপ আড়ত আছে। একজন ইংরেজ সমজদার শ্রীযুক্ত Bahr এবং তাঁহার ভাই শাংহাইয়ে কারবার করেন। তাঁহাদের ঘরে যাইয়া কয়েকবার চিত্র, মূর্ত্তি, মুদ্রা, বাসন ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়াছি। ভাই মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে ফড়িং, প্রজাপতি, ডিম্ব, পোকা ইত্যাদি নানাবিধ জীব সংগ্রহও করিয়া থাকেন। বিলাতেই ইঁহাদের মাল বিক্রী হয় বেশী। তবে যুদ্ধের প্রভাবে বাজারটা আমেরিকার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

চীনতত্ত্ব-প্রচারকগণের মধ্যে শিকাগো ফীল্ড মিউজিয়ামের (Chicago Field Museum) জার্ম্মাণ পণ্ডিত Berthold Laufer প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। Legge, Giles, Hirth ও Grootএর যেরূপ সম্মান Lauferএর সম্মানও সেইরূপ। ইঁহার রচনাবলী ইংরেজীতে প্রকাশিত বলিয়া পড়া গিয়াছে। কিন্তু এইরূপই প্রসিদ্ধ ফরাসী Chavannes এবংBurnoufএর রচনা চোখে দেখি নাই। Burnouf ভারতীয় পণ্ডিতমহলে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনাক্ষেত্রে সুপরিচিত। চীনতত্ত্বে Chavannesএর স্থান ভারত-তত্ত্বে ফরাসী Sylvain Leviএর অনুরূপ। ফরাসী Bazin প্রণীত Theatre Chinois গ্রন্থের নাম Chinese Sociologyতে দেখিয়াছি।

লাওকার চীন, তিব্বত, মাঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপান

সম্বন্ধে শিকাগোর মিউজিয়ামে তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। ইনি নৃতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ। ইঁহার আলোচনায় সভ্যতার নানা বিভাগই স্থান পাইয়া থাকে। ভারতীয় পণ্ডিতগণও লাওফারের কার্য্যাবলীর পরিচয় লইতে পারেন। অল্পকাল হইল, ইনি আমাদের "চিত্রলক্ষণ" জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। নাম Das Chitralakshana। ইহার ভূমিকায় অনুবাদক বলিতেছেন যে, চীনা চিত্রশিল্পের অবয়ব অনেকাংশে ভারতীয় কলার প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল। Ostasiastische Zeitschrift পত্রিকায় ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই পুস্তকের সমালোচনায় লাওফারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"Laufer holds that the influence of Indian Painting in China was not confined to Buddhist subjects but that it extended to the composition and technique especially the colouring of painting in general" সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পেরও প্রেরণা নিঃসৃত হইয়াছে।

সিনলজি সম্বন্ধে লাওফারের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম Jade. A Study in Chinese Archæology and Religion। ইনি যত দিক্ হইতে চীনা সভ্যতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর কোন পণ্ডিত বোধ হয় তত দিক্ হইতে চীনাতত্ত্বে প্রবেশ করেন নাই। অধিকন্তু লাওফারের চীনতত্ত্ব-বিষয়ক প্রত্যেক রচনায়ই ন্যূনাধিক পরিমাণে সমগ্র এশিয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই কারণে ভারতীয় ভারতৈতিহাসিকগণের পক্ষে লাওফারের গ্রন্থাবলী অবশ্য পাঠ্য। ইনি জার্ম্মাণ ভাষায়ও একাধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

কয়েকদিন হইল Lockhart-এর Chinese Coins বাহির হইয়াছে। চীনা মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই প্রথম গ্রন্থ। প্রকাশক, লণ্ডনের এশিয়াটিক-

সোসাইটি। ভূমিকা এবং ছবি দেখিয়া কলিকাতায় রাখালদাসের নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিলাম।

চীনারা এখনও নিজেদের জীবন আলোচনা করিতে অগ্রসর হয় নাই। কোনমতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য চীনা-সমাজে সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যেই এই সমাজে বর্ত্তমান জগতের বিদ্যা প্রচারিত হইতে পারিবে। এই কারণে স্বদেশের জাতীয় সম্পদ্ আলোচনা করিবার দিকে চীনারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। নবীন জীবন গঠনে এই অতীত সভ্যতারও আবশ্যকতা আছে, একথা ইহারা সম্প্রতি বুঝিতেছে না। কাজেই চীনতত্ত্বে চীনা পণ্ডিতের নাম পাই না। কু-হুংমিঙ্ই চীনের একমাত্র স্বদেশী "সিনলগ"।

যুবক চীন স্বদেশী সভ্যতার গৌরবও করে না—নব্য পাশ্চাত্য সভ্যতাও আশানুরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইহাদের জীবন দেখিলে মনে হয়, যেন লক্ষ্যশূন্য ভাবে ইহারা চলাফেরা করে। কোনো আদর্শে ইহারা মাতিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রাণমাতানো ভাবুকতার অভাব চীনে অত্যধিক দেখিতেছি।

চীনা ছাত্রেরা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পি, এইচ, ডি উপাধি পাইবার জন্য একটা করিয়া "মৌলিক" গ্রন্থ রচনা করিতে বাধ্য হয়। সেই উপলক্ষে চীন সম্বন্ধে কয়েকখানা চীনা প্রণীত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। প্রাচীন জীবন লইয়া লিখিত Chen প্রণীত The Economic Principles of Confucius এবং Kuo প্রণীত Chinese System of Public Education। (ইহার চতুর্থাংশ মাত্র প্রাচীন চীনের তথ্যে পূর্ণ) দুই-ই নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ লইয়া

দুই একখানা পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য লিখিত গ্রন্থও আছে। Wen প্রণীত Currency Problem in China, Chen প্রণীত Taxation in China (1644-1911) Koo প্রণীত Status of Aliens in China এবং Yen প্রণীত Constitutional Development in China, সবই কলম্বিয়া হইতে প্রকাশিত। চীনের আদর্শ লইয়া Spirit of Chinese Philanthropy শ্রীযুক্ত Tsu কর্ত্তৃক লিখিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, চীনকে বুঝিবার জন্য চীনাদের মধ্যে যথার্থ আন্দোলন সৃষ্ট হয় নাই। অতীতকে জাগাইয়া বর্ত্তমানকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিবার প্রচেষ্টা আরব্ধ হয় নাই। কাজেই ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিবার পাকা আয়োজন দেখিতে পাইতেছি না। চীন এখনও সত্যভাবে জাগে নাই বলিতে বাধ্য।

চীনকে একবার ভারতবর্ষ জাগাইয়াছিল। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। ফা-হিয়ানাদি চীন সন্তানগণ বিক্রমাদিত্যের ভারত হইতে ভাবুকতা আনয়ন করিয়া চীনা সভ্যতার "স্বর্ণযুগ" গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বর্দ্ধন যুগের ভারতীয় আদর্শ (৩০০-৭০০ খৃঃ অঃ) তাঙ্-সুঙ্ (৬০০-১২৫০ খৃঃ অঃ) যুগের চীনা "রে-নে-সাঁ-স" বা নবাভ্যুদয়ের সূত্রপাত করিয়াছিল। সেইরূপ বর্ত্তমান যুগের চীনা জাগরণ ও ভারতীয় ভাবুকতার আবেষ্টনেই সাধিত হইবে। ভারতীয় মন্ত্রই চীনকে জাগাইতে পারিবে। আর চীন এই ভাবে না জাগিলে জগতে নবজীবন গঠিত হইবে না। সুতরাং ভারতের দায়িত্ব অতি গুরুতর। বস্তুতঃ এশিয়ার সকল স্থান হইতেই ভারতবর্ষের ডাক পড়িয়াছে। নব্য ভারতের ভাবুকতা চোখে বুলাইবার জন্য মিশর এবং পারস্যও উদ্‌গ্রীব। অতএব ভাবুকতাময় যুবক ভারতকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি—

মিশরীয়েরা ডাকিছে তোমারে,
চীনারাও ডাকে 'আয় আয়' ক'রে,
পারসীকত সদাই বলে বারে বারে,
"ভাই হিন্দুস্থানী এশিয়া তোমার।"

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ এশিয়ার বিদ্যালয় ছিল। বিংশশতাব্দীতে ভারত-মাতা পুনরায় এশিয়াবাসীর দীক্ষাগুরু হইবেন।

লাওফারের অনেক রচনাই পত্রিকার ক্রোড় হইতে বাহির হয় নাই। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীতে বসিয়া কতকগুলি "রিপ্রিন্ট" পুস্তিকা দেখিয়াছি। সাধারণের পক্ষে সেগুলি হস্তগত করা কঠিন। কিন্তু প্রত্যেক রচনায়ই মুখ্যভাবে অথবা গৌণভাবে ভারতবর্ষের কথা আছে। চীনতত্ত্বজ্ঞের মধ্যে Chavannes এবং Burnof ভারত-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু লাওফারও যে ভারততত্ত্বে দৃষ্টি দিয়াছেন এ কথা ভারতবাসীর জানা আবশ্যক।

পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত লাওফারের নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি আমাদের কাজে লাগে।

(১) Historical Jottings on Amber in Asia (American Anthropological Association vol. I. pt. 3)

(২) Was Odoric of Pordenone ever in Tibet? ("Toung-Pao" July, 1914)

(৩) Some Fundamental Ideas of Chinese Culture (Journal of Race Development October 1914)

(৪) History of the Finger-Print System (Smithsonian Report (1912)

(৫) A Lanscape of Wang Wei (Ostasiatische Zeitochrift)

(৬) Arabic and Chinese Trade in Walrus and Narwhal Ivory ("Toung-Pao" vol. xiv)

(৭) The Relations of the Chinese to the Philippine Islands (Smithsonian Miscellaneous Collections 1907)

ফীল্ড মিউজিয়ম হইতে নিম্নলিখিত দুইখানা নাতিবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) Notes on Turquois in the East

(২) The Diamond : A study in Chinese and Hellenistic Folklore.

ফ্রেডরিক হার্থের Chau-Ju-Kua এবং China and the Roman Orient যে জাতীয় রচনা লাওফারের এই সকল রচনাও সেই জাতীয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লেন দেন, আমদানি-রপ্তানি, ভাববিনিময়, আদানপ্রদান ইত্যাদি কিরূপ চলিত, তাহার পরিচয় এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা ভারতবর্ষের বৈষয়িক ইতিহাস, সমুদ্র-বাণিজ্য এবং এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের তথ্য জানিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট লাওফারের রচনাবলী অমূল্য।

চীন-সম্বন্ধীয় ইঁহার আর দুইখানা গ্রন্থের নাম করিতেছি :—

(১) Chinese Pottery of the Han Dynasty (Brill Co, Leiden)

(২) Chinese Clay-figures, Part I. Prolegomena on the History of Defensive Armor (Chicago).

দ্বিতীয় গ্রন্থের রচনায় ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত অপরিচিত আলোচনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে বলিতে পারি, কিন্তু ইহাতে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচুর আছে। প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"A task of great interest, and one which heretofore has not been attempted. It will be recognised that this subject sheds new light on the ancient culture of China and her relations to other Culture-Zones of Asia" গ্রন্থের ভিতরে সম্প্রতি প্রবেশ করিব না। যদি চীন বা ভারত সম্বন্ধে কখনো কোনো সন্তোষজনক কেতাব লিখিতে পারি, তাহা হইলে লাও-ফারের আবিষ্কারসমূহের এক কণা বঙ্গভাষায় বাহির হইবে।

চীনা কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব বোধ করিয়াছি। সেইরূপ এখানকার দর্শন-সাহিত্য সম্বন্ধেও আধুনিক আলোচনা অত্যল্প। আর, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, গণিত, অর্থশাস্ত্র, শিল্প, কৃষি, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-রক্ষা, নগরগঠন, ধাতু-তত্ত্ব ইত্যাদি-বিষয়ক চীনা আবিষ্কার সমূহের বিবরণ কোন মতেই পাইতেছি না। আমাদের প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry, গোপাল-রাজের History of Aryan Medical science, রামরাজের Essay on the Architecture of the Hindus অথবা ব্রজেন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত Positive Sciences of the Hindus জাতীয় রচনা চীন-তত্ত্ববিষয়ক কোন ইংরেজী গ্রন্থে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। Martin প্রণীত The Lore of Cathay গ্রন্থে যৎকিঞ্চিৎ আছে। কিন্তু এই সকল দিকে অনুসন্ধান চালিত হইলে চীনা জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারত-বর্ষের প্রভাব অভাবনীয়রূপে সপ্রমাণ হইবে।

(১১) "চীন, জাপান ও ভারত"

আমার "হিন্দু চোখে চীনা-ধর্ম্ম" নামক ইংরেজি গ্রন্থের অপর নাম "এশিয়াবাসীর চিত্ত"। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলী হইতে ন্যূনাধিক তথ্য

সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "চীন, জাপান ও ভারত" নামে প্রকাশিত হইবে।

জাপানী ওকাকুরা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Ideals of the East যেখানে আরম্ভ করিয়াছেন, আমি আমার Chinese Religion Through Hindus সেইখানে শেষ করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পংক্তি "Asia is One" আমার রচনার শেষ অধ্যায়ের শেষ পংক্তি "I stop just at the threshold of the great Asiatic Unity" ওকাকুরার গ্রন্থে জাপানের শৈশবকাল হইতে আলোচনা সুরু করা হইয়াছে। আমার পুস্তকে ভারত ও চীনের মধ্যাহ্নকালে আলোচনা শেষ করিয়াছি। বস্তুতঃ এই মধ্যাহ্নকালের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি। জাপানের শৈশব ভারত ও চীনের মধ্যাহ্নকাল। আমাদের হিসাবে উহা হর্ষবর্দ্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর যুগ, চীনা হিসাবে তাঙ-বংশীয় তাইৎ-সুঙের যুগ, জাপানী হিসাবে অসুকা প্রদেশে রাজকুমার শোতোকুর নেতৃত্বে গোড়াপত্তনের যুগ। উহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্যগণের গৌরবরবি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনশত বৎসর ধরিয়া ভারতে প্রকাশমান ছিল। এই যুগে কালিদাসের জীবদ্দশায় চীনা ভিক্ষু ফাহিয়ান ভারত পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পর সাড়ে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত চীনা ও ভারতবাসীর এশিয়ায় গমনাগমন বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে চীন এবং আনুষঙ্গিকভাবে জাপান) ভারতীয় প্রভাব মণ্ডলের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। সেই ভারতীয় প্রভাবকে লোকেরা বৌদ্ধ প্রভাব বলিয়া জানে। বস্তুতঃ এই তথাকথিত বৌদ্ধপ্রভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ হইতে গণিত, রসায়ন, শিল্প, কলা, দর্শন, যন্ত্র, উৎসব ইত্যাদি যাহা কিছু ভারতের বাহিরে গিয়াছে, সকলই সংক্ষেপতঃ ভারত-সন্তান বা ভারত দেবতা বুদ্ধের

নামে প্রচলিত হইয়াছে। এই "বুদ্ধ-মার্কা" ভারতীয় প্রভাব বা তথাকথিত বৌদ্ধপ্রভাব চীনে এত অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছিল যে, চীনাদের চিন্তা-প্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, সুকুমার শিল্প, গণিত-বিদ্যা, তর্কবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, লোকরুচি ইত্যাদি সমস্তই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এমন কি, প্রাচীনতম কন্‌ফিউশিয় ধর্ম্ম ও নবরূপ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ সপ্তম শতাব্দীতে চীনা নেপোলিয়ান তাইৎ-সুঙ্ (৬২৭-৫০ খ্রীঃ অঃ) যখন তাঙবংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চীন-সমাজকে সভ্যতাহিসাবে "বৃহত্তর ভারতে"র একটি উপনিবেশ মাত্র বিবেচনা করা যাইত।

অর্থাৎ বাঙ্গালী নেপোলিয়ান ধর্ম্মপাল ও বিজয় সেন, গুর্জ্জর প্রতিহার নেপোলিয়ান মিহিরভোজ ও মহেন্দ্রপাল এবং তামিল নেপোলিয়ান রাজরাজ ও রাজেন্দ্রচোল ইত্যাদির সমসাময়িক চীন কালিদাস-বরাহ-মিহির-প্রবর্ত্তিত হিন্দু সভ্যতার প্লাবনে নিমজ্জিত ছিল। চীনারা তাহাদের এই যুগকেই "অগষ্টান এজ" বা স্বর্ণযুগ বলিয়া থাকে। এই যুগের চিত্রশিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিই জগতে সুপ্রসিদ্ধ। চীনের গৌরবসূচক কোন বস্তুর নাম করিতে হইলে তাঙ্-সুঙ্ (৬০০-১২৫০ খৃঃ) যুগের বস্তু উল্লেখ করিতে হয়। সেই তাঙ্-সুঙ্ যুগের জন্মদাতা আমাদের কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের ভারত। আর সেই তাঙ্-সুঙ্ যুগই জাপানী জীবনের প্রবর্ত্তক। ওকাকুরা এইখানে তাহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন— আমি এইখানে আমার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি। চীন, জাপান ও ভারত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইল এইটুকু মাত্র দেখিয়াই লেখনী সংবরণ করিলাম —ওকাকুরা সেই ঐক্যের ক্রমবিকাশ প্রধানতঃ জাপানী সমাজ হইতে দেখাইয়াছেন।

গুপ্ত বর্দ্ধন-পাল-গুর্জ্জর চোল-সেন (খৃঃ অঃ ৩০০-১২০০) গণের

ভারত মধ্যযুগের চীনে ও জাপানে (এবং অপর দিকে পারস্তে ও এশিয়া-মাইনারে) কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বোধ হয় কেতাব শেষ করিতে পারিতাম না। পুস্তক লেখা শেষ হইলেও তাহা ছাপিবার টাকা জুটিত না।

কাজেই মধ্য-যুগের এশিয়া (আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া লইলে) চীনা-জাতির স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে সম্প্রতি আত্মসংবরণ করিলাম। কিন্তু সে বৃত্তান্ত ভারতবাসীকেই লিখিতে হইবে। জাপানীরা এখন অন্য চিন্তায় মত্ত—পারসীক ও মিশরীয়েরা এই সকল তথ্য সবিশেষ অবগত নহে। আর বেচারা চীনসন্তানগণ মুমূর্ষু-অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে। একমাত্র নিঃসম্বল ভারতীয় ভাবুকই দুনিয়ার সভ্যতায় মধ্যযুগের এশিয়াবাসীর কৃতিত্ব এবং তাহাতে কালিদাস-বরাহমিহির-বিক্রমাদিত্যগণের স্থান সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অধিকারী।

ওকাকুরার গ্রন্থ পাঠ করিলে লোকেরা বুঝিবে যে, ভারতীয় প্রভাবে চীন, জাপান ও হিন্দুস্থান ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রাচ্য এশিয়ার ৮০ কোটি নরনারীর ঐক্য তথাকথিত বৌদ্ধপ্লাবনে সাধিত হইয়াছিল। হিন্দু ও চীনাজাতিদ্বয়ের আদানপ্রদানে এবং চীনা ও জাপানী জাতিদ্বয়ের আদানপ্রদানে এই ঐক্যসূত্র সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে খৃষ্টীয় চতুর্থ-সপ্তম শতাব্দীতে এইরূপ আদানপ্রদান, ভাববিনিময় এবং পর্য্যটকগণের গমনাগমন সাধিত না হইলেও বর্ত্তমানযুগে চীন, জাপান ও ভারতের ঐক্য দেখিতে পাইতাম। আমার রচনায় প্রাগ্‌-বৌদ্ধ এশিয়াও এক—এই মত প্রচারিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে আদানপ্রদানের সুযোগ থাকায় সেই ঐক্য বাড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু ভারত হইতে নূতন প্রভাব চীনে আমদানী না করিলেও আজ চীনে ও ভারতে বহুবিষয়ে সাম্য ও সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এইজন্য

খৃষ্টীয় চতুর্থ-সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার চীনা চিন্তাধারা আলোচনা করিতে হইয়াছে। বুদ্ধের নাম চীনে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। তাহার পূর্ব্বেকার চীনাজীবনও আলোচনা করা হইয়াছে—অধিকন্তু প্রাচীনতম কন্‌ফিউশিয় মতবাদ এবং প্রাক্-কন্‌ফিউশিয় চীনের সমাজও আলোচিত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, চীনে এবং ভারতে নরনারীগণের চিন্তা সমান্তরালভাবে একই পরিণতির দিকে প্রবাহিত হইতেছিল। দৈবক্রমে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম সাধিত হইয়াছে—সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মসম্মিলনের পরে এশিয়াবাসীর জীবন অধিক পরিমাণে "Asia is One" পদবাচ্য হইয়াছে। সুতরাং এশিয়ার ঐক্য কেবলমাত্র ধর্ম্মের ঐক্যে স্থাপিত নয়—ইহা আরও গভীরতর ভিত্তির উপর অবস্থিত। চীনা ও হিন্দু জন্মিয়াই এক—এশিয়াবাসীর চিত্ত সর্ব্বত্র একই উপাদানে গঠিত।

"চীন, জাপান ও ভারত" গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়

আমার অনুমান

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-কন্‌ফিউশিয় চীনে এবং প্রাক্-শাক্য (বৈদিক) ভারতে
বিশ্বশক্তির আরাধনা (—খৃঃ পূঃ ৭০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ—যজ্ঞ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পিতৃপূজা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ঋত, "তাও" বা সনাতন-ধর্ম্ম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—"একম্"

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক কন্‌ফিউশিয়াস এবং দার্শনিক শাক্যসিংহ

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রবীরগণের স্বধর্ম্ম—তথাকথিত ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সামঞ্জস্য-নিষ্ঠা (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০—১০০)

পঞ্চম অধ্যায়

চীন ও ভারতের দেবদেবী—সৰ্ব্বপ্রথম দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্‌গণের যুগ (খৃঃ পূঃ ৩৫০—১০০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জন্মকথা (খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০—খৃঃ ১০০)

(খ) ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্ম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শাক্যসিংহের প্রস্থান, বুদ্ধ"দেব" এবং তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গের প্রবেশ

(ক) ভাবুকতাময় (ভক্তি ও প্রেম) ধর্ম্মের উৎপত্তি

(খ) পারসীক এবং ইহুদী সমাজদ্বয়ের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

(গ) বুদ্ধ"দেবে"র যমজ-প্রায় ভারতের অন্যান্য দেবদেবী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আন্তর্জ্জাতিক দর্শন-বিনিময়ের খতিয়ান ও হিসাব নিকাশ

(ক) প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের একচোখো দাবী

(খ) স্বাধীন ও সমান্তরাল ক্রমাভিব্যক্তি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—হিন্দু-চীনা লেন দেনে ঘটক বা দালাল

(ক) জগতের ইতিহাসে মঙ্গোলিয় তাতার জাতির দান

(খ) কুশান বা ইন্দো সীথিয় (তাতার) রাজবংশের কৃতিত্ব

(গ) গ্রেকোরোমাণ প্রভাব সমন্বিত বৌদ্ধস্থাপত্য।

সপ্তম অধ্যায়

চীনের এক তথাকথিত অরাজকতার যুগ (খৃঃ অঃ ২২০—৬১৮)

প্রথম পরিচ্ছেদ—কালানুসারে সমালোচনা এবং তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—চীনা ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তথাকথিত কনফিউশিয় ধর্ম্ম, তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্ম, তথাকথিত "বৌদ্ধ ভারত", তথাকথিত "বৌদ্ধচীন"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—এশিয়ায় ঐক্যপ্রবর্ত্তনের অগ্রণীগণ

অষ্টম অধ্যায়

"বৃহত্তর ভারতে"র গোড়া-পত্তন—বিশ্বে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের প্রারম্ভিক যুগ (খৃঃ অঃ ৩০০—৬০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ—রাজচক্রবর্ত্তী বা ভারতীয় নেপোলিয়ানের দিগ্বিজয়

নবম অধ্যায়

চীনা সভ্যতার স্বর্ণযুগ (খৃঃ অঃ ৬০০—১২৫০)

দশম অধ্যায়

জাপানী জাতির ধর্ম্মজ্ঞান

একাদশ অধ্যায়

চীনা-জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুধর্ম্ম

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

এশিয়াবিষয়ক সামাজিক তথ্যের সংগ্রহ ও সমালোচন

এই গ্রন্থ মধ্যযুগের তিনজন এশিয়া-সন্তানের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে—একজন ভারতবাসী, একজন চীনা, একজন জাপানী।

ভারতবাসীর নাম কুমারজীব। ইনি আমাদের ইতিহাসে স্থান পান নাই—কিন্তু চীনে ইনি ধর্ম্মাত্মা শিক্ষাপ্রচারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি "আর্য্যাবর্ত্তবাসী ছিলেন—পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে বসতিস্থাপন করেন—অবশেষে মধ্যএশিয়ার পথে চীনে যাইয়া জনগণের দীক্ষাগুরু হন। ইঁহার জীবনের বেশী কথা জানিতে পারি নাই। একাধিক বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সমাজে ইঁহার প্রভাব খুব বেশী। যে সময়ে ফাহিয়ান মধ্যএশিয়ার পথে ভারতে আসিতেছিলেন সেই সময়ে ইনি চীনে গমন করেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দের দুই এক বৎসর আগে বা পরে ইনি চীনে উপস্থিত হন—চীনেই মৃত্যু হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্ অশোক এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে ভারত-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কুমারজীবের ন্যায় ভারতীয় শিক্ষাপ্রচারকগণ গুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের আমলে সেই প্রভাব চীনে অর্থাৎ প্রাচ্য-এশিয়ায় লইয়া যান। তাঁহাদের অনেকের নাম খুজিয়া পাওয়া যায় না। যে কয় জনের সন্ধান পাই তাঁহাদের মধ্যে কুমারজীব শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং "বৃহত্তর-ভারত"-স্থাপয়িতা হিন্দুকর্ম্মবীরগণের পঞ্জিকায় কুমারজীবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চীনসন্তানের নাম হুয়েন্থ-সাঙ্ বা য়ূয়ান্-চাঙ্ (৬০২—৬৬৪)। ইঁহার নাম ভারতে সুপরিচিত। ইনি আমাদের দুই প্রবলপ্রতাপ নরপতির অতিথি ছিলেন। ষোল বৎসর ধরিয়া ইনি ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা

করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইনি দিবারাত্রি তাঁহার হিন্দুবিদ্যা নানা ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় ইঁহার অসংখ্য অনুবাদগ্রন্থ আছে। প্রচারকার্য্যের জন্য চীনে ইঁহাকে এক বিরাট টোল খুলিতে হইয়াছিল! সেই টোলে বহু সহকারী, শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক একত্র পঠনপাঠন, গ্রন্থসম্পাদন, অনুবাদ ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিতেন। একাধিক জাপানী শিষ্যের গুরুরূপে ও হুয়েন্থ-সাঙ্ জাপানে প্রসিদ্ধ।

হুয়েন্থ-সাঙ প্রকৃতপ্রস্তাবে চীনে ভারতীয় আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ। ছয় শত বৎসর ধরিয়াই চীনে ভারত-তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছিল—হুয়েন্থ-সাঙের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ফাহিয়ানের ন্যায় ভাবুক ও ভক্ত চীনে হিন্দুবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচারের ফল হুয়েন্থ সাঙের সময়ে এবং পরে বহুল পরিমাণে প্রকটিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ চীনাসমাজে একটা ভারতীয় বন্যা ছুটিয়াছিল বলা যাইতে পারে। লোক-সাহিত্য, নাচগান বাজনা হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র, বীজ-গণিত, দর্শন যোগধ্যান পর্য্যন্ত সভ্যতার সকল অঙ্গই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু এই সময়ে চীনে এক নেপোলিয়ন-কল্প সম্রাট্ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার নাম তাঙ-বংশীয় তাইৎ-সুঙ্ বা তাই-চুঙ্ (খৃঃ ৬২৭-৫০)। সকল দিক হইতেই তাঙ-আমলে চীনে একটা নবজীবন বিকশিত হইতেছিল। হুয়েন্থ-সাঙ্ সেই নবজীবনের প্রারম্ভ-কালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া চীনাসমাজে যত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ফাহিয়ান তত হইতে পারেন নাই।

আর্য্যাবর্ত্তের হর্ষবর্দ্ধন এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলে হুয়েন্থসাঙ্ ৬২৯ হইতে ৬৪৫ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন—দেশে ফিরিবার পর অন্ততঃ বিশ বৎসর কাল ভারতীয় সভ্যতা চীনাসমাজে প্রচার করেন। ইনি আমাদের দেশে একজন চৈনিক পরিব্রাজক মাত্ররূপে পরিচিত।

ইঁহার লিখিত পর্য্যটনকাহিনী ভারতীয় ইতিহাসের এক সমসাময়িক সাক্ষী বলিয়া সম্মানিত। কিন্তু চীনা বৌদ্ধ সমাজে ইনি মহাপুরুষ, বুদ্ধাবতার বা জগদ্‌গুরুরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আমাদের শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য হিন্দুর চিন্তায় যে স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, হুয়েন্থ-সাঙ্‌ চীনা বৌদ্ধদিগের চিন্তায় সেই স্থান অধিকার করেন। ভারতে বসিয়া এরূপ বুঝিতে পারি নাই।

ভারতবর্ষের চীনা নাম তিয়েন্‌-চু (Tien-chu) অর্থাৎ স্বর্গ। জাপানী নাম তেন্‌-জিকু (Ten jiku) তাহারও অর্থ এই। সুতরাং হুয়েন্থ-সাঙ্‌ সেই স্বর্গ ভূমিতে পর্য্যটনপূর্ব্বক বিদ্যামৃত বহন করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিলেন তখন পতিতপাবনী গঙ্গার ভগীরথরূপে জনগণের ভক্তি আকর্ষণ করিবেন না কেন? বস্তুতঃ তাহাই বুঝিতেছি। কিন্তু সত্যভাবে বুঝিতে হইলে একবার তাঙ-সুঙ্‌ যুগের চীনা-সাহিত্যে প্রবেশ করা আবশ্যক। হুয়েন্থ-সাঙের টোল বা হিন্দু সাহিত্য-প্রচার-পরিষদের কার্য্যাবলী স্বচক্ষে না দেখিলে সে কথা যথার্থভাবে বুঝা যাইবে না। অধিকন্তু তিনি ষোল বৎসর ধরিয়া ভারতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আয়ত্ত করিতেছিলেন এবং সেই সমুদয় তত্ত্ব হজম করিবার পর বিশ বৎসর ধরিয়া সেগুলির কিরূপ আকার প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা ভারতবাসীর পক্ষে সম্প্রতি সদিচ্ছা মাত্র।

জাপানী মহাপুরুষের নাম কোবো দাইশী (৭৭৪—৮৩৫)। ইনি হুয়েন্থসাঙের একশত বৎসর পরবর্ত্তী কালের লোক—আমাদের শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। হুয়েন্থ-সাঙের জাপানী শিষ্যগণের মধ্যে দোশো নামক বৌদ্ধপ্রচারক জাপানে অদ্যাবধি পূজা পাইতেছেন। সপ্তম ও অষ্টমশতাব্দীতে এবং পরবর্ত্তী কালেও চীনের নানা কেন্দ্রে বহুসংখ্যক হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-পরিষৎ বা ভারতীয় বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই সকল পরিষদে বা বিদ্যালয়ে ভারতীয় অধ্যাপকগণের নামও শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারত, মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ-ভারত, প্রাচ্য-ভারত, আনাম, কোচিন-চীন ইত্যাদি নানা স্থান হইতে জলপথে অথবা স্থলপথে ভারত-সন্তানগণ চীনে অধ্যাপনা করিতে নিমন্ত্রিত হইতেন। চীনের বড় বড় সহরে বর্দ্ধিষ্ঠ হিন্দু টোলা বা ব্রাহ্মণপাড়া দেখা যাইত। Beal এবং Bungiu Nanjio প্রণীত পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে ভারতীয় শিক্ষা-প্রচারকগণের নাম পাওয়া যায়। সেই যুগে জাপানীরা চীনে আসিয়াই ভারতবর্ষের দান গ্রহণ করিত—ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত কোন জাপানী আসিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতাব্দীতে যে কয়জন জাপানী চীনে ভারত-তত্ত্ব শিক্ষা করেন, তন্মধ্যে কোবো দাইশী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। বলিতে কি, জাপানী বৌদ্ধসমাজে কোবো দাইশীর সমান পূজা প্রাপ্ত মহাপুরুষ বা বুদ্ধাবতার বা পরমহংস বা জগদ্‌গুরু আর কেহ আজ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হন নাই। জাপানে থাকিবার সময়ে কোবো দাইশীর নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোয়াসান পাহাড়ের আশ্রমে এক রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। সেখানে জাপানী সংস্কৃত পুঁথির কথা প্রথম শুনিতে পাই।

কোবো দাইশী তিনবৎসর মাত্র চীনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (৮০৪-৬)। কিন্তু স্বয়ং হুয়েন্‌সাঙের শিষ্য দোশো জাপানে ভারততত্ত্ব যতখানি প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, কোবো দাইশী তাহা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সংস্কৃতভাষার প্রচার, দেবনাগরী লিপির অনুকরণে জাপানী "কাটা কানা" লিপির প্রবর্ত্তন, ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতগ্রন্থ, চিত্রশিল্প এবং দেবদেবীর প্রচলন পর্য্যন্ত নানা তথ্যই জাপানীরা কোবো দাইশীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া থাকে। আমরা কোবো দাইশীকেই এই কারণে

জাপানের হুয়েন্থসাঙ্ বিবেচনা করিতে পারি। তাঁহার সময় হইতেই জাপানে "বৃহত্তর ভারতে"র সবিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারতৈতিহাসিকের নিকট কুমারজীব, হুয়েন্থসাঙ্ এবং কোবোদাইশী তিনজনই একশ্রেণীর অন্তর্গত।

(১২) বর্ত্তমান চীন

ভারতবর্ষের কথা উঠিলে মোটের উপর ত্রিশ কোটি বা বত্রিশ কোটি বা পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর দেশের কথা সকলের মনে আসে। সেইরূপ চীনের নাম করিলে চল্লিশ কোটি মানুষের জন্মভূমি মনে করি। চীনের লোকসংখ্যা পণ্ডিতগণের অনুমান মাত্র—এখনও যথারীতি গণনা করা হয় নাই। কেহ বলেন এ দেশে মাত্র বিশ কোটি লোকের বাস—কেহ বলেন পঁচিশ কোটি—কেহ বলেন ত্রিশ কোটি—চল্লিশ কোটি কেহই বিশ্বাস করেন না।

আমরা ভারতবর্ষে হিমাচলের অপর পারের গোটা এশিয়া-খানাকেই সংক্ষেপে চীন বলিয়া জানি। বস্তুতঃ এই চল্লিশ কোটি বা ত্রিশ কোটি বা বিশ কোটি চীনাদের দেশ অত বড় নয়। পশ্চিমে তিব্বত ও তুর্কীস্থান, উত্তরে মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তরপূর্ব্বে কোরিয়া—এই পাঁচটি জনপদ খাঁটি চীনদেশের বহির্ভূত—রাষ্ট্রীয় হিসাবে বহুকাল পর্য্যন্ত এই সকল দেশ চীন-সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল এবং কাগজে কলমে এখনও আছে—কেবল কোরিয়া জাপানের পূরাপুরি হস্তগত হইয়াছে। তিব্বত এখনও বৃটিশ ভারতের সামিল হয় নাই—মঙ্গোলিয়ায় এবং মাঞ্চুরিয়ায় ও জাপানী রুশ একতিয়ার খোলাখুলি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে চীনা জাতি, চীনা সভ্যতা, চীনা সমাজ ইত্যাদি বলিলে কোন দিনই এই সকল দেশের কথা ভাবা হইত না—এখনও ভাবা

উচিত নয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার কোন অঙ্গের আলোচনায় যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা এই সমুদয় দেশের পরিচয় লইতেও বাধ্য। কারণ বুদ্ধের নাম এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন সর্ব্বত্রই পাইব।

এই সকল দেশের বৃত্তান্ত ভ্রমণ-কাহিনীর মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে নাই। কোন সেনাপতি অথবা ব্যবসায়ী অথবা বিজ্ঞানবিৎ কোন উপায়ে এই সকল দেশ ঘুরিয়া আসিয়া পর্য্যটন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পর্য্যটকের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, পাঠকেরা নিজ মতলব অনুসারে এই সমুদয় হইতে তথ্য সঙ্কলন করিতে পারেন। আমাদের তিব্বত-পর্য্যটক শরচ্চন্দ্র দাসের A Journey to Lhassa and Tibetএর নাম সকলেই শুনিয়াছি। পাঠ করিয়াছেন কয়জন, জানি না। তাঁহার প্রণীত Tibetan-English Dictionaryও সুপ্রসিদ্ধ। Sven Hedin এবং অন্যান্য পর্য্যটকগণের গ্রন্থাবলীও আছে।

Sherring প্রণীত Western Tibet and The British Borderland গ্রন্থের পরিচয়স্বরূপ নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, "The Sacred Country of Hindus and Buddhists, with an account of the Government, Religion and Customs of its peoples." ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ। বস্তুতঃ এই ধরণের গ্রন্থ সবই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রধানভাবে নূতন দেশের আবিষ্কার ও বিবরণস্বরূপ এই সমুদয় রচনা পাঠক-সমাজে আদৃত হয়। তবে গ্রন্থকার স্বয়ং অবশ্য তাঁহার স্বীয় জন্মভূমির রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক মহলে অন্যভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাহা গ্রন্থপাঠে বুঝিবার জো নাই—আন্দাজ করা যাইতে পারে মাত্র। শেরিঙের গ্রন্থ পশ্চিম তিব্বতবিষয়ক—পূর্ব্ব তিব্বতসম্বন্ধে Ward প্রণীত

Land of the blue Pappy প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের বিস্তৃত নাম "Travels of a Naturalist in Eastern Tibet."

তুর্কীস্থান ও মধ্য-এশিয়া আজকাল ভারতীয় পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত থাকিবার কথা। এই জনপদে যে সমুদয় নব নব মূর্ত্তি, অক্ষর, চিত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার বিবরণ না জানা থাকিলে মধ্যযুগের ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে হয়। Steinএর Ruins of Desert Cathay এবং অন্যান্য রচনা অনেকেই হয়ত পাঠ করিয়া থাকিবেন। রুশ, জাপানী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, নানাজাতীয় পণ্ডিতই মধ্যএশিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন। মধ্য এশিয়ায় ভারতের স্বদেশী পণ্ডিতগণের অভিযান পাঠানো হইবে কবে?

মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে প্রাপ্তব্য :—(১) Perry-Ayscough এবং Captain Otter-barry প্রণীত With the Russians in Mongolia (২) Hedley প্রণীত Tramps in Dark Mongolia (৩) Nansen প্রণীত Through Siberia The Land of the Future গ্রন্থকার Christiania বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Oceanography বা সমুদ্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক (৪) Turner প্রণীত Siberia : A Record of Travel, Climbing and Exploration (৫) Harrison প্রণীত Peace or War East of Baikal? জাপান, রুশিয়া এবং চীনদেশের বর্ত্তমান সমস্যার চিত্র।

কোরিয়া এক্ষণে জাপানীদের খাশ সম্পত্তি। এই সম্বন্ধে জাপানীদের স্বপক্ষে বিপক্ষে দু' একখানা গ্রন্থ আছে। সেগুলি মামুলি ধরণের। পরাধীন জাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কেহ লিখিয়াছেন—অথবা কোরিয়া ভারতবর্ষের মতনই "সুশাসিত" হইতেছে, এই তথ্য প্রচারের জন্য কেহ বা লিখিয়াছেন। তবে সুপণ্ডিত Curzon প্রণীত Problems

of the Far East গ্রন্থের কোরিয়া-অধ্যায়ে সকল পাঠকই তৃপ্তি পাইবেন। তিনি লাটসাহেব হইবার বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তখনও কোরিয়া লইয়া চীনে জাপানে সংগ্রাম বাধে নাই। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী ফলিয়াছিল। লর্ড কার্জন সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্র-মণ্ডল সম্বন্ধে যেরূপ পারদর্শী, বিলাতে এবং ইয়োরোপে সেরূপ পারদর্শী বিজ্ঞ লোক অতি অল্প আছেন। কাজেই এই গ্রন্থখানা অনেক হিসাবেই পাঠযোগ্য। Whighamএর Manchuria and Koreaও পড়া আবশ্যক। ইনি কার্জনের ন্যায় মুসলমান-এশিয়ার তথ্যও পারস্তবিষয়ক এক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রন্থই সচিত্র—মূল্যও অত্যধিক। এইগুলির মধ্যে Stein প্রণীত মধ্য এশিয়ায় খননকার্য্যবিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। কার্জন ও হুইগৃহামের গ্রন্থদ্বয় রাষ্ট্রনৈতিক। অন্যগুলিকে ভৌগোলিক আবিষ্কার বা বিবরণের সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ভূগোলশাস্ত্র আলোচিত হয় না বলিলেই চলে—আমরা ভূগোলকে নিতান্ত নীরস বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। মরা জাতির বিবেচনায় ভূগোল নীরসই বটে। জীবন্ত লোকের বিবেচনায় ভূগোলের সমান সরস বিদ্যা আর নাই। জীবন্তজাতির লোকেরা ভৌগোলিক সাহিত্য হইতে প্রধানতঃ তিন প্রকার জ্ঞান লাভ করে। প্রথমতঃ দেশের নদ-পর্ব্বত-বন-জঙ্গল মেঘ-বায়ু ইত্যাদির বৃত্তান্ত জানিয়া স্থানীয় আবহাওয়া, ঋতুপরিবর্ত্তন, স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লয়। মানুষের চিন্তায় এই সকল কথাই সর্ব্বপ্রধান কথা। দুনিয়ার সকল লোকই স্বাস্থ্য অন্বেষণ করে—বাঁচিয়া থাকিতে চায়। ভারতবাসী স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত—কাজেই ভূগোলের তথ্য সাধারণতঃ অনাবশ্যক জ্ঞানে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ হইতে

অনেকটা আন্দাজ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবন্ত জাতির পক্ষে ভুগোল-বিস্তা সম্পদ্-বৃদ্ধির সহায় এবং প্রধান অবলম্বন। ভারতবাসীর সম্পদ্ নাই—সম্পদ্বৃদ্ধির সম্ভাবনাও নাই—কাজেই ভূগোল আমাদের নিকট নীরস। তৃতীয়তঃ, দেশের সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা অবগত হইয়া জীবন্ত জাতি তাহাকে শত্রু হস্ত হইতে সুরক্ষিত করিবার আয়োজন করে। রাস্তাঘাট, দুর্গ, রেলপথ, বাঁধ, ইলেকৃট্রিক তার, ডাকঘর, সেতু ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সেনাপতি, এঞ্জিনিয়ার ও রাষ্ট্রবীর ভৌগোলিকের শরণাপন্ন হন। •স্বদেশ, সাম্রাজ্য ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ভুগোল-সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যরত্নে বঞ্চিত জাতির পক্ষে ভূগোল নীরস হইবারই কথা।

এশিয়ার সকল প্রদেশই ইয়োরামেরিকানের ভোগভূমি—সুতরাং স্বাস্থ্য, সম্পদ্ এবং সাম্রাজ্য তিন দিক হইতেই তাঁহারা এশিয়ার ভৌগোলিক বিবরণে সুখ পান। এত বড় সরস বিস্তা বোধ হয় আর নাই—কিন্তু ভারতীয় বালক বা যুবকের পাতে যে ধরণের ভুগোল-গ্রন্থ দেওয়া হয়, তাহাতে এই রসের এক কাঁচ্চাও নিংড়াইয়া বাহির করা যায় না। অধিকন্তু, ভারতবাসীর না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সম্পদ্, না আছে সাম্রাজ্য। কাজেই ভূগোল-চর্চ্চায় আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না।

এইবার খাঁটি চীনদেশ সম্বন্ধে এই ধরণের কয়েকখানা ভৌগোলিক গ্রন্থের নাম করি। প্রথমেই যুন্-নান্ প্রদেশের বিবরণ উল্লেখযোগ্য। আজকাল চীনের মধ্যে এই প্রদেশই সর্ব্ব-বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এই প্রদেশের লোকেরাই সর্ব্বপ্রথমে যুয়ানের সাম্রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া চীনে তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছে। যুন্ নান্ প্রদেশ আমাদের ভারতবর্ষের সংলগ্ন। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার

এই প্রদেশে প্রাচীন হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ‘মডার্ণ রিভিউ’ এবং ‘প্রবাসী’তে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিছুদিন হইল বৃটিশ পল্টনের সেনা-পতি Davies প্রণীত Yun-nan নামক বৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত নাম "The Link between India and the Yangtse." প্রথমেই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ইংরেজমাত্রেরই যুন্‌-নান্‌ প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। ইনি তিন কারণ দিয়াছেন। (১) বৃটিশ ভারতের পূর্ব্ব সীমা কয়েকশত মাইল ধরিয়া এই চীনা-প্রদেশের পশ্চিম সীমা। (২) ভারতবর্ষ হইতে চীনের ইয়াংসি-উপত্যকায় রেলপথ বিস্তৃত করিতে হইলে যুন্‌-নানের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। (৩) যুন্‌-নানের দক্ষিণ পূর্ব্বে ফরাসী-অধিকৃত টং-কিঙ্‌ প্রদেশ অবস্থিত, এবং উত্তর-পশ্চিমে তিব্বত সংলগ্ন। কাজেই ত্র্যহস্পর্শ!

Johnston প্রণীত From Peking to Mandalay গ্রন্থের নামেই পরিচয়। তবে ইহাতে যে পথে ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে, সে পথ নাকি পূর্ব্বে অন্য কোন পর্য্যটক ব্যবহার করেন নাই। লেখক Buddhist China নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাজেই ইনি ভ্রমণ বৃত্তান্তে নৃতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, লোকাচারতত্ত্ব ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি-সম্পন্ন। এই গ্রন্থের বিস্তৃত নাম A Journey from North China to Burma throgh Tibetan Ssuch Uan and Yun-nan. চীনের পশ্চিমতম অঞ্চলের কাহিনী ইহাতে সবিশেষ বিবৃত আছে। গ্রন্থকার উত্তর-চীন সম্বন্ধেও একখানা বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। চীনের জার্ম্মান প্রদেশ শান্‌-টুঙ্‌ বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানের হস্তগত হইয়াছে। ইহারই কিঞ্চিৎ উত্তরে ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক ইংরেজ অধিকৃত প্রদেশ। তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এইটুকু স্থানের বর্ণনায় লেখক সমগ্র চীনা সমাজ ও সভ্যতার চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখকের রচনা সরস—যাঁহারা ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন, তাঁহারাও Johnston প্রণীত Lion and Dragon in Northern China পাঠ করিয়া চীনতত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

খাঁটি চীন সর্ব্বসমেত আঠারটা প্রদেশে বিভক্ত—এই গুলির নাম ও ইহাদের রাজধানীর নাম অনেকেরই মনে থাকে না। একখানা বৃহৎ গ্রন্থে এই সমুদয় তথ্য চিত্তাকর্ষকভাবে বিবৃত হইয়াছে। Geil প্রণীত Eighteen Capitals of China বেশ সুলিখিত। ইনি The Great Wall of China গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। চীনের বিরাট্ প্রাচীর সম্বন্ধে আর কোন ইংরেজি গ্রন্থ নাই।

চীন-সম্বন্ধে সর্ব্ববিখ্যাত ভৌগোলিক গ্রন্থের নাম Comprehensive Geography of the Chinese Empire। Richard কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত। ইংরেজী অনুবাদ কেলীওয়াল্‌শের দোকানে পাওয়া যায়। বইখানা কাছে রাখা আবশ্যক।

Wallace নামক একজন ইংরেজ ভৌগোলিক ও পশুতত্ত্ববিৎ শাংহাই হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত স্থলপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমি এই পথে পড়িয়াছিল। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত The Big Game of Central and Western China গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শিকারীর চোখে চীনের বিবরণ পাই। আর একজন শিকারী ও পশু-তত্ত্ববিদের নাম Sowerby. ইনি সেদিন এখানকার এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে তাঁহার শেষ শিকারের বিবরণ প্রদান করিলেন। তাঁহার Fur and Feather in North China চীনা জানোয়ার সম্বন্ধে সুলিখিত গ্রন্থ।

বর্ত্তমান চীনের রাজস্ব, কর, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেগুলি চীনা ছাত্রগণ কর্ত্তৃক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, উপাধির জন্য লিখিত। ভারতীয়

মারাঠা বা মান্দ্রাজী পণ্ডিত ওয়াগেল প্রণীত গ্রন্থাবলীও উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে Morse প্রণীত Trade and Administration of China উল্লেখ করিতেছি। ইনি The Gilds of China এবং International Relations of the Chinese Empire গ্রন্থদ্বয়েরও রচয়িতা। সুন্ ইয়াৎ-সেন্ যে কয়দিন চীনে কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, সেই কয়দিনের মধ্যে তাঁহার উদ্যোগে China Year Book বাহির হইয়াছিল। বৎসর বৎসর উহা বাহির হইবার কথা—কিন্তু বিপ্লবের প্রথম বর্ষের পর আর কোন খণ্ড বাহির হয় নাই। স্বরাজ স্থাপনের বৃত্তান্ত ইহাতে আছে। রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জ দার্শনিকভাবে আলোচনা করিয়া Reinsch কয়েক বৎসর হইল Intellectual and Political Currents in the Far East রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বর্ত্তমান চীনের অনেক কথা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। রাইন্শ আমেরিকার উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন—এক্ষণে পিকিঙে ইয়াঙ্কি স্বরাজের রাষ্ট্রদূত। ইঁহার গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন অধ্যাপক Ross নব্য চীনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি সুলেখক। ইঁহার The Changing Chinese সুখপাঠ্য, যদিও হাল্কা ও ভাসাভাসা।

বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অথবা বিংশশতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগে চীনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র Bland এবং Blackhouse প্রণীত দুই খানা গ্রন্থে পাই। নাম (১) Annals and Memoirs of the Court of Peking from the 16th to the 20th Century এবং (২) China under the Empress Dowager. বঙ্গেতিহাসের নবাবী আমল-বিষয়ক গ্রন্থে এশিয়ার যে চিত্র পাওয়া যায়, চীনবিষয়ক এই দুই গ্রন্থে সেই শ্রেণীর চিত্র পাই।

পাদ্রী Macgowan প্রণীত Men and Manners of Modern China গ্রন্থে পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ। Cornaby প্রণীত China under the Searchlight গ্রন্থে চীন-সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত আছে। আধুনিক চীন-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থের নাম করা হইল, তাহার অধিকাংশই পাঁচ, সাত বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই গ্রন্থখানা ১৯০১ সালে লিখিত। তখন বোধ হয় বর্ত্তমান চীন-সম্বন্ধে ইংরেজিতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ একখানাও ছিল না। চীনের প্রতি দুনিয়ার দৃষ্টি সবেমাত্র পড়িয়াছে। চীন-সমস্যাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়া সমস্যা দাঁড়াইবে। কাজেই এক্ষণে প্রতিবৎসর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে দেখিতে পাইব।

একজন নারী-পর্য্যটক Mary Gaunt চীনে বেড়াইয়া A Woman in China গ্রন্থে বর্ত্তমান চীনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Two Years in the Forbidden City গ্রন্থে মাঞ্চু রাজকুমারী Der-Ling পিকিঙ্ নগরের প্রাসাদ-মহাল্লা বা নিষিদ্ধ পুরীর বিবরণ দিয়াছেন। ইনি দুই বৎসরকাল চীন-সম্রাজ্ঞীর প্রধান সহকারিণী ছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রীর সঙ্গে শাংহাইয়ে কয়েকবার আলাপ হইয়াছে। রাজপরিবারের অন্তঃপুরের কথা পূর্ব্বে আর কখনও বাহির হয় নাই।

কেতাবের দোকানে প্রবেশ করিলে বই কিনাইবার ভূত স্কন্ধে চাপিয়া বসেন। চীনে আটমাস থাকিতে থাকিতে প্রায় ৮০০৲ মূল্যের বই কিনিয়া বসিয়াছি! এখন দোকানে আর ভয়ে ভয়ে যাই না।

চীন সম্বন্ধে যত প্রকার ইংরেজি গ্রন্থ আছে, সকলগুলি ক্রয় করিতে বোধ হয় দুই কি আড়াই হাজার টাকা লাগে। এইরূপ দুই এক সেট্ কেতাব বাঙ্গালা দেশে মজুত থাকা আবশ্যক। চীনের তত্ত্ব ভারতে না ছড়াইলে চলিবে না। কলিকাতার ইম্পিরিয়্যাল-লাইব্রেরীতে বোধ হয়

চীনতত্ত্বের অনেক গ্রন্থই আছে। কিন্তু নিতান্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা "পড়ুয়া" লোক ছাড়া অত বড় লাইব্রেরীতে আমাদের বেশী লোক বোধ হয় প্রবেশ করেন না। "রামমোহন লাইব্রেরী"র মতন বাঙ্গালী-টোলার কোন লাইব্রেরীতে এক সেট্ চীনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রাখিলে, উত্তম-মধ্যম-অধম-শ্রেণীর অনেকেই ইচ্ছানুরূপ তাহার ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। কোন ধনী বিদ্যোৎসাহী একাকীই এই সামান্য অর্থ-ব্যয়ে লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার পুষ্ট করিতে পারেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশে গৃহ-লাইব্রেরীতে টাকা খরচ করিবার সখ অনেকেরই আছে। তাঁহারাও চীন-বিষয়ক এক সেট্ রাখিতে পারেন।

এখানকার রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটির পুরাতন পত্রিকাগুলি কলিকাতায় এবং বোম্বাইয়ের সোসাইটিতে আছে। আমাদের ঐতিহাসিক বা দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এখানকার আজীবন সভ্য হইলে সস্তায় পুরাতন সংখ্যাগুলি ক্রয় করিতে পারেন। বোধ হয় ২৫০৲ টাকায়ই এক সেট্ পাওয়া যায়। আজীবন সভ্য হইবার জন্য এককালীন ৭৫৲ দিতে হয়।

(১৩) "বুদ্ধ-মার্কা" হিন্দু-সভ্যতা

আমাদের যাঁহারা প্রাচীন ভারতের পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, আকর-তত্ত্ব, যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা চীনে অনেক ভারতীয় তথ্য পাইবেন। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের তর্ক-বিজ্ঞান, চিত্তবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, উপনিষৎ, বেদান্ত, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অধ্যাত্মচিন্তা ইত্যাদির ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন, তাঁহারা চীনে অনেক ভারতীয় তথ্য পাইবেন। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের সুকুমার শিল্প ও ব্যবহারিক শিল্পের পরিচয় লইতেছেন, তাঁহারা চীনে ভারতশিল্পের বহু নিদর্শন পাইবেন। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের লোক-সাহিত্য, লোকাচার

নাচগান, উৎসব, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে তৎপর তাঁহারা চীনে ভারত-সমাজের অসংখ্য অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন। আর যাঁহারা ভারতীয় দেবদেবী, ধর্ম্মকর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত চীনে প্রচুর তথ্য পাইবেনই।

জাপান সকল বিষয়েই চীনের "জের" মাত্র—সুতরাং প্রাচীন ভারত-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিৎ সকলেই জাপানে ও নিজ নিজ আলোচ্য বিদ্যার রাশি রাশি উপকরণ পাইবেন। জাপানীরা অনেক সময়ে তাঁহাদের বিভিন্ন বৌদ্ধশাখা বা সম্প্রদায়গুলিকে জাপানের স্বদেশী আবিষ্কাররূপে প্রচার করেন। বস্তুতঃ সেগুলির প্রায় সবই আমাদের বৈষ্ণব, শৈব, তান্ত্রিক, সৌর, বাউল, জৈন, গাণপত ইত্যাদি ভারতীয় তেত্রিশ কোটি সম্প্রদায়েরই নামান্তর মাত্র। অধিকন্তু, জাপানের "নৌ"-নাটক, "ইকেবানা" বা ফুলশৃঙ্গার ইত্যাদি জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল অনুষ্ঠানেই ভারতবর্ষ বিদ্যমান। জাপানী বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্মচিন্তা, ধর্ম্মতত্ত্ব, কুসংস্কার, লোকরুচি, শিল্পকলা, সঙ্গীত, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদির পনর আনা হিন্দু-চীনা সভ্যতার এ-পীঠ ও-পীঠ মাত্র।

এই কথাগুলি অকাট্য প্রমাণসহ ভারতীয় সুধীমহলে প্রচারিত না হইলে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। তাহার জন্য চীনা ও জাপানী ভাষার ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগে চীন-জাপানের সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই লেনদেন বন্ধ হইয়াছে। কাজেই ভারত-বাসী চীন-জাপানে পদার্পণ করিবার পর চপষ্টিকের সাহায্যে আহার এবং বেশভূষার নূতনত্ব দেখিয়া হয়ত ভাবিতে পারেন—"এই সকল লোকের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা কোন দিন ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।" তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পর্য্যটক মাত্রেই এইরূপ কয়েকটা বাহ্য অনৈক্য

সত্ত্বেও বর্ত্তমান চীনা-জাপানীদের আটপৌরে জীবনেই বহুবিধ ভারতীয় লক্ষণ দেখিতে পাইবেন। তাহার পর একবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই তথাকথিত মাঙ্গোলিয় জাতিদ্বয়ের শিরায় শিরায় এবং অস্থিমজ্জায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত "বুদ্ধ-মার্কা" ভারতবর্ষের পরিচয় পাইবেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের মধ্যে কত হাজার লোক চীন হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত আজকাল পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ হইতেও কত হাজার লোক চীনে গিয়াছিলেন, তাহার সামান্য মাত্র সংবাদও ভারতীয় সাহিত্যে পাই না। সেই যুগে ভারতবর্ষ বলিলে, আজকালকার গোটা আফ্‌গানিস্থান, মধ্য এশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, কোচিন, আনাম ইত্যাদি জনপদও বুঝাইত। নূতন নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের ফলে এই তত্ত্ব আজকাল সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল জনপদ হইতেও যাঁহারা চীন-পর্য্যটনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত কে আন্দাজ করিতে পারে? অধিকন্তু চীনের বড় বড় রাষ্ট্রকেন্দ্রে হাজার হাজার চীন-প্রবাসী ভারত-সন্তান বাস করিতেন তাহার উড়ু উড়ু সংবাদ মাত্র পাইয়া থাকি। কাজেই ভারতবর্ষ হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা-গোদাবরীর জল চীনদেশে কতখানি লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহার ওজন করা এক প্রকার অসম্ভব। তবে চীনা সাহিত্যের বিশ্লেষণ সুরু হইলে হয় ত কোন দিন এই জলরাশি মাপিবার যুক্তিসঙ্গত মান-যন্ত্র নির্দ্ধারিত হইলেও হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত যে কয়খানা চীনাগ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় এক হাজার মাত্র চীনা ও ভারতীয় পর্য্যটকের নাম পাওয়া যায়। একমাত্র এই সংখ্যার কল্পনা করিলেই চীনে ভারতপ্রভাব খানিকটা আন্দাজ করিতে পারি। এই কয়জনের মধ্যে চীনে অনেকেই প্রসিদ্ধ; কিন্তু ভারতবর্ষের

আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে এবং শিক্ষিত-মহলে মাত্র তিন জন সুপরিচিত। সেই তিন জনের দ্বারাই চীনে ভারতবর্ষের জল কতখানি বহন করা হইয়াছিল ইহা আলোচনা করিলেও প্রাচ্য এশিয়ায় হিন্দুসভ্যতার মর্য্যাদা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে কালিদাস যখন রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি রচনা করিতেছিলেন সেই সময়ে ফাহিয়ান অন্ততঃ ছয় বৎসরকাল আমাদের পাটলীপুত্র রাজধানীতে জগদ্বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজ-অতিথি ছিলেন (খৃঃ—৪০৫—১১)। তাহার প্রায় দুই শত বৎসর পর হুয়েন্থ-সাঙ্ আমাদের বিক্রমাদিত্য-কল্প হর্ষবর্দ্ধন এবং দ্বিতীয় পুলকেশী সম্রাটদ্বয়ের আমলে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করেন। তিনি ষোল বৎসর (খৃঃ ৬২৯—৪৫) হিন্দুস্থানের আব্‌হাওয়ায় জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার পঁচিশ বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ইৎ-সিঙ্ বা ই চিঙ বুদ্ধ-মার্কা ভারত-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ভারতবর্ষ এবং মালয়দ্বীপ ও বৃহত্তর ভারতের অন্যান্য জনপদে চব্বিশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন (খৃঃ অঃ ৬৭১—৬৯৫)। ইঁহার ডায়েরীতে প্রকাশ যে তিনি যে সময়ে ভারত-পর্য্যটনে রত ছিলেন সেই সময়ের বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে অন্ততঃ আরও ষাট জন চীনাপর্য্যটক ভারতে ছিলেন। অর্থাৎ হুয়েন্থ-সাঙ্ এবং ইৎ-সিঙের সমসাময়িক বহু চীন-সন্তান স্বতন্ত্রভাবে ভারত-তত্ত্ব সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। ইৎ সিঙ্ সুমাত্রাদ্বীপের সংস্কৃত টোলের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বৎসর ধরিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দায় হুয়েন্থ সাঙ্ও আসিয়াছিলেন—কিন্তু বোধ হয় ফাহিয়ানের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত অথবা প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই।

এই তিন জনের মধ্যে পাণ্ডিত্য হিসাবে বোধ হয় ইৎ-সিঙ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার দখল অসামান্য হইয়াছিল। চরিত্র এবং ধর্ম্মজীবন হিসাবে বোধ হয় ভক্তশ্রেষ্ঠ ফাহিয়ান শীর্ষস্থানীয়। হুয়েন্থ-সাঙকে আমরা একজন পাকা "অর্গ্যানাইজার" বা ধুরন্ধর ও কর্ম্ম-পরিচালক বিবেচনা করিতে পারি। অবশ্য এই কর্ম্মবীরের বিদ্যাবুদ্ধি এবং জ্ঞানানুশীলনও প্রচুর পরিমাণেই ছিল।

ইঁহাদের একজন ভারতে ছয় বৎসর ছিলেন, একজন ষোল বৎসর ছিলেন এবং আর একজন চব্বিশ বৎসর ছিলেন। এতদিন কোন বিদেশে বাস করিলে প্রবাসী ব্যক্তির চরিত্র কতখানি বদলাইয়া যায়, ইহা একটা চিত্ত-বিজ্ঞান বা সাইকলজির প্রশ্ন। চোখের সম্মুখে যাহা দেখিতে পাই তাহার প্রমাণ লইলেই বুঝা যায় যে ৫।৭।১০।২০ বৎসর বিদেশে থাকিবার পর পর্য্যটক বা প্রবাসী নরনারীর নাড়ী ধমনী মাংসপেশী সবই বদলাইয়া যায়। তখন খাঁটি "স্বদেশী" ভাব বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই প্রশ্ন করিতেছি :—ফাহিয়ান, হুয়েন্থ সাঙ্ এবং ইৎ-সিঙ্ যখন চীনে ফিরিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কি চীনা ছিলেন না, ভারতীয়, "ইন্দো" ছিলেন? তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের স্বদেশ-ভায়ারা সহজে চিনিতে পারিয়াছিল কি?

এই সূত্রে ভেনিসের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মার্কোপোলোর গল্প মনে পড়িতেছে। তিনি বহুকাল পিকিঙে মোগল সম্রাট কুব্লাখাঁর অধীনে রাষ্ট্র কর্ম্মচারী ছিলেন—পরে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের পথে দক্ষিণ এশিয়ায় ভ্রমণ করেন। অবশেষে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর স্বীয় জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গ কেহই "আমাদের ঘরের দুলাল" বলিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হন নাই। সকলেই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক জ্ঞানে নির্য্যাতন করিতেছিল। বহু কষ্টে মার্কোপোলো স্বদেশীয় জনগণকে আত্মপরিচয় স্বীকার

করাইতে সমর্থ হন। এই চীনা ভারতপর্য্যটকগণের বোধ হয় এরূপ দুরবস্থা ঘটে নাই। কিন্তু চিত্ত-তত্ত্বের তরফ হইতে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে—ইঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, খোলশ, আত্মা, হাবভাব সবই চীনের পক্ষে অদ্ভুত ও অপরিচিত বোধ হয় নাই কি? ইঁহারা সকল বিষয়েই "ভারত-ফেরৎ" বা বিদেশীগন্ধী বিবেচিত হন নাই কি?

এখনই একটা তর্ক উঠিবে—"কেন হে বাপু? ইংরেজ স্ত্রীপুরুষেরা পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়াও খাঁটি ইংরেজ ভাবে স্বদেশে ফিরিতেছেন না কি? জার্ম্মানেরা আফ্রিকায় ও এশিয়ায় যত বৎসরই প্রবাসী হউন না, শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণই থাকিয়া যান না কি?" ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকা যে কোন ইয়োরামেরিকানের ভোগভূমি। এশিয়ার ও আফ্রিকার নরনারী গোটা মানুষ নয়—ইহারা পাশ্চাত্য নরনারীর সঙ্গে সমকক্ষ অথবা তাহাদের সমান চিত্তবিশিষ্ট জীব বিবেচিত হয় না। সমানে সমানে লেন দেন আজকাল প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কখনই হয় না। কাজেই পরস্পর-প্রভাবের দৃশ্য বর্ত্তমান যুগে দেখা যায় না। এক তরফা প্রভাবই দেখিতে পাই। ইয়োরামেরিকানদিগের চিত্তে প্রভুজনোচিত, মনিবজনোচিত, রাজজনোচিত আদর্শ, চিন্তা ও ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর প্রাচ্য জনগণের চিত্তে দাসজনোচিত, ভৃত্যজনোচিত, সেবকজনোচিত চিন্তা পুষ্ট হইতে থাকে। মনিবের চিত্তে দাস প্রবেশ করিতে অসমর্থ—দাসের চিত্তে মনিব প্রবেশ করিতে অসমর্থ। দুই চিত্ত দুই ধরণের। "কম্প্যারেটিভ সাইকলজি" বা তুলনামূলক চিত্তবিজ্ঞানের যে অধ্যায়ে এই তত্ত্ব আলোচিত হওয়া উচিত সেই অধ্যায় এখনও কোন দার্শনিক লেখেন নাই। কাজেই পণ্ডিতমহলেও অনেকে দাসজাতির আবহাওয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক পাশ্চাত্যেরই জানা আছে যে প্রাচ্য মানব তাঁহাদের সেবক মাত্র, শিষ্য-

মাত্র ও কেরাণীমাত্র, এবং প্রাচ্যজগতে তাঁহাদের নূতন কিছু শিখিবার নাই।

কিন্তু ইংরেজরা যখন ফ্রান্সে বসবাস করে, তখন লেনদেন চলে সমানে সমানে। জার্ম্মাণরা যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভবঘুরেগিরি চালায় তখনও লেনদেন চলে সমানে সমানে। এই ধরণের লেনদেন যখন বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন ইংরেজরা হয় ফরাসী ভাবাপন্ন আর মার্কিণ মেজাজ ও হাবভাব দেখা দেয় জার্ম্মাণ-চরিত্রে।

মধ্যযুগের ভারতে-চীনে যে সকল কারবার চলিত, তাহা এইরূপ সমানে-সমানে শ্রেণীর অন্তর্গত। চীনারা ভারতবাসীকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিত—হিন্দুরাও চীনাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে অভ্যস্ত ছিল। কাজেই চীনা জাতির স্বভাব সহজেই ভারতীয় নরনারীর স্বভাবে প্রবেশ করিতে পারিত আবার ভারতীয় চরিত্রও চীনা-চরিত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইত।

সুতরাং সেই যুগের চীনা পর্য্যটকদের উপর ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে সম্প্রতি আন্দাজের উপর নির্ভর করিলেও বলিতে হইবে যে, বহুবর্ষব্যাপী লেনদেন চীনা পণ্ডিতগণকে প্রায় ষোল আনা ভারতের বাচ্চায় পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছিল। তার পর মনে রাখা উচিত যে, চীনারা যে বয়সে ভারতে আসিতেন সেই বয়স নূতন প্রভাব আত্মস্থ করিবার বয়স। প্রায় সকলেই ছোকরা, যুবা, আর প্রত্যেকেই নূতন দুনিয়ার সকল শক্তি শুষিয়া লইয়া স্বদেশকে বৃহত্তর করিবার মতলবে ব্রতবদ্ধ।

ফাহিয়ান কত বৎসর বয়সে ভারতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না। হুয়েন্থ-সাঙ্ আসিয়াছিলেন ২৭ বৎসর বয়সে। ইৎ-সিঙ্ আসিয়াছিলেন ৩৭ বৎসর বয়সে। হুয়েন্থ-সাঙ যখন চীনে ফিরিয়া যান, তখন বালক ইৎ-সিঙের বয়স মাত্র ১১ বৎসর। তাহার পর যৌবনের ২৬ বৎসর কাল তিনি হুয়েন্থ-সাঙের হিন্দু-সাহিত্য প্রচারের আবেষ্টনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

চীনে যখন তাঁহার হিন্দুবিদ্যা সমাপ্ত হয়, তখন ইৎ-সিঙ্ ঠিক যেন "পি, এইচ, ডি," উপাধি লাভের জন্য "মৌলিক অনুসন্ধানে"র ইচ্ছায় আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। সেইখানেও দশ বৎসর কাটে। যৌবনের এইরূপ একাগ্র সাধনার ফলে যে চরিত্র গঠিত হয়, তাহার প্রভাব অসামান্য। বস্তুতঃ চীনে এই হিন্দু-বিদ্যা প্রচারকগণের প্রভাব অসামান্যই হইয়াছিল।

আরও এক কথা। তখনকার দিনে কেবল মাত্র রগড় দেখিবার জন্য কোন লোক দেশ পর্য্যটনে বাহির হইত না। বিশেষতঃ যে সমুদয় চীনা পর্য্যটক বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই সাধারণ ব্যবসায়ী বা হাতীর দাঁতের দালাল বা মকরধ্বজ কিম্বা বজ্রলেপের ব্যাপারী কিম্বা মণিমুক্তার জহুরী ছিলেন না। এই ধরণের শিল্পী, ব্যবসায়ী, জাহাজের কাপ্তেন, নাবিক ও আড়তদারের সংখ্যাও সেই যুগে অনেকই ছিল। কিন্তু ফাহিয়ানাদি পর্য্যটকগণ এই মালের বাজার করিতে আসেন নাই। ইহা অতি সহজবোধ্য কথা। ভারতবর্ষকে তাঁহারা স্বর্গ বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। আজকালও ভারতবর্ষে দেখিতে পাই যে, বহু ক্রোশ দূর হইতে সমাগত তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে আসিতে আসিতে বৈদ্যনাথ মন্দিরের চূড়া যখন তিন মাইল ব্যবধানে থাকিয়া প্রথম দেখে তখন তাহারা আনন্দে ধূলায় গড়াগড়ি যায়। এই ভাবুকতা হিন্দুরা এখনও উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ইহা কল্পনা করা অতি সহজ। ফাহিয়ানের' চরিত্র সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহাতে বোধ হয় ইনি এই ধরণেরই প্রেমিক ও ভাবুক ছিলেন। চৈতন্য সমুদ্র দেখিয়া যে ভাবে বিভোর হইতেন, রাধা কাল মেঘ মাত্র দেখিয়াই যে রসে হাবুডুবু খাইতেন, ফাহিয়ান ভারতবর্ষের নাম শুনিলে সেইরূপ ভূমানন্দে নাচিতেন। রামপ্রসাদের নিকট মা তারা যে বস্তু, আমাদের ভারতমাতা সাধকপ্রবর ফাহিয়ানের নিকট সেই বস্তু ছিল।

তাঁহার আত্মজীবনচরিতের একটা গল্প বোধ হয় সকলেই জানে। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া লঙ্কায় যাইবার সময় তাঁহার ভাগ্যে নৌকাডুবিরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রবল ঝড়ের উৎপাতে জাহাজ ফুটা হইয়া যায়—ক্রমশঃ তাহাতে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। শারঙ্, খালাশী এবং সহযাত্রী ব্যবসাদার ও দালালেরা এই সাধুর লাগেজ দেখিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিজ ব্যবহারোপযোগী লোটা কম্বল সবই সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকাণ্ড ঝুলির মধ্যে যে ভারত-তত্ত্ব বস্তাবন্দি ছিল, তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরা শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনীতে জানি—বিপৎকালের গান কিরূপ :—

"চরম সময়ে হও মা উদয়,
দেখে মরি তোমার শ্রীপদনলিনী।"

ফাহিয়ান প্রায় এই ভাবেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফাঁপড়ে পড়িয়া ভক্তবীর কোয়ান্-নিন (বা করুণা) দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। চীনা বৌদ্ধ সমাজে এই দেবী ভারতীয় করুণার অবতার অবলোকিতেশ্বরের সহধর্ম্মিণী অথবা অন্যতম রূপমাত্র। বিপদ্‌গ্রস্ত নরনারীর উদ্ধার করা কোয়ান্-নিনের কার্য্য। অনেকটা আমাদের মঙ্গলচণ্ডী আর কি। জাপানে ইঁহার নাম কোয়ান্-নন। ফাহিয়ান্ অনন্যচিত্ত হইয়া যোগে বসিয়া গেলেন—এবং কোয়ান্-নিনের শ্রীপদনলিনী ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহাই নহে। চীনা সমাজে যে সকল সাধুপুরুষ, মহাত্মা, মহর্ষি ইত্যাদি পূজা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়াও ফাহিয়ান প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবকল্প ঋষিগণ, আপনারাও আমার দুর্গতিনাশের জন্য কোয়ান্-নিনের নিকট প্রার্থনা করুন। যেন তাঁহার কৃপায় অবিলম্বে জাহাজের ফুটা বন্ধ হইয়া যায়—যেন শীঘ্রই কোন বন্দরে যাইয়া আমরা

নিরাপদে পৌঁছিতে পারি।" জীবন তুচ্ছ করিয়া, লোটা কম্বল জলে নিক্ষেপ করিয়া ভারততত্ত্ব-পূর্ণ ঝুলি সামলাইবার জন্য সাধক এইরূপে কাঁদিয়াছিলেন।

ফাহিয়ানের আত্মজীবনচরিত গ্রন্থের আর একস্থানে প্রকাশ—"আমি আমার পর্য্যটনকালে এত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম কিসের জোরে? অতি দুর্গম বিপজ্জনক স্থানেও আনন্দের সহিত চলাফিরা করিতাম কোন্ সাহসে? বিপৎ এবং মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিয়া এবং শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতাম, কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতাম না কেন? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম। সেই লক্ষ্য অনুসারে কর্ত্তব্য-পালন আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। তাহার জন্য আমি মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও অনেক সময়ে জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হই নাই। আমার উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ও আশার সহস্রাংশও যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার জনম সার্থক হইবে, এই ভাবিয়া আমি কর্ত্তব্য পালনের সময়ে মরণকেও ডরিতাম না।"

এইরূপ চরিত্রবান্ ও ভাবুকতাময় পর্য্যটকগণ চীন হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের লিখিত ডায়েরি হইতে ভারতেতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাই বলিয়া সন্তুষ্ট। ইঁহারা কি দরের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। যাহা হউক, দেখা গেল যে, এই সমুদয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে "মজিবার" জন্যই আসিয়াছিলেন—কোন রসে মজিতে হইলে যে একাগ্রতা ও সাধনা আবশ্যক, সেই একাগ্রতা ও সাধনা তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। আর যে বয়সে মানুষ নব নব চিন্তা ও কর্ম্মরাশির মূল্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই সমুদয় আরম্ভ করিতে সমর্থ ইঁহারা সেই বয়সেই ভারতে আসিয়াছিলেন। অধিকন্তু

যত দিন বিদেশে থাকিলে নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষের ধরণধারণও আগাগোড়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই সকল মজিবার জন্য প্রস্তুত এবং ভারতীয় রসে হাবুডুবু খাইবার জন্য দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ তত দিনের অপেক্ষাও বেশী সময় ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, বিক্রমাদিত্য, হর্ষ-বর্দ্ধন ইত্যাদি ভারত-সম্রাট্‌গণের আতিথ্যে চর্ব্বচোষ্য-লেহ্য-পেয়, গাড়ী গাড়োয়ান, নৌকা মাঝি, হাতী ঘোড়া, দ্বারবান বরকন্দাজ, দোভাষী, অধ্যাপক ইত্যাদি কোন বস্তুরই অভাব হয় নাই। কাজেই ভারতীয় জীবনের অলিগলি খুঁটিনাটি সবই ইঁহাদের পায়ের কাছে ছিল। ভারতীয় রসে মজিবার সকল প্রকার সুযোগই জুটিয়াছিল।

সুতরাং জাহাজ বোঝাই করিয়া অথবা গাড়ী বোঝাই করিয়া অথবা হাতী উট বা ঘোড়ার পীঠে চাপাইয়া এই অধ্যাত্ম-মালের ব্যাপারিগণ "বুদ্ধ-মার্কা" ভারতবর্ষের কতখানি স্বদেশে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা চলিতে পারে। ফাহিয়ান হুয়েন্থ-সাঙ্‌ ইত্যাদির ঝুলি-গুলা যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা ঝাড়িয়া দেখিতে অসমর্থ থাকিবেন তত দিন আমরা চীনে বৃহত্তর ভারতের যথার্থ প্রভাব সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য।

না হয় জানা গেল যে ইঁহারা সর্ব্বসমেত ২০০০ মূর্ত্তি, ১০,০০০ সংস্কৃত পুঁথি, কয়েক শত বুদ্ধচিহ্ন ইত্যাদি মাল চীনে হাজির করিয়াছিলেন। আর এই সমুদয়ের যথোচিত প্রচারের জন্য "এক্‌জিবিশন", "প্রদর্শনী", মেলা, উৎসব, তর্জ্জমা, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভারত-প্রভাব বুঝিবার জন্য আরও কিছু গভীরতর অন্বেষণ আবশ্যক। পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যত কিছু লিখেন তাহার অন্ততঃ দশগুণ তিনি জীবনে উপলব্ধি করেন। গ্রন্থকার যত কথা তাঁহার রচনায় প্রকাশ করেন, তাহার দশগুণ অন্ততঃ তাঁহার মাথায় গিজ্‌গিজ করে। প্রত্যেক মানুষেরই

•অপ্রকাশিত এবং অপ্রকাশ্য জীবন তাহার প্রকাশিত জীবন অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই ফাহিয়ানাদি চীনা সাধুপুরুষগণের মাথার খুলিটা খুলিয়া যদি মগজের ভিতরকার চিন্তাগুলি গণনা করা যাইত তাহা হইলে দীর্ঘকাল-প্রবাসের যথার্থ ফলাফল বুঝিতে পারিতাম। স্বদেশে ফিরিবার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আদা নুন খাইয়া ইঁহারা দিবারাত্রি ভারত-প্রচারে ব্রতবদ্ধ ছিলেন। প্রতিদিনকার প্রত্যেক ওঠাবসায়, প্রত্যেক সাহচর্য্যে, প্রত্যেক অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পর্য্যটকগণের অপ্রকাশিত জীবন তাঁহাদের শিষ্য ও সহকারিগণের মধ্যে কতখানি সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা খতাইয়া দেখা আবশ্যক। সেই নীরব প্রভাব ক্রমশঃ টোল হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে দোকানে, বিদ্যাস্থান হইতে উৎসবক্ষেত্রে, পল্লী হইতে পল্লীতে মেলা হইতে হাটবাজারে ছড়াইয়া পড়ে নাই কি ?

কাজেই চীনা পর্য্যটকগণের ঝুলির ভিতর হাত দিলেই ভারত-প্রভাব-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হইবে না। এই কার্য্য সম্যক্ সাধনের জন্য বর্ত্তমান যুগের ভারত-সন্তানকে তাঙ্-সুঙ্ যুগের চীনা সমাজে ডুবিতে হইবে। একবার ডুবিয়া বাহির হইতে পারিলে তথাকথিত "বুদ্ধ-মার্কা" ভারতবর্ষ কি বস্তু তাহা প্রচারিত হইতে পারিবে। দাঁতন করা হইতে আরম্ভ করিয়া মলত্যাগের পর 'হাতে মাটি করা' পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন তথ্যই চীনা পর্য্যটকগণ তাঁহাদের ডায়েরিতে বাদ দেন নাই। যে দিন চীনা সাহিত্যের বিশদ বিশ্লেষণ সুরু হইবে, সে দিন হয় ত দেখিব যে মধ্যযুগের চীনে ও জাপানে রসিকতা, কুস্তীকছরত, আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুক, নাচগান বাজনা, নাটক, কাব্য, দর্শন, বীজগণিত, রসায়ন, সুকুমার শিল্প, ভৈষজ্য-তত্ত্ব, তর্ক-বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সমুদয় বস্তুর পরিচয় পাই, সে গুলিকে সত্য-ভাবে বুঝিবার জন্ত ভারতবর্ষের টান পড়িয়াছে। আর সেই ভারতবর্ষ তথাকথিত "বৌদ্ধভারতবর্ষ" অথবা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের "মৌরুশি

পাট্টা" নয় ;—সেই ভারতবর্ষ শৈবশাক্ত-বৈষ্ণবসৌরতান্ত্রিক-জৈনবৌদ্ধগণের জন্মভূমি, সেই ভারত গুপ্ত-বর্দ্ধন-পাল-চোল-গুর্জ্জর সেনগণের কর্ম্মক্ষেত্র— অর্থাৎ সেই ভারতের একমাত্র পরিচয় এই যে উহা ভারতীয় জনগণের স্বদেশ।

তখন আমরা বুদ্ধের নাম মনে না রাখিয়া চীনজাপানে আসিলেও এখানকার বহু অনুষ্ঠানেই ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইব। রেলগাড়ী টেলিগ্রাফ ইত্যাদি বস্তুসমূহ খৃষ্টানদিগের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জন্য ভারতবর্ষে আমরা এই বস্তুগুলিকেই অনেক সময়ে খৃষ্টান বলিয়া থাকি। একদিন সপ্রমাণ হইবে যে, চীনারাও সেইরূপ ভারতবর্ষে প্রাপ্ত এবং ভারতবর্ষ হইতে আমদানি-করা যে কোন জিনিষের গায়ে 'বৌদ্ধ' দাগ লাগাইয়া দিত।

(১৪) ভারতে সিনলজি

আমাদের হরিনাথ দে চীনা ভাষা জানিতেন। কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে দখল কতখানি ছিল, তাহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়াছি, তিনি একখানা চীনা গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ "পাণিনি অফিসে"র জন্য প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা হয়ত চীন-তত্ত্ব ভারতে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনা যায় বাঁকিপুরের ব্যারিষ্টার প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সাওয়াল চীনা ভাষা জানেন। কতটা জানেন বলিতে পারি না।

কোনো পণ্ডিত ফরাসী ভাষা জানেন অথবা জার্ম্মাণ ভাষা জানেন বলিলে আমরা আন্দাজে তাঁহার বিদ্যা খানিকটা মাপিয়া লইতে পারি। কিন্তু চীনা ভাষা কেহ জানেন শুনিলেই, প্রশ্ন করিতে হয়—"তিনি এই ভাষা শিখিলেন কোথায়? কত বৎসর এই ভাষায় তাঁহার পরিশ্রম

করা হইয়াছে? প্রতি দিন কয় ঘণ্টা করিয়া তিনি এই ভাষার জন্য সময় দিয়াছেন? তাঁহার শিক্ষাদাতা ছিলেন কাহারা—চীনা পণ্ডিত না ইয়োরামেরিকান্ পণ্ডিত?" ইত্যাদি।

আমাদের দেশে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে চীনের নাম মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে বাধ্য হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীন লইয়া "ঘাঁটাঘাঁটি" করা বোধ হয় এখনও কাহারও বিশেষ আবশ্যক হয় নাই। শিক্ষিত মহলে সিনলজি এক প্রকার অজ্ঞাত।

বাঙ্গালী চীনের সংবাদ যাহা কিছু রাখেন, তাহা প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের প্রবন্ধাবলী হইতে। এই সমুদয়ে বর্ত্তমান চীনের পরিচয়ই বেশী—মধ্যযুগের বৃত্তান্ত কখনও কখনও পড়া যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রান্তে কখনও কেহ চীন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অবশ্য বিগত কয়েক বৎসরের বিপ্লববিষয়ক তথ্যগুলি ইংরেজিতে এবং প্রাদেশিক ভাষায়ও সংবাদরূপে প্রচারিত হইয়াছে। আর, কোন কোন মাসিকে হয়ত চীনা স্বরাজ, ডেমোক্রেসি, রিপাব্লিক, প্রজাতন্ত্রশাসন ইত্যাদির তারিফ বাহির হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লবতত্ত্বের প্রশংসা করিবার জন্য চীনের কোন তথ্য জানা না থাকিলেও চলে। কাজেই এই সকল রচনায় চীনের কথা ভারতে প্রচারিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এ কথাও সত্য যে, ভারতবাসী চীন-সম্বন্ধে যতখানি জানেন, চীনারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার শতাংশও জানেন না।

শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের লেখা "চীন-ভ্রমণ" নামক একখানা বইয়ের নাম শুনিয়াছি। অনেকেই এই গ্রন্থ পড়িয়া থাকিবেন। বোধ হয় রামলাল বাবুর গ্রন্থ ছাড়া ইহাই বাঙ্গালায় দ্বিতীয় গ্রন্থ। হঙ্কং ও শাংহাই, জাপান ও আমেরিকার পথে;—কাজেই বহু ভারতীয় মোসাফিরের পক্ষেই

এই বন্দর দুইটা অন্ততঃ দেখিবার সুযোগ ঘটে। বৎসরখানেক হইল শ্রীযুক্ত অঙ্গারিকা ধর্ম্মপাল চীন ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন—স্থানে স্থানে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংরেজিতে বাহির হয় নাই—সিংহলী ভাষায়ও হইয়াছে কি না সন্দেহ। ওয়াগেল প্রণীত বর্ত্তমান চীন সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থাবলীর নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

ভারতবাসীর চিন্তায় হিমালয়ের এই পারটা সমস্তই চীন। সুতরাং তিব্বতের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা চীনতত্ত্বজ্ঞও বটে এইরূপ আমরা ধরিয়া লই। এই হিসাবে শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাসের নাম "Bengal's hardy son" বা "বঙ্গের কর্ম্মঠ সন্তান" রূপে বঙ্গীয় সমাজে প্রবাদে পরিণত হইতে চলিল। তিনি তিব্বতী ভাষা জানেন—তাঁহার তিব্বত সম্বন্ধীয় Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থখানা প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সুপরিচিত। বিদেশীয় লেখকগণও এই পুঁথির তথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তিব্বত সম্বন্ধে আমাদের একটা গৌরব আছে। বিক্রমপুরের দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান বা অতীশ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট নয়পালের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কেন্দ্র হইতে তিনি তিব্বতে যাইয়া তান্ত্রিকতা প্রচার করেন। এইটুকু তিব্বততত্ত্ব ছাড়া আর একটা কথা আজকাল পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতী লামা তারানাথ একখানা "বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস" প্রণয়ন করেন। তাহাতে বঙ্গের পাল ও সেন সম্রাটগণ এবং তাঁহাদের সমসাময়িক বঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক মাত্রেই একবার লামা তারানাথকে সমালোচনা করিতে বাধ্য হন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের তিব্বতবিষয়ক রচনাবলী এখনও নিতান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক মহলেই আবদ্ধ আছে! দীপঙ্কর বা তারানাথের নাম যতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আলোচিত তিব্বততত্ত্বের

কোন অংশ ততটা ছড়ায় নাই। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সতীশচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে:—

(১) Srid-pa-ho—A Tibeto Chinese Tortoise Chart of Divination. ভবিষ্যদ্ গণনায় কূর্ম্মের ব্যবহার প্রাচীনতম চীনা সমাজেও লক্ষিত হয়। সুতরাং এই রচনাকে খাঁটি সিনলজির অন্তর্গত করাও চলে।

(২) Tibetan Scrolls and Images lately brought from Gyangtse.

এতদ্ব্যতীত "মহাব্যুৎপত্তি" নামক Alexander Csomas প্রণীত সংস্কৃত-তিব্বতী-ইংরেজী শব্দকোষ পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদিত।

তিব্বত সম্বন্ধে বঙ্গীয় ইতিহাসের একটা তথ্য আমরা কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের লেখা হইতে পাইয়াছি। তিনি অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কাম্বোজ নামক পাহাড়ী জাতি উত্তর বঙ্গ দখল করিয়াছিল। সেই জাতির রাজবংশ প্রায় একশত বৎসর বরেন্দ্রভূমিতে কর্ত্তৃত্ব করেন। তাঁহারা শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজকাল কোচ, পলিহা, মেচ ইত্যাদি অশিক্ষিত ও অনুন্নত সমাজের মেরুদণ্ড।

এই পর্য্যন্তই বোধ হয় আমাদের "সিনলজি"র বিশ্বকোষ। বঙ্গের বাহিরের ভারতবাসীরা চীনতত্ত্বের এতটা চর্চ্চাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। চৈনিক পরিব্রাজকগণের উল্লেখ অনাবশ্যক। সেকথা আমাদের ইতিহাসের অ, আ, ক, খ স্বরূপ।

কয়েকদিন হইল অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের Positive Sciences of the Ancient Hindus হস্তগত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় দার্শনিক মহাশয় বলিতেছেন—"Hindu scientific ideas

and methodology (e. g. the inductive method or methods of algebraic analysis) have deeply influenced the course of natural philosophy in Asia—in the East as well as the West—in China and Japan, as well as in the Saracen Empire." অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুপণ্ডিতগণ নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার সাহায্য লইয়াই বাস্তবজগতের তথ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আজকাল যে সকল আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলা হয় এবং যে সমুদয় সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, প্রাচীনকালে হিন্দু পণ্ডিতেরা সেই ধরণের আলোচনা-প্রণালীই অবলম্বন করিতেন এবং সেই জাতীয় সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন তথ্য তুলনা করিতে করিতে কখনও হয়ত একটা সাধারণ তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই সাধারণ তত্ত্ব বা নিয়মকে অনেক ঘটনার প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল বলা যাইতে পারে। তখন উহা একটা বিজ্ঞানসম্মত সত্যে দাঁড়ায়। ইহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মহলের অবলম্বিত আলোচনা রীতি। এই ধরণের "ইণ্ডাক্‌টিভ্‌" বা "আরোহ"-রীতিই প্রাচীন হিন্দুমহলেও অনুসৃত হইত। তাহা ছাড়া তথ্য-তুলনার ফলসমূহ শৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এইরূপ শৃঙ্খলীকরণের জন্য গণনা-শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। সাধারণ কার্য্যাবলী পাটিগণিতের সাহায্য লইলেই চলে। কিন্তু বিচিত্র ও জটিল তথ্যসমূহকে তুলনা, সামঞ্জস্য, গণনা ও শৃঙ্খলার বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্মতর গণিতশাস্ত্রের আবশ্যক। তাহার নাম বীজগণিত। এই বীজগণিতের সাহায্য না লইলে বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিকগণ স্বকীয় আলোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন না। এইরূপ বীজগণিতে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই হিন্দু-বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনাপ্রণালীসমূহ এবং আবিষ্কৃত সত্য-গুলি একমাত্র হিন্দুস্থানেই আবদ্ধ ছিল না। পরন্তু এই সমুদয়ের দ্বারা সমগ্র এশিয়ায়ই প্রকৃতি-বিষয়ক (জড়জগৎসম্বন্ধীয়) বিদ্যার সেবকগণ অনেকাংশে লাভবান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে চীন ও জাপান এবং পশ্চিমদিকে মুসলমান সাম্রাজ্য; দুই দিকেই হিন্দু মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত বাস্তব-বিজ্ঞান গভীরভাবে ও বিস্তৃতরূপে পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুজাতির বিজ্ঞানালোচনা বলিলে প্রকারান্তরে সমগ্র এশিয়ার কথা বলা হইল বুঝিতে হইবে।

দার্শনিক মহাশয় ইংরেজিতে কথাগুলি সূত্রাকারে বলিয়াছেন। তাহার ভাষ্য কিছু বৃহৎ হইল। বিলাতে থাকিবার সময় তাঁহার সঙ্গে চীন ও জাপানের গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। তাহা "ইংরাজের জন্মভূমি" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। দার্শনিক মহাশয় পদার্থ-বিজ্ঞানের আসরে নামিয়া চীনে ও জাপানে ভারতপ্রভাবের কথা বলিতেছেন। খাঁটি দর্শনচিন্তায় হিন্দুজাতি চীনা ও জাপানী পণ্ডিত-গণের মতিগতি কতখানি গঠিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ের আলোচনা স্বতন্ত্র।

শীল মহাশয় বিজ্ঞানসম্বন্ধে যে কথা বলিতেছেন, তাহা অন্য কোন ইংরেজিগ্রন্থে দেখি নাই। তিনিও বোধ হয় কোন বিদেশী-লিখিত গ্রন্থে দেখেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার নিজের লিখিত এই সুবৃহৎ Positive Sciences গ্রন্থের কুত্রাপি এ বিষয়ে একটি পংক্তিও নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry নামক হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসেও চীনের কথা নাই। তাহাতে মুসলমানজাতির বিজ্ঞানা-লোচনায় হিন্দু বৈজ্ঞানিক প্রভাব আলোচিত আছে। যাহা হউক, ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজে কলমে ভারতবাসীকে চীনতত্ত্বের একটা নূতন দিক্

দেখাইয়া দিলেন। ইহা অঙ্গুলি-সঙ্কেত মাত্র। এইদিকে ভ্রমণ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন কাহারা ?

দার্শনিক মহাশয় আর একটা বরাত দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"The progress of Indian Algebra (mainly in Southern India) after Bhaskara, parallel to the developments in China and Japan, is a subject that remains for future investigation." অর্থাৎ "ভাস্করাচার্য্যের পরও ভারতবর্ষে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতেই সেই চর্চ্চার পরিচয় বেশী। সমসাময়িক চীনে এবং জাপানেও প্রায় এইরূপ অনুশীলনই বীজগণিতজ্ঞগণ করিতেন। দক্ষিণ-ভারতে এবং চীনজাপানে বীজগণিতের ক্রমবিকাশ সমান্তরালভাবে সাধিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। এই বিষয় ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য রহিয়াছে।"

প্রথম হইতেই দেখিতেছি চীনে অনেক মজা। ভারতবাসী-মাত্রেই এখানে অনেক মজার কথা পাইবেন। দার্শনিক মহাশয় চীনে আসিলে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মজা দেখিবেন। তাঁহার একবার আসা উচিত। একাধিকবার তাঁহার ইয়োরোপ-ভ্রমণ হইয়াছে—একবার অন্ততঃ এশিয়া-ভ্রমণ হউক।

উপর উপর হইতে চীন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন। ইঙ্গিত, অনুমান, আন্দাজ, অঙ্গুলি-সঙ্কেত ইত্যাদির উপর আর নির্ভর করা চলে না। এখন চীনের "ভিতরে" প্রবেশ করা আবশ্যক। চীনা-ভাষাটা কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের দখলে রাখা প্রয়োজন।

মাত্র দুই চারিমাস চীনে থাকিব ভাবিয়া এদিকে দন্তস্ফুট করিয়া দেখিতে চেষ্টাও করিলাম না। লোকজনের মুখে শুনিয়া বুঝিতেছি, আমাদের কার্য্যোপযোগী জ্ঞানের জন্য অন্ততঃ পাঁচবৎসর কাল "সর্ব্বান্

ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” চীনা ভাষার সেবা করা চাই। তাহার জন্য নান্-কিঙ্ কিম্বা পিকিঙের মতন স্থানে আড্ডা গাড়া আবশ্যক। চীনের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা—লোকেরা নানা স্থানে নানাভাষায় কথা বলে—সাধারণ সংবাদপত্র বা নাটক নভেল ইত্যাদির ভাষায়ও আমাদের চলিবে না। আমাদিগকে “ম্যাণ্ডারিণ” ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহাই চীনাদের উচ্চপাণ্ডিত্যের ভাষা। তাঙ্-সুঙ্ যুগের সাহিত্য দখল করিবার জন্য—হুয়েন্‌ৎসাঙের ঝুলি হাতড়াইবার জন্য এই ম্যাণ্ডারিণ ভাষায়ই ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক।

পাঁচ বৎসর সময়, এমন কিছু বেশী নয়। আধুনিক এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতম জ্ঞানলাভের জন্য আমাদের এম্ এ, এম্, এস্‌-সি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে জার্ম্মাণি বিলাত অথবা আমেরিকায় সাধারণতঃ এই পরিমাণ সময়ই কাটাইতে হয়। যাঁহারা অর্থাভাবে এই পরিমাণ সময় দিতে পারেন না, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ বিষয়ে চরম জ্ঞানের পরিচয় পান না। তাঁহারা দেশে ফিরিয়া নূতন কোন বিভাগের প্রবর্ত্তক হইতে অসমর্থ হন। বস্তুতঃ চীন এবং বিশেষতঃ জাপান হইতে যে সকল ছাত্র বিদেশে পাঠানো হয়, তাহারা কেহ সাত বৎসর, কেহ দশ বৎসর এক একটা বিদ্যায় লাগিয়া থাকিবার জন্য বৃত্তি পাইয়া থাকে। এইরূপ লোকই পরে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ধুরন্ধর আর সুফল দেখাইয়া যথার্থ অগ্রণী বা প্রবর্ত্তক হইবার যোগ্য হয়।

আমরা দরিদ্র—দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। যেন তেন প্রকারেণ সস্তায় অল্প সময়ে পাকা লোক তৈয়ারি করিতে বাধ্য হই। নাই মামার চেয়ে কাণা-মামাও আমাদের ভাল। ফলতঃ কার্য্যক্ষেত্রে সফল লোক ভারতে বেশী দেখা যায় না। আমাদের বুদ্ধির অভাব বা

পরিশ্রমের অভাব বা অধ্যবসায়ের অভাব—এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। যত টাকা খরচ করিতে পারিলে বিদ্যালাভ হইতে পারে, তত টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। মান্ধাতার আমলে নিয়ম ছিল—সকলদেশেই—দারিদ্র্য বিদ্যার প্রতিবন্ধক নয়। বর্ত্তমান যুগে এ-কথা খাটে না। আজকাল ট্যাঁকে টাকা না থাকিলে হাজার সদিচ্ছায়ও উচ্চতম বিদ্যা অর্জ্জিত হইতে পারে না। আজকাল "যত গুড় তত মিষ্টি" এই সূত্র বিদ্যাক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তাই পাঁচ বৎসরের কথায় চম্‌কানো উচিত নয়। বরং পাঁচ বৎসর কালকে নিম্নতম হিসাবের কোঠায়ই ফেলা উচিত। পাঁচ বৎসরে চীনা সাহিত্যে "প্রবেশ" লাভ হইবে মাত্র। তাহার পর জীবনব্যাপী অনুসন্ধান আলোচনা ইত্যাদি। অন্যান্য বিদ্যাসম্বন্ধে যেরূপ অনুশীলন করিতে হয়, সিনলজি সম্বন্ধেও সেইরূপই করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বা দর্শনে এম্, এ উপাধি প্রাপ্ত কয়েকজনকে পাঁচ বৎসরের জন্য বৃত্তি দিলে চীনতত্ত্ব ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। অন্যান্য দেশে ছাত্র পাঠাইতে যত খরচ, চীনে তত নয়। বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলে বাস করিতে একজনের যত খরচ চীনে তত খরচ হয়। পিকিঙ্, নান্‌কিঙের মতন সহরে চীনা আব্‌-হাওয়ায় বাস করিতে মাসিক ৫০৲ টাকার অধিক খরচ কোন মতেই হইতে পারে না। অবশ্য অল্পকালের জন্য যাঁহারা "টুরিষ্ট" হইয়া আসেন, তাঁহারা বিদেশী মহাল্লায় হোটেলে বাস করিতে বাধ্য হন—তাঁহাদের পক্ষে স্বদেশী মহাল্লায় বসবাসের ব্যবস্থা করা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু বেশীদিনের জন্য থাকিতে আসিলে—বিশেষতঃ চীনাভাষা দখল করিবার উদ্দেশ্যে আসিলে—খাঁটি চীনা আবেষ্টনে থাকিতেই হইবে। নান্‌কিঙে বোধ হয় বিদেশী হোটেল একটাও নাই। পিকিঙ্, শাংহাইয়ের

বিদেশী হোটেলে খরচ ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র যেরূপ। কলিকাতা, কায়রো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, তোকিও, পিকিঙ্—সকল স্থানেই হোটেলের খরচ প্রায় সমান বলা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সদ্য বাহির হওয়া কাঁচা গ্র্যাজুয়েট অপেক্ষা কয়েকজন পাকা পণ্ডিত আসিলেই ভাল হয়। শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ত-তীর্থ অথবা শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরেজিজ্ঞ, দর্শনজ্ঞ লেখকগণই এই ক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রণী বা প্রবর্ত্তক হইবার যোগ্য। ইঁহারা সপরিবারে আসিতে পারেন—কোন অসুবিধা নাই। তামা তুল্সী গঙ্গাজল কোষাকুষী সবই চীনে পাওয়া যায়। বেশ ছোট খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীও অনেক। রীতিমত হিন্দুগৃহস্থালী চালাইবার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। চীনারা ঠিক আমাদেরই মতন—অতি নিরীহ, গোবেচারা, বড় ভালমানুষ। অতি শীঘ্র আত্মীয়তা জমিয়া যাইবে। তাহার উপর, জুলুমের ভয় নাই। কারণ চীনে ইংরেজের আইন ভারত-বাসীর জন্য সর্ব্বত্র। ঠিক যেন কলিকাতায়ই আছি আর কি! জাপানীর জন্য জাপানী আইন, জার্ম্মাণের জন্য জার্ম্মাণ আইন ইত্যাদি।

জাহাজে আসিবার সময়ও জাতিনাশের ভয় নাই। জাপানী জাহাজ কোম্পানী আছে—জাপানীরা ত বৌদ্ধ—গোখাদক নয়। মাত্র কয়েক বৎসর হইল জাপানীরা কেহ কেহ গখাদি ধরিয়াছে—এখনও গোমাংস উহাদের ধাতে লাগে নাই। অধিকন্তু জাপানী জাহাজে জাপানী ধরণে শুইবার খাইবার উঠিবার বসিবার ঘর আছে। ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য কামরায় মোসাফির না হইলেও চলে। আর যদি কেহ "স্বপাক" পছন্দ করেন, জাপানী কর্ত্তাদের বলিয়া তাহার আয়োজনও করানো যাইতে পারে। জাপানীরা এখনও আর কয়েক বৎসর কাল আমাদের বন্ধু। এক সঙ্গে দুই তিন চারি পরিবার আসিলে আরও ভাল। এই কয় পরিবারের

ভরণপোষণের সকল ব্যয় দেশের লোকেরই বহন করিতে হইবে। আজকাল কত নূতন নূতন দিকে বিদ্যা আহরণের জন্য টাকা খরচ করা হইতেছে। সিনলজি বিদ্যাটা আর উপেক্ষা করা চলে না। পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনের সময় আসিয়াছে। কোন জীবিত জাতির দেশে এইরূপ প্রথম অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ তিন লাখ টাকা খরচ করা হইত।

এই সঙ্গে আরও একটা প্রস্তাব করা যাইতে পারে। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ, প্রত্নতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ ও ভাষাতত্ত্ববিৎ সতীশচন্দ্র, নৃতত্ত্ববিৎ বিজয়চন্দ্র, শিল্পী-অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির এক অভিযান চীন-জাপানে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। ইঁহাদিগকে বুঝিবার মতন লোক একজনও চীনে আছে কি না সন্দেহ। চীনারা এশিয়াতত্ত্বের অ আ ক খও জানে না—আর নব্য পাশ্চাত্যতত্ত্বেও সবে হাতে খড়ি দিতেছে। জাপানেও ইঁহাদের লইয়া মাতামাতি করিবার লোক বেশী নাই। জাপান যে কত ফোঁপড়া ইঁহারা একবার স্বচক্ষে যাইয়া দেখুন—জাপানীরাও ইঁহাদিগকে দেখিলে অনেকটা "ঢিট" হইয়া আসিবে।

চীনে বোধ হয় একজন লোকও নাই, যাঁহাকে আমরা ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে পারি। ভারতে চীনতত্ত্ব প্রচারের জন্য এশিয়া হইতে যদি কোন লোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে জাপানী ভিন্ন গতি নাই। আমরা যেমন বাঙ্গালা ভাষা খানিকটা আয়ত্ত হইতে হইতেই সংস্কৃত ধরি, জাপানীরাও সেইরূপ জাপানী ভাষায় খানিক দূর অগ্রসর হইয়াই চীনা ভাষা ধরে। আমাদের কার্য্যোপযোগী ম্যাণ্ডারিণ ভাষাই জাপানে আলোচিত হয়। কাজেই উচ্চশিক্ষিত জাপানী মাত্রেই তাঙ্-সুঙ্ যুগের চীনাভাষা অল্প বিস্তর জানে। তবে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত-সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েট হইলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত হন না। জাপানীরাও সেইরূপ

একটা কোনো উপাধির অধিকারী হইলেই চীনাভাষায় দিগ্‌গজ হন না। ইহা সহজেই অনুমেয়।

কাজেই আমাদের দেশে জাপানী চীনপ্রচারক লইতে হইলে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। বিশেষতঃ, জাপানে আজ কাল একটা গুজব রটিয়াছে যে, জাপানী মাত্রেই নাকি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—পি, এইচ, ডি, উপাধি পান ইত্যাদি! ইহা আমাদের একটা কলঙ্ক। এই জন্য ভারতীয় পাণ্ডিত্যের দর জাপানে কিছু কমিতেছে। অবশ্য জাপানীরা কোনদিনই ভারতীয় পাণ্ডিত্যের সম্মান করেন নাই—সম্প্রতি ইঁহাদের বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি যেন কিছু বাড়িয়াছে। তবে আবার আজকাল ইঁহারা ভারতবাসীর সঙ্গে সখ্যস্থাপনে উদ্‌গ্রীব—এইজন্য মৌখিক সৌজন্য বৃদ্ধি পাইবারই কথা। যাহা হউক কোন জাপানীকে আমাদের দেশে অভ্যর্থনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কোষ্ঠী, জন্মপত্র, বিদ্যার দৌড় ইত্যাদি যথারীতি বাজাইয়া দেখা আবশ্যক। দু-এক ক্ষেত্রে বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহা না হইলে জাপানীরা ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ সম্বন্ধে ওরূপ ঠাট্টা করে কেন?

এই উপলক্ষ্যে দুই এক জন জাপানী পণ্ডিতের নাম করিতে পারি। তাকাকুসু ও আনেসাকি—দুই জনেই ভারতে সুপরিচিত। তবে ইঁহারা মামুলি বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চাই করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ধর্ম্মের চর্চ্চায় ইঁহারা দার্শনিক অংশ মাত্র আলোচনা করেন। বস্তুতঃ জাপানী ধর্ম্মে তেত্রিশ কোটি দেবতা, হাজারগণ্ডা পালাপার্ব্বণ, লক্ষ লক্ষ কুসংস্কার বর্ত্তমান। সেগুলি ইঁহারা চাপিয়া রাখেন। কাজেই যথার্থ জাপানকে ইঁহাদের বক্তৃতায় বুঝা কঠিন। অধিকন্তু, জাপানে "জোদো" "জেন" ইত্যাদি যে কয়টা বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আছে, সেগুলি যে ভারতীয় ভক্তি বা যোগপন্থীদিগেরই নামান্তর মাত্র; এ কথাও ইঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না—

অথবা জানেন না। জাপানী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" —এইরূপ প্রতিপন্ন করাই ইঁহাদের কার্য্য।

কবি য়োণে নোগুচি বিলাতে যাইয়া নামজাদা হইতে চেষ্টিত ছিলেন। ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ারের প্রতিনিধি এবং মিত্র-রাষ্ট্রের সন্তান হিসাবে ইংরেজেরা ইঁহার খাতিরও করিয়াছিলেন। ইনি বাল্য ও যৌবন ইয়াঙ্কি স্থানে কাটাইয়াছেন—কাজেই জাপানের 'জ'ও ইঁহার জানা নাই, জাপানীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। চীনতত্ত্বেও বোধ হয় আমাদের সমানই ইঁহার অভিজ্ঞতা। তবে ভারতবর্ষে ইঁহাকে ডাকিলে জাপানী কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে খানিকটা তরল জ্ঞান প্রচারিত হইতে পারে। ইনি আজ-কাল তোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। নোগুচি সাধারণতঃ ইংরেজিতে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন—আমাদের সরোজিনী নাইডুও এই ধরণের। ইঁহারা এশিয়াকে আবিষ্কার করিয়াছেন "মিষ্টিসিজ্‌মে"!

সুজুকি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি চীনা দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইনি শিকাগোর Open Court কাগজের Paul Carus নামক প্রাচ্য ভাবুকতা প্রচারকের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইঁহাকে ভারতে ডাকা যাইতে পারে। সুজুকির মুখে চীনের কথা মন্দ শুনাইবে না।

কাউন্ট ওতানি তিন চারিবার ভারতবর্ষে গিয়াছেন—এখনও বোধ হয় ভারতেই আছেন। ইনি চীনতত্ত্বেও বিশেষজ্ঞ। মধ্য-এশিয়ায়ও ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দখল অল্প—কাজেই আমাদের দেশে ইঁহার দ্বারা প্রচারকার্য্য বোধ হয় সহজসাধ্য নয়। তবে ইঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

জাপানী পণ্ডিতগণের মধ্যে সিনলজিতে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম

হাওরি। ইনি তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—পিকিঙ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন—এই বৎসর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্‌ফিউশিয় দর্শন প্রচারের জন্য আহূত হইয়াছেন। হার্ভার্ডে রওনা হইবার পূর্ব্বে ইঁহার সঙ্গে তোকিওতে আলাপ হইয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্য প্রচার করিয়া আনেসাকি হার্ভার্ড হইতে ফিরিয়াছেন—এক্ষণে হাওরি ইয়াঙ্কি মহলে চীনতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। হাওরির কোন গ্রন্থ বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই—রচনাবলী যাহা কিছু পত্রিকার অঙ্কস্থ।

আমরা ভারতবর্ষে নিজে পণ্ডিত হই বা না হই, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে উচ্চ মাপকাঠি রাখিয়া থাকি। সেই মাপ-কাঠির প্রয়োগ করিলে জাপানের সকল পণ্ডিতই আমাদের বিবেচনায় দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়িবেন। সংস্কৃত ভাষা ইঁহাদের কাহারও কাহারও জানা আছে—অথবা চীনা-সাহিত্যে কাহারও বা দখল আছে। এই জন্যই ইঁহাদিগকে সম্মান করা চলে। কিন্তু দার্শনিকতা, পাণ্ডিত্য, "স্কলারসিপ", স্বকীয় উদ্ভাবনা বা মৌলিক চিন্তাশক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশী খোঁজ লইবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের মধ্যে কেহ যদি পাশাভাষা জানেন, অথবা জাপানী ভাষা জানেন, অথবা জার্ম্মাণ ভাষা জানেন, তাহা হইলেই কি আমরা তাঁহাকে একটা বিশেষ কিছু বিবেচনা করি? তাঁহার নামের পশ্চাতে যদি বার্লিন বা কেম্‌ব্রিজ বা অন্য কোন বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি থাকে তাহা হইলেও আমরা আজকাল বিচলিত হই না। জাপানী সম্বন্ধেও যেন বিচলিত না হই। আশা করি, আমরা দুনিয়ার কোন জাতীয় পণ্ডিত সম্বন্ধেই একমাত্র নামে আর বিচলিত হইব না। জগতের সর্ব্বত্রই মেকী চলিতেছে—চলিবেও। সাধু সাবধান!

(১৫) তাজা ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন

"গৃহস্থ"য় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ জীবিতও নাই এবং গ্রীস ও রোম মরেও নাই।" এই কথা যুবক ভারতের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই বর্ত্তমান ভারতের ভাবুকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। তবে কথার মারপ্যাঁচে হয়ত এই সত্যটা কিছু ধোঁয়াটে ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু এই গোঁজামিল ও অস্পষ্টতা আর বেশী দিন টিকিবে না। ভারতের জনসাধারণ শীঘ্রই মরাভারতকে মরা-ভারতই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইবেন। ভারতীয় "অমরতা"র আলোচনা সম্প্রতি "ধামা-চাপা" থাকিবে।

এই লেখকের রচনায় ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন আলোচনাপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছে। প্রণালীটা ভারতবর্ষের নূতন—পুরাপুরি নূতন নয়—কথঞ্চিৎ নূতন। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্বের যাচাই সুরু হইয়াছে। তাহার ফলে আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা আজকাল নূতন কানে শুনা হইয়া থাকে। নবীনচন্দ্র দাস বলিতেছেন—"আধুনিক মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের হাত এড়াইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে আর "চুক্তি" করে না—স্বীয় বুদ্ধিবলে বিশ্বশক্তির সহিত "বুঝা-পড়া" করে—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে।" "শুনিতে পাই, মানুষ প্রথম অবস্থায় নিরাকার ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না—পূজা করিবে কাহার? সুতরাং পণ্ডিতগণ নিজেদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা বলে মূর্খের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণের জন্য নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন। * * * কিন্তু * * * নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ বা উপনিষৎকারগণের দ্বারা এত সংখ্যক অদ্ভুত দেবদেবীর সৃষ্টি ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। খুব সম্ভব এই সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি নিম্নস্তরের জাতিগণ কর্ত্তৃকই

সম্পন্ন হইয়াছিল। * * * ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজ ধর্ম্ম ও পূজা-পদ্ধতি আর্য্য ও অনার্য্যের অথবা সভ্য এবং অসভ্যের মিশ্রণজাত।" এই আলোচনা প্রণালী অ্যান্থ্রোপলজি বা নৃতত্ত্বের সামিল। আজকালকার পণ্ডিত-মহলে আত্মা, পরকাল, ভগবান ইত্যাদির আলোচনা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার গোড়ার কথা নয়। গোড়ার কথা আচারতত্ত্ব, কুসংস্কারতত্ত্ব, ভূতুড়ে গল্প, এক কথায় লৌকিক ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার। এই সকল কথা বুঝিয়াই আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অথবা আধ্যাত্মিকতার গৌরব কিছুমাত্র কমিবে না। মানুষ যে পশু এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে মাত্র। তাহা না বুঝা বেকুবি। তাহার ফলে মানুষের দেবত্বও আরও স্পষ্ট হইয়াই উঠিবে। নৃ-তত্ত্বের দিক হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের বিশ্লেষণ সুরু করিলে আর একটা মস্ত লাভ হইবে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশটা পরিষ্কার হইতে থাকিবে। দেখিতে পাইব যে প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের জীবন যাপনের রীতিনীতি বদলাইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাইব যে, "মাৎস্য ন্যায়", অন্তর্ব্বিদ্রোহ, বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ, ঘরোয়া লড়াই এবং রক্তারক্তি ভারতবর্ষে অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। ইহা ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা নয়—দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। আর দেখিতে পাইব যে, হিন্দুত্ব এবং হিন্দু-সমাজের দলভেদ, জাতিভেদ, বিধিনিষেধ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই মাৎস্য ন্যায়ের প্রভাবে নানা যুগে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস না বুঝিলে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব, জাতিভেদ, বর্ণসঙ্কর এবং সামাজিক অনুশাসন বুঝা যাইবে না। এই সকল কারণে যুবক ভারতে নৃ-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

'গৃহস্থে'র "আলোচনা"য় "নব হিন্দুত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "গৃহস্থ" প্রচার করিতেছেন—"হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কেবল প্রত্নতত্ত্বের কোষাগার নহে। ইহা হিন্দুত্বের নূতন জীবনের উৎস। * * * যে হিন্দুত্ব আজ ভারত প্রত্যাশা করিয়া আছে, তাহা কেবল একটা শাস্ত্রগত সূত্র নহে। নব হিন্দুত্ব একটা জীবনের ধারা। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগে এই হিন্দুত্ব নূতন প্রেরণা, নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবে। এই হিন্দুত্ব হিন্দুকে জগতের মধ্যে কেবল একটা ব্যতিরেক বা "এক্‌সেপ্‌-শন্" করিয়া ঘিরিয়া রাখিবে না। এই নূতন জীবন-ধারার স্রোত বিশ্ব-মানব সাগরের মধ্যে যাইয়া পড়িবে, এবং এই জীবনের প্রেরণায় হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া লইবে—সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইবে।" পৃথিবীতে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেলে পিটিবার আখড়া হইতে নবজীবন গজাইয়াছে কি না খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কাশীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক ভারত তাজা এবং সরস আদর্শের নায়াগ্রা ঝোরা পাইবেন কি না তাহাও এক্ষণে আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় টাট্‌কা মাল যোগাইতে পারেন—ভাল কথা। আর যদি এই প্রতিষ্ঠান মরা পচা ও বাসি মালেরই গুদাম-ঘর হইয়া থাকে, তাহাতেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।

আসল কথা "নব হিন্দুত্ব"—দুনিয়ার লোকের পাতে দিবার উপযুক্ত ভারতধর্ম্ম—বর্ত্তমান জগতের একটা শক্তিস্বরূপ ভারতবাসীর দর্শন ও জীবন। এই হিন্দুত্ব, এই ভারতধর্ম্ম এবং এই দর্শন ও জীবনের কথাই যুবক ভারতের সকল আন্দোলনের ভিতরকার কথা। এই নবীন হিন্দুত্বের আলোচনা খোলাখুলি বোধ হয় এখনও কেহ করেন নাই।

কিন্তু অন্ততঃ বিগত দশ বৎসরের সকল প্রচেষ্টাই এই "নূতন জীবনের উৎস" হইতেই বাহির হইয়াছে। যুবক ভারত আগাগোড়া বর্ত্তমান-নিষ্ঠ এবং ভবিষ্যপন্থী বা "ফিউচারিষ্ট"। "গৃহস্থ" নব্য ভারতের ফিউচারিজম্-তত্ত্বটা অর্থাৎ "ভবিষ্যবাদ"ই স্পষ্টভাবে ধরিয়াছেন।

যুবক ভারত "আর্কিঅলজি" প্রত্নতত্ত্ব বা কবরতত্ত্ব বা মরাতত্ত্ব বা অস্থিকঙ্কালতত্ত্বও আলোচনা করিয়া থাকেন। মরা ভারতের কবর এবং চিতাভস্ম খুঁড়িয়া আমরা ভাস, বরাহমিহির, রসরত্নসমুচ্চয়, রাজপুত-"পাহাড়ী" চিত্রশিল্প, "সঙ্গীত-রত্নাকর" কৌটিল্যনীতি, ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্র-চোল্‌কে বাজারে দাঁড় করাইয়াছি। কালিদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ইত্যাদির আসর দিন দিন বেশ জম্‌কাল করিয়া তুলিতেছি। কথায় কথায় যুবক ভারত অতীতের নজির বাহির করিয়া থাকেন—অতীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সকল ক্ষেত্রেই তুমুলভাবে দেখা দিয়াছে। তাজা ভারতে বাসি ভারতের কথা এত বেশী হয় কেন? কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন তবে বুঝি যুবক ভারত অতীতেই ডুব মারিল রে! বস্তুতঃ ইয়োরামেরিকার কোন কোন পণ্ডিতমহলে এই ধরণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বিশ বৎসর ধরিয়া একটা মজা দেখিতেছেন। সকল ভারতবীরই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে অতীত ভারতের বুলি শুনাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের ঝুলিতে ছিল বেদান্ত। পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কথা ত জানি। ততঃ কিম্?" ব্রজেন্দ্রনাথ লণ্ডনের "বিশ্বমানব-পরিষদে" জবাব দিলেন—"অহিংসা"। এই খানেই শেষ নয়।" আজ রবিবাবুর নামে দুনিয়ায় ভারতের নাগরা বাজিতেছে। কিন্তু নাগরার আওয়াজে শুনা যায় কেবল তথাকথিত "মিষ্টিসিজ্‌ম্।" আর সিংহলের ভাবুক কুমারস্বামীও বিলাতে বসিয়া ভারতশিল্পের অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দের যোগতত্ত্ব

হইতে রবীন্দ্রনাথের কবীর-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকানেরা ভারতের এক সুর শুনিতে পাইলেন। পুরাণা ভারতের কথা—মরা ভারতের কথা—এবং সেই পুরাণা ভারতেরও অকেজো দিক্টা। দেখিয়া শুনিয়া পাশ্চাত্যেরা হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন—"যাক্, বাঁচা গেল। নব্য-ভারত আজও সেই থাড়া বড়ি থোড় লইয়া মাতিতেছে। সুতরাং ইহারা জগতে নবশক্তি আনিতে পারিবে না। মরা ভারতের কবর "লাভা" প্রস্তরের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই জমাট্ বাঁধা মঞ্চের উপর আর নবজীবন গজিতে পারিবে না। অতএব ভারতবর্ষের নামটা খরচের খাতায় লেখ। ভারতের ত্রিশকোটি নরনারী জগতের কোন কাজে লাগিবে না। হিন্দুস্থান বিশ্বশক্তির বহির্ভূত সৃষ্টিছাড়া মৃৎপিণ্ড-বিশেষ।"

বিদেশীয়েরা যুবকভারত সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিতেছেন—দেশীয় লোকেরাও অনেকটা এই রূপই সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের "ভবিষ্যবাদে" প্রত্নতত্ত্বের মূল্য কত খানি? যুবকভারত অতীত-কথাকে কোন্ কাণে শুনিতেছেন? আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যুবক ভারত অতীতের জন্য অতীতের আদর বিন্দুমাত্র করেন না। পুরাণা আধ্যাত্মিকতার বড়াই আমাদের "ভবিষ্যবাদে" এক কাঁচ্চাও নাই। আমরা মোগল-ভারতের গৌরব-যুগ, অথবা গুপ্তবর্দ্ধন-পাল-চোল-সেন-আমলের হিন্দুত্ব, অথবা কাণিষ্কশাসিত আর্য্যাবর্ত্তের এবং আন্ধ্রশাসিত দাক্ষিণাত্যের ভারত-কীর্ত্তি অথবা মৌর্য্য-ভারতের জীবন, দর্শন ও ধর্ম্ম সবই বাতিল বিবেচনা করিয়া থাকি। এই সকল হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া যুবক ভারত হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহে না। যুবক ভারত বৃহত্তর কালিদাসের বৃহত্তর হিন্দুত্ব গড়িবে এবং বৃহত্তর উপনিষৎ, বৃহত্তর গীতা ও বৃহত্তর বেদান্ত রচনা করিয়া জগতে বৃহত্তর আধ্যাত্মিকতা আনিবে। আর

এই বিরাট্ সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান যুগের মানবজাতি জগতের সর্ব্বত্র উদ্দীপনা লাভ করিতে পারিবে। যুবক ভারত দুনিয়ায় এক প্রধান শক্তি হইয়া থাকিবে। বিশ্ববাসীর বিবেচনায় হিন্দুস্থান আর "অতীতের দেশ" মাত্র পরিগণিত হইবে না।

তথাপি তাজা ভারতে বাসি ভারতের বুলি এত বেশী আওড়ান হয় কেন? জবাব অতি সহজ। প্রথম কথা এই যে, আমরা বনিয়াদি ঘরের লোক। এই কথাটা দুনিয়ায় স্বীকৃত হয় না। আমাদের কুলজী পুঁথি বাহির করিয়া তাহা স্বীকার করাইতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের পুরাণা ভারতখানাকে বেকুব নরনারীর দেশ বিবেচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কুসংস্কার নকল করিয়া আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরাও পুরাণা হিন্দুস্থানকে অকর্ম্মণ্য চরিত্রহীন এবং মরা স্ত্রীপুরুষের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়াছেন। এই কুসংস্কারের ফলে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী পূর্ব্ববর্ত্তী চৌদ্দপুরুষের নিন্দা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং দুনিয়ায় মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। কাজেই পাশ্চাত্য এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের কুসংস্কার ধ্বংস করা ভবিষ্যবাদী যুবক-ভারতের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। আমরা দেখাইতে চাহি যে, আকবর, প্রতাপাদিত্য, শাজাহান, শিবাজী, আওরাংজেব, তানসেন, আবুলফজল, রামদাস, বিদ্যাধর, বাজীরাওয়ের ভারত ষোড়শ ও সপ্তদশ, এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপ হইতে কোন অংশে খাটো নয়। পাশ্চাত্য নরনারীর যতগুলি দোষ ছিল ভারতবাসীর দোষ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য নরনারীর গুণ যতগুলি ছিল ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের গুণ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। আমরা ঘরে ঘরে কামড়াকামড়ি করিয়াছি—ইয়োরোপীয়েরা ঠিক সেইরূপ কামড়াকামড়ি করিয়াছেন। আমাদের আওরাংজেব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন—হিন্দুতে মুসলমানে

লড়াইয়াছেন। আওরাংজেবের সমসাময়িক ফরাসী নরপতি জগদ্বিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুই অবিকল এই মোগল সম্রাটের জুড়িদার ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯) ইয়োরোপের যে অবস্থা ছিল, ভারতেরও তখন সেই অবস্থা ছিল। সুতরাং মোগল-মারাঠার যুগ ভারতের নিন্দনীয় যুগ নয়। তাহার পুর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা তুলিলেও বুঝিতে পারি যে, ইয়োরোপের মানুষ দেবতা নয়, এবং ভারতের মানুষ জানোয়ার নয়। যুগে যুগে ইয়োরোপীয়ানের যতগুলি দুর্ব্বলতা-সবলতা ছিল, ভারতবাসীরও ঠিক ততগুলি দুর্ব্বলতা সবলতা ছিল। রক্তমাংসের মানুষ ইয়োরোপে হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গায়িত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, কুসংস্কারে মজিত। রক্তমাংসের মানুষ ভারতেও হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গায়িত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কুসংস্কারে মজিত।

এই কথাটা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা একশত বৎসরের প্রভুত্বের ফলে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমাদের পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করিতে অনেকটা নারাজ। এইজন্য যুবক ভারতের প্রথম অস্ত্র "হিষ্টরিক্যাল্ ক্রিটিসিজম্" এবং "কম্পারেটিভ হিষ্টরি" অর্থাৎ "ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী" অথবা বিশ্ব সমালোচনায় ইতিহাসের প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা-প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের স্থান খুব বড়। বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্বের "ব্যাখ্যা" ও ভাষ্যই এই বিচার-প্রণালীর জীবন। এই কারণে যুবক-ভারত বাসি-ভারতের কথা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বাধ্য। ব্যাখ্যা কার্য্যে "প্রাণ-বিজ্ঞান" (বায়লজি) যুবক-ভারতের প্রধান সহায়।

দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে চাগাইয়া তোলা হইতেছে—কিন্তু অতীত কি অতীত বেশে দেখা দিতেছেন? দেখা দিলেও সেই অতীত বর্ত্তমানের আলোকে ও উত্তাপে ঝলসিয়া যাইতেছে না কি? বস্তুতঃ, যুবক-

ভারতের হাতে অতীত নবজীবনের একটা উপকরণ মাত্র। অধিকন্তু ইহা একমাত্র উপকরণ নয়। যুবক-ভারত নানা উপকরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বই যুবক-ভারতের ল্যাবরেটরি—মরা-ভারত অর্থাৎ ভারতের প্রত্নতত্ত্বটা বাদ পড়িবে কেন? বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়া পুরাণা ভারতের শক্তিপুঞ্জ ফেলিয়া দিলে বেকুবি করা হইবে। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত দিতেছি। মান্ধাতার আমলের গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক দর্শন ও গ্রীক চিন্তা-প্রণালীই ষোড়শ শতাব্দীর নবীন ইয়োরোপ গড়িয়া ছিল। ইয়োরোপের মনু অ্যারিষ্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪ ২২)। তিনিই বেকন-অবতারে (১৫৬১-.৬১৬) নবরূপে দেখা দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে "রেণেসাঁস" বা নবাভ্যুদয় ব্যাপারটা [illegible] মরা-গ্রীসেরই নবজীবন লাভ বৈ আর কিছু নয়। মরা-হাড়েও ভেল্কি খেলান যায়। মরা হাড় ফেলিয়া দেওয়া চতুর মানুষের কার্য্য নয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন ইয়োরোপে একটা বিরাট্ আন্দোলন হইয়া গেল। উহা ফরাসী-বিপ্লবের ও নেপোলিয়ানী যুগান্তরের সমসাময়িক (১৭৮৯-১৮১৫)। নাম রোমান্টিক আন্দোলন। জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স সর্ব্বত্রই এই আন্দোলনে নরনারী নবজীবন লাভ করিয়াছে। ভিতরকার কথা খতাইয়া দেখিলে বুঝি যে, এই আন্দোলনও অনেকাংশে মরা জিনিষেরই চাঁড়ান মাত্র। রোমান্টিক আন্দোলনের ভাবুকগণ মধ্যযুগের গল্প গুজব বীর-কাহিনী "রেলিক্‌স্" অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব এবং অতীত কথার সরস ব্যাখ্যা ও রংচঙ্গান টিপ্পনী সাজাইয়াই কিস্তী মাত করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) এবং বিলাতী স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) কথা অনেকেরই জানা আছে। গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) গট্‌জ্ নামক ষোড়শ শতাব্দীর এক জার্ম্মাণ ডাকাইত-বীরের জীবনবৃত্তান্ত নাটকাকারে প্রচার করেন। ইহা ১৭৭১

খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইয়োরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। পুরাণা "নিবেলুঙ্" গাথাই ভাবুক জার্ম্মাণির জীবন ছিল। গ্যেটের "ফাউষ্ট্" কাব্য ও এই ধরণেরই প্রত্নতত্ত্বের এক সদ্ব্যবহার।

কয়েকদিন হইল ইতালীতে ভাবুকপ্রবর ম্যাট্‌সিনি (১৮০৫—৭২) মধ্যযুগের দান্তে-সাহিত্যকে (১২৬৫—১৩২১) নব-জীবনের ফোয়ারা-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক ফরাসীদের "লেমিজারেবল্" গ্রন্থ (১৮৬৩) দুনিয়ার জনসাধারণের পুরাণ এবং দরিদ্রের গীতা-স্বরূপ। ভবিষ্যবাদের এই টাট্‌কা বিশ্বকোষখানা যাঁহার রচনা, তাঁহার কাব্য-নাট্য-গদ্যেও মধ্যযুগ বহু কথা কহিয়াছে।

ভারতে বিক্রমাদিত্যের কালিদাসও তাঁহার কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশ রচনা করিতে যাইয়া পুরাণা মালেরই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার মধ্যযুগে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস অতীতকে "ফিউচারিজমের" উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের "আদি কবি" বাল্মীকি দিগ্‌বিজয়ী গুপ্ত সম্রাট্‌গণের আমলে নববেশে দেখা দেন। আবার মোগল ভারতের রেনেসাঁস বা নবাভ্যুদয়কালে তাঁহার নূতন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

মরা হাড়ে ভেল্কি খেলান দুনিয়ার কবি-সম্রাট্‌গণের কার্য্য। মরা জিনিষের সদ্ব্যবহার, "পূর্ব্ব সূরি"গণের মাল মশলায় কায়দাফলানো অতীতকে জাগানো, প্রত্নতত্ত্বকে জীবনতত্ত্বে দাঁড় করান কালিদাস-দান্তে-শেক্‌স্‌পীয়ার-গ্যেটে-হিউগোর অমর কীর্ত্তি। অতীত অতীতবেশে আসেন না—ভবিষ্যবাদের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য নবরূপে দেখা দেন। কাজেই যুবক ভারতের ভবিষ্যবাদে অতীত-নিষ্ঠা বিচিত্র নয়, অতি স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, যুবক-ভারত দেখাইতে চাহেন যে, অতীত ভারত কোন দিনই সৃষ্টিছাড়া দেশ ছিল না। অন্যান্য মানবসমাজের সঙ্গে হিন্দুস্থানী মানবসমাজের লেনদেন প্রচুর ছিল। হিন্দুত্ব চিরকালই বিশ্বশক্তির বিরাট্

ঘূর্ণিপাকের মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিপাকরূপে বিরাজ করিত। দুনিয়ায় হিন্দু-সমাজ তাহার দাতব্য দান করিয়াছে। দুনিয়া হইতে হিন্দুসমাজ নব নব উপকরণ লাভ করিয়াছে। জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারতের নরনারী একাকী জীবনধারণ করে নাই। কাজেই বর্ত্তমান যুগে যুবক-ভারত হিন্দুত্বকে যে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার উপর দাঁড়াইতে হিন্দুত্ব অতি সহজেই সমর্থ হইবে। বহুযুগে বহু যুবক-ভারত হিন্দুত্বকে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। হিন্দুত্ব প্রত্যেক ডাকেই সাড়া দিয়াছে। এই জন্যই হিন্দু সভ্যতা অমর। ভারতের জীবন ও দর্শন কোন দিনই জগতে পশ্চাৎপদ ছিল না—আজও পশ্চাৎপদ থাকিবে না। ইহাই হিন্দুত্বের বিচিত্র অমরতা। ভবিষ্যপন্থী বর্ত্তমাননিষ্ঠ জাতি মরিতে পারে না—যুগে যুগে নব নব শক্তি হজম করিয়া অগ্রসর হয়। ভারতের জীবন ও দর্শন প্রথমে এশিয়ার নরনারীকে খাড়া করিয়া তুলিবে—তাহার পর ইয়োরামেরিকার জীবন ও দর্শনের সঙ্গে বুঝা পড়া করিবে। জগতের ভবিষ্যৎ মানবসমাজ সেই নবীন হিন্দুত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। প্রত্নতত্ত্ব হইতেই যুবক-ভারত এই ইঙ্গিত পাইতেছেন। এই জন্যই "বায়লজির" সেবক হইয়াও আমরা "আর্কিওলজি"তে মাতিয়াছি। মরা ভারতের আসল মূর্ত্তি যতই পরিষ্কার হইতে থাকিবে, ভবিষ্য-পন্থীদিগের কার্য্য ততই সহজ হইয়া পড়িবে।



লৌহ-কারখানার তত্ত্বাবধায়ক
শ্রীযুক্ত উ
(১০৭ পৃষ্ঠা)



ফুতান কলেজের প্রেসিডেন্ট
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লী
(১৩৭ পৃষ্ঠা)



ইয়াঙ্কিস্থানে চীন সাম্রাজ্যের
রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত উ টিংফাঙ্,
(৩০১ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

চীনের তৃতীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব

(১) "আবার আবার সেই কামান-গর্জ্জন !"

বিগত ৫ই ডিসেম্বর (১৯১৫) রবিবার সন্ধ্যাকালে "ইণ্টারন্যাশন্যাল ইনৃষ্টিটিউটে"র বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে পরিচালক রীড্ সাহেব বলিলেন—"মহাশয়, আজ এ পাড়ায় এক বাড়ীতে বিবাহের ধুম। বাহিরের আওয়াজ ঘরের ভিতর বড় বেশী প্রবেশ করিতেছে। কিছু জোরে চেঁচাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "এই যে বাজি পোড়াইবার শব্দ শুনিতেছি, উহা কি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে না কি ?" ইনি বলিলেন—"হাঁ, আপনাদের দেশেও বিবাহোৎসবে এইরূপ বাজি-বাজনার ব্যবস্থা আছে বুঝি!" বক্তৃতাদি হইয়া গেল। ডাক্তার উ-টিং-ফাঙ্ সভাপতি ছিলেন। রাত্রি হইয়া আসিল। রীডের বৈঠকখানায় আসিয়া সকলে বসিলাম।

খানিকক্ষণ পরে রীড-পত্নী আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ডাক্তার উ, মহা বিপদ। আবার বুঝি ১৯১৩ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত!" রীড্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হইয়াছে ?" পত্নী বলিলেন—"শুনিতে পাইতেছ না—কামান-দাগার আওয়াজ ?" উ হাসিয়া বলিলেন—"মেয়ে মানুষ মাত্রেই ভীরু। ভুঁইপট্‌কা, হাওয়াই, আতসবাজির আওয়াজ শুনিয়াই আপনি কামান-দাগার ঘটা দেখিতেছেন! পাশের বাড়ীতে যে বিয়ের সমারোহ!" রীড-পত্নী বলিলেন—"ভুঁই-পট্‌কার আওয়াজ, বোমার আওয়াজ, আর কামানের আওয়াজ তফাৎ করিবার মতন কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। ওই শুনুন "বুবুম্!" ওই শুনুন 'বুবুম্!' ইহা কি

ছেলেদের হাতের ভুঁই-পট্‌কা?" রীড্ এবং উ আলোচনা করিতে লাগিলেন—"তাই ত, এখন শাংহাইয়ে কামান দাগাদাগি কি জন্য? কাহার উপর আক্রমণ? কোথা হইতে আক্রমণ?" রীড্-পত্নী বলিতে লাগিলেন—"আমি যখন এই গৃহে আসিতেছিলাম—তখন মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দিয়া হুস্ করিয়া একটা কি চলিয়া গেল।" রীড্ এবং উ বলাবলি করিতে লাগিলেন—"বিদেশী মহাল্লার উপর আক্রমণ হইবে কেন? বোধ হয় নদী হইতে কেল্লার দিকে তোপ ছাড়া হইতেছে,—কিন্তু কেল্লাই বা আক্রমণ করিবে কে? শুনিতেছি কয়েক দিন হইল একখানা সশস্ত্র চীনা রণতরী শাংহাইয়ের ঘাটে আসিয়াছে। তাহার কাপ্তেন ও লস্করেরা ত সকলে য়ুয়ান্-পক্ষীয়। তাহারা কি হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল?" রীড্-পত্নী বলিলেন—"বোধ হয় তাই। জাহাজের লোকেরা য়ুয়ানের দল ছাড়িয়া বোধ হয় বিপ্লব সুরু করিল। এই জন্য কেল্লাটাকে আগে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত। এই কেল্লায় আজকাল য়ুয়ানের অনেক সৈন্য আছে। তাহা ছাড়া গোলাবারুদ রসদ ইত্যাদি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে।" রীড্ বলিলেন, "অসম্ভব নয়। শাংহাইয়ের বিপ্লব-পন্থীরা খুব সম্ভব জাহাজের কাপ্তেনকে হাত করিয়াছে। শাংহাইয়ে আজ কাল নাকি হাজার হাজার বিপ্লবপন্থী আসিয়া জুটিয়াছে। কোন কোন কাগজে প্রকাশ যে, বিদেশী মহাল্লার প্রত্যেক বাড়ীতেই নাকি য়ুয়ানের বিপক্ষীয় সুন-পন্থী একজন করিয়া চীনা আশ্রয় লইয়াছে!"

নানাপ্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। ভৃত্য আসিয়া জানাইল, উ মহাশয়ের ভবন হইতে মোটরকারে সংবাদ আসিয়াছে। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধ বিশেষ চিন্তিতভাবে গিয়া মোটরে বসিলেন। বৃদ্ধা রীড্-পত্নী ততোধিক বৃদ্ধা-উ-পত্নীর কথা পাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"আহা, বুড়ীর বৃদ্ধ

বয়সে বড় কষ্ট। একদিনও মনে শান্তি নাই। সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?" রীড্ বলিতে লাগিলেন—"ডাক্তার উ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। য়ুয়ান্ উকে বহুবার সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উ কোনমতেই য়ুয়ানের আধিপত্যে পদগ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সেদিন পিকিঙে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইল। য়ুয়ান্ এত সাধাসাধি করিলেন—তথাপি উ প্রদর্শনীর পরীক্ষক মাত্রও হইতে রাজী হইলেন না। এদিকে সুনের চরমপন্থিতাও উ পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ বয়স বাড়িয়াছে—গণ্ড-গোলের ভিতর না যাওয়াই ইচ্ছা। কিন্তু সুনের দল উকে সহজে ছাড়িবে না। মাথা গরম ছোক্‌রারা উকে কয়েকবার ভয়ও দেখাইয়াছে। তাহারা বলে—খোলাখুলি আমাদের দলে থাকিতে ইচ্ছা না করেন, য়ুয়ানের দলে যাইতে পারিবেন না। একবার যখন আমাদের দলে ছিলেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দিকেই সহানুভূতি দেখাইতে হইবে।' অধিকন্তু উ পয়সাওয়ালা লোক। কাজেই সুন-পন্থীরা উর তহবিল হইতে বিপ্লবের জন্য অর্থ-সাহায্য আশা করে।"

রীড্-পত্নী আবার বলিলেন—"চীনে নামজাদা বড়লোকদের বড় বিপদ্। কোন এক দলের পক্ষগ্রহণ করিলেই অপর দলের হাতে মৃত্যু একপ্রকার সুনিশ্চিত। বৃদ্ধ উ মহাশয়ের যখন তখন প্রাণসংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এ যাত্রায় বিপ্লব যদি সত্যসত্যই সুরু হয়, তাহা হইলে হয় য়ুয়ানের দল, না হয় সুনের দল উকে সর্ব্বদা প্রাণভয়ে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিবে। বুড়ী উ সেদিন আমার নিকট অনেক দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। আজকাল আবার সহরের ভিতরে চীনাদের বড় বড় দোকানে লুটপাট ডাকাইতি সুরু হইয়াছে। উর ঘরে কখন ডাকাইতি হয় বলা যায় না। কাজেই ধনে প্রাণে সারা হইবার ভয়ে উ-পরিবার বিশেষ বিব্রত।"

হোটেলে আসিয়া শুইয়া পড়া গেল। ভাবিলাম—মজা মন্দ নয়। বিলাত হইতে যেদিন বেলজিয়াম্ রওনা হইবার কথা, সেইদিন ইয়োরোপে রণভেরী প্রথম বাজিয়াছিল। আর একদিন দেরি হইলেই হয়ত বেলজিয়ামে যাইয়া কামানদাগা শুনিতাম। ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত চীনে আসিয়া কামান গর্জ্জন শুনিতে হইল। কলিকাতায় রাজরাজড়ারা পদার্পণ করিলে কেল্লা হইতে তোপ পড়ে। তাহা ছাড়া কামানের আওয়াজ জীবনে আর ত কখনও শুনি নাই। লড়াইয়ের সত্যিকার কামানদাগা শাংহাইয়ে প্রথম শুনিলাম। ভেতো বাঙ্গালীর কাণেও শুনাইতেছে মন্দ না। ব্‌বুম্, ব্‌বুম্, ব্‌বুম্—এইরূপ আওয়াজ দশবিশ মিনিট পর পর হইতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িলাম—রাত্রিকালে বোধ হয় দু একটা আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—ভোরেও ঘুম ভাঙ্গিবার সময়ে কামান-গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল। সকাল-বেলা আর কোন আওয়াজ নাই। বাহির হইয়া দেখি—সমস্ত রাত্রি কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল—এখনও চারিদিক্ ঝাপ্‌সা। কলিকাতায়ও শীতকালে অনেক দিন এইরূপ দেখা যায়।

কাগজ আসিল—বুঝিলাম বিপ্লবই বটে। সত্যিকার কামান, সত্যিকার আক্রমণ। কিন্তু চূড়ান্ত বেকুবি—নিষ্ফল প্রয়াস—অনেকটা ঠিক্ যেন "ঢাল নাই, তরওয়াল নাই, শান্তিরাম সিং"য়ের অভিনয়!

জাহাজের অধিকাংশ কর্ম্মচারিগণ সহরে এক ভোজে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে কাপ্তেন লস্করের সংখ্যা বেশী ছিল না। একখানা ছোট ষ্টীমলাঞ্চে চড়িয়া ত্রিশজন পাশ্চাত্যবেশী চীনা যুবক রণতরীতে উপস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি নৌ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। কয়েক-জনের সঙ্গে জাহাজের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আলাপ ছিল।

তাঁহারা যুবকগণকে জাহাজের বিভিন্ন বিভাগ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রিভল্‌ভার বাহির করিয়া যুবকেরা গোলন্দাজদিগকে বলিল—"বারুদখানার চাবি কোথায়? কামান দাগিতে হইবে—শীঘ্র চাবি দাও। নচেৎ হন্তব্যোঽসি ময়া।" ইত্যাদি। বেগতিক বুঝিয়া গোলন্দাজ ছোট ছোট কামানে ব্যবহারোপযোগী বারুদ ও তোপ বাহির করিয়া দিল। কয়েকজন চতুর লস্কর বড় বড় কামানের তোপগুলি জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। যুবকগণ ত কেহই কখন কামান দেখে নাই—কামান-দাগা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। বারুদ তোপ তাহাদের সম্মুখে আনা হইল। আবার গর্জ্জন করিয়া ছোক্‌রারা হুকুম করিল—"দাগো কামান!" গোলন্দাজেরা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়? কাহার উপর?" শান্তি-রামেরা বলিল—"আবার কিসের উপর? ঐ কেল্লা ও বারুদ ফ্যাক্টরির উপর।" প্রাণের ভয়ে গোলন্দাজেরা হুকুম মানিতে বাধ্য হইল। রাত্রির মধ্যে সর্ব্বসমেত পঁচাশীটা তিন ইঞ্চি তোপ ছাড়া হইয়াছিল। একটাও কেল্লায় অথবা বারুদখানায় অথবা কোন অট্টালিকার উপর পড়ে নাই। গোলন্দাজেরা চতুর—তাহারা সতর্কভাবে নিশানা ঠিক করিয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী বিদেশী কোন মহাল্লারই অনিষ্ট হইতে পারিল না। ছোক্‌রারা মহা খুসী—কেল্লা ত আক্রমণ করা হইতেছে—আর কি চাই? কেল্লার উপর গুলিগোলা পড়িতেছে কি না অতটা বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও ছিল না।

ভোর হইতে হইতে কুয়াশা ভেদ করিয়া য়ুয়ান্-পন্থীর নিকটবর্ত্তী এক জাহাজের লোকেরা এই জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। জাহাজটা কিছু কিছু জখম হইতেছে দেখিয়া যুবকগণ যে যেদিকে পারিল, নৌকা বক্ষে পলায়ন করিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—তাহাদিগকে পাক্‌ড়াও করিবার চেষ্টায় কোন ফল হইল না।

সেই রাত্রেই স্থলপথে কেল্লা আক্রমণ করিবার আয়োজনও নাকি করা হইয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী মহাল্লার স্থানে স্থানে বিপ্লববাদী সুন-পন্থীরা রিভল্‌ভার ও বোমা হাতে সুযোগ খুঁজিতেছিল। দুএকটা থানাও আক্রমণের কথা ছিল। মোটের উপর সবই ফাঁসিয়া গেল। দুই তিন দিন ধরিয়া এখানে ওখানে দুএকটা মারপিট্, ধর-পাকড়াওয়ের হাঙ্গামা চলিল। বিদেশীয়েরা কাণাঘুষা হাসাহাসি করিতে থাকিল। কেবল প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান্ দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। য়ুয়ান্-পক্ষীয়েরা ভাবিতে লাগিল—"তবে কি নির্ব্বিবাদে য়ুয়ানুকে রাজতক্ত প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না? ছেলে-ছোক্‌রারা ত এ যাত্রায় বেকুবি করিল। কিন্তু এই বেকুবির পশ্চাতে কতখানি বুদ্ধি, কর্ম্মপাণ্ডিত্য ও টাকার জোর আছে, তাহা ত আন্দাজ করিতে পারিতেছি না!"

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে শাংহাইয়ের সামরিক শান্তি-রক্ষক দুই যুবকের হাতে মারা পড়েন। ইনি চীনের একজন পাকা নাবধ্যক্ষ ছিলেন। লোকের অনুমান—ইনি য়ুয়ান্‌পক্ষীয়দিগের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া নিহত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সুন্‌পক্ষীয় লোক ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের সঙ্গে রিভল্‌ভার বন্দুকও পাওয়া গিয়াছে। সকলগুলিই জাপানী-মার্কা। জাপানী ব্যবসাদারেরা পয়সা পাইলে দুনিয়ার যে কোন বিপ্লবপন্থীকে নাকি গোলাগুলি বন্দুক বারুদ ইত্যাদি বেচিয়া থাকে। ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ এইরূপ বে-আইনি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। জাপানীরা বড় অর্থপিশাচ এবং নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে বলিয়া অখ্যাতি রটিতেছে। এই ধরণের অখ্যাতি সকল ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ারের বন্দুকগোলা-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

(২) প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্ ও বিশ্বশক্তি

হবু-রাজা য়ুয়ান্-শী-কাইয়ের তর সহিল না। ১২ ডিসেম্বরের য়ুয়ান্-পক্ষীয় পিকিঙের সংবাদপত্রগুলি লাল কাগজে ছাপা হইল। পিকিঙ্ সহরটা নব্য রাজকীয় পতাকায় সুশোভিত হইল। ঢাক ঢোল সহকারে প্রচার "অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন! অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন।" য়ুয়ান্‌কে দেশের লোকেরা "জবরদস্তি করিয়া" রাজসিংহাসন দিতেছে। মাঞ্চু, তিব্বতী, মঙ্গোলিয়, চীনা, মুসলমান, কন্‌ফিউশিয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ব্যবসায়ী—সকল শ্রেণীর লোকেরই নাকি ইহাই হৃদয়ের ইচ্ছা। যথারীতি ভোটও গণনা করা হইয়াছিল—একটা ভোটও য়ুয়ানের বিরুদ্ধে ছিল না! সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জননায়কগণ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে য়ুয়ানের দরবারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ভক্তি-গদগদকণ্ঠে য়ুয়ানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "চীনের চল্লিশ কোটি নরনারী সমবেত হইয়া আপনার ভগবচ্চিহ্নিত শ্রীমস্তকে রাজমুকুট দেখিতে অভিলাষী। এই কয় মাস ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত আপনার সন্তানস্বরূপ চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছে।" য়ুয়ান্ কিছু রুক্ষভাবে জবাব দিলেন—"আপনারা আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিলেন। আমাকে শান্তিতে তিষ্ঠিতে দেবেন না দেখিতেছি। যদি দেশের লোক রাজাই চাহেন তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে রাজমুকুট প্রদান করুন। আমি সম্রাট্ হইতে অসমর্থ।"

সেই দিনই চীনা ধুরন্ধরেরা আবার এক সভা আহ্বান করিলেন। আবার স্থির হইল য়ুয়ান্‌কেই সম্রাট্ করিতে হইবে। আবার তাঁহারা করযোড়ে য়ুয়ান্‌কে দেশবাসীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সেই দিনই য়ুয়ান্ মহা বিব্রতভাবে উত্তর দিলেন—"নেহাৎই আপনারা আমাকে তবে রাজা করিবেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া দেশের লোককে খুসী করিলাম।" শ্রীমুখ

হইতে এই বচন বাহির হইবা মাত্র পিকিঙ্ উল্লাসে মত্ত হইল। তাহার পর ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই তারিখ চীনের সর্ব্বত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল। য়ুয়ানের দল পিকিঙেই বেশী—কাজেই পিকিঙে উৎসবের মাত্রা বেশী। অন্যান্য সহরে অতি সামান্য মাত্র আয়োজন। সরকারী আফিস, আদালত ছাড়া আর কোন বাড়িঘরে আমোদপ্রমোদ পতাকার ধূম দেখা গেল না। শাংহাইয়ের স্বদেশী মহাল্লায়ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিন বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। লাল কাগজে কোন সংবাদপত্র পিকিঙ্ ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও ছাপা হয় নাই। সর্ব্বত্রই একমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীরা "হরির লুট" নিজে ছিটাইয়া নিজেই খাইলেন। পাড়ার লোক সে হরির লুটে যোগ দিল না। ১৫ই ডিসেম্বার তারিখে য়ুয়ান্ কাগজে কলমে রাজা হইলেন—চীনা স্বরাজকে কাগজে কলমে কবর দেওয়া হইল। নবীন সাম্রাজ্যের প্রথম বর্ষের প্রথম দিন ১৫ই ডিসেম্বার—কিন্তু রাজ্যাভিষেক-যজ্ঞটা পাঁজিপুঁথির তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই দিনই জাপান-সরকার য়ুয়ানকে এক উপদেশ-পত্র পাঠাইলেন। এই উপদেশে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও ইতালীয় গভর্ণমেণ্টও জাপানের পশ্চাতে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"য়ুয়ান্, কাজটা তাড়াহুড়া করিয়া সারিও না। আরও কিছু অপেক্ষা কর। দেশের লোকের মতিগতি কোন্ দিকে, সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। আমাদের বিশ্বাস তুমি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলে চীনের ভিতর বড় রকমের একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে বুঝিতেছ—চীনের বাণিজ্য সম্পদ নষ্ট হইতে থাকিবে—আর ঘটনাচক্রে হয়ত আমরাও আমাদের লোকজন-টাকা-পয়সা-শিল্প-ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য লাঠিসোটা লইয়া চীনের ভিতর হাজির হইব। বুঝিলে? কাঁচা কাজ করিও না, আমাদের বিশ্বাস তুমি তোমার বিপক্ষীয়গণের ওজন ঠিক করিতে পার নাই।"

এই ধরণেরই উপদেশ এই পাঁচ রাষ্ট্র প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বেও একবার দিয়াছিলেন। এই উপদেশ প্রদান কাণ্ডে কর্ত্তা ছিলেন জাপান—অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাপানী চীন-মন্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে য়ুয়ান্-দরবারে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। জাপানের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ বিরক্ত—আর ইংরেজ-মন্ত্রী জাপানী-মন্ত্রীর এক প্রকার হুকুম অনুসারে কর্ম্ম করিতেছেন দেখিয়া চীনের ইংরেজ-সমাজ নতশির। কি করা যায়?—ইয়োরোপে এখন মহাকুরুক্ষেত্র। জাপানকে ইংরেজের হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে এখনই ভারতবর্ষে জাপানী পতাকা উড়িবে। যাহা হউক, য়ুয়ান্ রাষ্ট্র-দূতগণকে সংক্ষেপে বলিলেন—"দেশের মধ্যে কোন প্রকার অশান্তির কারণ নাই। বিপ্লববাদীরা গণ্ডগোল সুরু করিলেও আমরা নিজ শক্তিতেই তাহা দমন করিতে পারিব। বিদেশীয় ধনজনের কোন অনিষ্ট হইবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। চীনে বিদেশীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আদৌ আবশ্যক হইবে না। এই সঙ্গে আশ্বাসও দিতেছি যে, সকল প্রকার বাধাদুর্য্যোগ বুঝিবার পূর্ব্বে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হইবে না।" য়ুয়ান্ বিদেশীয় চোখ-রাঙানিতে কাবু হইলেন না। য়ুয়ানের দৃঢ়তা দেখিয়া বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে হাসিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা শেক্স্পীয়ারের নাটকে অনেক দেখিয়াছি। একটা দৃশ্য য়ুয়ান্-উপলক্ষ্যে মনে পড়িতেছে। রসিকপ্রবর তাঁহার "জুলিয়াস সীজার" নাটকে বিশ্বশক্তি ও মানবের দ্বন্দ্ব অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সীজার যখন শত্রুহস্তে নিহত হব' হব' হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মুখে চূড়ান্ত দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য ও শক্তির কথা বাহির হইতেছে। পর মুহূর্ত্তেই যিনি মারা পড়িবেন, তিনি বুক ঠুকিয়া বলিতেছেন—"আমার কার্য্যপ্রণালী অটল, আমি শীঘ্র নড়ি না—আমাকে তোমরা কি fixed as the polar star বলিয়া জান না?"

১৫ই ডিসেম্বার তারিখে য়ুয়ান্‌ও শেক্‌স্‌পীয়ারীয় সীজারের মতন "আকাশের ধ্রুবতারার ন্যায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ"। দুনিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় য়ুয়ান্ নড়িবেন না।

চারিমাস মাত্র গত হইয়াছে। আজ ২১শে এপ্রিল গুড্ ফ্রাই-ডে (১৯১৬)। কাল কাগজে পড়িতেছিলাম য়ুয়ান্ বিপ্লবপন্থীদিগকে জানাইয়াছেন—"আমি চীনা-স্বরাজের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, (১) আমার ও আমার পরিবারের জীবন ও ধন-সম্পত্তি তোমরা নষ্ট বা বিপর্য্যস্ত করিবে না ; এবং (২) এত দিন যাঁহারা আমার স্বপক্ষে রাষ্ট্রকর্ম্ম করিতেছিলেন এবং আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাঁহাদিগের জীবনের উপর কোনরূপ আক্রমণ হইবে না। তোমরা এই দুই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেই আমি তোমাদিগের নির্ব্বাচিত সভাপতির হস্তে রাষ্ট্রের ভার সমর্পণ করিব।" আজ য়ুয়ান্ সভাপতির পদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য। মাসখানেক পূর্ব্বেই—২২শে মার্চ্চ তারিখে—তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়ার কল্পনায় সীজারের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, জগতের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা ঘটিল, স্বচক্ষে দেখিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াংসি ও হোয়াং-হো নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গিয়াছে। বিশ্বশক্তি বহুবিধ ও বিপুল। তাহার পরিমাণ ওজন করা কোন এক ব্যক্তির বা দলের সাধ্য নয়।

(৩) চীনের সি-কিয়াঙ-মাতৃক জনপদ

আলঙ্কারিক ভাষায় বলিলাম হোয়াং-হো এবং ইয়াংসির জল বহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ দুই নদীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। খাঁটি ভৌগোলিক হিসাবে বলা উচিত যে, জল বহিয়া গিয়াছে সি-কিয়াঙের।

বিদেশীয় রাষ্ট্রের কোনো প্রদেশের নাম সাধারণতঃ কোনো উচ্চ

শিক্ষিত লোকও মনে রাখে না। ইংলণ্ডের কাউন্টিগুলির নাম কয়জন ইয়াঙ্কি জানেন? জার্ম্মাণির প্রদেশ সমূহই বা কয়জন ইংরেজের জানা আছে? এমন কি, নিতান্ত ক্ষুদ্র বা নগণ্য স্বাধীন রাষ্ট্রেরও সংবাদ বেশী লোক রাখে না। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় লড়াই সুরু হইবার পূর্ব্বে তেজস্বী সার্ভিয়ার নাম পৃথিবীর কয়জনে জানিত? ঘটনাচক্রে সার্ভিয়ার নাম আজ দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশের প্রদেশ বা জেলা সমূহের নাম লোকসমাজে প্রচারিত না হইবারই কথা। ভারতবর্ষের কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগর ছাড়া বোধ হয় অন্য কোন নাম ভারতের বাহিরে পরিচিত নয়। প্রদেশ হিসাবে একমাত্র বাঙ্গালার নাম স্থানে স্থানে শুনা যায়। বার্ণার্ডি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গের নামটা জাহির করিয়া দিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে চীনেরও একটা প্রদেশ এখন হইতে দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ থাকিবে। তাহার নাম য়ুন্-নান্। সভাপতি য়ুয়ান্ ১৫ই ডিসেম্বার (১৯১৫) তারিখে সম্রাট্‌পদ গ্রহণ করিতে রাজি হন। তাহার দশ দিন পরে য়ুন্-নান্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা য়ুয়ান্‌কে তারে জানাইলেন—"য়ুয়ান্, আজ হইতে আমার প্রদেশ তোমার এলাকার বাহিরে জানিয়া রাখ। তোমার সাম্রাজ্যের এক্তিয়ার আমাদের এই য়ুন-নান্ স্বরাজে খাটিবে না। য়ুন্-নান্‌কে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র চীনের স্বরাজ-সেবকগণকে দলবদ্ধ করিতে আজ হইতে আমরা লাগিয়া গেলাম।" স্বরাজ-সংরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত য়ুন্-নান্ প্রদেশ এক নিমিষের মধ্যে সার্ভিয়ার মতন জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিরপেক্ষ লোকেরা ভাবিল—চীনেও তবে প্রাণ আছে? চীনারা নিতান্তই নড়নচড়ন-হীন জাতি নয়! ইহাদের মধ্যেও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক জন্মগ্রহণ করে। বাহবা য়ুন্-নান্!

১৯১৫ সালের বড়দিন (২৫।২৬ ডিসেম্বার)—কয়টা জগতের লোকেরা

চীনের মানচিত্র হাতড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। যূন্-নান্ কোথায়? নামটা ত স্বয়ং হবু-সম্রাট্ য়ুয়ানেরই লাগালাগি! কেহ কোরিয়া অঞ্চলে আঙ্গুল চালাইলেন—কেহ আসিয়া পিকিঙের নিকট ঠেকিলেন। কেহ কেহ শাংহাইয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহারা ইয়াংসি নদীর মোহনায় যূন্-নানের সন্ধানে থাকিলেন। অনেকে হয় ত জানেন—বিপ্লবপ্রবর্ত্তক সুন্ ক্যান্টনের লোক। তাঁহারা ক্যান্টনের নিকট যূন্-নান্ খুঁজিতে লাগিলেন। যাহাকে গরু খোঁজা বলে সেই ধরণের খোঁজ নিশ্চয়ই হইয়াছিল—তথাপি যূন্-নান্ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

না হইবারই কথা। শিক্ষিত চীনারাও বোধ হয় মানচিত্রে যূন্-নান্ বড় শীঘ্র বাহির করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ ইঁহাদের মনে কখনও বোধ হয় যূন্-নানের নাম উঠিবার আবশ্যক হয় না। বাঙ্গালা দেশকে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা বেদ-বর্জ্জিত দেশ বলিয়া জানিতেন। কোন সময়ে আমরা ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত সমাজরূপে ভারতে প্রচারিত ছিলাম। ভারতবাসী বাঙ্গালীকে সংক্ষেপে "প্রাচ্য" নাম দিয়া বর্ণনা করিতেন। অনার্য্যের দেশ, দ্রাবিড়ের দেশ, অসভ্যের দেশ ইত্যাদি সংজ্ঞা বঙ্গদেশের ছিল। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলে নাকি আর্য্যেরা পতিত হইতেন। রাখালদাসের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" দেখিতেছি যে, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" বাঙ্গালীরা নাকি "পক্ষি"-জাতীয় মনুষ্য বিবেচিত হইত! সে সব মান্ধাতার আমলের কথা। কিন্তু যূন্-নান্ সত্য সত্যই চীনাদের চিন্তায় এইরূপ "পক্ষি-জাতীয়" মনুষ্যের দেশ—বেদ-বিবর্জ্জিত দেশ—বুনো অসভ্যদের দেশ। সভ্যতর চীনাদের সংখ্যা এখানে অতি অল্প। বস্তুতঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যূন্-নান্ চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চু সম্রাটেরা এই জনপদকে চীনের দখলে আনিয়াছেন। কাজেই চীনারাও যূন্-নানের সংবাদ বেশী রাখে না।

বলিয়াছি বিগত চারি মাসে সি-কিয়াঙের জল অনেকখানি বহিয়া গিয়াছে। য়ূন্-নান্ প্রদেশের অবস্থান এই "সি"-নদীর মাথায়। য়ূন্-নানের একমাস পর কুই-চাও প্রদেশ য়ূয়ানের বিরুদ্ধে স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিল। তখনও য়ূয়ান্ নরম হইলেন না। তাহার তিন সপ্তাহ পর কোয়াং-সি প্রদেশ স্বরাজের দল পুরু করিল। এইবার য়ূয়ান্ রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেন, এবং সন্ধির জন্য স্বরাজ-সংরক্ষকগণের নিকট তার করিলেন। তাহার ও প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে কোয়াং-টুঙ্ প্রদেশ য়ূয়ানের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ফলতঃ দেখিতেছি, সে দিন য়ূয়ান্ "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" ভাবিয়া সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বড় দিন হইতে গুড্ ফ্রাইডে পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনের সি-কিয়াঙ্-প্রক্ষালিত জনপদ জগতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইল।

য়ূন্-নান্, কুই-চাও, কোয়াং-সি এবং কোয়াং-টুঙ্ এই চারি প্রদেশকে চীনের সি-ধৌত বা সি-মাতৃক অঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই জনপদের আয়তন আমাদের চারিখানা বাঙ্গালা দেশের সমান—তাহা অপেক্ষাও বেশী।

চীনাভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। প্রদেশগুলির নামও অর্থযুক্ত। কোনটার অর্থ অমুক পাহাড়ের পূর্ব্ব, কোনটার অর্থ অমুক হ্রদের দক্ষিণ ইত্যাদি। কতকগুলির নাম কবিত্বপূর্ণ। কাজেই প্রদেশের নাম করিবামাত্র চীনারা অতি সহজেই তাহার অবস্থান বুঝিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয়ের পক্ষে বুঝা সহজ নয়।

চীনের আলোচনায় তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া—এই পাঁচ জনপদের নাম ভুলিয়া যাওয়া আবশ্যক। এইগুলি ছাড়িয়া দিলে চীন সাম্রাজ্যের যতখানি অবশিষ্ট থাকে, তাহারই নাম চীন। এই চীন আঠারটা প্রদেশে বিভক্ত। চীন বৃটিশ-শাসিত ভারত অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড়—কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের ⅔ অংশমাত্র।

বাষ্পপোত আবিষ্কারের যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল লোকই কৃষিকার্য্যকে জীবন ধারণের প্রধান উপায় বিবেচনা করিত। জগতের প্রায় সকল দেশকেই কৃষি-প্রধান বলা চলিত। তখনকার দিনে নদনদীর গতি, আকৃতি ইত্যাদি অনুসারে জনগণের স্বাস্থ্য ও সম্পদ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইত। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত সকল দেশকেই মোটের উপর "নদী-মাতৃক" বলিলে দোষ হইত না।

বর্ত্তমান কালে কৃষিকার্য্যের মূল্য নূতন ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে—কারণ, ব্যবসায় ও শিল্পের প্রভাবেই এক শতাব্দী ধরিয়া মানবসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই প্রভাব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন পাশ্চাত্যেরা—কিন্তু এশিয়ায় এখনও কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের যুগই চলিতেছে বলা চলিতে পারে।

অধিকন্তু সকল যুগেই পাহাড়পর্ব্বত-উপত্যকার অবস্থান এবং নদনদীর খাত-প্রবাহ হইতে প্রত্যেক দেশের বিভাগ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান-কালের বাষ্পনিয়ন্ত্রিত এঞ্জিনচালিত শিল্পের প্রভাবেও দুনিয়ার কুত্রাপি এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বিভাগ সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই এখনও কোন দেশের জেলা বা কাউণ্টি বা প্রভিন্স বুঝিতে হইলে নদনদীর গতি অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আজকাল ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশকে সভ্যতা হিসাবে আর নদীমাতৃক বলা চলে না। কিন্তু প্রাকৃতিক হিসাবে এগুলিও চিরকালই নদীমাতৃকই থাকিবে। আর চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ও মিশর প্রাচীন কালের মতন বর্ত্তমান কালেও সভ্যতা হিসাবে নদীমাতৃকই রহিয়াছে, এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারে ত আছেই।

চীনকে তিনটি নদীমাতৃক জনপদে বিভক্ত করিতেছি। চীনে নদনদীকে "হো", "কিয়াঙ", "চুয়ান্" ইত্যাদি বলে। উত্তরের অঞ্চল হোয়াং-

প্রক্ষালিত, মধ্যের অঞ্চল ইয়াংসি (বা ইয়াংছি)-প্রক্ষালিত, আর দক্ষিণের অঞ্চল সি-প্রক্ষালিত। হোয়াং-হো চীনের শতদ্রুবিপাশা, ইয়াংসি-কিয়াঙ্ নর্ম্মদা-গোদাবরী এবং সি-কিয়াঙ্ কাবেরী।

ভারতে আর্য্য-সভ্যতা পঞ্চনদ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রসারিত হইয়াছে। সুদূর দক্ষিণকে আর্য্যময় করিবার জন্য অগস্ত্য-যাত্রার আবশ্যক হইয়াছিল। রামায়ণের কবি দক্ষিণাঞ্চলটাকে বানরের দেশরূপে প্রচার করিয়াছেন। তাহার দক্ষিণ ত রাক্ষসের মুলুক! চীনা সভ্যতার ধারাও অনেকটা এই ধরণের। প্রাচীনতম চীনা সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। উহা হোয়াং-মাতৃক দেশ। সেই অঞ্চলকেই চীনারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল বা গৌরব বলিয়া জানিত। সেই অঞ্চলের চারিদিকে যে সকল জনপদ ছিল সে গুলির একটা সাধারণ নাম প্রদান করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। সেই নাম "Land of the Barbarians" অর্থাৎ অপরিচিত, "ম্লেচ্ছ" বা অসভ্য "বর্ব্বর"দিগের দেশ। এই পারিভাষিক শব্দ আমাদের "পক্ষিজাতীয় মানুষের দেশ" অথবা "বানরের দেশ" অথবা "বেদ-বর্জ্জিত দেশ" অথবা "রাক্ষসের দেশ" ইত্যাদি বিবরণের অনুরূপ।

প্রাচীন চীনের সভ্যতা-কেন্দ্র সেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে হোয়াঙের প্রবাহ অনুসারে চীনা সমাজের প্রসার পূর্ব্বদিকে সাধিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রবর্ত্তিত হয়। তখনও চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র বেশী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয় নাই। হোনান নগর সেই যুগে রাজধানী ছিল—মোগল সম্রাট্ কুবলা খাঁ পিকিঙ্ নগরে রাজধানী প্রথম স্থাপন করেন। সে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। পিকিঙের বহু পশ্চিমে হোনান্ নগর।

এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চলের বর্ব্বর বা পক্ষিজাতীয় মানুষ চীনা সভ্যতার

অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সঙ্গে দক্ষিণেও সভ্যতার অভিযান আসিত। ইয়াংছি পর্য্যন্ত সভ্যতার বিস্তার সাধিত হইতে অনেক শতাব্দী কাটিয়াছিল। কাজেই ইয়াংছির দক্ষিণ-অঞ্চল সে দিন মাত্র চীন-মণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে। সি-মাতৃক সমগ্র জনপদই খাঁটি-সভ্য-চীনাদের আবহাওয়া বেশী দিন ভোগ করে নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের চীন-সম্রাটেরা এই দক্ষিণতম অঞ্চল সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন বলা যাইতে পারে। পুরাতন পুঁথিতে এই সকল প্রদেশবিষয়ক নানা প্রকার অদ্ভুত কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণ বর্ণিত বহু ভৌগোলিক কল্পনার পাশে চীনা-মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত কল্পনাগুলি বেশ থাপ খাইবে।

কোন সময়ে হয় ত সম্রাট্‌গণের খেয়ালে এই দক্ষিণা বর্ব্বরগণের খোঁজ-খবর লওয়া হইত। মাঝে মাঝে অভিযানও পাঠান হইত। কিন্তু লঙ্কায় যিনিই আসিতেন তিনিই রাজা হইয়া বসিতেন। সম্রাটের নিকট বশ্যতা-স্বীকার বা খাজনা দাখিল করার কথা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন। বহু কাল পরে হয় ত আবার এক নরপতি সেনাপতিকে আদেশ করিতেন—"দক্ষিণ-অঞ্চলের বানরেরা কি করিতেছে দেখিয়া আসিবার জন্য ফৌজ পাঠাও। অনেক দিন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।" কয়েক বৎসর পর সেনাপতি আসিয়া জানাইতেন—"হুজুর, ওখানকার বুনো ডাকাইতেরা ("দস্যু"গণ) বিদ্রোহী হইয়াছে—চীন-সম্রাটের শাসন মানিতে চাহে না।" সম্রাট্ বিদ্রোহদমনের জন্য লোকজন পাঠাইতেন। দুই তিন সম্রাটের রাজ্যকাল গত হইলে হয় ত একদিন সংবাদ আসিত—"দক্ষিণ অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।" সন তারিখ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের সি-প্রক্ষালিত দক্ষিণ জনপদের সম্বন্ধ অনেকটা এইরূপই ছিল। য়ুন্ নান্ এবং কুই চাও তাঙ্-সুঙ্-মোগল-মিঙ্ আমলে (৬০০—১৬৫০ খৃঃ অঃ) ও চীন-সম্রাট্‌গণের পুরাপুরি বশে আসে

নাই। দুইটা বঙ্গদেশের সমান এই জনপদ মাত্র দুইশত বৎসর হইল চীনের দখলে আসিয়াছে। তবে কোয়াং-টুঙ্ ও কোয়াংসি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুঙ্ সম্রাট্‌গণের অধীনে ছিল। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশ চীনের অঙ্গীভূতই আছে।

সি-ধোত জনপদের মধ্যে একমাত্র কোয়াংটুঙ্ প্রদেশ সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ক্যাণ্টননগর এই প্রদেশের বন্দর। মধ্যযুগের চীনা-সভ্যতায় ক্যাণ্টনের কৃতিত্ব ও গৌরব আছে। বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রথম অবস্থা হইতে ১৯১১ সালে সুনের উদ্ভব পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাসে ক্যাণ্টন প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য তিন প্রদেশ চিরকালই নগণ্য। এই অঞ্চল এতই দুর্গম যে এখানকার লোক চীনকে কিছু দেয়ও নাই—চীন হইতে কিছু গ্রহণ করেও নাই বলা যাইতে পারে। অথচ আজ চীনের এই পনর আনা "অ-চীনা" অঞ্চল দুনিয়ায় চিরপ্রসিদ্ধ হইতে চলিল।

(৪) য়ুন্-নান্-বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চ

আজকাল আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, লোকাচার-তত্ত্ব, কুসংস্কার-তত্ত্ব এবং এই ধরণের অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। যাঁহারা ভারতের চাক্‌মা, মিশ্‌মি, আবর, কোল, সাঁওতাল, পোলিহা, মেচ, ওরাঁও, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতীয় নরনারীর সংবাদ রাখিতেছেন, তাঁহারা পাঁট্‌রি বোচ্‌কা ও মাথামাপার কলযন্ত্র লইয়া এই য়ুন্-নান্ প্রবর্ত্তিত বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চে আসুন। এখানে তাঁহারা অনেক রসদ পাইবেন। এই চারিখানা বাঙ্গালাদেশের সমান ভূখণ্ডে লোকসংখ্যা মাত্র চারি কোটী। আমাদের ২৮ জেলার ৮০,০০০ বর্গমাইলে পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর বাস। চীনের এই সি-ধোত জনপদের প্রায় ৩২০,০০০ বর্গমাইলে অন্ততঃ বিশ কোটী লোকের বসতি থাকা উচিত ছিল—কিন্তু আছে মাত্র চারি কোটী।

এই চারি কোটীর মধ্যে খাঁটি চীনা এক কোটীও নয়—শতকরা ৭৫ জনেরও অধিকসংখ্যক লোক "অ-চীনা" অর্থাৎ "পক্ষিজাতীয়," "দস্যু"-জাতীয়, "বর্ব্বর," "বানর" বা "রাক্ষস"। তাহাদের নাম, মিয়াও, চুংকিয়া, লোলো, ইকিয়া হাক্কা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এখানে "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি", ছত্রিশ ভাষা, আটচল্লিশ বিবাহ-পদ্ধতি, উনপঞ্চাশ ধর্ম্মানুষ্ঠান। কাজেই এথ্‌নলজিষ্ট, অ্যান্‌থ্‌পলজিষ্ট পণ্ডিতগণের পক্ষে বর্ত্তমান বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চ একটি তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থের পাণ্ডার সংখ্যা এখনও অতি অল্প।

ভারতবর্ষে অনার্য্য আর্য্য হইয়াছে, অহিন্দু হিন্দু হইয়াছে, অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়াছে, শূদ্র ক্ষত্রিয় হইয়াছে, "পতিতরা" জাতিতে উঠিয়াছে। ভারতবাসী য়ুন্‌-নান্‌ অঞ্চলে আসিয়া দেখুন অচীনা চীনা হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে।

শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার সেদিন "প্রবাসীতে" চীনে হিন্দুপ্রভাব সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে একখানা পুরাতন চীনা-পুঁথি হইতে ঐতিহাসিক কাহিনী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কাহিনীটা কোন কোন বিষয়ে আমাদের অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িকার সমান মূল্যবান্‌। এই ধরণের বহু কাহিনী চীনা ঐতিহাসিক পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। রামলাল বাবুর প্রামাণিক গ্রন্থ অনুসারে ভারতীয় মৌর্য্যবংশের কোন লোক য়ুন্‌-নানের প্রথম রাজবংশের স্থাপয়িতা। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, মৌর্য্যবংশের কোন লোকই নাকি প্রথম চীন-সম্রাট্‌ শি-হুয়াংতি নামে পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, য়ুন্‌-নানের হিন্দু-রাজবংশ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বোধ হয় আজকাল মিয়াও, চুংকিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। চীনা সম্রাট্‌গণ তাঁহাদিগকে বর্ব্বর, বানর, রাক্ষস, দস্যু ও ডাকাইত বলিয়া জানিতেন। তাহারাই বহুকাল পর্য্যন্ত সম্রাট্‌দিগের সেনা ধ্বংস করিয়াছিল—এখনও এই সকল জাতিকে "করদ"রাষ্ট্রের

অন্তর্গত বলা চলে। ইহাদের সঙ্গে খাস চীন-রাষ্ট্রের (চীন-সাম্রাজ্যের বা চীন-স্বরাজের) কোন সংস্রব নাই। ইহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—দলপতি বা রাজা, বা মোড়ল, বা নায়কের আদেশ প্রতি-পালন করাই ইহাদের একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান। চীন-সরকার এই সকল দলপতি বা মণ্ডলের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ বার্ষিক সেলামি পাইয়া সন্তুষ্ট।

আমাদের দেশে অনেকে স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্রশাসন, রিপাবলিক্, স্বরাজ ইত্যাদি শব্দ কানে শুনিবামাত্রই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা যুন্-নান্ অঞ্চলের এই সকল কথা মনে রাখিলে "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" ইত্যাদি গাহিয়া মূর্চ্ছা যাইবেন না। কারণ এই অঞ্চল চিরকালই একপ্রকার স্বাধীন, বিদ্রোহী, অ-চীনা।

শুনিতে পাই এখানকার দেশটা নাকি "ধনধান্য-পুষ্পে-ভরা"। এখানকার ধাতুরত্ন নাকি অসীম। ভারতে ভূতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করিবার জন্য বেশী পণ্ডিত এখনও অগ্রসর হন নাই। হইলে তাঁহাদিগকে এখানে ডাকিতাম। চীনারাও এখন পর্য্যন্ত খাঁটি চীনের ভিতরেই কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক তৈয়ারি করিয়া উঠিতে পারে নাই। দেখিতেছি, এ সম্পদ ফরাসী ও ইংরেজের কপালেই আছে। জাপানীরাও দৃষ্টিপাত করিতেছে। বেচারা জার্ম্মাণেরা এশিয়ায় খুঁটা গাড়িয়া বোধ হয় শীঘ্র বসিতে পারিবে না। তবে জার্ম্মাণ-পণ্ডিতেরা যুন্-নান্ অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, বনতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, পাহাড়-তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বে যথেষ্টই পারদর্শী। অভাব মাত্র সুযোগের। দেখা যাউক, এই চারিখানা বাঙ্গালা দেশ কাহার বা কাহাদের কপালে নাচিতেছে।

ভারতবর্ষের অন্ততঃ এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা এই সি-মাতৃক দেশে আসিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইবেন। কবি ও শিল্পীদিগের কথা

বলিতেছি। এখানে কুয়াশা আছে, মেঘ আছে, হ্রদ আছে, ঝরণা আছে, চিরবসন্ত আছে, শুভ্র তুষার আছে, গিরিশৃঙ্গ আছে, উপত্যকা আছে, শ্যামল বৃক্ষরাজি আছে, বিচিত্র জীবজন্তু আছে, অসংখ্য উদ্ভিদ্‌লতা আছে। শুনিতে পাই এই জনপদ সৌন্দর্য্যের একটা খনিবিশেষ। ভাবিতেছি বুঝি টিরলপ্রদেশের আল্পস্ পাহাড়, দাক্ষিণাত্যের অমরকণ্টক, আমেরিকার নায়াগ্রাপ্রপাত, হিমাচলের ভীমতাল নাইনিতাল, রাজস্থানের উদয়পুর সবই এখানে দেখিতে পাইব। অধিকন্তু এডেল-ভাইস্ ও ফর্গেট্-মি-নটের শোভা, পাইনের সারি, এবং "অঘ্রাণের ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি"ও এখানে রাশীকৃত। একজন ইয়াঙ্কি পর্য্যটক য়ূন্-নান্ প্রদেশকে জগদ্বাসীর ভাবী স্বাস্থ্যাবাসরূপে বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার মতে য়ূন্-নান্ চীনের সুইটজর্ল্যাণ্ড।

কুই-চাও প্রদেশও প্রকৃতির রম্য নিকেতন। এই পর্ব্বত-সমুদ্র য়ূন্ নানেরই অংশবিশেষ। এই দুই প্রদেশকে প্রাকৃতিক হিসাবে এক প্রদেশ বলা উচিত। রাষ্ট্রীয় হিসাবেও সর্ব্বদা এই দুই প্রদেশকে এক প্রদেশ বিবেচনা করা হইত। সম্প্রতি যে রাষ্ট্র বিপ্লব চলিতছে, তাহাও এই দুই প্রদেশের নামেই চলিতেছে। বিদ্রোহকে "য়ূন্-কুই বিপ্লব" বলা হইয়া থাকে।

কোয়াং-সি প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে হিমালয় দেখিয়া বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিৎ হুকার তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে বর্ণনা আজও পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানের বিবরণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কোয়াং-সি প্রদেশে নদীপথে নৌকায় ভ্রমণ করিবার এক বিবরণ Gail তাঁহার Eighteen Capitals of China গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পর্য্যটক ক্যামিয়া নদীর শোভায় মুগ্ধ। বিচিত্র পর্ব্বত-সমাবেশে স্রোতস্বতীরও হ্রদসমূহের সৌন্দর্য্য শতগুণ

বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃক্ষহীন লাইমষ্টোন পাহাড়ের সুদৃশ্য গঠনও মেঘাবৃত হইলে এক প্রকার সুষমায় মণ্ডিত হয়—আবার চন্দ্রালোকে আর এক প্রকার সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি অভিভূত করে। এ দিকে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি মন্দির-চূড়ার মতন ক্যাসিয়ার স্থির জলে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে।

এইবার কোয়াং-টুঙের কথা বলা যাউক। এই প্রদেশ খাঁটি বাঙ্গালা দেশ—পূর্ব্ববঙ্গ—বলিতে কি, বরিশাল। পাহাড় পর্ব্বতের গরিমা বা সুষমা এখানে নাই। কোয়াং-টুঙ্ একদম্ সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা। দুনিয়ার নদী আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গকে ভাসাইয়া ফেলিয়াছে। সেইরূপ সিকিয়াঙ নানা শাখাপ্রশাখায় কোয়াং-টুঙ্কে সুন্দরবন ও বাখরগঞ্জে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী ক্যাণ্টনমাহাত্ম্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অধিকন্তু কোয়াং-টুঙ্ চীনের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধপ্রদেশ—কোয়াং-টুঙের বন্দরে ভারতীয় জাহাজ আসিয়া লাগিত। কোয়াংটুঙেই চীনারা এশিয়াকে পাইত এবং এশিয়ায় চীন বিতরণ করিত। কোয়াং-টুঙ চিরকাল গতিশীল, অগ্রগামী ব্যবসায়িগণের বাস। শেষ পর্য্যন্ত কোয়ংটুঙ্ সুন্-ইয়াৎসেনের জন্মভূমি।

কোয়াং-টুঙে আসা অতি সহজ। হাজার মাইল বিস্তৃত এ প্রদেশের সমুদ্র-কিনারা। প্রায় দুই তিন শত ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ ইহার ধারে অবস্থিত। ইংরেজের হঙ্কঙ্, পর্ত্তুগীজের ম্যাকাও, এবং চীনাদের ক্যাণ্টন—এই তিনটা বড় বন্দর এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ প্রবেশপথ। সুতরাং কোয়াং-টুঙ্ পর্য্যটকমাত্রেরই পথে পড়ে।

কিন্তু য়ুন্-কুই বা কোয়াং-সি দেখিবার সাধ মিটানো বড় সহজ নয়। এই সকল অঞ্চল আর-একখানা তিব্বতবিশেষ—দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন—লোকজনের অগম্য। এই জন্যই চীনারা বহু শতাব্দী প্রয়াসেও এই স্থানকে চীনের পাকা অঙ্গে পরিণত করিতে পারিল না। এই জন্যই এখানে

স্বাধীনতার আন্দোলন, বিদ্বেষ বা বিপ্লব লাগিয়াই আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এক য়ূন্‌-কুই বিদ্রোহ সুরু করিয়াছিল। ষোল বৎসর পর্য্যন্ত এখানে একটা স্বাধীন মুসলমান-চীনা রাষ্ট্র চলিতে থাকে। ইংরেজের দরবারেও এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে মাঞ্চু-সম্রাট্ য়ূন্‌-কুই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। এই অঞ্চলে যে কোন লোক দাঁড়াইয়া যদি বলে—"আমার দেশ স্বাধীন—পিকিঙ্ বা নানকিঙের তোয়াক্কা আমি রাখি না" তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। তাহার স্বাধীনতা হাতের পাঁচস্বরূপ। খাশ সরকারের পক্ষে এই ব্যক্তির শাস্তি দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। চোখের সম্মুখে আমরা তিব্বতের স্বাধীনতা দেখিতেছি। তিব্বত চীনকেও যেরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া থাকে, বৃটিশ-শক্তিকেও প্রায় সেইরূপই তুচ্ছ করিয়া থাকে। তিব্বত ত সর্ব্বদাই বলিতেছে—"এস পিকিঙ্, আমাকে দখল কর। এস ইংরেজ, আমাকে দখল কর।" কিন্তু দখল করে সাধ্য কার? প্রবেশ পথই নাই যে! এই জন্যই তিব্বত এখনও স্বাধীন। কাজেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিলেই যখন তখন মূর্চ্ছা যাইবার প্রয়োজন নাই।

স্বরাজসংরক্ষকগণ বেশ জানেন যে, চীনের অন্য কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ সুরু করিলে য়ুয়ান্‌পক্ষীয় সৈন্যগণের সঙ্গে তাঁহাদের ত একটা বড় রকমের সম্মুখ-সমর হইবেই হইবে। অত গণ্ডগোলে যাইয়া লাভ কি? আজ-কালকার দিনে এক লক্ষ সৈন্যের পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা কুবের-সন্তানগণের সাজে। চীনা সুন্‌-পন্থীরা অত টাকা কোথায় পাইবে? দুই চারি দশ গণ্ডা বন্দুক আর কিছু গোলা বারুদ মাত্র যাঁহাদের সম্বল তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন ধরণের হইবারই কথা। তবে সুন্‌-পন্থীদিগের ট্যাঁকে টাকাকড়ি কিছুই নাই, এরূপ ভাবা উচিত নয়। অন্ততঃ দেশবিদেশে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার খরচ তাঁহাদের আছে। আমেরিকান,

জার্ম্মাণ, জাপানী ও ফরাসী কাগজে কাগজে বিদ্রোহের সংবাদ প্রতিদিনই পাঠানো আবশ্যক। সে পরিমাণ টাকা হাতে না লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়ানো বেকুবি। তাহা ছাড়া লোকজন টাকা পয়সা, কাপড় চোপড় ধান চাউল এ সব ত যথাস্থানেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ বুঝিয়াই বোধ হয়, বিদ্রোহিগণ এমন এক কেন্দ্র নির্ব্বাচন করিলেন, যেখান হইতে একমাত্র হুঙ্কার ছাড়া ব্যতীত অন্য কোন লাঠালাঠি রক্তারক্তির কাজ বেশী আবশ্যক হইবে না। সেই মজার জায়গার নাম যূন্-নান্।

(৫) যূন্-নান্ কোথায় ?

বাঙ্গালীরা যেমন তিব্বতখানাকে মাথায় করিয়া রাখে, ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা সেইরূপ যূন্-নান্‌কে বগলদাবা করিয়া রাখে। অথবা বলা যায় যে, যূন্-নান্ ব্রহ্মবাসী ও আনামী এই দুই জাতির ঘাড়ে চাপিয়া আছে। কাজেই বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয়ের দৃষ্টি সর্ব্বদাই যূন্-নানের দিকেই রহিয়াছে।

ভারতবাসী যূন্-নানে আসিতে হইলে রেঙ্গুন হইয়া রেলে ও ষ্টীমারে ইরাবতীর ধারে ভামো নগরে উপস্থিত হইবেন। এই সহর বৃটিশসীমানার প্রায় শেষ। এখান হইতে যূন্-নানের সীমান্ত দুই দিনের পথ। এই পথেই ইংরেজ-বণিকেরা যূন্-নানে কারবার করেন। ভামো হইতে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে যূন্-নানের এক বর্দ্ধিষ্ঠ নগরের নাম তেঙ্গিয়ে। এই নগরকে "open port" বা খোলা-বন্দর বলে। আমরা নদীর কিনারায় বা সমুদ্রকূলে অবস্থিত পল্লী বা সহরকে বন্দর বলিয়া জানি। কিন্তু চীনের খোলা বন্দরগুলির সঙ্গে নদী বা সমুদ্রের কোন সংস্রব নাই। অবশ্য তেঙ্গিয়ে ইরাবতীর এক শাখার ধারে অবস্থিত। বিদেশীয় রাষ্ট্রের বণিকগণ চীনসরকারকে কোন কোন সহর ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বদা

অবাধ বা উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন। সেই সকল কেন্দ্রে বিদেশীয়েরা নিজ নিজ সুবিধা ও মতলব অনুসারে বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পার্ব্বত্য য়ূন্‌-নান্‌ প্রদেশে এই ধরণের খোলাবন্দর তিন চারিটা আছে। তেঙ্গিয়ে চীনের দক্ষিণতম প্রদেশের পশ্চিমতম নগর। ভামো হইতে তেঙ্গিয়ে যাইতে হইলে বোধ হয় অশ্বযান বা গর্দ্দভযান আবশ্যক হয়। গরুর গাড়ীও বোধ হয় নাই। রেলপথ খুলিবার কথা চলিতেছে। এই অঞ্চলের সর্ব্ববিখ্যাত সহর বা হাট বা গঞ্জের নাম তালিফু। ঐ কেন্দ্রের জন্যই তেঙ্গিয়ে বন্দরে ইংরেজের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তালিফু পর্য্যন্ত রেল তৈয়ারি হইলে ইয়াংসির কিনারা পর্য্যন্ত একপ্রকার আয়ত্ত হইবে। তাহার সন্নিকটে ও অপরপারে ছি-চুয়ান বা চতুর্ণদ প্রদেশের উর্ব্বরভূমি। বস্তুতঃ সেই ইয়াংসি-উপত্যকার সঙ্গে ইরাবতী-ধৌত জনপদের সংযোগ-সাধনই বৃটিশ-রাষ্ট্রবীরগণের চরম লক্ষ্য।

য়ূন্‌-নানে নদনদীর সংখ্যা কম নয়—অথচ একটায়ও নৌকা বা ষ্টীমার চালানো অসম্ভব। ইরাবতীর শাখা, সালুয়েন ও মেকঙ্‌ এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত—কিন্তু য়ূন্‌-নানের ভিতর ইহাদের গতি অতিশয় পর্ব্বত-সঙ্কুল বনময় স্থানের মধ্যে লুক্কায়িত। ইয়াংসির কয়েক শত মাইল য়ূন্‌-নান্‌ প্রদেশের উত্তরসীমা—কিন্তু এই অঞ্চলে কোন কোন স্থানে নদীটা ঠিক যেন দুই পাহাড়ের ভিতরকার ক্ষুদ্র নর্দ্দমা মাত্র। আর পাহাড়ের দুই পাড় সতর আঠার হাজার ফিট্‌ উচ্চ। কাজেই ইয়াংসির জলেও য়ূন্‌-নানের কাজ হয় না। এদিকে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বড় বড় নদী আছে। সি নদী য়ূন্‌-নানের পাহাড়েই জন্ম পাইয়াছে, তাহাতে য়ূন্‌-নানের কাজে লাগে নাই। আর একটা নদীর কতকগুলি বড় বড় শাখা য়ূন্‌-নান্‌ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির দ্বারা লাভবান্‌ হইয়াছে একমাত্র ফরাসী-অধিকৃত টংকিঙ্‌ বা আনামদেশ। য়ূন্‌-নান্‌ ঠিক যেন

তিব্বত। তিব্বত হোয়াংহোর জন্ম দিয়াছে, ইয়াং-সির জন্ম দিয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম দিয়াছে, সিন্ধুর জন্ম দিয়াছে। এত বড় বড় দরিয়ার জন্মদাতা হইয়াও তিব্বতের না আছে কৃষিসম্পদ, না আছে গমনাগমনের পথ—চারিদিকে কেবল শুক্‌না পাহাড় অথবা ঝোরা, অথবা বরফ তিব্বতে প্রবেশ করিবে কে? য়ুন্‌-নানেই বা প্রবেশ করে কে?

য়ুন্‌-নান্‌ শব্দের অর্থ কেহ বলেন "মেঘাচ্ছন্ন দক্ষিণাঞ্চল" কেহ বলেন "মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতের দক্ষিণ"। নান্‌=দক্ষিণ। য়ুন্‌=মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বত= মেঘালয়=হিমালয়। আমরা হিমালয় শব্দে যাহা বুঝিয়া থাকি, বোধ হয় চীনা "য়ুন্‌"শব্দের অর্থ তাহাই। সুতরাং য়ুন্‌-নান্‌ শব্দের অর্থ য়ুন্‌ বা চীনা হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চল।

এখন পর্য্যন্ত য়ুন্‌-নানে প্রবেশের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ ফরাসী আনামের ভিতর দিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল সমুদ্রতীরবর্ত্তী হাইফঙ্‌ বন্দর হইতে য়ুন্‌-নান্‌-ফু পর্য্যন্ত রেলপথ তৈয়ারি হইয়াছে। পূর্ব্বে য়ুন্‌-নানের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রেল ছিল। এক্ষণে প্রাদেশিক রাষ্ট্র-কেন্দ্র য়ুন্‌-নান্‌-ফু পর্য্যন্ত সমুদ্র হইতে রেলে যাওয়া যায়। কিন্তু চীনের ভিতর দিয়া য়ুন্‌-নান্‌-ফু পৌঁছিতে অনেক কষ্ট। রাস্তাঘাট পার্ব্বত্য দেশে যেরূপ আশা করা যায় সেইরূপ। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানবলে অন্যান্য দেশে পার্ব্বত্য রাস্তায়ও মটরকার চলিয়া থাকে। য়ুন্‌-নানে তাহা দেখিবার জো নাই বলাই বাহুল্য। তবে এ দেশ ফরাসী কিম্বা ইংরেজের হস্তগত হইলে হয়ত সে সব যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বৃটিশ-সেনাপতি বলিতেছেন যে, বেঙ্গল হইতে য়ুন্‌-নান্‌-ফু পৌঁছিতে ৪০।৪৫ দিন লাগে, শাংহাই হইতে য়ুন্‌-নান্‌-ফু পৌঁছিতে ৭০ দিন লাগে, ক্যাণ্টন হইতে পৌঁছিতে ৬৭ দিন লাগে। হাই-ফঙ্‌ হইতে পৌঁছিতে আজকাল অবশ্য বেশী সময় লাগে না। কিন্তু হাই-ফঙের পথে প্রেসিডেণ্ট

য়ুয়ান্‌ও বিদ্রোহদমনের জন্য সেনা পাঠাইতে পারেন না। তাঁহাকে চীনের ভিতর দিয়াই সেনা পাঠাইতে হইবে। কাজেই য়ূন্‌-নান্‌-ফু বিদ্রোহী হইলে তাহাকে জব্দ করা সময়-সাপেক্ষ। এই সহর দার্জ্জিলিঙ্গের সমান উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত।

য়ূন্‌-নান্‌ প্রদেশের উত্তরে ছি-চুয়ান বা চতুর্নদ প্রদেশ। ইয়াং-সির বড় বড় চারিটা শাখা হইতে এই প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে কুই-চাও এবং কোয়াং-সি প্রদেশ। প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্‌ য়ূন্‌-নান্‌কে শাস্তি দিবার জন্য হয় ছি চুয়ানের পথে সৈন্য পাঠাইবেন অথবা কুই-চাও ও কোয়াং-সি প্রদেশদ্বয়ের পথে সৈন্য পাঠাইবেন। এই দুই প্রদেশ পর্ব্বতময় ও দরিদ্র। নদীপথে যতখানি আসা যায় সেখান হইতে য়ূন্‌-নান্‌ প্রদেশের সীমান্ত এক দিনের পথ। এই দুই প্রদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা সৈন্য আছে, সেগুলিকে য়ূন্‌-নানের বিরুদ্ধে পাঠান চলিতে পারে না। অধিকন্তু এই দুই প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা য়ূন্‌-নানের স্বপক্ষে যাইবেন না কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ ইঁহারা য়ূন্‌-নানের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন।

কাজেই য়ুয়ান্‌ প্রথম হইতেই ছি-চুয়ানের পথে সেনা পাঠাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পিকিঙ্‌ হইতে হ্যান্‌-কাও পর্য্যন্ত রেলে আসা যায়। তাহার পর ইয়াং-সি উজাইয়া নৌকায় ইচাঙ্‌ ও চুংকিঙ্‌ পর্য্যন্ত আসিতে অনেক দিন লাগে। তাহার পর আরও উজাইয়া সুইফু পর্য্যন্ত আসিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই সুইফু নগর হইতে য়ূন্‌-নানের সীমান্ত তিন দিনের পথ। হ্যান্‌-কাও হইতে সুইফু ১২০০ মাইল।

(৬) বিদ্রোহের ঢাক

চীনের প্রাদেশিক রাষ্ট্রকেন্দ্রে দুই জন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। একজন সমরবিভাগের কর্ত্তা আর একজন সাধারণ শাসনের অধ্যক্ষ।

য়ুন্‌-নান্‌-ফুতেও এই দুই জন কর্ত্তা আছেন। ১৫ ডিসেম্বর তারিখে য়ুয়ান্‌ রাজপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবার পর হইতে এই দুই কর্ত্তা নাকি খানিকটা বাঁকিয়া বসিলেন। জাপানী কাগজে ২১ ডিসেম্বর হইতে চারি পাঁচ দিন প্রকাশিত হইতে লাগিল যে ছি চুয়ান, য়ুন্‌-নান্‌, কুই-চাও, কোয়াং-সি ও কোয়াংটুঙ্‌ এই পাঁচ প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তারা য়ুয়ানের বিরুদ্ধে জটলা সুরু করিয়াছেন। ইংরেজ-পত্রিকায় এই সংবাদ হাসিয়া উড়ান হইতে থাকিল। অথচ ইতিমধ্যে পিকিঙের দপ্তরেই য়ুন্‌-নানের তার উপস্থিত। পিকিঙ্‌-দরবারও বাজারে য়ুন্‌-নানের বিদ্রোহ প্রচার করেন নাই। কারণ তাহা হইলে হয়ত বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ য়ুয়ানের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা স্বীকার না করিতে পারেন।

শেষপর্য্যন্ত ২৬ ডিসেম্বর তারিখে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতেই হইল। য়ুন্‌-নান্‌-ফু হইতে বৃটিশ ও ফরাসী কন্‌সাল তাঁহাদের পিকিঙের বড় আফিসে তারে জানাইলেন যে, য়ুন্‌-নান্‌ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আনামের ফরাসী সরকার হইতেও পিকিঙের ফরাসী মন্ত্রীর নিকট এই সংবাদ পাঠান হইল।

য়ুন্‌-নানের কর্ত্তারা পিকিঙে দুইবার তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দাবী—(১) সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-সমিতির ধুরন্ধরগণের মুণ্ডপাত করা হউক। চারি পাঁচ পাণ্ডার নাম দেওয়া হইয়াছিল। (২) সভাপতি য়ুয়ান্‌ নাকে খত দিয়া চীনা জনসাধারণের মাপ চাহুন। (৩) চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জবাব না পাইলে য়ুন্‌-নান্‌-স্বরাজ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইবে। দুইবার তার করা হইল—দুইবারই আল্‌টিমেটাম বা চরম কথা জানান হইল। কোন জবাব পাওয়া গেল না দেখিয়া য়ুন্‌-নানের কর্ত্তারা ফরাসী-গবর্ণমেণ্টকে যথারীতি স্বাধীনতা জ্ঞাপন করিলেন।

য়ুন্‌-নানের কর্ত্তারা চীনে ঘরোয়া-বিবাদের আগুন জ্বালিলেন এবং

লড়াইয়ের নাগরা বাজাইলেন। কিন্তু ইঁহারা যন্ত্রমাত্র—এই বিপ্লবের প্রকৃত কর্ত্তা দুইজন খ্যাতনামা চীনা ধুরন্ধর। তাঁহারা য়ুন্‌-নানের লোক নন। একজন কর্ম্মবীর, অপর ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ভাবুক ও সাহিত্যসেবী। এই দুইজন য়ুন্‌-নান্‌ ফুতে পৌঁছিবামাত্র বিপ্লবের ঢাকে কাঠি পড়িল।

এই কর্ম্মবীরকে ইংরেজেরাও খুব মজবুদ লোক বলিয়া প্রশংসা করেন। তাঁহার নাম সেনাপতি চাই-আও (Tsai Ao)। চীনের এই তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব চাইয়ের নামেই পরিচিত থাকিবে। চাই অনেক দিনের পাকা লোক। মাঞ্চু আমলে ইনি সেনাবিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। য়ুন্‌-নান্‌ প্রদেশের সমর-কলেজ কিছুকালের জন্য ইঁহার কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইত। ১৯১১ সালে মাঞ্চুবংশ ধ্বংস হইলে চাই য়ুন্‌-নান্‌ ও কুই-চাও প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সম্প্রতি ইনি পিকিঙের বড় আফিসে উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। চাই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমর-বিদ্যালয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন।

পিকিঙে যখন য়ুয়ান্‌ স্বরাজ-ধ্বংসের আন্দোলন চালাইতেছিলেন তখন চাই য়ুয়ানের সকল কার্য্যেই সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। ভিতরে ভিতরে বোধ হয় য়ুয়ানেব বিপক্ষীয় দলের পুষ্টিসাধনেও চাই যত্নবান্‌ ছিলেন। বস্তুতঃ গত কয়েক মাসের ঘটনায় সেরূপই মনে হইবে। চরমপন্থী সুনের দল সকলেই যেন এ কয়দিন একেবারে ডুব মারিয়াছিল। কোনো কেন্দ্র হইতেই য়ুয়ানের বিরুদ্ধে একটুকু টুঁ শব্দও করা হয় নাই; বরং সকলেই য়ুয়ানের মতে হুঁ করিয়া চলিয়াছেন। য়ুয়ান্‌ সুনের এই "চাল" ধরিতে পারেন নাই। এই জন্য চাইয়ের মতন অন্তরঙ্গ বন্ধুও য়ুয়ান্‌কে ছাড়িয়া দিবেন একথা য়ুয়ান্‌পক্ষীয় কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না। অথচ সেই চাই-ই বিদ্রোহের ঢাকে ঘা মারিলেন প্রথম।

নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি চাই স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছুটি লইয়া পিকিঙ্ ত্যাগ করেন। তাঁহার গন্তব্য স্থান কোথায় কেহ জানিল না। পরে জানা গেল তিনি তোকিওতে সুনের সঙ্গে মাথামাথি করিতেছেন। তোকিওতে এই সময়েই আমেরিকা হইতে সেনাপতি হোয়াং-সিঙ্ও উপস্থিত। হোয়াঙ্ ১৯১৩ সালের বিপ্লবে প্রসিদ্ধ হন। সুন এবং হোয়াঙ্ দুই জনেরই চীনে ফিরিয়া আসা অসম্ভব—য়ুয়ানের দরবার এই দুই জনের মাথার উপর যথেষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। হোয়াঙ্ এই দুই বৎসর যাবৎ আমেরিকায় টাকা তুলিতেছিলেন এবং ইয়াঙ্কি মহলে লোকমত গঠন করিতেছিলেন। হোয়াঙ্ ইংরেজি ভাষা জানেন না—কোন বিদেশীয় ভাষাই জানেন না। এক্ষণে নাকি কয়েক লক্ষ টাকা হাতে লইয়া হোয়াঙ্ সুনের নিকট আসিয়াছেন। চাই, হোয়াঙ্ ও সুনের পরামর্শ চলিতেছে। এই ধরণের সংবাদ তোকিওর জাপানী কাগজে প্রকাশ।

পরে খবর পাওয়া গেল যে, চাই জাপান ত্যাগ করিয়াছেন—হঙ্কঙের পথে য়ুন্-নানে প্রবেশও করিয়াছেন। এ সব খবর অবশ্য পিকিঙ্ দরবার যথাসময়ে পান নাই; পাইলেও চাইকে য়ুন্-নানের পথে আটক করিতে সমর্থ হন নাই। ঘটনা যাহা দেখিতেছি—চাই জাপান হইতে বিদ্রোহের ঢাক ঘাড়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। হয়ত ছদ্মবেশে পথে কোয়াংটুঙ্, কোয়াংসি এবং কুই-চাওয়ের লোকজনের সঙ্গেও চাই পাকা কথা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। য়ুন্-নান্-ফুতে পৌঁছিবামাত্র চাই নিজমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঢাকে বাড়ি মারিয়াছেন। য়ুন্-নান্-ফুর শাসনকর্ত্তারা চাইয়ের অধীনে পূর্ব্বে কর্ম্মচারী ছিলেন—এবং জাপানের সমর বিদ্যালয়েও বোধ হয় সতীর্থ সুহৃৎ ছিলেন।

এখন জানা যাইতেছে যে চাই যখন ঢাক ঘাড়ে করিয়া জাপান ত্যাগ

করেন, তখন তিনি জাপান হইতে বোধ হয় চীনা ভাবুকপ্রবরকেও সঙ্গে করিয়া আসেন। তাঁহার নাম লিয়াঙ্-চি-চাও। চাই এবং লিয়াঙ্ সম্ভবতঃ একত্র য়ূন্-নান্-ফুতে প্রবেশ করিয়াছেন। লিয়াঙের প্রশংসা ইংরেজেরাও করিয়া থাকেন। চীনাসমাজে ইনি একজন আদর্শ-প্রচারক দার্শনিক নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কোয়াংটুঙের অধিবাসী সুনের স্বদেশ-ভায়া। বিশেষতঃ আধুনিক চীনের রামমোহন রায় স্বরূপ কাঙ্-য়ূ-ওয়ে লিয়াঙের গুরু। মাঞ্চু আমলে কাঙ্ চীনে নবজীবন প্রবর্ত্তনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ চেষ্টা যে সকল জাপানী স্বদেশের জন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রিন্স ইতো, কাউন্ট ওকুমা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। চীন এখনও কৃতকার্য্য হয় নাই বলিয়া কাঙ্ জগতে পরিচিত নন। তথাপি কাঙের নাম নব্য চীনে যাতুমন্ত্রের মতন কাজ করে। ইনি রাষ্ট্রসংস্কারের আন্দোলনে এখনও লিপ্ত আছেন। কাঙ্ ও লিয়াঙ্ মাঞ্চু আমলে বাধ্য হইয়া জাপানপ্রবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে উদ্দীপনামূলক ভাবুকতাময় গ্রন্থপ্রবন্ধাদি রচনা করা লিয়াঙের একমাত্র কার্য্য ছিল। বহুবার সাধাসাধির পর লিয়াঙ্ য়ূয়ানের দরবারে একবার মুদ্রা ও রাজস্ব বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল লিয়াঙ্ পদ-ত্যাগ করিয়াছেন। সেনাপতি চাই এবং সাহিত্যবীর লিয়াঙ যে বিপ্লব প্রবর্ত্তন করিতেছেন, সেই বিপ্লব চীনাসমাজে উপেক্ষিত হইবার নয়। বিদেশীয়েরাও এইরূপই বুঝিতে বাধ্য হইলেন।

চাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে তারে জানাইলেন—"স্বরাজের পতাকা আপনারা কোনমতেই নামাইবেন না। আমরা য়ূয়ানের দর্প চূর্ণ করিব। য়ূয়ানের বাড়াবাড়িতে যে সকল স্বরাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক চীন-সন্তান সাহায্য করিয়াছে তাহাদেরও যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব। আপনারা স্বরাজের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন।" চাইয়ের

লোকেরা ফরাসী সরকারকে জানাইলেন—"য়ুয়ানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা চীনা জনসাধারণের ইচ্ছিত বস্তু নয়! য়ুয়ান্ লোকজনকে জবরদস্তি করিয়া এই মত প্রচার করাইয়াছেন। দেশের লোক গণতন্ত্র বা স্বরাজই চাহে। আমরা য়ুন্-নানে সেই স্বরাজ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। আজ হইতে আমরা স্বতন্ত্র য়ুন্-নান্-রাষ্ট্র গঠন করিলাম। এই রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন ফরাসীর জীবন বা ধনসম্পত্তি আমরা স্পর্শ করিব না। কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যদি ফরাসীজাতির কিছু ক্ষতি হয়, তাহার জন্য বিশ্বাস-ঘাতক য়ুয়ান্ দায়ী। য়ুয়ান্ সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য।"

য়ুয়ান্ বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানাইলেন—"আপনারা চাইয়ের চ্যাংড়ামিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইবেন না। য়ুন্-নান্ প্রদেশ নিতান্ত নগণ্য ও পশ্চাদ্‌গামী জনগণের বাসস্থান। তাহা ত আপনাদের জানাই আছে। আমি চাইকে কয়েক দিনের ভিতরই দুরস্ত করিতেছি। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তাই য়ুন্-নানের বিরুদ্ধে সেনা পাঠাইবেন। য়ুন্-নানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আমায় বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না।"

পিকিঙ্-দরবার ফরাসী-সরকারকে দুইটা বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। প্রথমতঃ আনামের ভিতর দিয়া য়ুয়ান্ সেনা পাঠাইতে চাহেন। তাহা হইলে চাই শীঘ্রই কাবু হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, চাই যেন আনামের ভিতর দিয়া য়ুন্-নানে কোন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারেন।" ফরাসী গবর্মেণ্ট য়ুয়ান্‌কে বলিলেন—"আমরা চীন-স্বরাজকে চিনি—চীন সাম্রাজ্য ত এখনও স্বীকার করি নাই। কাজেই য়ুন্-নান্ প্রদেশ স্বরাজ-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন চালাইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বিধি-সঙ্গত। সুতরাং আমরা আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য। তবে য়ুন্-নানের লোকেরা আনামের ভিতর দিয়া যাহাতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে আমরা আইনতঃ বাধ্য।

আপনাদের ঘরোয়া-বিবাদের কোন পক্ষ গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়।”

বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের প্রথম অবস্থায় জার্ম্মাণি বেলজিয়ামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—“আমাদের সৈন্য আপনাদের ভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে দিন। তাহা হইলে সহজে ফ্রান্স আক্রমণ করিতে পারিব।” বেলজিয়াম সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন – ফলে জার্ম্মাণি গায়ের জোরে বেলজিয়াম দখল করিয়াছেন—এবং তাহার ভিতর দিয়া সেনা লইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। য়ুয়ানের গায়ে যদি জোর থাকিত তাহা হইলে তিনিও পিকিঙ্ হইতে জাহাজে সেনা পাঠাইয়া আনাম দখল করিতেন, এবং আনামের পথে য়ুন্-নান্‌কে কাবু করিতে চেষ্টিত হইতেন। য়ুয়ানে আর কাইসারে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

পিকিঙ্ দরবার হইতে হুকুম জারি করা হইল—“চাই একটা বদমায়েস গুণ্ডা বিশেষ—মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছুটি লইয়া চোরের মতন য়ুন্-নানে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানকার নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় লোকজনকে অনর্থক ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। শীঘ্রই চাই-টাকে পিকিঙে ধরিয়া আনা হউক। তাহার টাকা পয়সা সম্পত্তি যেখানে যাহা আছে সব বাজেয়াপ্ত করা হইবে। পিকিঙ্ দরবারের বিচারে চাইয়ের যথোচিত দণ্ড দেওয়া হইবে।” কিন্তু “বিড়ালের গলায় ঘণ্টা লাগাইবে কে?”

এ দিকে চাই চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ইনি পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী কুই চাও এবং কোয়াং-সি প্রদেশদ্বয়কে হাতে রাখিয়াই য়ুন-নানে প্রবেশ করিয়াছেন। কাজেই এই দুই প্রদেশ হইতে চাইয়ের কোন ভয় নাই। একমাত্র ভয় উত্তরবর্ত্তী ছি-চুয়ান প্রদেশ হইতে। অবশ্য ছি-চুয়ানের অনেক লোকই য়ুয়ান্-বিরোধী। দুইখানা বাঙ্গালা দেশের সমান ছি-চুয়ান প্রদেশ। ইহার অনেক জেলাতেই ছোটখাট বিদ্রোহ সুরু করানো যাইতে পারে। আর

ছি-চুয়ানের রাষ্ট্রকেন্দ্রে যে কয়টা সৈন্য আছে, সেগুলিকে চাইয়ের বিরুদ্ধে কখনই পাঠান হইবে না। য়ুয়ান্ পিকিঙ্ হইতে যে সমুদয় সৈন্য পাঠাইবেন তাহাদের সঙ্গেই চাইকে লড়িতে হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়া চাই ৬০০০ ফিট উচ্চ য়ুন্-নান্-ফু সহর হইতে উত্তর দিকের প্রান্তরে নামিতে থাকিলেন—শেষে য়ুন্-নান্ প্রদেশ ছাড়াইয়া সসৈন্যে ছি-চুয়ান প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। সীমান্ত হইতে তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া সুইফু নগর চাই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। লড়াইয়ের ইহা জার্ম্মাণ নীতি। শত্রুপক্ষকে আত্মরক্ষায় ফেলা বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণেরা প্রথম হইতেই রণ-নীতি স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। চাই ঠিক তাহাই করিলেন—ছি-চুয়ান প্রদেশের মধ্যে য়ুয়ানের সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ প্রদেশে প্রদেশে গণ্ডগোল সুরু হইল—খোলাখুলি বিদ্রোহ বেশী দেখা দিল না—কিন্তু নগরে নগরে, সৈনিকমণ্ডলে, সংবাদপত্রের সুরে বিদ্রোহের চিহ্ন লক্ষ্য করা কঠিন থাকিল না। য়ুয়ান্ কুই-চাও এবং কোয়াং-সি প্রদেশদ্বয়ের শাসনকর্ত্তাদিগকে জানাইলেন—"তোমরা সদল-বলে য়ুন্-নানের পূর্ব্বপ্রান্ত আক্রমণ কর।" ইঁহারা জরুরি তারে পিকিঙ্ দরবারকে জানাইলেন—"কুছ পরোয়া নাই! আপনারা টাকা পাঠাইয়া দিন—অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া দিন। আমরা সৈন্যসংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছি। কিয়দংশ নগর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে—কিয়দংশ লইয়া আমরা য়ুন্-নান্ আক্রমণ করিব।" য়ুয়ান্ ইঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এইগুলি হাত করিবার জন্য কুই-চাও এবং কোয়াং-সি প্রদেশদ্বয় প্রথম হইতেই য়ুন্-নানের দলভুক্ত হয় নাই। কিন্তু পিকিঙ্ দরবার ইহাদের চালাকি বুঝিতে পারেন নাই। টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইলে ইহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

কুই-চাও জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে য়ূন্-নানের দলে খোলাখুলি প্রবেশ করিল। তখন হইতে বিদ্রোহকে য়ূন্-কুই বিদ্রোহ বলা হইতেছে। চীনে সংবাদ পাওয়া বড়ই কঠিন। তাহার উপর উভয় পক্ষই যথাসম্ভব মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমান-জগতের যুদ্ধ-নীতির ইহা অঙ্গবিশেষ—বর্ত্তমান জগৎ কেন—দুনিয়ায় চিরকালই এই নীতি প্রচলিত। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বেশ বুঝা গেল যে যুদ্ধ চলিতেছে। য়ূয়ানের লোকেরা চাইয়ের লোকের সঙ্গে ছি চুয়ানের পল্লীতে ও নগরে লড়িতেছে, এবং কুই-চাওয়ের স্বরাজপন্থীরাও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী হু-নান্ প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধে জয়পরাজয়ের সংবাদ গোলমেলে। খবরগুলি জাপানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত বলিয়া ইংরেজেরা বিশ্বাস করেন না—জাপানী কাগজওয়ালারা নাকি বিদ্রোহী ঘেঁসা। রয়টারের সংবাদে জাপানী সংবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাহির হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ ও ফরাসী কাগজে কি সংবাদ বাহির হইতেছে ভগবানই জানেন। পিকিঙ্ দরবার হইতে যে সকল খবর বাহির হয়, তাহাতে জানা যায় যে সরকারী সৈন্যেরা সর্ব্বত্রই জিতিতেছে, চাইয়ের লোকেরা সর্ব্বত্রই হঠিতেছে। অথচ মার্চ্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছি চুয়ান এবং হু-নানের মধ্যেই লড়াইয়ের ক্ষেত্র। য়ূন্-কুই বিদ্রোহীরা তখনও নিজেদের কোটে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে একবার কাগজে পড়া গেল যে, কোয়াংটুঙ্ প্রদেশের জেলায় জেলায় সৈন্যগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা সেনাপতিগণকে হুকুম করিতেছে—"শীঘ্রই আপনারা য়ূন্-কুইদলে যোগদান করুন, তাহা না হইলে আমরা লুটপাট সুরু করিব।" এই ধরণের সৈন্য ক্ষেপিবার গুজব অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন নগর হইতেও শুনা গেল। এগুলিতে য়ূয়ানের চোখ কতখানি ফুটিল জানা যায় না। কিন্তু মার্চ্চের মাঝামাঝি

যখন কোয়াং-সি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা য়ুন্-কুইদলের সামিল হইলেন, তখন য়ুয়ান্ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এক সপ্তাহ মধ্যেই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন রদ করা হইল। য়ুয়ান্ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-সমিতির নিকট তাঁহাদের আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিলেন।

প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্ ২২ মার্চ্চ তারিখে দেশবাসীকে এক লম্বা ইস্তাহার প্রদান করিলেন। তাহাতে অনেক সুখদুঃখের কথার মধ্যে, কাজের কথা এই,—

"আমি স্বরাজ রক্ষার জন্য চিরকালই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু দেশবাসী আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, দেশের লোক যখন স্বরাজ চাহে না, তখন স্বরাজ বর্জ্জন করিলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে না। এইরূপ বুঝিয়া আমি স্বরাজ ভাঙ্গিতে সম্মতি দিয়াছিলাম—কিন্তু রাজা হইবার সাধ আমার আদৌ ছিল না। বস্তুতঃ আমি লোকের চিত্ত রঞ্জন করিবার জন্য রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতে বলিয়াছি—অথচ আয়োজন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি কোন চেষ্টা করি নাই। শেষে যখন য়ুন্-কুই বিদ্রোহ প্রবর্ত্তিত হইল দেখিলাম, তখন সকল আয়োজনই স্থগিত রাখিতে কর্ম্মচারিগণকে আদেশ দিয়াছি। * * * আমার নিজের বিশ্বাস আন্তরিক ভাবে জানাইতেছি। আমি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-সমিতির কার্য্যপ্রণালী কোন দিনই পছন্দ করি নাই। তাঁহাদের মত আমার মত নয়। আমি এই সঙ্গে তাঁহাদের সকল দলিল ফিরাইয়া দিতেছি। আমি যে সাম্রাজ্যের ভারগ্রহণ করিতে রাজি হইয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া যাইতেছি। আজ হইতে চীনে সাম্রাজ্যের প্রস্তাব চিরলুপ্ত হইল। * * * যাঁহারা স্বরাজ-সংরক্ষণের জন্য বিদ্রোহের ধ্বজা খাড়া করিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে স্বরাজের সেবায় মনোযোগী হউন। গৃহবিবাদে শক্তিক্ষয় অনাবশ্যক। আমি আমার দোষ স্বীকার করিতেছি। আমার জন্মভূমির সন্তানগণও আমাদের পবিত্র দেশের মুখ রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন।"

য়ুয়ান্ সাম্রাজ্যের প্রস্তাব রদ করিলেন—নাকে খত দিলেন। তথাপি যুদ্ধ পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকিল। চীনের মতি-গতি বুঝিয়া উঠা কঠিন। ক্রমশঃ নানা প্রদেশ হইতে নানা নামজাদা লোক য়ুয়ান্‌কে ব্যক্তিগত পরামর্শ তারে পাঠাইতে লাগিলেন। শাংহাইয়ের অধিবাসী পুরাতন চীন সাম্রাজ্যের মন্ত্রী-প্রধান সুনের সহযোগী ও স্বরাজপন্থী তাঙ্-শাও-ই য়ুয়ানের আমলে দুই তিন বৎসর কাল নীরব ছিলেন। তিনিও এ যাত্রায় য়ুয়ান্‌কে এক খোলা চিঠি পাঠাইলেন। মর্ম্ম—"য়ুয়ান্, তুমি আমার পুরাতন বন্ধু। তোমার অন্তঃকরণ সরল—আমিও তোমাকে সরলভাবে বন্ধুজনোচিত পরামর্শ দিতেছি। ভাই, আর কি বুঝিতে বাকি আছে? দেশের লোক তোমার দৌরাত্ম্যে অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে। তোমার উৎপাত ইহারা আর সহ্য করিবে না। তোমাকে চীন চাহে না। তুমি সরিয়া পড়।" য়ুয়ান্‌কে সরিয়া পড়িবার উপদেশ বহু ব্যক্তিই দিতে আরম্ভ করিলেন। ছি-চুয়ান্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং কিয়াং-সু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আজকালকার চীনা-রাষ্ট্র-মণ্ডলে অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারাও এক্ষণে মন খুলিয়া য়ুয়ান্‌কে জানাইলেন—"আমরা বরাবরই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। তুমি এত-দিনে বুঝিলে! যাহা হউক, সাম্রাজ্য রদ হইয়াছে ভালই—কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের নেতৃবর্গ ইহাতেও বোধ হয় সন্তুষ্ট নন। য়ুয়ান্, তুমি অনেকবার স্বদেশের জন্য আত্ম-ক্ষতি স্বীকার করিয়াছ। এ যাত্রায়ও সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান কর। দেশের লোক শান্ত হউক। সেনাপতি চাইয়ের অধীনস্থ সৈনিকদল তেজস্বী ও স্বদেশ-ব্রতধারী। তাহাদিগকে পরাজিত করা সরকারী বেতন-ভোগী সৈন্যের কার্য্য নয়। কাজেই সম্মুখ-সমরে চাইকে তুমি হঠাইতে পারিবে না। সকল দিক্ দেখিয়া বুঝিতেছি তোমার পদত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" ইত্যাদি।

কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ থামিল। ছি-চুয়ানের শাসনকর্ত্তা চাইয়ের সঙ্গে

সন্ধির সর্ত্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অথচ দেখিতে দেখিতে এপ্রিলের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কোয়াংটুঙ্ এবং চি-কিয়াঙ্ প্রদেশ য়ুন্-কুই দলের সামিল হইয়া গেল। এদিকে গুড্ ফ্রাইডে আসিতে না আসিতে য়ুয়ান্ও পদত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কোথায় চল্লিশ কোটি নরনারীর দেশে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-ভোগ—আর কোথায় জনগণ কর্তৃক ঘৃণিত লাঞ্ছিত নিন্দিত জীবন! এখন দেশের ভিতর তিষ্ঠিতে পারিলেও হয়! অদ্ভুত দুনিয়া।

য়ুয়ান্! তোমার বুকের পাটা কি ক্ষুদ্র! তোমার বুদ্ধিও কি স্থূল! এত বড় ভীরু ও কাপুরুষের হৃদয় লইয়া তুমি নির্ব্বিবাদে মহাকণ্টকময় রাজতক্তে বসিতে চাহিয়াছিলে? য়ুয়ান্ তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? এ কয় বৎসর ধরিয়া তুমি একে একে চীনের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই নিজের হস্তগত করিয়াছ—সত্যসত্যই এক প্রকার রাজা হইয়া বসিয়াছ—কেবল কাগজে কলমে রাজা শব্দ লিখিতে বাকি ছিল! দুনিয়ার নিরপেক্ষ লোকেরা ইহা দেখিয়া ভাবিত—বুঝি বা য়ুয়ান্ চীনের সীজার, ক্রমওয়েল বা নেপোলিয়ান্। ইয়োরামেরিকানেরা ভাবিত বুঝি বা জগতে "পীতাঙ্গ বিভীষিকা" তোমার নেতৃত্বে সত্যসত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়। বুঝি বা এশিয়ায় পাশ্চাত্যের আস্ফালন যথার্থভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। এশিয়াবাসী ভাবিত—এইবার বুঝি এশিয়ার ইজ্জত রক্ষা হইতে চলিল। জগতের আশঙ্কাস্থল ও আশাস্থল য়ুয়ান্, আজ তুমি এ কি করিলে? তুমি প্রাণভয়ে ভীত! তুমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দেশবাসীকে জানাইলে—"ওগো আমাকে মারিও না। আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অনিষ্ট করিও না। আমার কোন দোষ নাই। আমার পরামর্শদাতারা আমাকে ভুল বুঝাইয়াছিল।" চারি মাসের ধাক্কায় তোমার এত পরিবর্ত্তন? সীজার, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ানের চরিত্র অন্য উপাদানে গঠিত। যাহা হউক, যুবক চীনের

প্রতিপত্তি আজ হইতে দুনিয়ায় বাড়িয়া গেল। এশিয়ার মুখ রাখিবার জন্যই যেন ভগবান্ যুয়ান্‌কে চীনের রাবণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

(৭) চীনা স্বরাজের গঙ্গাযাত্রা

চীনারা বিপ্লব করে কিন্তু রক্তারক্তি করে না। গোলাপজলের পিচকারি লইয়াই যেন ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। বিগত পাঁচ বৎসরের ভিতর চীনে তিন তিনটা বিদ্রোহ বা দাঙ্গা হইল—অথচ ইয়াংসির পীতজল একবারও রক্তবর্ণ হইল না। এ যাত্রায় ত দেখিতেছি পাঁয়তারা সুরু হইতে না হইতেই লড়াইয়ের বাজনা থামিয়া গেল। সন্ধির কড়ার আলোচিত হইতেছে। যুয়ান্ বড় বেশী এলাইয়া পড়িয়াছেন। ইনি এত শীঘ্র কাবু হইবেন চাইয়ের পল্টন ভাবিতে পারে নাই। যুয়ান্ চালে চলিতেছেন না ত? যাহা হউক স্বরাজ কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ বাঁচিয়া গেল। এখন কিছু মজার কথা বলা যাউক।

আগষ্ট (১৯১৫) মাসে জাপান ছাড়িয়া কোরিয়ায় আসি। জাপান সমুদ্র পাড়ি দিবার সময়েই এশিয়ার দিক হইতে একটা আওয়াজ হাওয়ায় আসিয়া কাণে ঠেকিল—"বল হরি হরিবোল!—চীনা স্বরাজকে খাটে তোল!" সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পোর্ট-আর্থার হইতে পিকিঙে পৌছিলাম। পৌছিয়াই দেখি ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডাক্তার গুড্‌নো সাহেব স্বরাজকে জবাব দিয়াছেন। চীনের ব্যাধি চিকিৎসা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার "প্রেস্‌ক্রুপশন" বা ব্যবস্থা-পত্রও প্রস্তুত। ইনি বলিলেন—"প্রাচ্যে স্বরাজ হজম হইবে না। আপনাদের অন্য দাওয়াই চাই। কি করিব? আমি চিকিৎসক। চীনে প্রবাদ আছে, ঔষধ যত তিক্ত হয় ততই তাহা উপকারী। আমি তিক্ততম

ঔষধেরই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম। চীনা স্বরাজকে খাটে তুলিতে পরামর্শই দিয়াছি। উহার শ্বাস উপস্থিত।" বাস্তবিক তখন স্বরাজ খাটেই উঠিয়াছেন—চীনারা বড়ই বিব্রত দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক দিন পরে "বিরাট প্রাচীর" দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে গুড্‌নো সাহেবের খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। ম্যানেজার উত্তর দিলেন—"তিনি কল্য পিকিঙ্ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি জাপানের পথে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমেরিকা হইতে বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন ?" উত্তর পাইলাম—"না, চীনে ত তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।" বুঝিলাম স্বরাজকে খাটে তোলাইয়াই রাষ্ট্র-চিকিৎসক মহাশয় প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি শ্মশান পর্য্যন্ত "যস্তিষ্ঠতি" হইয়া "বান্ধবের" কার্য্য করিলেন না।

গুড্‌নো সাহেব একজন নামজাদা লোক। ইয়াঙ্কি পণ্ডিত মহলে উইল্‌সন, এলিয়ট্, ষ্ট্যান্‌লি হল, রাইন্‌শ্, গুড্‌নো ইত্যাদি মনীষিগণ প্রায় সমান দরের ব্যক্তি। সকলেই ইঁহাদের নাম জানে। আমাদের দেশে কলেজের ছাত্রেরাও বোধ হয় ইঁহাদের সকলেরই রচনাবলী পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাইন্‌শ্ এক্ষণে পিকিঙে ইয়াঙ্কি মন্ত্রী। ষ্ট্যান্‌লি হল চিত্ত-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান লইয়া কারবার করেন—রাষ্ট্রনীতির ধার ধারেন না। শিক্ষাধুরন্ধর এলিয়ট বুড়া হইয়াছেন। আর উইল্‌সন ত এক্ষণে ইয়াঙ্কিস্থানের সভাপতি। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাকা লোকের নাম উঠিলে গুড্‌নো মহাশয়ের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে হইবে। প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্ তিন মাসের জন্য উচ্চহারে "ভিজিট্" বা পারিশ্রমিক দিয়া গুড্‌নো সাহেবকে চীনের ব্যাধি চিকিৎসার জন্য আনাইয়াছিলেন। ইয়াঙ্কিরা দুনিয়ায় স্বরাজের প্রবর্ত্তক—ফরাসী বিপ্লব সুরু হইবার পূর্ব্বেই আমেরিকায় গণতন্ত্র

স্থাপিত হইয়াছিল। ইয়াঙ্কিস্থানের নর্দ্দমাতেও গণতন্ত্র, প্রজাশক্তি, স্বাধীনতা, রিপাব্লিক্, স্বরাজ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির গন্ধ পাওয়া যায়। সেই ইয়াঙ্কিসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবীর ও শিক্ষাধুরন্ধর চীনে আসিয়া স্বরাজের ধ্বংস সাধন করিলেন। ইয়াঙ্কিরা গুড্নোর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। চীনারা ইয়াঙ্কিসন্তান-মাত্রকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া জানে। তাহারা ভাবিতেছে—"এ যে ভীষণ সয়তানী! যাহারে কাণ্ডারী করি ভাসাইয়াছিনু তরী সেই আমাদিগকে অকুল-সাগরে ঠেলিয়া পলায়ন করিল।" ইংরেজ-সমাজের নিরপেক্ষ লোকেরাও ব্যাপারটা বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন—"যদি কোন ইংরেজ-পণ্ডিত চীনে আসিয়া স্বরাজের বিরুদ্ধে এবং রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে মত প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইতাম না। কারণ ইংরেজেরা প্রজাতন্ত্র শাসনের নামে গলিয়া যায় না। আমাদের রাষ্ট্রবীরেরা রাজতন্ত্রেরই পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু ইংরেজ-বিদ্বেষী, স্বরাজের পাণ্ডা, ইয়াঙ্কি-সন্তান তাঁহার চোদ্দপুরুষের মুখে চূণ-কালী লাগাইতে সাহসী হইলেন কি করিয়া?"

গুড্নো ব্যবস্থাপত্রে বলিয়াছেন—"অবশ্য আমি চীনাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কোনপ্রকার আদেশ বা ইঙ্গিত মাত্র করিতে ইচ্ছা করি না। আমি স্কুলমাষ্টারী হিসাবে চীনের বর্ত্তমান সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে মনে হইয়াছে যে প্রজাতন্ত্র চীনের ধাতে এখনও বহুকাল লাগিবে না।" কিন্তু কি চীনা, কি ইয়াঙ্কি, কি ইংরেজ কেহই তাঁহার এই মুখবন্ধে খুসী নন। সকলেই সন্দেহ করিতেছেন ইহার মধ্যে কিছু বুজরুকি আছে। বাজারে নানা গুজব—কাগজে পত্রে প্রকাশ করে সাধ্য কার? তাহা হইলে এখনি বিরাট মানহানির মোকদ্দমা রুজু হইয়া যাইবে। ডাক্তার সাহেব স্বরাজকে খাটে তোলাইয়া আর একদিনও চীনে থাকিলেন না। তাহারই বা অর্থ কি? তিনি এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের

গুবর্ণর—ছুটির পর কলেজ খুলিবে—এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া আবশ্যক। এরূপ শুনিয়াও লোকেরা সন্তুষ্ট নয়।

এত বড় প্রবীণ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র পাইয়া য়ূয়ানের পেটোয়ারা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা স্বরাজকে কাঁধে তুলিয়া পিকিঙের রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে থাকিলেন—"রাম নাম সাত্যা হ্যায়—চীনা স্বরাজ যাতা হ্যায়!" আমাদের ভাষায় বলিব গঙ্গাযাত্রা হইতেছে—চীনাদের কথায় বলা উচিত স্বরাজকে খাটে করিয়া হোয়াঙের ধারে রাখা হইল। এখনও ত উহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন বাহির হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দু-এক ফোঁটা হোয়াংহোর জল উহার মুখে দিতেই হইবে। সেপ্টেম্বারের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বারের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত স্বরাজ গঙ্গার ঘাটেই থাকিলেন। ১৫ই ডিসেম্বার তারিখে রটিয়া গেল স্বরাজের মৃত্যু হইয়াছে—য়ূয়ান্ সম্রাট্ হইতে রাজি আছেন। তাহার দশ দিন পরে য়ূন্-নান্-ফুতে সেনাপতি চাইয়ের হুঙ্কার। তিন মাসের মধ্যে ভয়ে ভয়ে য়ূয়ান্ বলিতে বাধ্য হইলেন—"স্বরাজ মরে নাই—ক্লোরোফরমের প্রভাবে অচেতন ছিল। আমি সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছি।"

গঙ্গাযাত্রার দিনকয়টা য়ূয়ান্ খুব ব্যস্ত। গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেলের সকল প্রকার ব্যবস্থা হইতে থাকিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে হবু-সম্রাটের নূতন নাম, উপাধি, পোষাক, সিংহাসন, আসবাব কিরূপ হওয়া উচিত তাহার জন্য বৈঠক বসিল। এক ডজন পত্নীর মধ্যে কে পাটরাণী হইবেন, তাহা আলোচিত হইতে লাগিল। প্রাণাধিক যুবরাজের পদবী সম্মান ইত্যাদির কথাও যত্নসহকারে কমিটিতে উঠান হইল। তাহার পর উজির নাজির মন্ত্রী সেনাপতি হইতে পাহারাওয়ালা বরকন্দাজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারীর জন্য খেতাব বক্‌শিসও নির্দ্ধারিত হইতে

থাকিল। "কালনেমীর লঙ্কাভাগ" কাণ্ডের কোন অনুষ্ঠানই বাকি রহিল না।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশে প্রদেশে সভাসমিতি করানো, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করানো, ভোট দেওয়ানো, "জনসাধারণের মত" সংগ্রহ করানো ইত্যাদিও বাদ পড়িল না। সবই যেন লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতেছে, বিদেশীয়গণকে এই কথা বিশেষ জোরের সহিতই বুঝানো হইতে থাকিল। জাপানী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করা হইত। কোন দিন হয়ত প্রকাশ অমুক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সাম্রাজ্যপন্থী নন, তিনি দায়ে পড়িয়া এই নূতন আন্দোলনে যোগ দিতেছেন। অমনি ইংরেজ কাগজ-ওয়ালারা পিকিঙ্ দরবারের সংবাদই সত্য বলিয়া প্রচার করিতেন। অথচ প্রায়ই শুনা যাইত, আজ অমুক মন্ত্রী পদত্যাগ করিতেছেন, কাল অমুক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী স্বাস্থ্যের জন্য ছুটি লইতেছেন, পরশু আর এক জন প্রধান সেনাপতি ঠান্‌দিদির পেটের অসুখের জন্য চাকরি ছাড়িতেছেন ইত্যাদি। যাঁহারা য়ুয়ানের সঙ্গে বচসা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিতেন, তাঁহারা এইরূপে সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় থাকিলেন। যাঁহারা এই ফাঁকে য়ুয়ানের বন্ধু হইয়া টাকা মারিবার মতলব করিলেন তাঁহারা রহিয়া গেলেন। আর যাঁহারা গভীর জলের মাছ তাঁহারাও য়ুয়ানের স্বপক্ষে সকল কাজই করিতে থাকিলেন। উদ্দেশ্য যথাসময়ে য়ুয়ান্‌কে হাস্যাস্পদ করা। পরবর্ত্তী কালের ঘটনা দেখিয়া স্বরাজের গঙ্গাযাত্রার সময়কার ঘটনাগুলি এইরূপই বোধ হইতেছে।

এক দিন এখানকার বিখ্যাত কমার্শ্যাল প্রেসের গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগে দেখি, সম্পাদকগণ টেক্‌স্‌টবুক্‌গুলি সংশোধন করিতেছেন। প্রত্যেক পুস্তিকায় 'স্বরাজে'র স্থানে 'সাম্রাজ্য' লেখা হইতেছে। যে সকল স্থলে লেখা ছিল "দশ হাজার বৎসর আমাদের চীনা স্বরাজ বাঁচিয়া থাকুক", সেই

সকল স্থানে লেখা হইতেছে "দশ হাজার বৎসর আমাদের সাম্রাজ্য বাঁচিয়া থাকুক।" এই ধরণের সংশোধন আগাগোড়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে য়ুয়ান্ শিক্ষাসংস্কার-বিষয়ক আদেশে বোধ হয় এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকিবেন। এখন দেখিতেছি পুস্তকগুলি আবার সংশোধন করা আবশ্যক! ছাপাখানার লাভ।

জনগণের ভোট গণনা করা হইয়া গেল। য়ুয়ান্ এই ভোটদাতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ এক মেডেল বা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। অভিষেক-যজ্ঞের জন্য গঠিত কমিটির মেম্বারগণও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের "ব্যাজ" বা পদক স্থানীয় অলঙ্কার পাইলেন। এই কমিটির নাম মহামহোৎসব-সমিতি। এই ধরণের একটা সমিতি একবার বড় বিপদে পড়িলেন। য়ুয়ানের নিকট তাঁহারা "সমগ্র দেশবাসী"র এক আবেদন পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কন্‌ফিউশিয় তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশগণ যথোচিত ভাষায় সুন্দর চিত্রাক্ষরে আবেদন লিখিয়াও ফেলিয়াছেন। গোল বাধিল য়ুয়ানকে সম্বোধন করা যাইবে কি বলিয়া! 'সম্রাট' বলা হইবে না, "ভগবৎ-পুত্র" বলা হইবে, না "পিকিঙেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলা হইবে? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া উঠিল না। এই জন্যই নাকি "সমগ্র দেশ-বাসী"র আবেদন চীনেশ্বরের শ্রীচরণে পাঠানই হইল না! এতদিন ভাবিতাম যে, আবেদননিবেদনের আর্জ্জি লিখিতে ভারতীয় রায়-বাহাদুর-বিদ্যাভূষণ-মহামহোপাধ্যায়গণের সমান দুনিয়ায় আর কেহ নাই। দেখিতেছি চীনারা আমাদিগকেও হারাইতে পারে।

সাম্রাজ্যের জন্য নয় প্রকার সীল-মোহর আবশ্যক হইবে। যে সে ধাতু বা পাথরে সীল প্রস্তুত করিলে চলিবে না। চীনের প্রত্যেক প্রদেশে সংবাদ পাঠান হইল। সকল কেন্দ্র হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্বেত "জেড্" প্রস্তরের নমুনা পিকিঙে আসিতে থাকিল। মহামহোৎসব-সমিতি সেই

সমুদয় হইতে নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। নূতন সাম্রাজ্যের জন্য নূতন পতাকা আবশ্যক। তাহার নক্সাও স্থির হইয়া গেল।

য়ুয়ান্ আজকাল বৎসরে মাত্র পনর লক্ষ টাকা পাইতেছেন। সম্রাট্ হইলে তাঁহাকে বৎসরে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। যে দিন য়ুয়ান্ রাজা হইবার জন্য অনিচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন সে দিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিম্নলিখিত বাণী বাহির হইয়াছিল—"আমাকে চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে। আপনারা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। আপনারা জানেন রাজা হওয়া কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। একবার ভাবিয়া দেখুন আমার পরিবারের স্বার্থত্যাগ কত বেশী। আজ আমার পুত্র-কন্যাগণ দেশের সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারিতেছে। তাহাতে সমাজের কল্যাণ কত দিকে সাধিত হইতেছে। কিন্তু আমি সম্রাট্ হইবার পর ইহারা সকলেই রাজপুত্র ও রাজকন্যা হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা আর দেশের সাধারণ লোক থাকিবে না। তাহাদের কর্ম্মের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে। ইহা কি কম স্বার্থত্যাগ? যাহা হউক প্রজা-রঞ্জনের জন্য এবং দেশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি সকল স্বার্থই জলাঞ্জলি দিলাম।" য়ুয়ানের আত্মবলিদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে!

য়ুয়ান্ অভিষিক্ত হইলে পর চীনের প্রত্যেক সৈন্যকে ৩৲ করিয়া বকশিস দিবেন প্রচার করা হইল। অবশ্য য়ুয়ানের ট্যাঁক হইতে দেওয়া হইবে না। অধিকন্তু আট শ্রেণীর লোকের তালিকা করা হইল। তাঁহাদের প্রত্যেককে সম্মানসূচক খেতাব বা পদক বা পুরস্কার বা যা হউক কিছু দেওয়া হইবে। যাঁহারা সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার রব চীনে প্রথম তুলিয়াছেন, যাঁহারা পরে হুজুগটা চাগাইয়াছেন, যাঁহারা সাক্ষাতে বা পরোক্ষে এই শুভ আন্দোলনে এমন কি "কাঠ-বিড়ালীর কাজ" পর্য্যন্ত করিয়াছেন—এই ধরণের সকলেই আট শ্রেণীর

তালিকায় স্থান পাইবেন। শ্রীযুক্ত চীনেশ্বরের রথ প্রস্তুত করিবার জন্যও সমরবিভাগের কর্ত্তারা আদিষ্ট হইলেন। পাঁজী-পুঁথি দেখিয়া অভিষেকের শুভক্ষণ স্থির করিবার জন্য গণৎকার পণ্ডিতেরা লাগিয়া গেলেন। পিকিঙ্ দরবার হইতেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইল। পিকিঙের পল্টন য়ুয়ানের ভক্ত। তাহাদিগকে এক মাসের বেতন বেশী দেওয়া হইয়া গেল। য়ুয়ানের মূর্ত্তিযুক্ত রূপার ডলারও টাকশালে তৈয়ারী হইল। দুই একটা হস্তগত হইয়াছিল। এখন খুঁজিয়া পাই না।

য়ুয়ান্ তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহযোগিগণকে প্রকাশ্য পত্রে জানাইলেন—"আপনারা নিজকে আমার 'প্রজা' বলিয়া বর্ণনা করিবেন না। ইহাতে আমার বড় লজ্জা করে। প্রাচীনকালের সম্রাট্‌গণ পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে কথা খাটে সে কথা কি আমার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ?"

উপাধিবিতরণের ব্যবস্থাও রাজার হালেই হইতে থাকিল। নানা নূতন নূতন খেতাব তৈয়ারি করা হইল। কেহ প্রিন্স, কেহ মার্ক্ইস্, কেহ ডিউক ইত্যাদির জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। অনেকে উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেহ প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে "উপরোধে ঢেঁকি" গিলিলেন।

অন্তঃপুরের ব্যবস্থা করিতেও ভুল হয় নাই। পট্টমহাদেবীর বেশভূষা হইতে চাক্‌রাণী পর্য্যন্ত মহামহোৎসব-সমিতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সখী নিযুক্ত হইয়া গেলেন। কিছু গোল বাধিল যুবরাজ লইয়া। য়ুয়ানের দুই পুত্রে লাঠালাঠি হইবার উপক্রম। ক্রাউন-প্রিন্স বা যুবরাজ করা হইবে কাহাকে ? এই উপলক্ষ্যে পিকিঙের পল্টনও নাকি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা কতদূর গড়াইয়াছিল জানিতে পারি নাই।

য়ুয়ান্ কর্ম্মচারিগণকে জানাইলেন—"আমার চারিজন অতি প্রিয় বন্ধু আছেন। আমি সম্রাট্ হইলে তাঁহাদের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আপনারা সাব্যস্থ করুন।" এই বন্ধু-চতুষ্টয়ের জন্য প্রথমেই একটি মোলায়েম পারিভাষিক শব্দ সৃষ্ট হইল। তাহার পর ইঁহাদের জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকার কল্পিত হইল। সাধারণ লোকেরা য়ুয়ানের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে কুর্ণিশ করিবেন—কিন্তু ইঁহারা ঘাড় সোজা রাখিয়াই আসিবেন। ইহাই প্রথম দফা বিশেষত্ব। অন্যান্য লোককে বিদায় দিবার জন্য য়ুয়ান্ সিংহাসন ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য য়ুয়ান্ দরজা পর্য্যন্ত আসিবেন। এই গেল তুই নম্বর বিশেষত্ব। আর গণ্ডাকয়েক বিশেষত্বের পর "মধুরেণ সমাপয়েৎ"ও আছে। য়ুয়ান্ রাজা হইবামাত্র এই বন্ধু চতুষ্টয়ের প্রত্যেককে কয়েকলক্ষ টাকা নজর দেওয়া হইবে। বাল্যকালে হবু-রাজরাজড়াদের বন্ধু থাকা সৌভাগ্যের কথা। কয়জনের কপালেই বা জুটে!

সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এখনও আসে নাই। একদিন কাগজে পড়িলাম চীনের সকল প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিলিয়া একটা পরিষৎ গঠন করিয়াছেন। ব্যাপার কি? মহামহোৎসব সমিতি তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত হবু সম্রাট্ য়ুয়ানবাহাদুরের বংশ-লতিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। বহু গবেষণার পর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ একটা অমূল্য সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। কাগজে প্রকাশ—য়ুয়ানের পূর্ব্বপুরুষগণ নাকি মিঙ্-সম্রাট্দিগের আত্মীয় বা জ্ঞাতি বা কুটুম্ব বা ঐ ধরণেরই কিছু ছিলেন। আর কি চাই? বিখ্যাত তাঙ্ ও সুঙ্ সম্রাট্গণের পর চীনে বিদেশীয় মোগল-রাজবংশের আধিপত্য ছিল। সেই মোগলের উপর স্বদেশী বিপ্লববাদী চীনারা বড় চটা। মোগলবংশের পর মিঙ্বংশ চীনে রাজত্ব করেন (১৩৬৮—১৬৪৪)। মিঙেরা চীনের খাঁটি স্বদেশী।

মিঙের পর মাঞ্চুরা চীন-সম্রাট্ হন। এই মাঞ্চুরাও মোগলদের মতন চীনের বিদেশী। মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করাই সুন্‌পন্থী স্বরাজ-পাণ্ডাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই য়ুয়ান্ যথন মিঙ্‌বংশাবতংশ তখন য়ুয়ানের সম্রাট্ হইবার দাবী ত ষোল আনা! জয় পরম-কন্‌ফিউশিয়-ভট্টারক বৌদ্ধ-প্রেমিক মিঙ্-কুলতিলক য়ুয়ান্ চীনেশ্বরের জয়!

স্বরাজ হোয়াংহোর ঘাটেই আছেন। নির্ম্মল বায়ু সেবনে মাঝে মাঝে চৈতন্যোদয় হইতেছে। স্বরাজ-সেবকগণ বেশী উচ্চবাচ্য করিতেছেন না সত্য—কিন্তু একদম নিঝুমের পালাও নয়। অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলেন। কেহ বাপের শ্রাদ্ধ বলিয়া দেশে গেলেন—কেহ চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দিয়া ছুটি মাগিলেন। যাহারা ছুটি পাইলেন না তাঁহাদের কেহ কেহ অন্ধকারে পলায়ন করিলেন। একজন বড় সেনাপতি নাকি কুলী সাজিয়া পিকিঙ্ ত্যাগ করিয়াছেন। শেষে য়ুন্-নান্-ফুর কাণ্ড প্রকটিত হইল। স্বরাজ এতদিন পরে একবার চোখ খুলিয়া দেখিলেন। বুঝি বা চীনের হাতুড়ে কবিরাজেরা স্বরাজকে বাঁচাইয়া তোলেন। পাশ-করা ইয়াঙ্কি ডাক্তার ত ফেলই মারিয়াছেন।

বিদ্রোহের ব্যাপারেও অনেক মজার কথা আছে। সাম্রাজ্যের পাণ্ডারা ত প্রথমেই চাইকে পাকড়াও করিয়া পিকিঙে আনিবার হুকুম জারি করিলেন। কেবল তাঁহাকে পাকড়াও করিবার লোকই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তারপর য়ুয়ানের নিকট একটা অতি সুচিন্তিত প্রস্তাব পেশ করা হইল। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইবেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হউক। কেবলমাত্র উপাধি-বা পদক নয়—নগদ টাকাও বিতরণ করা যাউক। কাহাকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা, কাহাকেও বা চারি হাজার টাকা ইত্যাদি হারে পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব অতি সমীচীন বলিয়া গৃহীতও হইল। হবচন্দ্র

রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী আর কি! পদক কিরূপ হইবে? ঠিক বিলাতী “ভিক্টোরিয়া-ক্রশের” মতন।

চীনে লড়াই বাধিলে চুরি-ডাকাইতির খুব সুযোগ। ছি-চুয়ানে ও হুনানে আসিয়া য়ূন্-কুই বিদ্রোহীরা য়ুয়ানের পল্টন আক্রমণ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলায়ই বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কাজেই সরকারী পল্টন আর স্বরাজ-সেবক পল্টন সবই বড় বড় কেন্দ্রে সজ্জিত বা অর্দ্ধসজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে। সরকারী সৈন্য ঐ সকল স্থান হইতে কোনমতেই সরানো যাইতে পারে না। চোর-ডাকাইতেরা মাহেন্দ্রক্ষণ পাইয়া বসিল। চীনের সর্ব্বত্র বাজার লুট, সহর লুট, দোকান লুট, নৌকা-লুট, গাড়ী-লুট ইত্যাদি লুটের যোগ পড়িয়া গেল। সাধারণ সময়ে ফৌজের ভয়ে চোর-ডাকাইতেরা চুপ করিয়া থাকে। তথাপি চুরি-ডাকাইতি বন্ধ হয় না বলিলেই চলে। এখন লড়াই বাধিয়াছে শুনিয়া দস্যুদের অবাধ বাণিজ্য সুরু হইবারই কথা।

অন্যান্য দেশে চুরি-ডাকাইতি বিশেষ সমস্যাজনক নয়। তাহাতে দেশীয় লোকের শান্তি ও সম্পদ নষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু চীনে চুরি ডাকাইতির ফল বড় বিষময়। যদি ঘটনাচক্রে কোন একজন জাপানী বা জার্ম্মাণ বা ইংরেজ বা ফরাসী বা রুশের গায়ে বা সম্পত্তিতে কোন ডাকাইতের হাত পড়ে তাহা হইলে গোটা চীন লইয়া টানাটানি পড়িবে। দুইজন জার্ম্মাণ-পাদ্রীর গায়ে হাত পড়িয়াছিল বলিয়া চীন একটা জেলা জার্ম্মাণকে, একটা জেলা ইংরেজকে এবং একটা জেলা জাপানীকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই চীনে গৃহ-বিবাদ কেবল ঘরোয়াকাণ্ড নয়—ইহা একটা দুনিয়ার কাণ্ড—পূরা দস্তুর আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা।

স্বরাজ-সংরক্ষকগণের কিছু কিছু সুবিধাও হইতেছে মন্দ নয়। ইঁহাদের লোকজন টাকা-পয়সার অভাব ত যথেষ্ট। ইঁহারা জেল খুলিয়া

কয়েদিগুলিকে পল্টনের সামিল করিলেন। রাস্তায় যে সকল গুণ্ডা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগের সাহায্যেও দলপুষ্ট করিলেন। আর বড় বড় ডাকাইতের মৌচাক হইতেও সৈন্যসংখ্যা বাড়াইয়া লইলেন। ইহাও এক ধরণের কম্পাল্‌সরি অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সৈন্যবৃত্তি আর কি? ডাকাইতেরাও ত দেশেরই লোক! 'কন্‌স্ক্রপ্‌শন্' প্রথা যে দেশের সমরবিভাগে অবলম্বিত সে দেশে কি চোর-সাধু, ডাকাইত-ভদ্র ইত্যাদি পার্থক্য করা হয়? লম্বা-চওড়া লোক পাইলেই সে সেনাবিভাগে প্রবেশযোগ্য।

চীনে সৈন্যদের মাসিক বেতন বড় অল্প। কাজেই সৈন্যেরাও অনেক সময়ে চুরি-ডাকাইতি-লুটপাটের সুযোগ খুঁজিয়া থাকে। আর সরকার-বাহাদুরও অনেক সময়ে ইহাদিগকে মাপ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা চীনের সনাতন রীতি—কেবল য়ুয়ানের আমলে নয়। চীন-দরবারের রাজকোষ সর্ব্বদাই শূন্য—পল্টনের বেতন প্রায়ই বাকি থাকে। এইজন্য সৈন্যেরা সেনাপতিগণকে অনেক সময়ে শাসাইয়া দেয়। সেনাপতিরা সৈন্যের ভয়ে জীবন কাটাইতে বাধ্য হন। সুতরাং কেহ যদি ফৌজগুলিকে টাকার লোভ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে সেনাপতিগণকে বশে আনা অতি সহজ। চীনের সেনাবিভাগ এই কারণে যারপরনাই বিশৃঙ্খল। কখন কোন্ পল্টন কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে—তাহা পূর্ব্ব হইতে আন্দাজ করা সুকঠিন। হয়ত কোন এক লক্ষ্য অনুসারে এক অভিযান পাঠানো হইল—অর্দ্ধ-পথে সৈন্যেরা হয়ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিল। তখন যে উদ্দেশ্যে অভিযান পাঠানো হইয়াছিল ঠিক তাহার উল্টা ফল পাওয়া যায়। তাহার উপর যদি সৈন্যগণের অথবা সেনাপতির কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় মত থাকে তাহা হইলে গণ্ডগোলের চূড়ান্ত। বিগত পাঁচ বৎসরের তিনটা বিপ্লবেই চীনাপল্টনের এই দুরবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

য়ুয়ান্ পিকিঙের পল্টনকে নানা উপায়ে খুসী রাখিয়াছেন—কিন্তু সমগ্র

চীনের সৈন্যদলকে খুসী রাখা ত সোজা কথা নয়। তাহাই যদি পারা যাইবে তাহা হইলে মাসিক বেতন অত অল্প কেন—আর তাহাও মাস মাস দেওয়া হয় না কেন? হয়ত য়ুয়ান্ কোন কোন প্রদেশের কোন কোন সেনাপতিকে ঘুশ দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছেন। হয়ত কোন কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা য়ুয়ান্ রাজা হইলে বড় রকমের দাঁ মারিবেন আশা পাইয়াছেন। কিন্তু সুন্‌পন্থীরাও ত বশীকরণ মন্ত্র জানে। তাহারাও ত খাঁটি চীনাসন্তান। অধিকন্তু যথার্থ স্বদেশ-সেবক, আন্তরিক স্বরাজসংরক্ষক এবং স্বার্থত্যাগী ভলান্টিয়ারের দলও নগণ্য নয়। সকলেই কি কোন দেশে কখনও একমাত্র নাম-কে-বাস্তে বিপ্লবপন্থী?

প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণায় এই সকল কারণে অনেক বিচিত্র তথ্য দেখিতে পাইতেছি। য়ুন্-কুই প্রদেশদ্বয়ের শাসনকর্ত্তারা নিজেই সমগ্র জনপদের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু সৈন্যগণ যদি ইঁহাদের বশে না থাকিত তাহা হইলে এই কার্য্য হইত না। অর্থাৎ য়ুয়ানের টাকা যদি এই দুই প্রদেশে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে চাই হয়ত এই কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতেন না। এদিকে কোয়াংটুঙ্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং ভীরু। এই প্রদেশের জেলাগুলি একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। জেলাগুলি সৈন্যগণের কর্তৃত্বেই এইরূপ করিয়াছে। যখন সব ছোট ছোট সেনাপতি বিদ্রোহী হইল, তখন শাসনকর্ত্তা মহাশয় বাধ্য হইয়া প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। চিকিয়াঙ্ প্রদেশের কাণ্ড আরও বিচিত্র। য়ুয়ান্ এখানকার কর্ত্তাকে লিখিলেন—"তুমি য়ুন্-কুই বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।" ইনি জবাব দিলেন—"আমি যদি আমার কেন্দ্র ছাড়িয়া যাই তাহা হইলে এই স্থান রক্ষা করিবে কে? আমার প্রদেশবাসীদের মতলব বুঝিতে পারিতেছি না।" য়ুয়ান্ বলিলেন—"আমি আমার পিকিঙের পল্টন তোমার সাহায্যের জন্য পাঠাইতেছি।" চিকিয়াঙের

কর্ত্তা জবাব দিলেন—"দোহাই আপনার, এমন কার্য্যটি করিবেন না। পিকিঙের পল্টন চিকিয়াঙে আসিলেই চিকিয়াঙ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।" বস্তুতঃ তাহাই হইল—পিকিঙের পল্টন আসিতেছে শুনিবামাত্র লোকজন ক্ষেপিয়া উঠিল। শাসনকর্ত্তা প্রাণভয়ে পিকিঙে জানাইলেন—"আমি স্বাধীন।"

বিদ্রোহ বা বিপ্লব এক এক কেন্দ্রে এক এক কারণে সুরু হইতেছে। কোথাও সেনাপতি বা শাসনকর্ত্তা প্রবর্ত্তক—কোথাও বা পল্টন অথবা জনসাধারণ প্রবর্ত্তক। মোটের উপর হাওয়ায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবের গন্ধ পাইতেছি। কাজেই য়ুয়ান্ নির্ভর করিবেন কাহার উপর? যে সেনাপতিকে চাইয়ের বিরুদ্ধে পাঠান হইল তিনি যে চাইয়েরই অন্তরঙ্গ বন্ধু নন কে বলিতে পারে? চাই য়ুয়ানের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিতেছিলেন। তিনিই আজ বিদ্রোহের চাঁই ও ধুরন্ধর। অন্যান্য যাহারা য়ুয়ানকে এতদিন সাহায্য করিতেছিলেন তাঁহারাই বা য়ুয়ান্‌কে চাইয়ের মতন মজাইবেন কি না কে জানে?

একটা মস্ত মজার খবরও পাওয়া যাইতেছে। ছি-চুয়ানের মাঠে লড়াই চলিতেছে। য়ুয়ানের সেনাপতি চাইকে কাবু করিবার জন্য নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দুই জনের সম্বন্ধ আজকাল পরম শত্রুতায় পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ সরকারী সেনাপতি যখন চাইয়ের উল্লেখ করেন তখন তাঁহাকে "সুং-পো মহোদয়" নামে অভিহিত করেন। "সুং-পো" নামটা সেনাপতি চাইয়ের গৌরবসূচক উচ্চ পদবী স্বরূপ। আমরা "ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা"কে "বিদ্যাসাগর মহাশয়" বলিলে যেরূপ ভাবিয়া থাকি চাইকে সুং-পো মহোদয় বলিলে সেইরূপ ভাব মনে আসে। শত্রু কখনও শত্রুকে এরূপ সম্বোধন করে কি? আবার, য়ুয়ান্ ছি-চুয়ানের শাসনকর্ত্তাকে চাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ

করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা বোধ হয় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত। অথচ এই শাসনকর্ত্তা চাইকে "লাও-তি" অর্থাৎ "কনিষ্ঠ ভ্রাতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। আর চাই-ও শাসনকর্ত্তাকে "লাও-কো" অর্থাৎ "বড়্দা" বলিয়া সম্মান করিতেছেন। শত্রুতে শত্রুতে ভ্রাতৃভাব কোন্ দেশে দেখা যায়? সত্যই চীনে অনেক মজা। এ কি লড়াই না পিরীত? বিপ্লব না রগড়?

(৮) চীনের রামমোহন রায় বা প্রিন্স ইতো কাঙ্ য়ু-ওয়ে

কর্ম্মী চাই এই খেলানার বিপ্লবের গ্যারিবল্ডি। ভাবুক লিয়াঙ্ ইহার ম্যাট্সিনি। চীন-"সংস্কারক" কাঙ্ য়ু-ওয়ে লিয়াঙের গুরু।

কাঙ্ এখনও জীবিত—বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর—শাংহাইয়ের বিদেশী মহাল্লায় বাস। "সংস্কারক" নামে কাঙ্ পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-পণ্ডিত সমাজে পরিচিত। বস্তুতঃ কাঙ্ই চীনের প্রথম বিপ্লব-পন্থী দার্শনিক। চীনা নবতন্ত্রের জন্মদাতারূপে কাঙ্ প্রসিদ্ধ থাকিবেন। কাঙের জীবন-কাহিনীতে যুবক চীনের ইতিহাস পাই।

আজকাল কথায় কথায় চীনে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠে। উপরা-উপরি তিনটা বিপ্লব চোখের সম্মুখে ঘটিয়া গেল। এইগুলির পশ্চাতে কাঙের চিন্তা ও অঙ্গুলি-সঙ্কেত বিরাজ করিতেছে। আর ১৯১১ সালের পূর্ব্বে যে সকল আধা-বিপ্লব বা সংস্কারের আন্দোলন চীনে দেখা দিয়াছে, সেগুলির পশ্চাতেও কাঙ্ ছিলেন। "পুরাতনে চলিবে না—নূতন জীবন চাই"—এ কথা কাঙের পূর্ব্বে চীনে কেহ বলেন নাই। এ কথা তিনি প্রথম প্রচার করেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। নবীন চীন নিতান্তই শিশু। বর্ত্তমান চীনের যে কোন কথা বুঝিতে হইলে এই সন-তারিখটা মনে রাখা আবশ্যক। দুনিয়ার ঠাকুরদাদা চীন বর্ত্তমান জগতে মাত্র ২৩ বৎসর

হইল ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। সেই দেশে কতখানিই বা আশা করা যাইতে পারে?

কাঙ্‌কে একবার চীনের রামমোহন রায় বলিয়াছি। আবার জাপানী প্রিন্স ইতো এবং কাউণ্ট ওকুমার নামও এই সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করিয়াছি। কোথায় এক ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ারের জগদ্বিখ্যাত রাষ্ট্রবীর ইতো, আর কোথায় এক অ-জানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুরু রামমোহন, আর ততোধিক অ-জানা ও মৃতপ্রায় সমাজের সংস্কারপ্রয়াসী কাঙ্! বোধ হয় এই তিন নামের একত্র সমাবেশ যারপরনাই বিসদৃশ ও খাপছাড়া। কিন্তু দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে চাই-লিয়াঙের এই খেলানার বিদ্রোহটার মূল্য ও তাৎপর্য্য কি? ইহা বুঝিতে যাইয়াই ভারত, জাপান ও চীনের নাম তিনটা একসঙ্গে মনে উঠিয়াছে।

চীনের রামমোহন আজও বাঁচিয়া আছেন—বাঙ্গালী রামমোহনের বার্ষিক শ্রাদ্ধই বোধ হয় হইয়া গেল পঁচাশী বার। প্রিন্স ইতো কোরিয়ান স্বদেশসেবকের হাতে মারা না পড়িলে এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন। তাঁহার সহযোগী ও বন্ধু ওকুমা স্থবির কিন্তু এখনও এশিয়ার ফাষ্টক্লাশ পাওয়ারের প্রিমিয়ার বা মন্ত্রী-প্রধান। বাঙ্গালী, জাপানী ও চীনা রামমোহনের বয়স তুলনা করিলেই তিনটা নবীন সমাজ বা জাতির বয়স বুঝিতে পারি। নব্য বঙ্গ জ্যেষ্ঠ, নব্য জাপান মধ্যম, নব্য চীন কনিষ্ঠ। এই ক্রমটাই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িতেছে।

অনেক কথা ভাবিতেছি। ডায়েরিতে দু-একটা লিখিয়া যাই। শুনিতে পাই আমাদের "আর্য্যসমাজের" পাণ্ডারা বিক্রমাদিত্যের কালিদাসকেও নাকি বয়কট করিয়াছেন। অপরাধ—কালিদাস পৌরাণিক! কালিদাস শিবপার্ব্বতীর স্তব লিখিয়াছেন—রাম-রাবণের গল্প লিখিয়াছেন এবং বিষ্ণু-স্তোত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং পৌত্তলিক কালিদাসকে "সত্যার্থ-প্রকাশের"

পাঠকগণের পাতে দেওয়া চলে না! ঊনবিংশ শতাব্দীর নিষ্কর্ম্মা ভারত-বাসী দুনিয়ার কোন বস্তুই "মণিকর্ণিকার ঘাটের" সংশ্রবে না দেখিলে বুঝিতে পারিত না। এই মরা জাতির চিন্তায় স্থান পাইয়াছে মাত্র দুই বস্তু—প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় সমাজ। কাজেই কালিদাসকে যাচাই করিবার সময়ে প্রথম প্রশ্ন করা হয়—"কি হে বাপু, তুমি ঋগবেদের অমুক সূক্ত আওড়াইতে পার কি?" দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়—"তুমি দেশের রাজাকে বর্ণাশ্রমাণাং গুরু রূপে বর্ণনা করিয়াছ না? তাহা হইলে দেখিতেছি তুমি জাতিভেদটা স্বীকার করিয়া লইয়াই কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলে? আচ্ছা, যাহ'ক, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কি মত? দেখিতেছি এ বিষয়ে তুমি মাথা ঘামাও নাই।" সুতরাং কালিদাস ফেল মারিলেন।

রামমোহনকে লইয়াও আমরা এই ধরণের গণ্ডগোলে পড়িয়াছি। দুনিয়ার লোকেরা যে দুই বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটানো এক প্রকার অনাবশ্যক বিবেচনা করে বর্ত্তমান ভারতের মরা-ঘেঁসা নরনারী একমাত্র সেই দুইটা বিষয় লইয়াই মাতামাতি করিয়া থাকে। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী আমরা এইরূপ করিয়াছি—বিংশ শতাব্দীরও কতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিব ভগবান জানেন। কাজেই নবীন এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম চিন্তাবীর বঙ্গে এবং ভারতে তথাকথিত "ধর্ম্ম"-সংস্কারক এবং তথাকথিত "সমাজ"-সংস্কারক নামে পরিচিত হইলেন! দুর্ভাগ্য রামমোহনের। আবার হয় ত এক দিন শুনিব যে রবি বাবুও বাঙ্গালার বাজারে বাজারে ধর্ম্ম-প্রচারক নামে পরিচিত হইতেছেন! কেন না তিনি প্রতিদিন সকালে বোলপুরের পাঠশালায় ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। অসম্ভবও নয়—কারণ বিবেকা-নন্দের ভক্তেরাও ভারতের নীটুশেকে একজন "আচার্য্য" করিয়া ছাড়িয়া-ছেন। জীবন্মৃতজাতির দেশে বিবেকানন্দ কোন "আনন্দ"ও হইতেন না;

অথবা "আচার্য্য"ও হইতেন না—খাঁটি নরেন্দ্রনাথ দত্তই থাকিতেন এবং হয় ত বয়স্কাউট্ বা অন্য কোনো স্বেচ্ছাসেবকগণের ধুরন্ধরভাবে পূজা পাইতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত "মণিকর্ণিকার ঘাট" ছাড়া আর কিছু বুঝে নাই। কামকাঞ্চনকীর্ত্তি-ভোগে বঞ্চিত হইতে হইতে আমরা বৈরাগ্যের চরম-সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই অবস্থায় প্রাচীনকালের জীবন্ত ভারতকেও আমরা দীন, হীন মরা চোখে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। তখনও প্রাচীন ভারতীয় রাজরাজড়াদের নাম ত আবিষ্কৃতই হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দু একজন হিন্দু-সম্রাট্ সম্বন্ধে উড়ু উড়ু সংবাদ রাখিতেন মাত্র। এই কয় জনকেও আমরা ন্যাংটা ফকির বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। মহারাজ অশোক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। মধ্য-এশিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনার, গ্রীস ও মিশর পর্য্যন্ত তিনি স্বচেষ্টায় ভারতের কীর্ত্তি ও প্রভাব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই রাজচক্রবর্ত্তী অশোককেও আমরা প্রায় ন্যাড়া-মাথা লোটাকম্বলধারী ভিক্ষু ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি নাই। একমাত্র অধঃপতিত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন মরা প্রত্ন-ব্যবসায়িগণের দেশেই সেলুকাস-বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা সাজে। আর, এক হাজার বৎসরের বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে কেবলমাত্র খোলকরতালের ধ্বনি, ন্যাড়ানেড়ীর কড়চা এবং শৈবশাক্তের তাণ্ডব আবিষ্কার করাও মরা ভারতেরই কৃতিত্ব। রামমোহনকেও এই ব্যাধিগ্রস্ত চোখেই দেখা হইতেছে। এই যুগের ভারতে চাণক্য-নীতি-শাসিত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সর্ব্বত্র প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী, যথেচ্ছাচারী নরপতি বিবেচিত হইবেন ন্যাড়ার সর্দ্দার। সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত ও আবিষ্কৃত হইল একমাত্র মালা-জপা ও ধ্যানধারণার কর্ম্মূলা। তেজস্বী, শক্তিমন্ত্রের প্রবর্ত্তককে দাঁড় করান হইতেছে চোখবুজা বুদ্ধভাবে। সেই

যুগের ভারতে রামমোহন "ধর্ম্ম"-সংস্কারক ও "সমাজ"-সংস্কারকরূপে পরিচিত হইবেন না কেন? কাজেই প্রিন্স ইতো বা কাউণ্ট ওকুমার নাম এক্ষেত্রে অতি অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবারই কথা।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ এবং বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এশিয়ায় ইয়োরোপ এই প্রথম বসিল। বাঙ্গালীরা এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম পর-বিজিত জাতি। প্রাচ্যের এই জাতিই পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে দেখিয়াছে। এই কারণে এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বঙ্গসমাজে।

সমগ্র ভারত একদিনে ইংরেজের অধীনে আসে নাই—মোটা ভাবে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষকে ইংরেজময় করিতে পূরা এক শতাব্দী লাগিয়াছে। বোম্বাই বা মহারাষ্ট্র ইংরেজের দখলে আসিয়াছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে—এবং পঞ্চনদ বৃটিশ হইয়াছে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশ বৃটিশ,—প্রথম ফরাসীবিপ্লব ও নেপোলিয়ানের পতনের পর মহারাষ্ট্র বৃটিশ, এবং তাহারও ত্রিশ বৎসর পরে পঞ্চনদ বৃটিশ। সেই বৎসর ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব চলিতেছিল। তখনও জাপানে ইয়োরোপের ধাক্কা পৌঁছে নাই। তাহার পাঁচ বৎসর পর জাপানীরা ইয়াঙ্কি জাহাজের কামান প্রথম শুনিতে পায়। তখনও তাহাদের "নবাবী আমল"। তাহার পনর বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় মিকাদো সম্রাটের রাজ্যপ্রাপ্তি (১৮৬৮)। ইতো এবং ওকুমা এতদিনে সবেমাত্র উদীয়মান হইলেন।

বঙ্গদেশ যখন ইংরেজের অধীন হয় তখনও ইয়োরোপে আর এশিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞান হিসাবে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। তখনকার মুরশিদাবাদ লণ্ডন অপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর। মহারাষ্ট্র যখন ইংরেজের অধীন হয় তখন ইয়োরোপে বাষ্পপোত চলিয়াছে, কল ও যন্ত্রের শাসনে শিল্প-

কর্ম্ম চলিতেছে। এই নূতন আবিষ্কারে ইংরেজ অগ্রণী। অধিকন্তু ফরাসীর দর্প চূর্ণ করিয়া ইংরেজ দুনিয়ার একমেবাদ্বিতীয়ং হইয়াছেন।

রামমোহন রায় বৃটিশ-বাঙ্গালার শৈশবে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃটিশ-বোম্বাইয়ের শৈশবও দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের ইয়োরোপ এবং উদীয়মান বাষ্পনিয়ন্ত্রিত সভ্যতার শৈশব দুই-ই রামমোহনের চোখে পড়িয়াছিল। তিনি ১৮৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তখন বিলাতে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রেভলিউশন" বা শিল্প-বিপ্লব বেশ জোরে মাথা তুলিয়াছে।

মধ্যযুগের ইয়োরোপ ভাঙ্গিয়া নবীন ইয়োরোপ গড়া হইতেছিল। রামমোহন তাহা দেখিয়াছিলেন। মধ্যযুগের এশিয়া ভাঙ্গিয়া নবীন এশিয়া গড়িবার আয়োজন হইতেছিল। তাহাও তিনি দেখিলেন। কিন্তু এশিয়ায় নূতন গড়া স্বাধীনভাবে সুরু হয় নাই। ইয়োরোপ বঙ্গে খুঁটা গাড়িয়া নবীন এশিয়া গড়িতে আরম্ভ করে। এশিয়ার এই ভাঙ্গাগড়া কি উপায়ে সাধিত হইবে? কোন্ পথে চালিত হইবে? কোথায় গিয়া ঠেকিবে? তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিবার ভার সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীর উপরই পড়িয়াছিল। কেননা তখন এশিয়ার আর কোন জাতি ইয়োরোপের স্পর্শে আসে নাই—অথবা অধীন হয় নাই—এমন কি নামও শুনে নাই। যে মাথায় এই পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করা হইয়াছিল সেই মাথাটার নাম রামমোহন রায়ের মাথা। দুনিয়ার ইতিহাসে রামমোহনের মূল্য এই।

এশিয়ার ভাঙ্গাগোড়া ইয়োরোপের স্পর্শ ব্যতীত কি সুরু হইতে পারিত না? ইতিহাস বলিতেছে—"না। এশিয়াকে হয় ইয়োরামেরিকার অধীন হইতে হইবে—না হয় শিষ্য হইতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" কারণ কি? "ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এশিয়াবাসী ইয়োরোপীয়ানের সমান ছিল প্রায় সকল বিষয়েই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এশিয়ার লোকেরা ঘুম মারিয়াছিল। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে পুরুষ-

কারের প্রভাবে এবং প্রধানতঃ কয়েকটা দৈব আবিষ্কারের ফলে ইয়োরোপে নবজীবনের বীজ উপ্ত হইতেছিল। সেগুলির সাহায্যে মানব-জীবন শত-গুণ সুখময় হইতে বাধ্য। কাজেই যাহারা সেই রত্ন বা অমৃত আবিষ্কার করে নাই তাহাদিগকে হয় আবিষ্কারকগণের শিষ্যত্ব করিতে হইবে, না হয় দাসত্ব করিতে হইবে।" ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্যের ভজনা করিয়াছে—কিন্তু মনিব ও প্রভুভাবে। জাপানীরা পরে ভজনা করিয়াছে গুরুভাবে—চীনারা সর্ব্ব-পশ্চাৎ ভজনা সুরু করিয়াছে—ইহারাও গুরুভাবে। জাপানের শাগ্‌রেতী সার্থক হইয়াছে, চীনের শাগ্‌রেতী এক্ষণে পরীক্ষা করা হইতেছে। আর দাসজাতির ভজনা পরীক্ষাক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না।

রামমোহন যখন যুবক তখন তাঁহার বিশ্বকোষে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এশিয়ার বিদ্যা সঞ্চিত ছিল। সেই বিদ্যার জোরে ইয়োরোপের উদীয়মান নবীন বিদ্যার খতিয়ান করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কাজেই তাঁহাকে অনুবাদ, অনুকরণ, লেনদেন, ঝাড়াবাছা, ঘসামাজা, বুঝাপড়া, তুলনা সমালোচনা ইত্যাদির আয়োজন করিতে হইল। সেই আয়োজনেই নবীন বঙ্গ ও নবীন ভারতের জন্য সর্ব্বতোমুখী অঙ্গুলিসঙ্কেত রহিয়াছে। তখন নবীন ইয়োরোপের সবে মাত্র জন্ম—কাজেই নবীন ভারতগঠনের উপায় নির্দ্দেশও সদ্যজাত শিশুর অনুরূপ। কিন্তু তাহাতেই ইয়োরোপের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত এশিয়ার নূতন বাণীও খানিকটা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

সেই বাণী বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি প্রিন্স ইতোর জাপানী "কন্‌-ষ্টিটিউশন"-গঠনে। উহা ১৮৮৬ সালের কথা। রামমোহন এই ঘটনার অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বেই মারা গিয়াছেন। এই সময়ে ইয়োরোপীয় নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভরা জোয়ার চলিতেছে—নবীন ফরাসী রিপাব্লিক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৮৭০)—নবীন জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে (১৮৭০)—স্বাধীন ইতালীর জন্ম হইয়াছে (১৮৭০)—ইয়াঙ্কি স্বরাজও

গৃহবিবাদের পর নবজীবন লাভ করিয়াছে (১৮৭০)। রামমোহন নবীন ইয়োরোপের শৈশব মাত্র দেখিয়াছিলেন—ইতো নবীন ইয়োরোপের যৌবন দেখিয়াছেন। এই জন্য জাপানী রামমোহনের চোখে দুনিয়ার যে ছবি পড়িয়াছে, বাঙ্গালী রামমোহনের চোখে সে ছবি পড়িতে পারে নাই। অধিকন্তু, রামমোহন মরা বঙ্গজননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন— কিন্তু ইতোর য়ামাতো-জননী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া নবজীবন অনুভব করিতেছিলেন। এই কারণে রামমোহনের বাণী অস্পষ্ট, অস্ফুট এবং কথঞ্চিৎ অকেজো—কিন্তু ইতোর প্রত্যেক কথা সার্থক, সুব্যক্ত এবং ফলপ্রসূ। রামমোহনে আর ইতোতে অন্য কোন প্রভেদ নাই—উভয়েরই সমস্যা একরূপ—উভয়কেই এশিয়ার ভাঙ্গাগড়া পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যালোচন ও পরিচালন করিতে হইয়াছে। একজন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই কার্য্য করিয়াছেন—আর একজন শেষ পাদে করিয়াছেন। একজন তাঁহার জন্মভূমিতেও সুপরিচিত নন—আর একজনের নামে সমগ্র এশিয়া পরিচিত। জাপানী রামমোহন দিগ্বিজয়ী ; বাঙ্গালী রামমোহনকে কেহ পুছে না।

বাঙ্গালী রামমোহনের অত পরে জাপানী রামমোহনের আবির্ভাব হইল কেন? অর্থাৎ নবীন জাপান নবীন ভারতের অত পরে জন্মিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটা প্রশ্ন করি—নবীন বঙ্গের অত পরে নবীন পঞ্চনদের উৎপত্তি হইল কেন? উভয়ের উত্তর—"দৈবক্রমে। পাঞ্জাবী চরিত্রের গুণে বা দোষে নয়—জাপানী চরিত্রের গুণে বা দোষে নয়—বঙ্গদেশ পৃথিবীর যে চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ঠিক সেই চৌহদ্দির মধ্যে জাপানীরা বাস করিলে জাপানী ইতো নবীন এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম চিন্তাবীর হইতেন—অর্থাৎ জাপানে বৃটিশশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইত।"

ভারতবর্ষের নাকটা প্রকাণ্ড ভারত মহাসাগরে বাহির হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম ভাঙ্গাগড়া সুরু হইয়াছে ভারতবর্ষে—এইজন্যই

ইয়োরোপের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার সর্ব্বপ্রথম ভার পড়িয়াছে ভারতবাসীর ঘাড়ে। স্পেন্‌পর্ত্তুগীজের গৌরবযুগে তুর্কীরা রোমাণ সাম্রাজ্য দখল করিয়া বসে (১৪৫৩ খৃঃ অঃ)। তাহার ফলে ভূমধ্যসাগরের পথে ভারতবর্ষের লেনদেন খৃষ্টান ইয়োরোপের বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ বাহির করিবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইয়োরোপীয় জাহাজগুলি ভাসিতে ভাসিতে যেখানে ডাঙ্গা পাইল সেখানেই প্রথম ঠেকিল। সেই ডাঙ্গা ভারতবর্ষ। আর উজাইয়া যাওয়া বেশী আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। জাপান পর্য্যন্ত কেহ কেহ ঠেলিয়া গিয়াছিল—কিন্তু

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি॥"

এই বুঝিয়া পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ ভারত মহাদেশ লইয়াই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিলেন। সুদূর জাপানে এবং চীনে দু-একটা মাত্র অভিযান প্রেরিত হইত। তাই বলিতেছি—ইয়োরোপ এশিয়াকে প্রথম পাইয়াছিল ভারতবর্ষে দৈবক্রমে। তার পর ঘটনাচক্রে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। এই জন্যই বঙ্গে রামমোহন।

বৃটেনিয়া-দেবীর ভারতে আগমন হইয়াছিল নৌকায়—গজে বা অশ্বপৃষ্ঠে নয়। এইজন্য পঞ্চনদে বৃটিশ-শক্তি সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে ভারতের রামমোহন পাঞ্জাবী নন। ইহা খাঁটি ভৌগোলিক দৈব। আধ্যাত্মিক বা জাতীয়-চরিত্রের বিশেষত্ব-বিশ্লেষণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। না করিলেও চলিতে পারে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপে তুমুল লাঠালাঠি। কোন ইয়োরোপীয় জাতিই সবল ছিল না। তাহাদের বণিকেরা ভয়ে ভয়ে ভারতবর্ষে আসিত। স্বদেশের বাহিরে এতদূরে তাহারা বড় রকমের একটা কিছু ফাঁদিয়া বসিবে আশা করে নাই। সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য

চালানই বিরাট কাণ্ড ছিল—এই কারণে চীন ও জাপানের প্রতি দৃষ্টি দিবার সুযোগ ও শক্তি তাহাদের বেশী ছিল না। এই কারণেই ১৭৫৭ সালের ঘটনা জাপানে ঘটে নাই, চীনেও ঘটিতে পারে নাই। জাপানীরা এবং চীনারা তখন ঠিক ভারতবাসীর মতনই নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছিল। জাপানী জাতি বিশেষ কোন চরিত্রের বলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে এরূপ ভাবা উচিত নয়। পারস্য এবং চীনের স্বাধীনতা রক্ষাও বিশেষ কোন চরিত্রবলের সুফল নয়—ভৌগোলিক-দৈব মাত্র। ভারতবর্ষের নাকটার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়াঙ্কিস্থান সবেমাত্র ঘরকন্না আরম্ভ করিয়াছে—ইংরেজ সবেমাত্র দুনিয়ার সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্র-শক্তি হইয়াছে—ইংরেজজাতি সবেমাত্র ভারতবর্ষের শাসনভার পাইয়াছে। কাজেই ইয়াঙ্কিরা তাহাদের মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমপ্রদেশ ভেদ করিয়া জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে বহুকাল অসমর্থ ছিল। এদিকে ইংরেজও ভারত-শাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য অনেক দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিপ্লব নষ্ট হইবার পর ভারতে বৃটিশশক্তি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। এই কারণে জাপানের দিকে অভিযান ইংরেজের পক্ষেও বহুকাল সম্ভবপর হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই অভিযান সম্ভবপর হইতে পারিত। কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় রাষ্ট্র তখন (১৮৭০ খৃঃ) জগতে দেখা দিল। রুশ, জার্ম্মাণ ও ফরাসী, ইংরেজ ও ইয়াঙ্কি—অন্ততঃ এই পাঁচ শক্তির কর্তৃত্ব এশিয়ায় একসঙ্গে চলিতে থাকিল। অর্থাৎ রাষ্ট্র-মণ্ডলে বখরাদার অনেক জুটিলেন। এইজন্য এই সময়ে জাপান ও চীনের ভাগ-বাটোয়ারা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন (১৭৫৭—১৮১৮) ইংরেজের দখল হয় তখন ফরাসী তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজ তাহার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন—রুশিয়া জার্ম্মাণি

এবং আমেরিকা তখনও জন্মেন নাই। আর যুদ্ধের ফলে ওয়াটার্লুর পরে ফরাসী আধমরা হইয়া রহিলেন। এই কারণে ভারতে একচ্ছত্র বৃটিশ-সাম্রাজ্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে—কিন্তু জাপানে, চীনে ও পারস্যে কোন একচেটিয়া বিদেশী অধিকার টিকে নাই। জাপান ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ধাক্কা খাইবার পর তাড়াতাড়ি ঘর সাম্‌লাইতে অগ্রসর হইল। বিভিন্ন বিদেশীয় রাষ্ট্রগুলি তখন পরস্পর প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ। অনেকে জাপানের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিতেও পারে নাই। এই ফাঁকে জাপান দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সেই ফাঁকে প্রিন্স ইতো এশিয়ার সেরা রাষ্ট্রবীর।

বিদেশীয়েরা পরস্পর প্রতিযোগী। এই জন্যই চীনও এখন পর্য্যন্ত অটুট ও স্বাধীন আছে। কিন্তু ১৮৯৪ এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীনারা জাপানীদের মত প্রবল ধাক্কা খায় নাই। এইজন্য তাড়াতাড়ি ঘর সাম্‌লাইতে চেষ্টিত হয় নাই। ঘর সাম্‌লাইবার চেষ্টা সবে সুরু হইয়াছে। আজ ২৩ বৎসর, বস্তুতঃ মাত্র ১৫ বৎসর সেই চেষ্টার কাজ চলিতেছে। সেই কর্ম্মের উদ্যোক্তা, চীনা রামমোহন বা ইতো, কাঙ্ য়ু-ওয়ে।

জাপান ঘটনাচক্রে আজ ইংলণ্ডের বন্ধু—দুনিয়ায় ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার। এই কারণে যে-কোন জাপানী ফাষ্টক্লাশ লোক। জাপানী রামমোহনও ফাষ্টক্লাশ লোক বটেই। বেচারা চীনের দুর্ভাগ্য যদি আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে চীনা রামমোহনও ইতোর সম্মান পাইবেন। বাঙ্গালীর রামমোহন—নবীন এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম চিন্তাবীর—বঙ্গীয় ইতোর নাম দুনিয়ায় কেহ করিবে না!

চাই-লিয়াঙের বিদ্রোহে এশিয়ায় ভাঙ্গাগড়ার অন্যতম কাণ্ড দেখিতে পাইতেছি। ইহা য়ুয়ানের বিরুদ্ধে একটা দাঙ্গা মাত্র নয়—ইহা পাশ্চাত্য দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রাচ্যের নূতন বাণী-প্রচারের প্রয়াস। চীনে মধ্যযুগের এশিয়া এতদিনে নবীন ইয়োরোপের সাক্ষাৎ পাইল। আজ বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়

দশক। ইহার একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে ভারতে নবীন ইয়োরোপ দেখা দিয়াছে। চীন ভারতের এক শত বৎসর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। জাপানেও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থাই ছিল। জগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বুঝা-পড়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। য়ূন্‌-নান্‌-বিপ্লবের মতন বিপ্লব এশিয়ায় এখনও অনেক হইবে। গোটা এশিয়াকে নবীন করিতে যথেষ্ট সময় আবশ্যক।

(৯) চীনের ও এশিয়ার ভাঙ্গন-গড়ন

রামমোহনের আমলে এশিয়ার ভাঙ্গা-গড়া সুরু হইয়াছে। কাঙের আমলেও সেই ভাঙ্গা-গড়াই চলিতেছে। চাই-লিয়াঙের বিদ্রোহে বঙ্গীয় পলাশী-যুদ্ধেরই তত্ত্ব দেখিতেছি। কর্ম্মক্ষেত্র, আবেষ্টন, ও ফলাফলের কথা স্বতন্ত্র।

চীনারা কি ভাঙ্গিতে চায়? আর, ইহারা গড়িতে চায়ই বা কি? কাঙকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ চীনের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় বর্ষ। এই বৎসর চীন-সম্রাট্‌ একজন দীন ভাবুককে রাজ-দরবারে দেখা করিবার জন্য আহ্বান করেন। সেই ভাবুকের নাম কাঙ। কাঙ্‌ একটা দরখাস্ত সঙ্গে করিয়া চীনেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হন। সেই দরখাস্তটা চীন-"সংস্কারের" মোসাবিদা।

এই মোসাবিদার মধ্যে কয় দফা প্রস্তাব ছিল তাহা আন্দাজ করা কিছু কঠিন নয়। ভারতবাসী কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের আর্জ্জি লিখিতে লিখিতে হাত ভোঁতা করিয়া ফেলিয়াছেন। রাষ্ট্রস-স্ক'রের হুজুগে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, কম-বেশী সবই কাঙের দরখাস্তের মধ্যে ছিল। তবে ভারতবাসী আজ শতাব্দী ও দেড় শতাব্দী ধরিয়া নব্য শাসন-প্রণালীর সংস্রবে আছেন। এই কারণে আমাদের বোলচাল কিছু বেশী লম্বাচওড়া—রাষ্ট্রীয় পারিভাষিক শব্দের মার-প্যাঁচ অনেক রপ্ত করিয়াছি। আর কাঙের দেশে নব্য শাসন-

তত্ত্ব সবেমাত্র লোকের পেটে পড়িয়াছে। তাঁহাদের গলার আওয়াজ এই জন্য হয় ত কিছু নরম। এই জন্য হয় ত ভারতীয় নেতৃবর্গ কাঙের মোসাবিদা পাঠ করিয়া ভাবিতে পারেন—"ইহার নাম সংস্কার? ইহার নাম বিপ্লব? এ যে ছেলেখেলা! ইহার জন্য লাঠালাঠি! ইহার জন্য কাঙ্-লিয়াঙের প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন ও দেশত্যাগ?"

চীনারা মাঞ্চু আমলে লম্বা চুল বা বেণী বা টিকি রাখিত। এই টিকির কোন প্রয়োজন নাই। এ কথাটা ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ইয়াঙ্কি, জাপানী এমন কি ভারতবাসী ত অতি সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু এ কথা কোন চীনা বুঝিতে পারিত কি? কোন এক ব্যক্তি বুঝিলেও জনগণের মধ্যে এ কথা প্রচার করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর ছিল না। তাহা হইলেই দাঙ্গাহাঙ্গামা মারমার কাটকাট লাগিয়া যাইত! সুতরাং কোন সমাজে সংস্কার বা বিপ্লব কাহাকে বলে বাহিরের লোক তাহা বুঝিতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও জাপানীদের সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। সমুদ্র-যাত্রা করিয়া দেশে ফিরিলে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইত। রাষ্ট্রবীর প্রিন্স ইতোও এই পাপের ফল এড়াইতে পারেন নাই—বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। অথচ সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ায় কোনো দোষ থাকিতে পারে ত্তনিয়ার কোন লোককে তাহা বুঝানো অসম্ভব। টিকি-কাটার প্রস্তাব চীনে এক মহা বিপ্লব-সমুদ্র-যাত্রার প্রস্তাব জাপানে এক মহা-বিপ্লব। যাঁহারা এই সকল প্রস্তাব তুলিতে সাহসী হন তাহারা বীর-পদবাচ্য—কারণ তাঁহারা প্রাণ হাতে রাখিয়া এই রব তুলিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা কেহই সক্রেটিশ-গ্যালিলিও অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তি নন। ভারতীয় সমাজে এইরূপ অনেক "বিপ্লব" ঘটিয়া থাকে। সেগুলির কথা শুনিলে চীনারা এবং জাপানীরাও হাসিবে—ইয়াঙ্কি-আমেরিকানদের ত কথাই নাই।

আমাদের দেশী লোকজনের কথা সম্প্রতি ছাড়িয়া দিতেছি। গবর্ণ-

মেণ্টের আইন-কানুন আলোচনা করিলেও বিপ্লব পদ-বাচ্য অনেক কথাই উল্লেখ করা যায়। "ভারতবাসীকে সমর-বিভাবে নিযুক্ত করা আবশ্যক"—ইহা প্রচার করা এক বিরাট বিপ্লব। আর যদি কোন দিন গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের হিসাবে একটা বিপ্লব-সাধন ঘটিয়া যাইবে। অত বড় কথাটা তুলিয়া প্রয়োজন নাই। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষে আজকাল গবর্ণমেণ্টকে জানান হইতেছে যে, বাঙ্গালীর সকল শিক্ষা বঙ্গভাষার সাহায্যে প্রদান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট কি এই প্রস্তাবকে একটা মহা এডুকেশন্যাল রেভলিউশন বা শিক্ষা-বিপ্লব ভাবিতেছেন না? অথচ ইয়াঙ্কি, জার্ম্মাণ, জাপানী ও চীনারা শুনিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে কি? তাহারা ভাবিবে—"ইহার জন্য এই কাণ্ড? একে বলে সংস্কার বা বিপ্লব? ইহার জন্য যুক্তি তর্ক ও মাথা ঘামান?" এক সমাজে যাহা দু দুগুণে চারের মতন সহজ কথা বা হাতের পাঁচ বা স্বতঃসিদ্ধ, অন্য দেশের পক্ষে তাহাই বিষম সমস্যাস্থল, যুক্তি-তর্ক-সাপেক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ। এক জাতি ঘুমের ঘোরেও যাহা করিয়া যায় অপর জাতিকে তাহা করিতে হইলে অনেক লাঠালাঠি রক্তারক্তির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাজেই কাঙের মোসাবিদাটা বুঝিতে হইলে নিজের পরিচিত ঘরোয়া কথা ভুলিয়া পরকীয় আবেষ্টনে প্রবেশ করা আবশ্যক।

প্রিন্স ইতোর যেমন জাপানী আইনে প্রাণদণ্ড ছিল, কাঙেরও সেইরূপ প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে প্রাণদণ্ড নাই। সমুদ্রযাত্রা করিলে হুঁকা-কল্কে বন্ধ হয় মাত্র—ধোপা-নাপিতও বোধ হয় বন্ধ হয়। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু নূতন-কিছু করার ফল সর্ব্বত্রই সমান। আজ ভারতীয় সমাজের ক্ষমতা থাকিলে সমাজ-বিরোধীকে কেবল "একঘরো" মাত্র করা হইত না—প্রাণদণ্ডও দেওয়া হইত। সে দণ্ড দিবার ক্ষমতা আজকাল ভারতে যাঁহাদের আছে তাঁহারা

যথাসময়ে তাহার ব্যবহার করিতে ছাড়েন না। দুনিয়ায় সর্ব্বত্র বিপ্লব মাত্রেরই এক দণ্ড। বিপ্লবের মাত্রা-বিশেষে দণ্ডের উনিশ বিশ করা হয় মাত্র। তবে এক সমাজে যাহা বিপ্লব অন্য সমাজে হয়ত তাহা ছেলেখেলা। কিন্তু গ্রীক্ আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার প্রত্যেক যুগেই বিপ্লব নামক ঘটনা সর্ব্বত্র এক প্রণালীতে শাসন করা হইয়াছে।

সেদিন একজন বলিতেছিলেন—"লিয়াঙ্ বা কাঙের মতন লোক চীনে অনেক আছেন। কিন্তু তাঁহারা কাগজপত্রে লেখা বন্ধ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের প্রভাব নাই। চীনারা পাকা লেখকগণকে খুব খাতির করে। ইহা আমাদের একটা স্বভাব বলিতে পারি। কাঙ্ এবং তাঁহার চেলা উভয়েই পাঁকা লেখক। উভয়েই কাগজে লিখিয়া লিখিয়া সর্ব্বদা লোক-দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছেন। এই জন্য কাঙ্-লিয়াঙের একটা দল আছে বলিতে পারি। কিন্তু অন্য কোন সাহিত্য-সেবীর দল গঠিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা কালে-ভদ্রে লেখেন মাত্র। কু হুঙ্মিঙ, ইয়েন্-ফু ইত্যাদি পণ্ডিতগণ কাঙের সমানই শ্রদ্ধার্হ—ইঁহারা সকলেই প্রায় সমবয়স্ক। অথচ ইয়েন কিম্বা কু চীনা সাধারণ্যে পরিচিতই নন।"

ভাবিতেছি—দুনিয়ার দস্তুরই এই। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে মোকদ্দমায় জয়-পরাজয় তদ্‌বিরের উপর নির্ভর করে। কাছারিতে যাইয়া তদ্‌বির না করিলে ডিগ্রি পাওয়া যায় না। এইরূপ তদ্‌বির সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই আবশ্যক! মফঃস্বলের লেখক বা গ্রন্থকারগণ কলিকাতার বন্ধুগণকে অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন—"আরে ভাই, আমাদের লেখা কি কলিকাতার বাজারে চালাইতে পারি? আমাদের মুরুব্বি কোথায়? তদ্‌বির করে কে?" বই লেখা, বই ছাপানো, বই বাজারে বাহির করা, বই সমালোচনা করান, বই দোকানে রাখা, বই বেচান, বই টেক্‌স্‌ট্‌-বুক কমিটিতে পাঠানো, সবই তদ্‌বির-সাপেক্ষ। এ কথা কেবল বঙ্গদেশের

সাহিত্য-বাজারের কথা নয়—দুনিয়ার সকল বাজারের এই দস্তুর। লংম্যানই প্রকাশক হউন, আর ম্যাক্‌মিলানই প্রকাশক হউন, মস্তবড় বিশ্ববিদ্যালয়ই মুরুব্বি হউন অথবা বিরাট বিজ্ঞানপরিষৎই অভিভাবক হউন, গ্রন্থকার বা বিজ্ঞানবীর বা সাহিত্যরথী মাত্রকেই তদ্‌বিরের চেষ্টায় থাকিতে হয়! তদ্‌বির না করিয়া কেহ কখনও কোন কর্ম্মক্ষেত্রের মাম্‌লায় বিজয়ের বরমাল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়ম এই।

কাঙ্ তদ্‌বিরে বেশ মজবুৎ। তাঁহার চেলাও এইরূপ। দল পুরু করিবার জন্য, পেটোয়ার সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ইঁহারা সর্ব্বদাই ফন্দি আঁটিয়া থাকেন। আমাদের দেশে জনসাধারণের বিশ্বাস—"দল পুরু আপ্‌না-আপ্‌নিই হয়। তোমার পেটে যদি কিছু থাকে তাহার প্রচার একদিন না একদিন হইবেই। তোমার নিজের সেজন্য আদৌ কোন চেষ্টা আবশ্যক নাই। দুনিয়ার লোক ঘাড় পাতিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে।" বস্তুতঃ দুনিয়ায় এরূপ কখনও ঘটে না। এক ব্যক্তি দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন—আর হঠাৎ একদিন তাঁহার জয়জয়কার জগৎ ভরিয়া আরব্ধ হইল—এ সব কথা বালকেরা বিশ্বাস করে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে এই সব কাহিনীকে স্থান দেওয়া উচিত। মত প্রচার, দল গঠন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ ইত্যাদি তদ্‌বির ভিন্ন হয় না। স্বয়ং যীশুখৃষ্টও তাঁহার বাণী হাটে-বাজারে প্রচার করিতে উৎকণ্ঠিত ছিলেন—শাক্যসিংহও বুদ্ধ হইবামাত্র পেটোয়া মহলে উপদেশ প্রচারে লাগিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর একের পিঠে শূন্য দশ, দশের পিঠে শূন্য শ—ইত্যাদি ক্রমে তদ্‌বিরের প্রভাবে তাঁহাদের বক্তব্য জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বাজারে মত ছড়ায় না। যোগিবেশে লছমনঝোলায় আড্ডা গাড়িলে দুনিয়া হইতে উপদেশ প্রচারের ডাক পড়ে না। তথাপি যদি ডাক পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পেটোয়াদের

তদ্বিরের ফলে এই ডাক পড়িয়াছে। জগতে অমুক লোক বিখ্যাত হইয়াছেন—অথচ বিখ্যাত হইবার চেষ্টা করেন নাই—এ কথা একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন আমরাই বিশ্বাস করি। পৃথিবীর কোন লোক এ কথা বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর সকল সমাজেই লোকেরা বিখ্যাত হইতে চেষ্টাও করে—তাহার জন্য সকল কৌশল এবং ফন্দি অবলম্বনও করে—তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। তাঁহাদের মত এই—"বাপু, দুনিয়ায় যশের ক্ষেত্র খোলা রহিয়াছে। আর জানই ত সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে। মাথায় কিছু থাকে, দিয়া যাও—জগতের সকল লোকের কানে পৌঁছাও। এইজন্য হাজার কৌশল ও ফিকির আছে। তুমিও জান, আমিও জানি। তুমিও তোমার ব্যবসা তদ্বির কর—আমিও আমার ব্যবসা তদ্বির করি। বাজারে যাচাই হউক—ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্ কিছুই আবশ্যক নাই।" কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের এ বিষয়ে একটা গোঁজামিল ও জুয়াচুরি চলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে "প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা"—যশের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বথা দমনীয়। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চতম যশের ক্ষেত্র হতভাগ্য দেশে একদম নাই। টাকাটা সিকিটা দোয়ানিটা লইয়া আমাদের যত লোভ। কাজেই যশস্বী হওয়া কাহাকে বলে ভারতবাসী এক প্রকার জানেই না বলিলে চলে! অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবার কথা—যশের অভাবেও আমাদের স্বভাব কম নষ্ট হয় নাই। তাহার ফলে সামান্য মাত্র কীর্ত্তিলাভের কারবার লইয়া চরম রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা। অধিকন্তু সকলেই সলজ্জভাবে বলিতে অভ্যস্ত—"কি করিব—আমি ত চেষ্টা করি নাই। সকলের অনুরোধে বা উপরোধে ঢোঁক গিলিলাম। ইঁহারা, উঁহারা, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খেতাব বা প্রশংসাপত্র বা অভিনন্দন দিতেছেন ইত্যাদি।" অথচ যশের চেষ্টায় কেহ পশ্চাৎপদ নন।

চীনেও অনেকটা এখন পর্য্যন্ত গোঁজামিল দেখা যায়। কিন্তু "ফার্ষ্টক্লাশ" জাপানী সমাজে আর এ সব জুয়াচুরি চক্ষুলজ্জা বা ধড়িবাজি নাই। জাপানীরা এ সব বিষয়ে পাশ্চাত্যদের মতন খোলাখুলি ভাবে চলিয়া থাকে। বই লিখিয়াছে—সুতরাং তাহার বিজ্ঞাপন আবশ্যক—তাহার তদ্বির আবশ্যক। সভাসমিতি বক্তৃতা গল্পবাজি সকল বিষয়েই জাপানীরা ইংরেজ ইয়াঙ্কিদের মতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রশংসা পাইলে কেহ লজ্জা বোধ করে না। প্রশংসিত ও যশস্বী ব্যক্তি মাত্রেই ধন্যবাদের সহিত যেন কর্ত্তব্য-পালনের মূল্য গ্রহণ করে। প্রশংসা এবং যশ বিতরণও করা হয় বহু লোককে। নানা কর্ম্মক্ষেত্রে হাজার হাজার লোক একসঙ্গে প্রশংসিত হয়। ফলতঃ চক্ষুলজ্জার কোন কারণই থাকে না। ইংরেজ, ইয়াঙ্কি জাপানী ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা যথার্থ "নিষ্কামভাবে" প্রশংসা হজম করে। দুর্ভাগ্যপূর্ণ সমাজের লোক এ কথা সহজে বুঝিবে কি? ব্যক্তি মাত্রেই প্রশংসা-যোগ্য এবং ব্যক্তিমাত্রেই কর্ত্তব্যপালনের মূল্যস্বরূপ প্রশংসা গ্রহণে তৎপর—এই দৃশ্য ভারতবর্ষে কবে দেখিব? ভারতবর্ষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের দেশ হইবে যবে! বোধ হয় সে-দিন আসিতে দেরি আছে।

কাঙ্ একজন জবরদস্ত অর্গ্যানাইজার বা দলপতি। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ দরবারে প্রথম আহূত হন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি সাতবার দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। সাতবারই পেশকারেরা রাজদরবার পর্য্যন্ত কাঙের মামলা পৌঁছিতেই দেন নাই। পেশকারগণের ভয় পাছে সম্রাট্ এই সকল কিম্ভূতকিমাকার সংস্কারের প্রস্তাবে ক্ষেপিয়া উঠেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কাঙের বয়স ৩৭ বৎসর। তিনি চারি বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আর্জ্জি দাখিল করেন। চারি বৎসর কালের মধ্যে সাতবার আবেদন করা এবং সাতবারই ফেলমারা যে সে হাড়ে সহ্য হয় না।

চীনা-মুল্লুকে মাঞ্চু আমলে কথা বলে সাধ্য কার? এই অবস্থা এখনও

অনেক ভারতীয় করদ বা ফিউডেটেরি রাষ্ট্রে দেখা যায়। বৃটিশ ভারতের অধিবাসীরা সংবাদপত্রে এই সকল তথাকথিত স্বাধীন রাজন্যবর্গের শাসন তারিফ করিয়া থাকেন। কিন্তু বোধ হয় কেহই ঐ সকল রাষ্ট্রের প্রজা হইতে ইচ্ছা করিবেন না। এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত বৃটিশভারতবাসী-দিগের ভোট লইলে অনেক মজার কথা বাহির হইয়া পড়ে বিশ্বাস করি। বড়য় ছোটয় মিলাইয়া বলিতেছি—বঙ্গে জমিদারী বা নবাবী শাসন যে বস্তু, ভারতে ফিউডেটরি শাসন যে বস্তু, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিলাতী ষ্টুয়ার্ট শাসন যে বস্তু, অথবা ফরাসী চতুর্দ্দশ লুইয়ের শাসন যে বস্তু, চীনে মাঞ্চুশাসন সেই বস্তু। এই কথাটা বুঝিলেই কাঙের অসমসাহসিকতা বুঝা যাইবে। কাঙ্ ফরাসী ভাবুক রুসো অপেক্ষা ছোটদরের লোক নন।

মাঞ্চু-সম্রাট্ কোয়াঙ্-সু কাঙের গুণপণায় মুগ্ধ হইলেন। প্রথম মিলন হইতেই কোয়াঙে কাঙে বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। কোয়াঙ্ তাঁহার ছোট বড় সকল নাজির-উজির ও মন্ত্রীকে ছাড়িয়া এই অজ্ঞাত-কুলশীলের হাতে ধরা দিলেন—কাঙের পাল্লায় পড়িলেন। কাঙ্ যাদু জানেন এ কথা কখনও শুনি নাই। কোয়াঙ্কে কাঙ্ কোন মন্ত্রবলে তুক্‌মুক করিয়া-ছিলেন—এরূপ বিশ্বাসও কোন লোক করে না। অথচ কোয়াঙ্ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"কাঙ্ একজন মানুষের মতন মানুষ। ইঁহার কি গভীর পাণ্ডিত্য! কাঙের আলোচনাশক্তি কি তীক্ষ্ণ—কাঙের মাথাটা কি পরিষ্কার! কাঙের প্রস্তাবগুলি কাজে চালাইতে পারিলে চীন শীঘ্রই বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের একতিয়ার এড়াইতে সমর্থ হইবে। কাঙ্, তুমি আমার গুরু, তুমি সমগ্র চীনের গুরু, চল্লিশকোটি চীনা নরনারীর তুমি উদ্ধারকর্ত্তা।"

চরিত্রবান্ কর্ম্মবীর বা ভাবুকের সংস্পর্শে আসিয়া অনেকেই এইরূপ মজিয়া থাকেন। জগতে এই দৃষ্টান্ত নূতন নয়। যাঁহার পাল্লায় পড়িয়া

লোকেরা মজিতেছে, তিনি স্বয়ং নিজের প্রভাব বুঝিতে অসমর্থ। অথচ তাঁহার আশে-পাশে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই বীরবরের আজ্ঞা পালন করে। এইরূপ বীরপুরুষ ঠিক যেন মেস্‌মারাইজার বা "সাপুড়ে"। জার্ম্মাণ-সাহিত্যবীর গ্যেটের প্রভাব অত্যধিক ছিল। তাঁহার আশেপাশে স্ত্রীপুরুষ যিনিই থাকিতেন তিনিই কাবু হইতেন। ইহা কেবল সাহিত্য-মণ্ডলের প্রভাব নয়। আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয়, বৈষয়িক সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই এইরূপ সাপুড়ে, মেস্‌মারাইজার, ওঝা, গুরু, ওস্তাদ, পীর বা অবতার দেখা যায়। ভারতবাসীও এই ধরণের মনোহরণকারী সাপুড়ে ছোট-বড় অনেক দেখিয়াছেন।

কাঙ্‌ পিকিঙে খাতির জমাইয়া বসিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং রাজদরবারের মধ্যে কাঙের এক দল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কাঙের লোকজন চীন-রাষ্ট্রের কর্ত্তা হইয়া পড়িল। কাঙের ওঝাগিরিতে চীনের ঘাড় হইতে একটা দুইটা করিয়া ভূত নামিতে আরম্ভ করিল। শাসনকর্ম্মের সকল বিভাগেই সংস্কার সুরু হইল। সম্রাট্ তাঁহার সরকারী মন্ত্রীদিগকে ডিঙাইয়া অতি গোপনীয় পরামর্শসমূহ কাঙের সঙ্গে করিতেন। চীনের প্রদেশে প্রদেশে নিভৃত পল্লীতেও নবযুগের ঊষা দেখা দিল। যেন এক মন্ত্রবলে চীনা-এশিয়ায় ভাঙন লাগিয়াছে।

কাঙের ওস্তাদী বুঝি কৃতকার্য্য হয় হয়। কিন্তু চীনে এই সময়ে একটি কালভুজঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই সাপুড়ে পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গা কাঙের ক্ষমতায় কুলাইল না। তিনি ডাওয়েজার (রাজ-জননী) সম্রাজ্ঞী—কোয়াঙের মাতা। কোয়াঙের নূতন নূতন আইন দেখিয়া বুড়ী প্রমাদ গণিলেন। তিনি ভাবিলেন—"এই রে! এইবার বুঝি মাঞ্চুবংশে শনি প্রবেশ করিল। আর মাঞ্চু-ক্ষমতা রক্ষা করা চলে না, দেখিতেছি। মাঞ্চু-কুলাঙ্গারকে কি কুক্ষণে আমি জঠরে ধারণ

করিয়াছিলাম! কোয়াঙের মাথা এত বিগ্‌ড়াইয়া গেল কি করিয়া? ছোকরাটা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অধিকার দিতে প্রবৃত্ত! প্রজারা যদি আস্কারা পায় তাহা হইলে কি আর মাঞ্চুবংশ চীনে তিষ্ঠিতে পারিবে? কোয়াঙ্‌ যে আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিতেছে।"

মায়ে-পুতে বনিল না। কাঙ্‌ কোয়াঙ্‌কে এতই কাবু করিয়াছেন—অথবা কোয়াঙ্‌ নিজেই এত চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৪।৫ খৃষ্টাব্দের জাপানী-সমরে চীনারা পরাজিত হইল। চীনের অধোগতি দেখিয়া বিদেশীয়গণ ভাবিলেন,—"চীন তবে ফোঁপড়া! ও হরি! আমরা এতদিন চীনের বিরাট কলেবর দেখিয়া ভীত হইতেছিলাম? অথচ নাবালক অসভ্য জাপান চীনকে এক ঘা লাগাইয়া দিল। এইবার তবে চীনের ভাগবাটোয়ারার কথাটা খোলাখুলি আলোচনা করা চলিতে পারে।" চীনারা জাপানের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া কোয়াঙের সংস্কার-প্রচেষ্টায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইতে থাকিল। কিন্তু চীনের শনিঠাকরুণ গোঁ ছাড়িলেন না। পিকিঙে দুই দল গড়িয়া উঠিল—বুড়ীর দল আর চ্যাংড়া রাজার দল। এই দুই দলে ঠোকাঠুকি অহরহ চলিতে থাকিল। শেষ পর্য্যন্ত কোয়াঙ্‌ কাঙের পরামর্শে স্থির করিলেন—বুড়ীকে বন্দী করা যাউক। বুড়ীকে আটক না করিলে চীনে ছোকরার দল অবাধে কাজ করিতে পারিবে না। পুত্র মাতার জন্য চুপ্‌চাপ কারাগারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

য়ুয়ান্‌-শি-কাই এই সময়ে পিকিঙে সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাকে কোয়াঙ্‌ এবং কাঙ্‌ উভয়েই দলের লোক বিবেচনা করিতেন। বুড়ীকে নিজ প্রাসাদের মধ্যে অবরুদ্ধ করিবার ভার য়ুয়ানের হাতে দেওয়া হইল। য়ুয়ান্‌ সদলবলে প্রাসাদ আক্রমণ করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু য়ুয়ান্‌ চতুর লোক। এত বড় ষড়যন্ত্রে যোগ দিবার পূর্ব্বে স্বার্থের হিসাবটা

করিতে থাকিলেন। চিলিপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন য়ুয়ানের মুরুব্বি। এই মুরুব্বির তদ্‌বিরেই য়ুয়ানের পদবৃদ্ধি ও ক্রমিক উন্নতি হইয়াছে। এই কারণে য়ুয়ান্ মুরুব্বি মহাশয়কে গোপনে সব কথা বলিয়া দিলেন। অথচ মুরুব্বি নিজে কাঙ্‌-কোয়াঙের বিরুদ্ধপন্থী—তিনি বুড়ীর দলের লোক। শাসনকর্ত্তা মহাশয় তৎক্ষণাৎ বুড়ীকে জানাইলেন—"ভীষণ-চক্রান্ত! "ভবঘুরে" কাঙের কুমন্ত্রণায় সম্রাট্ বাহাদুর আপনাকে বন্দী করিতে উদ্যত। ষড়যন্ত্র আরও কত গভীর কে জানে?" রাজজননী এইবার কাঙের মধুচক্র ভাঙ্গিলেন। কাঙের নামে "হুলিয়া" জারি করা হইল।

কাঙ্ তখন টিন্‌সিন্-নগরে ছিলেন। ইংরেজপাদ্রী টিমথি রিচার্ড কাঙের বিপৎ জানিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। কাঙ্ এক বৃটিশ জাহাজে টিন্‌সিন্ হইতে শাং-হাই আসিলেন। সম্রাজ্ঞীর কর্ম্মচারীরা টিন্‌সিনে উপস্থিত হইয়া দেখে—পাখী উড়িয়া গিয়াছে এই মাত্র। "ধর! ধর!" রব চারিদিকে উঠিল। কাঙ্ তখন শাং-হাইয়ের বন্দরে আসিয়া ঠেকিতেছেন। এমন সময়ে শাং-হাইয়ের বিদেশী মহাল্লার একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্ম্মচারী এক বৃটিশ ষ্টীম লাঞ্চে আসিয়া জাহাজে উঠিলেন। তাঁহার হাতে কাঙের ফটো। কাঙকে দেখিয়াই ইংরেজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কাঙ্?" কাঙ্ অবশ্য উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বুড়ীর দলের লোক না ছোকরা রাজার দলের লোক কাঙ্ হঠাৎ বুঝিবেন কি করিয়া? যাহা হউক, কাঙ্ বলিয়া ফেলিলেন—"হাঁ"। ইংরেজ বলিলেন—"মালপত্র জাহাজেই থাকুক। আপনি আমার ষ্টীমলাঞ্চে আসুন।" কাঙ্ তাহাই করিলেন, ষ্টীমলাঞ্চ অদৃশ্য হইতে না হইতেই আর একখানা ষ্টীমলাঞ্চ আসিয়া জাহাজে ঠেকিল। এই লাঞ্চের লোকেরা আসামী কাঙকে পাকড়াও করিতে আসিয়াছে। কাঙ্ তখন ইংরেজ-বন্ধুর আশ্রয়ে "ফেরার"। কাঙকে বৃটিশ রণতরীতে বসাইয়া ইংরেজ

ফিরিয়া আসিলেন। কাঙ্ বাঁচিয়া গেলেন। সুন্ ইয়াৎ-সেনের জীবনও একবার ইংরেজ-বন্ধুগণের সাহায্যেই রক্ষা পাইয়াছিল।

এই গেল ১৮৯৮ সালের ঘটনা। চীন-সংস্কার ধামা-চাপা হইয়া রহিল। কাঙ্ ও লিয়াঙ্ জাপান-প্রবাসে স্বদেশের উদ্ধার জপিতে থাকিলেন। এক দুই তিন চারি করিয়া নামজাদা ভাবুক চীনারা তাঁহাদের দলে প্রবিষ্ট হইতে থাকিল। তাঁহারা কাগজ বাহির করিলেন—পুস্তিকা ছাপিলেন—বক্তৃতা করিলেন—যেথানে যেথানে চীনাদের আড্ডা সেই সকল স্থানে হুজুগ চাগাইয়া তুলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাঙ্-লিয়াঙ্ মাম্লা তদ্বির করিতে সিদ্ধহস্ত। আর কলমের জোর ত আছেই। অধিকন্তু মাথার মধ্যে কেজো-অকেজো নানাপ্রকার চিন্তা কিল্‌বিল্ না করিলে কি দল পাকাইয়া তোলা যায়? সুতরাং কাঙের কলমের জোরে জাপান-প্রবাসী, আমেরিকা-প্রবাসী, যবদ্বীপ-প্রবাসী, সিঙ্গাপুর-প্রবাসী এবং আনাম-প্রবাসী চীনসন্তানগণ একটা কল্পনা-গঠিত আদর্শ-রাষ্ট্রে বাস করিতে অভ্যস্ত হইল। এই কল্পনা ও ভাবের রাজ্য হইতেই ক্রমশঃ বাস্তব রাজ্য গড়িয়া উঠে। কাঙ্ চীনের রাজদরবারে হারিলেন—কিন্তু চীনা জনগণের হৃদয়ে হৃদয়ে জীবিত রহিলেন। এতদ্ব্যতীত চীনের বাহিরের চীনারা ত কাঙেরই লোক। এই ধরণের "বৃহত্তর চীন" হইতেই চীনের বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

কাঙ্ তাঁহার চেলা সম্রাটের সাহায্যে চীনসংস্কারের আশা ছাড়িলেন না। কিন্তু কাঙের সাঙ্গোপাঙ্গ বলিতে থাকিলেন—"গুরুদেব, আর কেন? মাঞ্চুদিগকে থরচের থাতায় লেখাই যুক্তিসঙ্গত। উহাদের সাহায্যে চীনের উদ্ধারসাধন করা আকাশকুসুম মাত্র। এই বংশের লোপ না করিলে চীনের উন্নতি অসম্ভব।" দেখিতে দেখিতে ১৯০০ সালের "বক্সার" বিপ্লব আসিল। চীনা কুস্তী-সমিতির লাঠিয়ালেরা বিদেশীয়গণের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করিল।

চীনের ইজ্জৎনাশের চূড়ান্ত হইল। কাঙ্ তখনও মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিবার প্রস্তাবে সম্মত নন। কিন্তু কাঙের চেলারা দিন দিন গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঙ্ ক্রমশঃ নরমপন্থী বা মডারেট নামে অবজ্ঞাত হইতে থাকিলেন। কঙের চেলারা চরমপন্থী বা একষ্ট্রীমিষ্ট নাম গ্রহণ করিলেন। কাঙের নাম রহিল "সংস্কারক"—নব্যতন্ত্রের চাঁইয়েরা হইলেন "বিপ্লব-পন্থী"। এই বিপ্লবপন্থীদিগের দলপতির নাম সুন্ ইয়াৎসেন। প্রবাসী চীনসন্তানগণের কল্পনায় সুনের কীর্ত্তি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা হইতে লাগিল—আর কাঙ্ কিছু কিছু হতপ্রভ হইতে থাকিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কাঙের বন্ধু সম্রাট্ কোয়াঙ্ মারা গেলেন। মাঞ্চুবংশে বাতী দিবার জন্য রহিল মাত্র এক দুগ্ধপোষ্য শিশু। তখন হইতে কাঙ্ মাঞ্চুপ্রীতি প্রচার করিবার আর মুখ পাইলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ১৯১১ সালে সুনের দল মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিল। চীন জনসাধারণের প্রবর্ত্তিত "স্বরাজে" পরিণত হইল।

চীন-নায়কগণের মধ্যে সুনের নাম জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চীনারা নিজে সুন্‌কে বিশেষ শ্রদ্ধা করে না। চীনের দেশপূজ্য লোকের নাম কাঙ্ য়ু-ওয়ে।

রাষ্ট্রশাসন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে কাঙের মাথা খেলে। পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায়ও কাঙ্ চীনে নবদর্শন আনিয়াছেন। আদর্শ-সমাজ, আদর্শ-পরিবার, আদর্শ-রাষ্ট্র, আদর্শ-ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা আদর্শ কাঙের "ইউটোপিয়া"য় পাওয়া যায়। আদর্শপ্রচারকগণের অসীম অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দীপনা কাঙ্-চরিত্রে বিরাজ করিতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভবপর হউক বা না হউক, উচ্চতম এবং গভীরতম চিন্তা প্রচার করিতে কাঙ্ পশ্চাৎপদ নন। এই সকল চিন্তা প্রচার করিবার জন্য তিনি যৌবনে বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। কন্‌ফিউশিয়াস,

বুদ্ধ, যীশু, নব্যবিজ্ঞান, রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী—কোন বস্তুই কাঙের বিদ্যালয়ে বাদ পড়িত না। নবীন প্রবীণ বহু ছাত্র কাঙের জুটিয়াছিল। প্রবীণ ছাত্রগণের মধ্যে লিয়াঙ্ সর্ব্বপ্রসিদ্ধ—এবং সর্ব্বদাই গুরুদেবের সহযোগী ও বন্ধু রহিয়াছেন। কাঙ্ একাধারে করিতকর্ম্মা অর্গ্যানাইজার এবং স্বপ্নদ্রষ্টা কল্পনাপরায়ণ ভাবুক। কোয়াংটুঙ্গে বা চীনের বঙ্গদেশে কাঙের জন্ম—ক্যাণ্টন নগর তাঁহার যৌবনের কর্ম্মকেন্দ্র—সি-ধৌত জনপদে তাঁহার প্রথম স্বপ্নপ্রচার। এই আবেষ্টনেই সুনেরও উৎপত্তি এবং বিকাশ। "পক্ষি-জাতীয়" নরনারীর আবাসভূমি বঙ্গদেশে এশিয়ার ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে—চীনা এশিয়ার ভাঙ্গনও এইরূপ জনপদ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইল। যুগে যুগে নব নব জনপদ নব নব জীবনের সূত্রপাত করে।

(১০) চীনা-বিপ্লবের তত্ত্বকথা

ভারতবর্ষ এক নয়—ভারতবর্ষ বহু। "ভারতীয় ঐক্য" একটা মোলায়েম শব্দ মাত্র—আর এই শব্দেরও কোন মূল্য নাই। এই কথাগুলি না বুঝিলে বর্ত্তমান ইয়োরোপের কথা বুঝা যাইবে না। এই কথাগুলি বুঝি না বলিয়াই এতদিন ইয়োরোপের কোন যুগের কোন কথাই বুঝি নাই। আবার ঠিক এই কথাগুলি না বুঝিলে বর্ত্তমান চীনের কথাও বুঝিতে পারিব না। এই কথাগুলি বুঝি নাই বলিয়াই চীনের কোন কথাই এত দিন বুঝি নাই। প্রাচীন ইয়োরোপ কোন দিনই এক ছিল না—চিরকালই অ-নেক। মধ্যযুগের ইয়োরোপও অ-নেক, বর্ত্তমান ইয়োরোপ ত অ-নেকই, আর ভবিষ্যতের ইয়োরোপও অ-নেকই থাকিবে। সেইরূপ প্রাচীন ভারত অ-নেক ছিল, মধ্যযুগের ভারত অ-নেক ছিল, এবং বর্ত্তমান ভারতও অ-নেকই রহিয়াছে। সেইরূপ চীনও সকলযুগেই অ-নেক ছিল—

আজও চীন অ-নেকই আছে। দুনিয়ার ইতিহাসের একমাত্র উপদেশ--বৈচিত্র্য, বহুত্ব, অর্থাৎ অনৈক্য।

১৯১২ সালে সুন্ ইয়াৎ-সেন বিপ্লব সুরু করিয়াছেন। এই বিপ্লবে একসঙ্গে দুইটা আন্দোলন চলিতেছে (১) মাঞ্চু বিদ্বেষের অর্থাৎ বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলন, (২) গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বা স্বরাজ অর্থাৎ রিপাব্লিকের আন্দোলন। দুনিয়ার লোকেরা এই দুইটা আন্দোলনই দেখিতেছে। এই দুইটা আন্দোলন যাঁহারা পছন্দ করেন, তাঁহারা সুন্-পন্থীদিগকে বাহবা দিতেছেন—আর যাঁহারা পছন্দ করেন না তাঁহারা গালি দিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে যে, এই চারি বৎসরের বিপ্লব তিনটা বিদেশী-ধ্বংসের অর্থাৎ "স্বাধীনতার" আন্দোলনও নয়, অথবা "স্বরাজে"র অর্থাৎ রিপাব্লিকের আন্দোলনও নয়। এই দুইটা আন্দোলনই বাজে আবরণ মাত্র। বস্তুতঃ দেখিতেছি অন্তর্ব্বিদ্রোহ আর ঘরোয়া-লড়াই। বুঝা যাইতেছে যে, চীনা-সমাজে প্রবল রাষ্ট্রশক্তির অভাব হইয়াছে—সমগ্র সমাজকে কোন এক শাসনে রাখিবার ক্ষমতা চীনের কোনো কেন্দ্রে নাই। অর্থাৎ চীনে "মাৎস্য-ন্যায়" চলিতেছে। সোজা কথায় ইহার নাম অরাজকতা। "স্বাধীনতা" ও "স্বরাজ" এই দুইটা তত্ত্ব বা শব্দ উপলক্ষ্য মাত্র। তবে এই মাৎস্যন্যায়ের ভিতরেই শাসন-"সংস্কারের" আকাঙ্ক্ষা বেশ দেখা যাইতেছে। এই সংস্কারের আকাঙ্ক্ষাই যুবক চীনের প্রাণ। তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের চীনা-কলেবর হইতে নানা অঙ্গ খসিয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে মধ্যযুগের ইয়োরোপ হইতে নানা অঙ্গ খসিয়া আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। মধ্যযুগের ভারতও বৃটিশ অধীনতায় আধুনিকতা লাভ করিতেছে। এ সব কথা আজ অতি পুরাতন হইতে চলিল। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে মধ্যযুগের রাষ্ট্র-পদ্ধতি

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের চীন বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও মধ্যযুগেই আছেন। তাঁহার আধুনিক-যুগের চলনসই মূর্ত্তি এখনও প্রকটিত হয় নাই। সেই মূর্ত্তি কবে প্রকটিত হইবে বলা কঠিন। অধিকন্তু সেই মূর্ত্তি ভারতীয় প্রণালীতে দেখা দিবে কি ইয়োরোপীয় প্রণালীতে দেখা দিবে তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু দেখিতেছি যে, মধ্যযুগের চীন আর থাকিবে না। একটা হেস্তনেস্ত হইবেই হইবে। চোখের সম্মুখের বিপ্লব-গুলা তাহারই অন্যতম উপায় ও লক্ষণ মাত্র। মাঞ্চু-বিরোধ এবং রিপাব্লিক এই দুইটা তত্ত্ব ভুলিয়া গেলেও বর্ত্তমান চীনের বিপ্লব-তত্ত্ব বুঝিতে কিছু কষ্ট হইবে না।

চীনাদের স্বাধীনতা আমি হিংসা করিতেছি না। চীনাদের স্বরাজ দেখিয়াও আমার চোখ টাটাইতেছে না। চীনাদের পরাধীনতা অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া আমি আনন্দিত এরূপ ভাবিবারও কারণ নাই। এশিয়ার ধাতে স্বরাজ লাগিবে কি না তাহাও আলোচনা করিতেছি না। চীনাদের ভাল মন্দ, সু-কু, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতেছি না—আর প্রাচ্য-জাতিপুঞ্জের ভবিষ্য কোষ্ঠি-গণনায়ও প্রবৃত্ত হই নাই। নিরপেক্ষভাবে ঘটনাগুলি তলাইয়া দেখিতেছি মাত্র।

চীনের বর্ত্তমান বিপ্লবকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলা চলে না। এই ধরণের বিপ্লব বা আন্দোলন চীনে অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। তাহা হইলে সকল গুলিকেই স্বাধীনতার আন্দোলন বলিতে হয়। চীনাদের খাঁটি স্বদেশী রাজবংশের আমলেও অসংখ্য বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল—সেগুলিকেও "স্বাধীনতা" বা বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলন বলিতে হয়!

চীনে দুইবার মাত্র বিদেশী রাজবংশের আধিপত্য হইয়াছে। প্রথম মোগল আমল খৃঃ অঃ ১২৬০ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় মাঞ্চু আমল ১৬৪৪ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত। এই দুই আমলেই বহুবার অন্তর্ব্বিদ্রোহ

দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহের সংখ্যা স্বদেশী আমলের বিদ্রোহ-সংখ্যা হইতে বেশী নয়। বিদেশী আমলে অশান্তি ও অরাজকতা অর্থাৎ মাৎস্যন্যায় ঘটিয়াছে। আবার স্বদেশী আমলেও ঠিক সেইরূপ মাৎস্যন্যায়ই ঘটিয়াছে। স্বদেশী রাজারা বেশী দিনের জন্য কখনও চীনে অখণ্ড সাম্রাজ্য ভোগ করেন নাই। দুই পুরুষের অধিককাল বোধ হয় কোন বংশই সমগ্র চীনের অধীশ্বর ছিলেন না। লাঠালাঠি, রক্তারক্তি প্রত্যেক স্বদেশী বংশের আমলেই অনেকবার হইয়াছে। বিদেশী রাজবংশের আমলে আর নূতন কি ঘটিয়াছে? কিছুই না। মাত্র এই যে, কোন কোন বিদ্রোহের ধুরন্ধর-গণ "বিদেশী-বর্জ্জনে"র পতাকা খাড়া করিয়াছেন। মুখরোচক "স্বদেশী" শব্দে কোন কোন সময়ে বিদ্রোহীর দল পুরু হইয়াছে। মোগল এবং মাঞ্চু-আমলের বিদ্রোহ-সমূহের মধ্যে "স্বদেশী"-"বিদেশী" ফর্ম্মূলা বেশীবার ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিদ্রোহগুলি অন্যান্য আমলের বিদ্রোহেরই অনুরূপ ছিল। সকল আমলেই বিদ্রোহের কারণ এক প্রকার—বিদ্রোহের আকারও একপ্রকার। চীন চিরকালই অ-নেক।

চীনের ইতিহাস বিদ্রোহে ভরা। ইয়োরোপের ইতিহাসও তাই—ভারতের ইতিহাসও তাই। বস্তুতঃ বিদ্রোহই ইতিহাসের একমাত্র তথ্য। অশান্তি, অন্তর্ব্বিপ্লব, ঘরোয়া-লড়াই ইত্যাদি বাদ দিলে ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। এইগুলিই মানুষের জীবন। এই বিষয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্য প্রভেদ নাই। ইয়োরোপের মানুষ চিরকালই মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। এশিয়ার মানুষও ঠিক তাহাই করিয়াছে। এশিয়া ত ইয়োরোপের প্রায় ডবল। কাজেই এশিয়ায় ইয়োরোপের ডবল মাৎস্যন্যায় থাকিবারই কথা। চীন, ভারত ইহারা একাকীই ইয়োরোপের প্রায় সমান। কাজেই ইয়োরোপীয় ইতিহাসে যতবার ঘরোয়া-লড়াই হইয়াছে ভারতের ইতিহাসেও ততবার হইবার কথা। ইহাতে ভারতবাসীর

লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। চীনাদের ইতিহাসেও ঠিক ততবার ঘরোয়া-লড়াই হইবার কথা। চীনাদেরও ইহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। ইয়োরোপ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ছোট-বড়-মাঝারি বিশটা রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এই হিসাবে এশিয়া ছোট-বড়-মাঝারি চল্লিশটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক।

পৃথিবীর কোথাও কোন রাজবংশের ক্ষমতা বেশী দিন থাকে নাই। পৃথিবীর কোথাও কোন সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা বেশীদিন অতিবিস্তৃত থাকে নাই। পৃথিবীর কোন যুগেই শান্তিভোগ মানুষের কপালে ঘটে নাই। সুতরাং চীনা বিদ্রোহগুলির কারণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। দুনিয়ার অন্যান্য স্থানে যে যে কারণে বিদ্রোহ হইয়াছে, চীনেও প্রায় সেই সকল কারণেই বিদ্রোহ হইয়াছে। সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে বিদ্রোহ-বিজ্ঞান লেখা হইয়া যাইবে। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কথা এই যে, দুনিয়ায় শক্তির খেলা চলিতেছে অহরহ। শক্তিতে শক্তিতে যুঝাযুঝিই মানব-জীবনের একমাত্র তথ্য। কাজেই শক্তিকেন্দ্রের উৎপত্তি, গঠন, বিস্তার ও বৃদ্ধি মানবেতিহাসের আসল কথা। "রামচন্দ্রের জন্ম হইবামাত্র রাবণের সিংহাসন টলিয়াছিল। তুমি বড় হইতেছ—কাজেই তুলনায় সংসারের আর দশজন ছোট হইতেছে। তুমি জয়লাভ করিতেছ—কাজেই কতকগুলি লোক তোমার বশে আসিতেছে। তোমার রাজ্য বাড়িতেছে—কাজেই কোন কোন রাজ্য পরাধীন হইতেছে। লাভের অপর পিঠই ক্ষতি, জয়ের অপর পিঠই পরাজয়, সবলের অপর পিঠই দুর্ব্বল, শক্তির অপর পিঠই অ-শক্তি। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের গঠন বা সাম্রাজ্যের পতন, ঘরোয়া-লড়াই, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি ঘটনা শক্তিমানে শক্তিমানে পাঞ্জা-কষাকষি মাত্র। বিশ্বশক্তির আবেষ্টনে ওঠানামা, হ্রাসবৃদ্ধি, চলাচল কোনদিনই রুদ্ধ হইবে না। এইগুলির কোনটাকে বিদ্রোহ, কোনটাকে

বিপ্লব, কোনটাকে সাম্রাজ্যবিস্তার, কোনটাকে রাজ্যনাশ বলা হইয়া থাকে। এই সকল শব্দের মূল্য এক কড়া। সমাজ-বিজ্ঞানের অথবা প্রাণ-বিজ্ঞানের চোখে এ গুলি শক্তিকেন্দ্রের নড়ন-চড়ন মাত্র—অর্থাৎ বাসুকির পার্শ্বপরিবর্ত্তন মাত্র। একমাত্র বসন্তের মলয় মারুৎই জগৎ রক্ষা করে না—কাল-বৈশাখীও প্রকৃতিরই দান। এই জন্যই জগতে শত-লক্ষবার রাষ্ট্রশক্তির নড়ন-চড়ন অর্থাৎ জয়পরাজয়, অর্থাৎ বিদ্রোহবিপ্লব ঘটিয়াছে। চীন জগতেরই এক অংশ—চীনারা সৃষ্টিছাড়া দেবতা বা জানোয়ার নয়। এই জন্য চীনা ইতিহাসে কালবৈশাখীর সংখ্যা বেশ মোটা।

চীনাদের বর্ত্তমান বিপ্লব ঐতিহাসিক হিসাবে বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলন নয়, স্বাধীনতার আন্দোলন নয়—ইহা একটা বিদ্রোহমাত্র। চীনারা স্বদেশী রাজবংশের মধ্যে তাঙ্-বংশ (৬১৮—৯০৫) এবং মিঙ্বংশ (১৩৬৮—১৬২৮) এই দুইবংশের তারিফ করিয়া থাকে। তাঙ্ আমলে চীনা সাম্রাজ্যের বিস্তার সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান আকারের সমান হয়। মিঙ্-বংশের প্রবর্ত্তক একজন নগণ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে পূর্ব্ববর্ত্তী মোগলবংশের উচ্ছেদ সাধন করা হয়। কিন্তু তাঙ্-বংশের আমলে দাঙ্গা হইয়াছে কতবার? তাহার সংখ্যা করা কঠিন। বস্তুতঃ এই বংশের একুশ জন রাজার মধ্যে ষোল জন নামে মাত্র রাজা ছিলেন। এই বংশের রাজত্বকাল প্রায় তিনশত বৎসর। তাহার মধ্যে পুরাপুরি দুইশত বৎসর ধরিয়াই অশান্তি বিরাজ করিয়াছে। মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে, অথবা সেনাপতিতে সেনাপতিতে, অথবা প্রদেশে প্রদেশে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুইশত বৎসরের ঘটনা। অধিকন্তু বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণও বন্ধ ছিল না। চীনেশ্বরগণ আজ মন্ত্রীর অধীনে, কাল সেনাপতির হাঁবে দিনাতিপাত করিয়াছেন। নেপোলিয়ান্-পদবাচ্য সম্রাট্ এই বংশে একাধিক

জন্মেন নাই। কাজেই অখণ্ড চীনের সাম্রাজ্য অল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। তারপর মিঙ্‌বংশের ইতিহাসেও এই দৃশ্যই দেখিতে পাই। প্রবর্ত্তক মহাশয় একজন জবরদস্ত সেনাপতিই ছিলেন। তিনি সত্যসত্যই চীনেশ্বর পদ দাবী করিতেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের বাহুবল বেশী ছিল না। কাজেই তখন "স্বদেশী" আমলেও ঘোরতর অশান্তি বিরাজ করিত। বিদেশী মাঞ্চু ও মোগল আমলের দাঙ্গাগুলিকে স্বদেশী আন্দোলন অথবা স্বাধীনতার আন্দোলন এই জন্যই বলা উচিত নয়। কেন্দ্রশক্তির অভাবে সাম্রাজ্যের যে অবস্থা হইয়া থাকে, এই সকল আন্দোলন তাহারই পরিচয়। অর্থাৎ চীনের অনৈক্যই স্বাভাবিক, ঐক্য নয়।

আর এক কথা। চীনের মোগল আমল কি বিদেশী আমল? মাঞ্চু আমল কি বিদেশী আমল? চীনারা এই দুই আমলে সত্য সত্যই পরাধীন ছিল কি? সমাজতত্ত্বের তরফ হইতে কোন হিসাবেই মোগল ও মাঞ্চু সম্রাট্‌গণকে চীনের বিদেশী বলা চলে না। মোগল ও মাঞ্চুরা যদি বিদেশী হয়, তাহা হইলে চীনের অন্যান্য রাজবংশগুলিও ন্যূনাধিক বিদেশী। কারণ তাতার রক্তের প্রভাব প্রায় সকল বংশেই ছিল। চীনের প্রাচীনতম সভ্যতা বিদেশী—চীনা সভ্যতার পরবর্ত্তী কালেও বিদেশী প্রভাব রহিয়াছে। নব নব জাতির সহিত মিশ্রণ কোন দেশেই বন্ধ করা যায় না। এই হিসাবে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের সভ্যতাই বিদেশী প্রভাবে গঠিত। ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইয়াঙ্কি সকলেই বিদেশী প্রভাবান্বিত। এই হিসাবে ভারতবর্ষ আগাগোড়া বিদেশী প্রভাবে গঠিত। কারণ ভারতবর্ষ মূলতঃ দ্রাবিড় বা অনার্য্যদিগের দেশ। এই দেশে আর্য্য আসিয়াছে—তাতার আসিয়াছে—এবং এই দুই দলের অসংখ্য শাখা আসিয়াছে। এই হিসাবে পৃথিবীতে খাঁটি স্বাধীন দেশ একটাও নাই।

মাঞ্চুবংশকে বিদেশীবংশ বলিতে হইলে বিলাতের হ্যানোভারবংশও

বিদেশীবংশ। সুতরাং বর্ত্তমানযুগের ইংরেজজাতিকে পরাধীন বলিতে হইবে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে ইংরেজের একদল ওলন্দাজ দেশের উইলিয়মকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। উইলিয়াম ইংরেজসমাজের বিদ্রোহীদলকে দমন করিবার পরে ইংলণ্ডেশ্বর হন। কাজেই এক্ষেত্রেও ইংরেজজাতির পরাধীনতা। এই ধরণের পরাধীনতা নাই বা ছিল না কোন জাতির?

মোগল ও মাঞ্চুরা বাহির হইতে আসিয়াছিল। সত্য কথা। কিন্তু তাহারা আর বাহিরে ফিরিয়া যায় নাই। বাহিরের কোন দেশ বা জাতিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার জন্য তাহারা চীন লুটিতে থাকে নাই। তাহারা চীনকেই জন্মভূমি ও পিতৃভূমি বিবেচনা করিত। চীনেই তাহাদের কবর হইত—চীনেই তাহারা উল্লাস আমোদ করিত—চীনকেই তাহারা নানা উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিত। তাহারা চীনাদিগকে অন্য কোন নরনারীর বাঁদীস্বরূপ ব্যবহার করিত না—বরং সকল বিষয়ে সনাতন চীনাধর্ম্ম, সভ্যতা ও আদর্শেরই অনুসরণ করিত। তাহাদের প্রভাবে মোগল আদর্শ বা মাঞ্চু আদর্শ নামক নূতন কোন আদর্শ জগতে ছড়াইয়া পড়ে নাই। তাহারা দুনিয়ায় চীনা-সভ্যতারই গণ্ডী বিস্তার করিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া, লেনদেন, ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষাসাহিত্য, ভাষা ও লিপি সকল বিষয়েই তাহারা লাওট্জে-কন্‌ফিউশিয়াস্‌-বুদ্ধ-শাসিত চীনাদের সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। মোগল-আমলে এবং মাঞ্চু-আমলে চীন-গৌরব তাঙ্‌ বা মিঙ্‌-আমলের চীন-গৌরব অপেক্ষা কম নয়। তাহা হইলে মোগল ও মাঞ্চুদিগকে বিদেশী বলা যায় কি করিয়া?

অধিকন্তু, রাষ্ট্রশাসনেও মোগল এবং মাঞ্চুরা চীনা জনসাধারণের অপ্রীতিকর কার্য্য করিত না। জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল। পরীক্ষা দ্বারা গুণ দেখিয়া লোক বাহাল করা চীনা শাসনপদ্ধতির দস্তুর। এই সনাতন রীতি "বিদেশী" আমলেও

রক্ষিত হইয়াছিল। চীনা সেনাপতি, চীনা মন্ত্রী, চীনা শিক্ষক, চীনা শাসনকর্ত্তা মাঞ্চু আমলে উচ্চতম গৌরবই প্রাপ্ত হইতেন। সোণার তাঙ্-মিঙ্ যুগে চীনাদের সুযোগ বা সুবিধা আর কি বেশী থাকিতে পারে? অবশ্য বিদেশী বংশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে নানা কর্ম্মক্ষেত্রে বিদেশী লোকের সমাগম বাড়িয়া গিয়াছিল। চীনাদের রুটিতে মাঞ্চুরা এবং মোগলেরাও ভাগ বসাইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহারা মাঞ্চু বা মোগল ছিল না—সকল বিষয়েই চীনা হইয়া গিয়াছিল।

মাঞ্চু-আমলে চীনাদের পরাধীনতা বুঝিবার একটা প্রমাণ সকলেই জানেন। উহা মাথার টিকি। চীনারা কোনদিনই এই টিকি পছন্দ করে নাই। কিন্তু এই টিকিকে খাঁটি গোলামীর লক্ষণ বলি কি করিয়া? সম্রাট্‌গণ স্বয়ংই এই টিকি রাখিতেন—মাঞ্চুরা সকলেই টিকি-ভক্ত ছিল। কাজেই গোলামে মনিবে প্রভেদ সাধন টিকি রাখার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। টিকি মাঞ্চুদের একটা "ফ্যাশন"। মাঞ্চুরা এই ফ্যাশন চীনে চালাইতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য চীনারা স্বাধীনভাবে এই ফ্যাশন প্রবর্ত্তন করিতে নারাজ। কাজেই তাহাদিগকে এ বিষয়ে বাধ্য করা পরাধীনতা বুঝাইয়া দেওয়ার সমান। এই টিকির কথা ছাড়িয়া দিলে মাঞ্চু-আমলে অন্য কোনো কারণে চীনাদিগকে পরাধীন বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষের মুসলমান-আমল চীনের মাঞ্চু-আমলেরই অনুরূপ। বরং মাঞ্চু-আমল চীনে বেশী "স্বদেশী"। কারণ ভারতে হিন্দুসমাজে এবং মুসলমান সমাজে বিবাহাদি লেন দেন চলিত না। কিন্তু মাঞ্চু চীনা সমাজে ধর্ম্মগত বা বিবাহগত বা আচারগত বিশেষ প্রভেদ ছিল না। ভারতবর্ষে মুসলমান আমলে হিন্দু সেনাপতি আফগানিস্থান দখল করিতে প্রেরিত হইতেন। হিন্দু মন্ত্রীর অধীনে রাজকোষ থাকিত। হিন্দু ও পাঠান একত্র হইয়া হিন্দু ও মোগলের বিরুদ্ধে লড়িত। ঐ লড়াই ধর্ম্মগত বা সমাজগত

ছিল না—প্রদেশগত ছিল। পাঠান-বিদ্রোহীকে কাবু করিবার জন্য মোগল-সম্রাট্ হিন্দু-জায়গীরদারকে সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন। আবার মোগল-সেনাপতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যও হিন্দু সেনাপতি নিযুক্ত হইত। বাদ্‌শাহের পুত্রগণ বিদ্রোহী হইলেও হিন্দু যোদ্ধাদের ডাক পড়িত। এই কথা বুঝিতে পারিলে চীনের মাঞ্চু-আমল বুঝা যাইবে। মাঞ্চু-আমলে অনেক বিদ্রোহ হইয়াছে—সেই সকল বিদ্রোহ-দমনের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন কাহারা ? চীনারা। বস্তুতঃ চীনা-মাঞ্চু বিরোধ ছিল না বলিলেই চলে। তবে সর্ব্বপ্রথম যখন নূতন বংশ স্থাপিত হয় তখন লোকের মনে বিদেশী-বিদ্বেষ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বিচক্ষণ নরপতিগণ অল্পকালের মধ্যেই চীনে খাঁটি স্বদেশী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ মুসলমান-আমলে পরাধীন ছিল না—চীনও মাঞ্চু-আমলে পরাধীন ছিল না। পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল সত্য—কিন্তু তাহা কখনই বংশগত হইয়া পড়ে নাই। উহা ব্যক্তিগত খামখেয়ালি মাত্র ছিল। এই ধরণের ধর্ম্ম-নির্য্যাতন এবং জাতি-নিপীড়ন ইয়োরোপীয় ইতিহাসে প্রচুর দেখা যায়। সকল কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে জনগণের যতখানি রাষ্ট্র-স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম-স্বাধীনতা ছিল, চীনেও ঠিক ততখানি রাষ্ট্র-স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম-স্বাধীনতা ছিল, ভারতেও ঠিক ততখানি রাষ্ট্র-স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম-স্বাধীনতা ছিল। এই যুগের ইয়োরোপে আজকালকার স্বরাজ, "জনসাধারণের অধিকার" প্রজাতন্ত্র-শাসন, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা, "ন্যাশন্যালিটি" স্বাদেশিকতা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি কিছুই ছিল না। কোন দেশেরই চতুঃসীমা দেখিয়া ধর্ম্ম, জাতি, ভাষা, আদর্শ বা সভ্যতার চতুঃসীমা বুঝা যাইত না। সেই যুগের রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে মাঞ্চু চীন এবং মুসলমান-

ভারত কোন অংশে নিন্দনীয় ছিল না—বরং কোনো কোনো বিষয়ে হয়ত উন্নতই ছিল।

মাঞ্চু-চীন পরাধীন চীন নয়। মাঞ্চুরা সকল বিষয়েই চীনের খাঁটি স্বদেশী। তবে রাজবংশের শক্তি প্রবল থাকা না থাকা স্বতন্ত্র কথা। তাঙ্-বংশের শক্তিও বেশী দিন ছিল না, মিঙ্-বংশের শক্তিও বেশী দিন ছিল না। সেইরূপ মাঞ্চুবংশের শক্তিও বেশী দিন থাকে নাই। সুতরাং মাঞ্চু-আমলের চীনা-দুর্দ্দৈবগুলি বিদেশী-বংশের ঘাড়ে ফেলা উচিত নয়। তাঙ-মিঙ্-যুগেও চীনে নানা দুর্দ্দৈব, নানা দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। মাঞ্চু-আমলেও এইরূপই ঘটিয়াছে। চীনের কোন দুর্দ্দশার জন্য মাঞ্চুদিগকে দায়ী করিলে অন্যান্য দুর্দ্দশার জন্য মিঙ্ ও তাঙ্দিগকে দায়ী করিতে হইবে। "যত দোষ নন্দঘোষ"—এই সূত্র ইতিহাসে খাটিবে না।

মুসলমান-আমলে ভারত-গৌরব মুসলমানধর্ম্মী আমীর-ওমরা ও বাদশাহ সেনাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ মাঞ্চু-আমলে চীন-গৌরব মাঞ্চু-জাতীয় আমীর-ওমরা ও বাদশাহ সেনাপতি জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের নাম চীনা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দুর্ব্বল এবং চরিত্রহীন লোক সকল জাতিতেই দেখা দেয়—মাঞ্চুসমাজেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য সমগ্র মাঞ্চুসমাজকে চীনাদের সর্ব্বনাশের মূল বলা যায় না। অবশ্য সুন্-পন্থীরা মাঞ্চুদিগকে একদম নরপিশাচরূপেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। আন্দোলন চালাইবার জন্য এরূপ বর্ণনা স্বাভাবিক বুঝিতে পারি। কিন্তু বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

সোণার মিঙ্বংশও কালে অধঃপাতে আসিয়াছিল। কেন্দ্রশক্তির দুর্ব্বলতায় চীন বহু খণ্ড-চীনে পরিণত হইয়াছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত চীনাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। এই অবস্থায় একদিন কোন চীনা-সেনাপতি মাঞ্চু-নরপতিকে চীনের সিংহাসন দখল করিবার জন্য আহ্বান

করেন। মাঞ্চু-নরপতি পিকিঙ্ দখল করিয়া চীনেশ্বর হন। খাঁটি চীনা-ধরণে প্রথম মাঞ্চুসম্রাট্ ঘোষণা করিলেন—"হে আকাশ, হে পৃথিবী, 'বিশ্বপুত্র' আমি আপনাদের নিকট আমার রাজ্যাভিষেক জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পিতামহ চীনের পূর্ব্বাঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকৃতী বংশধর আমি সেই রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁহার ন্যায় আমিও ভগবৎ-ভৃত্য মাত্র। চীনের মিঙ্-সম্রাট্গণ সকল বিষয়ে অবনত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে চীনারা নানা বিদ্রোহ সুরু করিয়াছিল। চীনা-জনসাধারণ এই সকল বিদ্রোহে যারপরনাই বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। চীনে অরাজকতা দাঁড়াইয়া যায়। এই কারণে আমি আমার বংশগৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া চীন-নিপীড়ন-কারীদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছি। আমার ক্ষমতায় চীনের জনসাধারণ শান্তিলাভ করিয়াছে। তাহার পর সকলের ইচ্ছানুসারে আমি পিকিঙে আমার সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। আমি সিংহাসনেও উপবিষ্ট হইলাম। হে পৃথিবী, হে আকাশ, আপনারা আমার দেশের দুর্দ্দৈব-নিবারণে আমাকে সাহায্য করুন।"

মাঞ্চু-নরপতি প্রথম হইতেই চীনকে "আমার দেশ" বলিয়া সিংহাসনে বসিলেন। অধিকন্তু তিনি চীনাদের উদ্ধারকর্ত্তা বা পতিতপাবন স্বরূপ নিজের পরিচয় দিলেন। মিঙ্‌বংশ যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখনও প্রবর্ত্তক মহাশয় চীনের উদ্ধারকর্ত্তা স্বরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বিদেশী মোগলবংশের ধ্বংস-সাধন করেন। অথচ তাঁহার বংশধরগণই কালে বিদেশী মাঞ্চুকর্ত্তৃক চীনের নিপীড়নকারীরূপে বিবৃত হইলেন। আসল কথা "স্বদেশী" "বিদেশী" শব্দ চীনা ইতিহাসে প্রযোজ্য নয়। যাঁহারই বাহুবল ছিল তাঁহাকেই চীনে "উদ্ধারকর্ত্তা", "পতিতপাবন", "যুগাবতার" বা স্বদেশসেবক বলা যুক্তিসঙ্গত। চীন কোনদিনই সত্যভাবে পরাধীন

ছিল না—শক্তিশালী সম্রাটের আমলে চীনারা অখণ্ড সাম্রাজ্যের প্রজা—দুর্ব্বল সম্রাটের আমলে চীনে মাৎস্যন্যায়। অতএব চীনের বর্ত্তমান আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলন বলা অনুচিত।

(১১) সুন্ ইয়াৎ-সেনের ইস্তাহার

একদিন হ্যান্-বংশ ধ্বংস হইয়াছিল—একদিন তাঙ্-বংশ ধ্বংস হইয়াছিল—একদিন মিঙ্-বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। আজ মাঞ্চুবংশ ধ্বংস হইল।

মিঙের সিংহাসনে বসিবার সময় মাঞ্চু-সম্রাট নিজকে চীনের উদ্ধারকর্ত্তা-রূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। মাঞ্চুবংশের ধ্বংসকারীরাও নিজেদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। সভাপতি হইবামাত্র বিপ্লবপন্থীদিগের পক্ষ হইতে সুন্ ইয়াৎ-সেন দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে এক ইস্তাহার পাঠাইলেন। ইহা বিপ্লবের ফার্ম্মাণ বা জবাবদিহি। এই ধরণের কৈফিয়ৎ দেওয়া বিপ্লব-প্রবর্ত্তকগণের দস্তুর। ইয়াঙ্কিরাও এইরূপ করিয়াছিল—ফরাসীরাও এইরূপ করিয়াছিল। ইংরেজেরাও দ্বিতীয় জেম্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার সময়ে এইরূপ লম্বা ইস্তাহার জারি করিয়াছিল। চীনারাও এইরূপ করিল। ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় যত মুল্লুকে বিপ্লব হইবে সকল স্থানেই এইরূপ বিপ্লবের কৈফিয়ৎ প্রচার করা দস্তুর থাকিবে।

এই সকল ইস্তাহারের মোসাবিদা মোটের উপর এক প্রকার। ফর্ম্মূলাটা সংক্ষেপে দিতেছি—"ভোঃ ভোঃ দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্রপতিগণ, শৃণ্বন্তু সর্ব্বে। আমরা জগতে এক নূতন শক্তি আবির্ভূত হইলাম। আমাদিগকে মালাচন্দন প্রদান করিয়া আপনাদের সভায় স্থান দিন। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা অথবা শাসনকর্ত্তারা বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। আমাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ তাঁহারাই। এইজন্য

আমরা তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছি। আমাদের আমলে জনগণের সকল প্রকার উন্নতি সাধিত হইবে। আমরা বিশ্বমানবের বিরাট দেউলে বাতি জ্বালিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিলাম। আমরা আপনাদের দশ ঘরের একঘর হইয়া থাকিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।" এই সকল ফার্ম্মাণের মূল্য কিছুই নয়। ফার্ম্মাণ-লেখকগণ পুরাণা আমলের দোষ দেখাইতে বাধ্য। কিন্তু সেগুলি দুনিয়ার লোকে স্বীকার করিতে বাধ্য নয়। আবার ফার্ম্মাণ-লেখকেরা ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রতিজ্ঞা করিতে ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার ওজন দুনিয়ায় যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিবেন।

ফার্ম্মাণের জোরে বিপ্লব টিকানো যায় না। ফার্ম্মাণের পশ্চাতে বাহুবল, ধনবল, বিদ্যাবল এবং চরিত্রবল থাকিলেই বিপ্লব টিকিতে পারে। দুনিয়ার লোকে বিপ্লবের ইস্তাহার একবার মাত্র পাঠ করিবে—কিন্তু বিপ্লব-পন্থীদিগের শক্তি আছে কি না তাহাই চব্বিশঘণ্টা বিশ্ববাসীর পরীক্ষা-বস্তু থাকিবে। বিপ্লব-পন্থীরা যদি শক্তিমান্ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দুনিয়ার রাষ্ট্র-মণ্ডলে আসন দিতেই হইবে। তখন পুরাতন আমলের চূড়ান্ত গুণ থাকিলেও তাহার উকীল কেহ জুটিবে না। আবার বিপ্লব-পন্থীরা ভবিষ্যতে অত্যাচারী এবং কুলাঙ্গার হইলেও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে সকলেই ইতস্ততঃ করিবেন। বিপ্লবের ইস্তাহারের কোন মূল্য নাই—ইহা কতকগুলি বাক্য মাত্র। বাক্যগুলি সত্য হউক মিথ্যা হউক—তাহাতে আসে যায় না। বিপ্লব-প্রবর্ত্তকগণের শক্তি থাকিলেই হইল। মানুষ শক্তি-পূজার পুরোহিত—কথা-কাটাকাটির ধার ধারে না।

ফরাসী-বিপ্লবের ইস্তাহার ছিল "ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি" প্রচারিত "রাইট্‌স্ অব্-ম্যান্" বা মানবের অধিকার (২৬ আগষ্ট ১৭৮৯) নয়--অথবা শাসন-"সংস্কারের" খসড়া মোসাবিদা (সেপ্টেম্বার ১৭৯১) ও নয়। ফরাসীরা লেখাপড়ায় খুব মজবুত—সরস ফার্ম্মাণ জারি করা তাহাদের পক্ষে অতি

সহজ কথা। এইরূপ ফার্ম্মাণ তাহারা অনেক জারি করিয়াছিলও। কিন্তু তাহাদের যথার্থ কৈফিয়ৎ বা ফার্ম্মাণ বা ইস্তাহার ছিল নেপোলিয়ান্। এক হাতে "মানবের অধিকার" এবং অপর হাতে নূতন শাসন-প্রণালীর খসড়া লইয়া তাহারা দেশের রাজাকে হত্যা করিল। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র-পুঞ্জের নরপতিরা এই কাণ্ডে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন ফরাসীদের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সমগ্র ইয়োরোপ ব্রতবদ্ধ হইয়া ফরাসী-বিপ্লব দলন করিতে থাকিলেন। ফরাসীরা কি তখন ইস্তাহারের দোহাই দিয়াছিল? তাহারা বলিল "কুছপরোয়া নাই—আমরা ইয়োরোপের সমগ্র রাজমণ্ডলীকে 'কলা দেখাইতেছি'। আমাদের নেপোলিয়ান্ আছে।" নেপোলিয়ান্ ফরাসীজাতির হৃদয়-কমলে বসিলেন। ভল্টেয়ার রুসোর বক্তৃতা এবং দাঁতো-রোব্‌স্‌পিয়ারের স্বরাজ-পদ্ধতি নেপোলিয়ানে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। নেপোলিয়ান সমগ্র ফ্রান্সের অবতার হইলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ এই শক্তি-সাধকের জীবনরূপে দেখা দিল। নেপোলিয়ানের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আড়াই কোটি ফরাসী ত্রিশকোটি ফরাসীর বল ও উদ্দীপনা লাভ করিল। নেপোলিয়ান্ দুনিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনপূর্ব্বক পাঁয়তারা সুরু করিলেন। যদি কাহারও শক্তি থাকে এই বীরবরের গতিরোধ করুক! যদি কাহারও শক্তি থাকে ফ্রান্সের পুরাতন রাজবংশের উকীলী করুক। যদি কাহারও শক্তি থাকে ফরাসী জনসাধারণের অতিবৃদ্ধি ধূলিসাৎ করুক! ফরাসী জন-সাধারণ তাহাদের এই সেবকপ্রবর কর্ম্মবীরকেই তাহাদের একমাত্র কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়াছিল। ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত তাহাদের আর কোন কৈফিয়ৎ আবশ্যক হয় নাই। দৈবদুর্ব্বিপাকে ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের পতন হইল। জলবৃষ্টির দৌরাত্ম্যে মাঠ ভিজিয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়ান কামান দাগিবার সুযোগ পান নাই। যাহা হউক নেপোলিয়ান বন্দী হইলেন। ফরাসী-বিপ্লব ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

নেপোলিয়ানের সমান আর একজন লোক ফ্রান্সে ছিল না। কাজেই বিপ্লবের ইস্তাহার আর জারি হইল না। কাগজে-লেখা ইস্তাহারগুলি তখন পোড়াইয়া ফেলাই আবশ্যক হইল।

সুন্ ইয়াৎ-সেন এক কাগজে-লেখা ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি সুন্ নান্-কিঙে্ স্বরাজপক্ষীয়গণের অস্থায়ী দরবার স্থাপন করেন। ৫ই জানুয়ারি স্বরাজতন্ত্রের কৈফিয়াৎ প্রচারিত হয়। নিম্নে এইটা দেওয়া যাইতেছে :—

"জগতের সহৃদয় জাতিপুঞ্জ, শুভমস্তু। চীনাদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত চরিত্র এতদিন কঠোরভাবে নিষ্পেষিত হইতেছিল। এই কারণে আমাদের নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি স্থগিত ছিল। এই দুরবস্থার মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য বিপ্লবের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি। এই বিপ্লবে মাঞ্চুদিগের যথেচ্ছশাসন বহিষ্কৃত হইল এবং স্বরাজ বা গণতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। আমরা সাময়িক উন্মাদনায় মাতিয়া রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতেছি না। বহুকালের আকাঙ্ক্ষা আজিকার ঘটনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

"চীনের প্রকৃতিপুঞ্জ অতি শান্তিপ্রিয় এবং নিয়মনিষ্ঠ। আমরা কোন দিনই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করি নাই। আমরা ২৬৭ বৎসর কাল আমাদের দুঃখ যারপরনাই সহিষ্ণুতার সহিত চাপিয়া রাখিয়াছি। নানাবিধ শান্তিসুলভ প্রণালীতে আমরা আমাদের অভাব অভিযোগ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিনা রক্তপাতে চীনা জনসাধারণের অধিকার বৃদ্ধি এবং সুখ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস এতদিন বিফল হইয়াছে। কষ্ট ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় আমরা আমাদের বিধিদত্ত মানবাধিকার পাইবার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অত্যাচারপূর্ণ শাসনের একতিয়ার

হইতে মুক্তিলাভ করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছি। এই প্রথম এক দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার উদ্দীপনা লাভ করিলাম।

"মাঞ্চুরা আগাগোড়া চীনাজাতিকে দুনিয়া হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। আর, যথেচ্ছ-শাসনপ্রণালী ছাড়া অন্য কোন প্রণালী তাহাদের জানা ছিল না। এই শাসনে আমাদের যাতনার সীমা দেখিতে পাইতাম না। এক্ষণে আমরা বিশ্বের স্বাধীন জাতিপুঞ্জের নিকট আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতেছি। আমাদের বিপ্লবের কারণ আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

"মাঞ্চুরা চীন অধিকার করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের সঙ্গে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অনেকপ্রকার আদানপ্রদান হইত। ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র কোন দিনই গোঁড়ামি করিতেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মার্কোপোলোর রচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তীকালে নেষ্টরপন্থী খৃষ্টানেরা চীনে ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ পাইতেন। অষ্টম শতাব্দীর এক প্রস্তরফলক সিয়ান্-ফু নগরে আজও দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে সেই অবাধ ধর্ম্মপ্রচারের পরিচয় পাই। কিন্তু মাঞ্চুরা মূর্খতা এবং স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া চীনের সঙ্গে বিশ্ববাসীর সংযোগ বন্ধ করিয়া দিলেন। চীনারা তাহার ফলে কূপ-মণ্ডূক হইয়া পড়িল। তাহাদের বুদ্ধি কমিতে থাকিল। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশেও মাঞ্চুনীতি কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল। এই পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

"চীনাজাতিকে চিরগোলাম রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঞ্চুরা কু-শাসনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে নানাবিধ অসঙ্গত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যথা মৌরুশি পাট্টা, একচেটিয়া অধিকার, ইত্যাদি। কিম্ভূত-কিমাকার রীতিনীতি, সৌজন্য শিষ্টাচার ও আদব কায়দা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জনগণের সম্মতি গ্রহণ না করিয়াই মাঞ্চুসম্রাট্‌গণ অবৈধ এবং অনিষ্টজনক

খাজনা আদায় করিয়াছেন। কয়েকটামাত্র বন্দর খোলা রাখিয়া তাঁহারা আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য দাবিতে চেষ্টিত রহিয়াছেন। নানা দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা মাল আমদানি রপ্তানির পথ সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন—দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য বিকাশেও বাধা দিয়াছেন। দেশের প্রাকৃতিক সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা তাঁহাদের আদৌ ছিল না। বরং এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিকূলতাই ছিল। সুবিচারের এবং পক্ষপাতহীন বিচারের আয়োজন করা হয় নাই। দোষ সাব্যস্থ হইবার পূর্ব্বেই আসামী ও কয়েদিগণকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

"রাজকর্ম্মচারিগণ ঘুশখোর। ইহা জানিয়াও সম্রাট্গণ সংস্কারের ব্যবস্থা করেন নাই। বরং ঘুশ খাইয়া চরিত্রহীন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেই তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন। গুণ অনুসারে লোক-বাছাই মাঞ্চু-আমলে হইতে পারে নাই। মুরুব্বির জোরে লোকেরা রাষ্ট্র-দরবারে পদলাভ করিয়াছে। উন্নত-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের কোন আন্দোলনকেই ইঁহারা সুনজরে দেখেন নাই। আমাদের চরিত্রবান্ সংস্কারকগণের হাড়ভাঙ্গা অধ্যবসায়ের ফলে আমরা কয়েকটা তথাকথিত সংস্কারের আশা পাইয়াছি মাত্র। কিন্তু সম্রাট্গণ এই সকল আশা প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত—তাঁহারা আশাপূরণ করিতে চেষ্টিত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

"বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ তাঁহাদিগকে এতবার 'পাঁচ জুতা' লাগাইয়াছেন; তথাপি মাঞ্চু-সম্রাট্গণের আক্কেল হইল না। এখনও তাঁহাদের হুঁস নাই। অথচ পরকীয় লাঞ্ছনাভোগ করিতে করিতে চীনারা আজ দুনিয়ার সর্ব্বনিম্ন-আসনে পতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজ আমাদের রাজবংশ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ উভয়েই বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাত্র। এই সকল দুরবস্থার প্রতীকার হইলে আমরা আবার দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারিব। তখন আমরা জাতিতে উঠিব। আমরা লড়িয়াছি এবং নূতন

শাসনপ্রণালীও প্রবর্ত্তন করিয়াছি। আমাদিগের কার্য্যসম্বন্ধে আপনারা ভুল বুঝিবেন না। পাছে আপনারা স্বরাজ-প্রবর্ত্তক বিপ্লব-পন্থীদিগের বিরুদ্ধে অন্যায় মত পোষণ করেন, এইজন্য আমরা খোলাখুলি আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি।

"মাঞ্চু-সরকার আপনাদের সঙ্গে যে সকল সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছেন, আমরা সেগুলি সম্মান করিয়া চলিব। কিন্তু আমরা বিপ্লব সুরু করিবার পর মাঞ্চুরা যদি গোপনে কোন সন্ধি করেন, তাহার জন্য চীন-স্বরাজ দায়ী থাকিবেন না।

মাঞ্চুসরকার আপনাদের নিকট যত টাকা ধারেন, আমরা সেই সকল টাকা চীন-স্বরাজেরই ঋণ বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বিপ্লব সুরু হইবার পর মাঞ্চু-সম্রাট্‌গণ আপনাদের টাকা ধার লইলে তাহার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

মাঞ্চু-সরকার এতদিন আপনাদিগকে চীনের নানা নগরে "কন্‌সেশন" মহাল্লা দান করিয়াছেন। এই সকল মহাল্লায় আপনাদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি সুরক্ষিত করিবার বিশিষ্ট বিধি আছে। সেই সকল কন্‌সেশন এবং বিধিব্যবস্থা চীনস্বরাজও সম্মান করিয়া চলিবেন।

আমরা আমাদের দেশকে সকল উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টিত থাকিব। মাঞ্চুদিগকে আমরা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব না। তাঁহারা অশান্তি সৃষ্টি না করিলে চীনাদের সমান সকল প্রকার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে।

আমরা আমাদের আইন-কানুনগুলির সংস্কার করিব। রাজস্ব-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করা হইবে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্ম-বিষয়ে আমরা নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন করিব। বিদেশীয় রাষ্ট্র ও জনগণের সঙ্গে হৃদ্যতা বর্দ্ধন করা

আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। আমরা এক্ষণে নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আশা করি, আমাদের এই নবীন প্রয়াসের সময়ে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের বন্ধুত্ব করিবেন। তাঁহারা এতদিন চীনা জাতিকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ আমরা জাগিয়া কাজে নামিয়াছি। অতএব নিবেদন আপনারা আমাদের সহায় হউন।

আপনারা আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। চীন স্বরাজ বিশ্বের রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রবেশলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। আমরা এই লোভনীয় বরেণ্য পদ পাইয়াই কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইব না। মানব জাতির উন্নতি-বিধানে এবং মানব সভ্যতার চরম-পরিণতি-বিকাশে সাহায্য করিবার জন্যই আমরা আপনাদের সঙ্গে মিলিতে চাহি।

ইতি সুন্ ইয়াৎ-সেন

প্রেসিডেন্ট।"

এই ইস্তাহারের প্রথমার্দ্ধ ইতিহাসের কথা—দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা। প্রথমার্দ্ধ আগাগোড়া মিথ্যা। ভবিষ্যতের কথা করিৎ-কর্ম্মা লোকের কার্য্যের ফলের উপর নির্ভর করিবে।

সুন্ মহাশয় মাঞ্চুবংশের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়াছেন। অথচ এই বংশের প্রথম দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের জনসাধারণ তাঙ্ বা মিঙ্ আমলের সকল সুযোগ-সুবিধা এবং গৌরব ভোগ করিয়াছে। ইতিহাস খুঁটিয়া দেখাইতে গেলে চীনের মহাভারত লেখা হইয়া পড়িবে। মাঞ্চু-আমলে বিদেশীয় খৃষ্টানদিগের অত্যাচার বাড়িয়া যায়। এইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কোন সম্রাট্ বিদেশী-বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। জাপানেও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে সকলগুলিই তাঙ্ ও মিঙ্ বংশ সম্বন্ধেও

প্রযোজ্য। অধিকন্তু অনেকগুলি সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সকল রাজবংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ফরাসী চতুর্দ্দশ-লুইয়ের যথেচ্ছ শাসন সুবিদিত। সুন্ মহাশয় বিংশ শতাব্দীর ভরা জোয়ারে অনেক তত্ত্ব দু-চুগুণে চারের মত জন্মিয়া অবধিই শিখিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও ইয়োরোপীয়ান্‌দিগের জানা ছিল না। কাজেই আজকালকার সুপরিচিত মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী-জার্ম্মাণি-সমন্বিত অষ্ট্রীয়ান্ সাম্রাজ্য সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঞ্চু-সাম্রাজ্যেরই জুড়িদার ছিলেন। মাঞ্চুরা জগতের সমসাময়িক নরপতিবৃন্দ হইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পপোতের আবিষ্কার হইয়াছে—তাহার পর দুনিয়া বদ্‌লাইয়া গেল। এই বস্তু চীনাদের আবিষ্কার নয়। এই জন্যই চীনে নবজীবন আসে নাই। কিন্তু তাহার জন্য কি মাঞ্চুবংশ দায়ী? জাপানীরা সেদিন মাত্র ওস্তাদি-চালে ঘর সামলাইয়া লইয়াছে। তাহারা মাঞ্চু চীনের অবস্থায়ই ছিল—কিন্তু তাহা বলিয়া একটা রাজবংশের ঘাড়ে সকল দোষ চাপানো তাহারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই।

যাহা হউক, মাঞ্চুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই মাঞ্চুরা মরিল। মরুক্। সকল রাজবংশই এইরূপে মরিয়া থাকে। মাঞ্চু কর্ত্তৃক মিঙ্ ধ্বংস এবং সুন্-কর্ত্তৃক মাঞ্চু-ধ্বংস এক গোত্রের অন্তর্গত। সুতরাং সুনের আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলন বলিতে পারি না। ইহা দুর্ব্বলের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি মাত্র—এবং নববলের বিজ্ঞাপন প্রচার মাত্র। এই নববলের আকার বা প্রকার বা পরিমাণ ভবিষ্যতের ইতিহাস বিচার করিবে। সম্প্রতি এই নববল স্বরাজতন্ত্ররূপে দেখা দিয়াছে। পুরাণা শাসনপ্রণালীর আমূল সংস্কারসাধন সুন্-পন্থীদিগের উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী ভল্টেয়ার ও মণ্টেস্কু বিলাতের আদর্শে ফরাসী রাষ্ট্র সংস্কারের



মিঙ্‌-সম্রাটের স্মৃতি-ফলক

আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। কাঙ্, লিয়াঙ্ ও সুন্ আজ ইয়োরামেরিকার আদর্শে চীন-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন।

মাঞ্চুবংশ ধূলিসাৎ হইল। এক ধাক্কায় এই বংশ ভাঙ্গে নাই। সুনের ধাক্কা শেষ ধাক্কা মাত্র। কোন রাজবংশই এক ধাক্কায় কাবু হয় না। সকল বংশেই "ভাঙ্গন" লাগে। এই ভাঙ্গন বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনও অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ভারতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনও অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

চীনের রাজবংশগুলি অনেক ধাক্কায় কাবু হইয়াছে। হ্যান্-বংশে বহুকাল ধরিয়া ঘুণ লাগিয়াছিল। তাঙ্-বংশেও ঘুণ লাগা অবস্থা দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। মিঙ্-বংশের ক্রমপতনেও এইরূপ দেখিতে পাই।

মাঞ্চুবংশের ক্রমপতনের চিত্র আমরা সুনের বক্তৃতায় পাইতেছি। ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সুন্ সদলবলে নান্‌কিঙের নিকটবর্ত্তী মিঙ্ সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এইখানে মিঙ্-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্রাটের কবর আছে। সেই কবরের সম্মুখস্থ স্মৃতিফলককে উদ্দেশ্য করিয়া একটী বক্তৃতা পাঠ করা হয়। সুনের সহকারী বক্তৃতা পাঠ করেন। মৃত মিঙ্-বীরের আত্মার নিকট বর্ত্তমান বীরগণ স্বদেশোদ্ধারের সংবাদ পাঠাইলেন। মিঙ্-প্রবর্ত্তক একজন সামান্য লোক ছিলেন—সুন্ ও একজন সামান্য লোক। মিঙ্-বীর বিদেশী মোগলবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। সুন্ বিদেশী মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিলেন। কাজেই মিঙের সমাধিক্ষেত্রে সুনের বক্তৃতা অতি স্বাভাবিক। এই বক্তৃতায় মাঞ্চুবংশের ভাঙ্গনটা বুঝানো হইয়াছে।

"য়ুং-চেঙের রাজত্বকালে (১৭২৩—৩৬) হুনান্ প্রদেশের চাং-সি এবং চেং-চিঙ্ বিদ্রোহী হন। চিয়া-চিঙের রাজত্বকালে (১৭৯৬—১৮২১) 'গুপ্ত-সমিতি'র লোকেরা সম্রাটের জীবননাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তাহার পর ছি-ছোয়ান্ এবং শেন্-সি-প্রদেশদ্বয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তাঙ্-কোয়াঙ্ (১৮২১—৫১) এবং হিয়েন্-ফুঙের (১৮৫১—১৮৬২) রাজত্বকালে এক বিরাট বিদ্রোহের অভিনয় হইয়াছিল।

কোয়াং-সি প্রদেশের এক নিভৃত পল্লীতে তাহার সূত্রপাত। সেই বিদ্রোহের নাম তাই-পিঙ্ বিপ্লব। ১৮৫০ হইতে ১৮৬৪ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। মাঞ্চুবংশ যায় যায় হইয়া পড়ে। সমগ্র দক্ষিণ চীন এবং উত্তর-চীনের পিকিঙ্ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত বিদ্রোহীরা পরাজিত হন। এই সকল বিফলতায়ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বদেশসেবা বর্জ্জন করেন নাই। বরং জনগণের বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে থাকে। তার পর আমাদের দিন আসিল। যুবক-চীন এক্ষণে চীনাদের অধিকার পুনঃস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অধিকন্তু মাঞ্চু-দস্যুরাও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। বিদেশীয় শত্রুরা একে একে আমাদের পবিত্র জন্মভূমির বিভিন্ন অংশ ছিনিয়া লইতেছে। মাঞ্চুরা তাহাদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ—বরং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদিগের হাতে সোণার চীনের নানা জনপদ ছাড়িয়া দিতেছে।

"বর্ত্তমান যুগের চীনারা অবনত হইতে পারে। কিন্তু আমরা কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি? আমাদের বীর পিতামহগণের আত্মা কি আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের কর্ত্তব্যপালনে সাহসী ও উদ্যোগী করিতেছে না? আমরা আমাদের প্রাচীন বীরত্ব ভুলি নাই। এই সেদিন ক্যান্টন-বন্দরে বিদ্রোহ খাড়া করিয়াছি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পিকিঙ্ নগরেও বোমা ফুটাইয়া মাঞ্চুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আন্হুই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে বন্দুকের গুলিতে "খাল্" করিয়াছি। তার পর ইয়াং-সির কূলে কূলে বিদ্রোহ মাথা তুলিয়াছে এবং

চীনের সর্ব্বত্র গুপ্ত-সমিতির আয়োজন পাকা হইতে থাকে। অবশেষে দৈবক্রমে ক্যাণ্টনের বিদ্রোহীরা ধরা পড়িলেন। ঐ যাত্রায় আমাদের প্রয়াস বিফল হইল। কিন্তু বিফলতায় আমরা দমি নাই। বিফলতার পর বিফলতা আমাদের কপালে জুটিয়াছে—তথাপি স্বদেশ-সেবকের কর্ম্ম করিবার জন্য লোকের অভাব হয় নাই। মাঞ্চুদরবার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আজ মাঞ্চুদের অন্ত্যলীলা প্রকটিত হইতেছে।

"এই অন্ত্যলীলার বীরগণ উচাঙে বিপ্লব সুরু করেন। এই নগরে কার্য্য আরব্ধ হইবামাত্র চীনের নগরে নগরে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িল। সমুদ্রের কূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ অল্পদিনের ভিতরেই যোগদান করিল। ইয়াং-সির দুই কূল আমাদের বিপ্লবপক্ষীয় সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ক্রমশঃ হোয়াং-হোর দক্ষিণস্থ সমগ্র জনপদই মাঞ্চুদের হাতছাড়া হইয়া গেল। উত্তরাংশও আমাদের পবিত্র আন্দোলনে যোগ দিতে দেরি করিল না। পিকিঙের মাঞ্চু-দরবার এক্ষণে চীনা জনসাধারণের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে।"

প্রায় সকল রাজবংশেরই ক্রম-পতনের বিবরণ এইরূপ। সুনের বক্তৃতা মিঙের অধঃপতন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, তাঙের অধঃপতন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, হানের অধঃপতন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য জগতে বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। প্রকৃতি বৈচিত্র্য ভালবাসে—জগতে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্য অর্থাৎ বহুত্ব বেশী। আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্য এই জন্যই ভাঙ্গিয়াছে—মৌর্য্য-সাম্রাজ্যও এই জন্যই ভাঙ্গিয়াছে—গুপ্ত-সাম্রাজ্যও এই জন্যই ভাঙ্গিয়াছে—রোমাণ সাম্রাজ্যও এই জন্যই ভাঙ্গিয়াছে—শার্ল্যমেনের ফ্রাঙ্ক-সাম্রাজ্যও এই জন্যই ভাঙ্গিয়াছে—হাবস্‌বুর্গবংশের অষ্ট্রীয়ান্ ("হোলি-রোমাণ") সাম্রাজ্যও এই জন্যই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। অতএব চীনারা অথবা এশিয়াবাসীরা মহাপাপী নয়। জগতে প্রতিদিনই একজন করিয়া

চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, শি-হোয়াং-তি বা তাই-চুঙ্, ফ্রেডরিক্ বা নেপোলিয়ানের সমান জবরদস্ত্ সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জোড়াতালি-দেওয়া রাজ্যে ভাঙ্গন লাগা অতি স্বাভাবিক। সুনের আন্দোলনে সেই ভাঙ্গনই দেখিতেছি। মাঞ্চুপতনকে ফেনাইয়া বিদেশী-বহিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

(১২) স্বরাজ-তত্ত্ব

এইবার সুনের আন্দোলনে "স্বরাজ"-তত্ত্ব কতখানি আছে দেখা যাউক। মাত্র চারি বৎসরের ব্যাপার—এত শীঘ্র ইহার ফলাফল আলোচনা করা দুষ্কর। বলা বাহুল্য, স্বরাজ শব্দটা সুনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিদ্রোহীরা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন—"এক রাজা মরে যদি অন্য রাজা হবে। বাঙ্গালার সিংহাসন খালি নাহি রবে॥" দুনিয়ার সকল দেশের বিদ্রোহীরাই এইরূপ বুঝিয়া থাকে।

ইয়াঙ্কিরা ইংরেজকে হারাইয়া স্বাধীনতা লাভ করে (১৭৭৬—৮৩)। তাহাদের সমাজে রাজা নামক কোন বস্তু ছিল না। কাজেই স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ইয়াঙ্কিরা রাজতন্ত্রের কথা ভাবিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্র তাহাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর পর ফরাসীরা বিপ্লব করে। তাহাদের বিপ্লবেও রাজতন্ত্র ধ্বংস করিবার কথা প্রথমে উঠে নাই। ইংরেজের অনুকরণে রাজবংশ রক্ষা করিবার প্রয়াস প্রায় সকল দলেরই ছিল। সকলেই শাসন-সংস্কারে ব্রতী ছিল। "মানবের অধিকার"-প্রচারকগণও রাজবিরোধী ছিল না। ক্রমশঃ ঘটনাচক্রে রাজহত্যা এবং রাজতন্ত্র-বর্জ্জন ঘটিয়াছে। ফরাসী-রাজ অষ্ট্রীয়া ও প্রুশিয়ার নরপতিদ্বয়ের সঙ্গে গোপনে বন্ধুত্ব না করিলে ফরাসী-বিপ্লবের আকার অন্যরূপ হইত।

১৭৮৯ সালের ১৭ জুন ফরাসী-বিপ্লবের গোড়া পত্তন হয়। ১৭৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বার রাজতন্ত্র রদ করা হয়। এই তারিখকে ফরাসী স্বাধীনতার প্রথম বর্ষ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতর ফরাসী জনসাধারণ স্বেচ্ছায় রাজশক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে চেষ্টিত হয় নাই। ফরাসী রাজার বন্ধুভাবে অষ্ট্রীয়া এবং প্রশিয়ার রাজারা ফ্রান্স আক্রমণ করিতেছিলেন। কাজেই জনগণের পক্ষে রাজাকে দেশের শত্রু বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছিল। অবশেষে ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। এই বৎসরেরই অক্টোবর মাসে রাণীকেও এইরূপ বিচারের পর খুন করা হয়। ফলতঃ প্রজাতন্ত্র বা স্বরাজ ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার কথা নয়—গৌণ ফলমাত্র।

সুইটজর্ল্যাণ্ডের লোকেরা পল্লীস্বরাজে বাস করিত। তাহাদের উপর পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের রাজরাজড়ারা জুলুম চালাইত। কিন্তু ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে পল্লীবাসীরা প্রবলপ্রতাপ অষ্ট্রীয়ান-সম্রাট্‌কে সম্মুখ-সমরে পরাজিত করে। তাহার পর হইতে সুইসদিগের পল্লী-স্বরাজগুলি একপ্রকার স্বাধীন। ইহারা কখনও রাজতন্ত্র দেখে নাই। কাজেই প্রজাতন্ত্র ইহাদের চিন্তায় একমাত্র শাসনপদ্ধতি। ইয়াঙ্কি-স্বরাজ এবং সুইস-স্বরাজ এই হিসাবে এক জাতীয় পদার্থ। ১৩১৫ সালের বিজয়লাভের পর মূল পল্লীস্বরাজগুলি জার্ম্মাণ, ইতালীয় এবং ফরাসী পল্লীর সমবায়ে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফেলিয়া নগরের প্রসিদ্ধ দরবারে সুইটজর্ল্যাণ্ড পূরা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সুইটজর্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিবার প্রয়াসে কোন সম্রাট্ সফল হন নাই। কাজেই সুইস্-স্বরাজ বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গণতন্ত্রশাসিত দেশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ-জাতির স্বরাজ ছিল—কিন্তু তাহা ক্রমশঃ রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

সুইস্ ও ইয়াঙ্কি রিপাব্লিকের উৎপত্তি ফরাসী রিপাব্লিকের উৎপত্তি হইতে স্বতন্ত্র। স্বরাজতত্ত্বের আলোচনায় এই কথা মনে রাখা আবশ্যক। ফরাসীরা নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্বরাজ করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের একশত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল। ইংরেজেরাও স্বরাজ লইয়া মাতামাতি করে নাই। এক রাজার বদলে আর এক রাজা বসানোই ইংরেজের বিপ্লব (১৬৮৮)। তবে রাজার হাত পা যথাসম্ভব বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে কিছুদিনের জন্য স্বরাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমওয়েলের গণতন্ত্র বিলাতী ধাতে লাগে নাই (১৬৪৯-৫৩)। ইংরেজেরা ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে এক রাজাকে খুন পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু খাঁটি প্রজাতন্ত্র আজও বিলাতে নাই। এই বিলাতী শাসনপ্রণালীই মোটের উপর জগতের সর্ব্বত্র নকল করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র নানা বিপ্লব ও বিদ্রোহ হইয়াছে। ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এই দুই বৎসর ইয়োরোপে রাষ্ট্রীয় 'কাল বৈশাখী'র বর্ষ। স্বরাজ, রিপাব্লিক, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শব্দ এই সকল বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথাও স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র চলিতেছে—কিন্তু রাজাকে এবং রাজমন্ত্রিগণকে প্রজার নিকট জবাবদিহি করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধিগণের নিকট রাষ্ট্রশাসনের সকল তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য। প্রতিনিধিগণের অনুমতি না পাইলে তাঁহারা এক কড়াও কর পাইবেন না এবং এক আধ্‌লাও কোন কাজে খরচ করিতে পারিবেন না। ইহাকে সংক্ষেপে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি বলা চলে। মোটের উপর এই নীতিই আজকালকার রাজতন্ত্রের নীতি। অর্থাৎ ষোলকলায় পূর্ণ স্বরাজ ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড এবং ইয়াঙ্কিস্থান ব্যতীত জগতের আর কোথাও নাই।

তবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই ইয়াঙ্কি আদর্শের স্বরাজ স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের উৎপত্তিও সুইস এবং ইয়াঙ্কি স্বরাজেরই অনুরূপ।

ইহারা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীন ছিল। তাহাদিগকে হারাইয়া ইহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাই ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সমাজে রাজা নামক কোন জীব ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরাজতন্ত্রের কথা উঠিলে ইতালীয় স্বদেশসেবক ম্যাট্‌সিনির কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। ইনি স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শাসনপ্রণালী চিন্তাই করিতে পারিতেন না। রাজতন্ত্র বস্তুটা ম্যাট্‌সিনির ধারণায় সয়তানস্বরূপ ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পঁচিশ বৎসর বয়সে ইনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। ১৮৭২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই চল্লিশ বৎসর কাল ম্যাট্‌সিনি 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ইতালীতে স্বরাজ আজও দেখা দিল না। অথচ দুই হাজার বৎসর পরেও দুনিয়ার ভাবুকগণ ম্যাট্‌সিনিকে পূজা করিতে ছাড়িবেন না। ম্যাট্‌সিনির যৌবনকালে ইতালী নানা স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। অধিকন্তু উত্তরাংশ অষ্ট্রীয়ান-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল এবং দক্ষিণাংশ স্পেনের এক রাজবংশের অধীন ছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইতালীর এই দুর্দ্দশা নিবারিত হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ইতালীর স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল এবং ঐক্যও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বরাজ এখনও বহু দূরে। ম্যাট্‌সিনির চক্ষুশূল রাজতন্ত্রই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালীতে অবলম্বিত হইয়াছে।

দুনিয়ার লোকে স্বরাজ বুঝিতে পারে না—রাজতন্ত্রই বুঝে। কতক-গুলি পরিবার দল বাঁধিয়া কোন নূতন দেশে সমাজ গড়িতে প্রবৃত্ত হইলে

স্বরাজ সহজেই স্থাপিত হইলেও হইতে পারে। উত্তর আমেরিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার দৃষ্টান্ত এই। অথবা কোন দেশে যদি প্রথম হইতেই কোন রাজবংশের একতিয়ার না থাকে সেই দেশেও স্বরাজ চালানো সহজ। সুইটজারল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য পল্লীগুলি এই কথার দৃষ্টান্ত। অবশ্য স্বরাজের পাণ্ডারা পরে স্বরাজের মুণ্ডপাত করিয়া রাজবংশ স্থাপন করিতেও পারেন। সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু রাজবংশ-সমন্বিত-সমাজে বিপ্লবের দ্বারা স্বরাজ গড়িয়া তোলা সহজ কথা নয়। বিলাতে স্বরাজ দাঁড়ায় নাই। ফরাসী স্বরাজের ইতিহাসটা কিছু বিচিত্র।

১৭৯২ সালে ফরাসী স্বরাজ স্থাপিত হয়। স্বরাজসেবক নেপোলিয়ান্ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানি "সাম্রাজ্য" চলে। নেপোলিয়ানের পতনের পর ইয়োরোপীয় রাজমণ্ডলী ফ্রান্সের পুরাতন বুর্‌বোঁ রাজবংশকে প্যারির সিংহাসনে বসাইলেন। এই রাজবংশ ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। অর্থাৎ ১৭৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮০৪ সালের ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বার বৎসরকাল মাত্র ফরাসী স্বরাজ জীবিত ছিল। তাহার পর পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র চলিতে থাকে।

১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফরাসীরা পুরাণা বংশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া নূতন একজন লোককে রাজা করে। এই বিপ্লবে স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। নূতন রাজা লুই ফিলিপ (১৮৩০—৪৮) আঠার বৎসরকাল রাজতন্ত্রেরই সূত্রবৃদ্ধি করিলেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ফ্রান্সে আবার স্বরাজ স্থাপিত হইল। ইহার নাম দ্বিতীয় ফরাসী রিপাব্লিক। এই স্বরাজের আয়ু কতদিন? প্রায় ৫ বৎসর মাত্র!

১৮৫২ সালের ডিসেম্বার মাসে স্বরাজের সভাপতি লুই নেপোলিয়ান্

কৌশলে সম্রাট্ হইয়া বসিলেন। এই সাম্রাজ্যের আমল ১৮৫২ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত। লুই নেপোলিয়ান্ ফ্রান্সের বনিয়াদি বুরবোঁ বংশের সন্তানও নন—অথবা লুই ফিলিপের মতন একজন সাধারণ জমিদারের পুত্রও নন। ইনি ভুঁইফোঁড়-সম্রাট্ বীর-নেপোলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুতরাং এই আঠার বৎসর নেপোলিয়ানি রাজতন্ত্রের জেরই ফরাসী সমাজে চলিয়াছে। পরে জার্ম্মাণির নিকট ফরাসীরা পরাজিত হইয়া রাজতন্ত্র রদ করিয়াছে এবং স্বরাজ পুনরায় স্থাপন করিয়াছে। ইহার নাম তৃতীয় রিপাব্লিক।

ফ্রান্সে আজকাল তৃতীয় স্বরাজটাই চলিতেছে (১৮৭০—)। লুই-নেপোলিয়ান্ সেদাঁর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্যারিতে তার করিলেন—"আমার পল্টন হারিয়াছে—আমি বন্দী"। জনসাধারণ ক্ষেপিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরাজ স্থাপন করিল। যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর শাসন-প্রণালী অনেক সময়ে নির্ভর করে। বীর নেপোলিয়ান্ যতদিন ধরাখানাকে সরার মতন বিবেচনা করিতেছিলেন, ততদিন ফরাসী জাতি স্বরাজের কথা ভুলিয়া সাম্রাজ্যের নেশায় মাতিয়াছিল। আবার লুই-নেপোলিয়ান্ যদি সেদাঁর যুদ্ধে জার্ম্মাণ জাতিকে কয়েক ঘা লাগাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বরাজের পক্ষে উকীল ফরাসী-সমাজে জুটিতই না। সকলেই রাজতন্ত্রেরই বাহবা দিত।

১৮৭০ সালের পর হইতে ফ্রান্সে তৃতীয় স্বরাজ চলিতেছে। কিন্তু রাজতন্ত্রীদিগের দল কমে নাই। ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত ফরাসী স্বরাজের আয়ু "এখন তখন" ছিল। তিন দল রাজতন্ত্রী ফ্রান্সে ঘটি-মঙ্গল করিতে থাকিলেন। এক দল চাহেন বনিয়াদি বুরবোঁ বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—দ্বিতীয় দল চাহেন নেপোলিয়ান্-বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—তৃতীয় দল চাহেন লুই-ফিলিপের জমিদারবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৮৭৫ সালের পর স্বরাজ

অনেকটা স্থিরপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ রাজবংশসমূহে বাতি দিবার লোক একে একে মারা গিয়াছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের বংশধরের মৃত্যু হইয়াছে—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বুর্‌বোঁবংশের শেষ সন্তান মারা পড়িয়াছেন—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জমিদারবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। কাজেই আজকাল রাজতন্ত্রীরা সিংহাসনে বসাইবার লোক খুঁজিয়া পান না। তথাপি মাঝে মাঝে স্বরাজ তুলিয়া দিবার কথা ফরাসী-সমাজে উঠিয়া থাকে—দু-একটা আন্দোলনও হইয়াছে। ফরাসী-পার্ল্যামেণ্টে রাজতন্ত্রী মেম্বার আজও আছেন।

বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণ-পল্টন যদি প্যারি পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে পারিত, তাহা হইলে ফরাসী স্বরাজ বোধ হয় টিকানো কঠিন হইত। যুদ্ধে হারিয়া গেলে ফরাসীরা বোধ হয় শাসন-প্রণালীটা ঝাড়িয়া দেখিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী সংবাদপত্রে আলোচনার সুর কিছু স্বরাজ-বিরোধী ছিল। ফরাসীরা বিলাত এবং জার্ম্মাণি দেখিয়া মনে মনে ভাবে—"এই সকল দেশে রাজা আছেন—আমাদের দেশে রাজা নাই। কিন্তু ইংরেজ-প্রজা আর জার্ম্মাণ-প্রজা ফরাসী প্রজা অপেক্ষা কোনো বিষয়ে কম স্বাধীনতা ভোগ করে কি? জনগণের অধিকার রাজতন্ত্র অপেক্ষা স্বরাজের বিধানে বেশী আছে কি?" বিলাতে থাকিবার সময়ে এই ধরণের কথা কানে ঠেকিয়াছিল।

চীনে আজ চারি বৎসর হইল প্রাচ্য জগতের প্রথম স্বরাজ স্থাপিত হইয়াছে। সুন্ ইয়াৎ-সেন আমাদের রোব্‌স্‌পিয়ার অথবা ম্যাট্‌সিনি। মাত্র ভাবুকতার হিসাবে এই তুলনা করা গেল। কিন্তু সুনের আন্দোলনে স্বরাজ দানা বাঁধিবে, কি রাজতন্ত্র গজিবে, কি ফেডারেশন অর্থাৎ রাষ্ট্র-সমবায় দাঁড়াইয়া যাইবে, কি পররাজ ও পারতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীনতা ভাসিয়া উঠিবে তাহা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে লাভবান্ হওয়া যাইবে না।

চীন আমেরিকার মতন নূতন দেশ নয়—আমেরিকার কোন কথাই চীনে খাটে না। বস্তুতঃ আমেরিকার কোন কথাই ইয়োরোপেও খাটে না। রাজবংশ-সমন্বিত দেশে স্বরাজ স্থাপনের দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের বিলাত এবং ফ্রান্স। কাজেই চীনা-স্বরাজের কোষ্ঠিগণনার জন্য বিলাত ও ফ্রান্সের নজির সম্মুখে রাখা ভাল। বিলাতের স্বরাজ দুই এক দিনের মধ্যেই উপিয়া গিয়াছিল। ফ্রান্সে স্বরাজ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এইজন্য ফ্রান্সের স্বরাজ-কথা চীনা-স্বরাজপ্রসঙ্গে কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গেল।

কথা উঠিতে পারে যে, স্বরাজের নজিরের জন্য এশিয়াবাসীর এশিয়ার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। স্বরাজ এশিয়ায় নূতন জিনিষ নয়। অন্যান্য অনেক মালের মতন স্বরাজও প্রাচ্যজগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে আমরা যে স্বরাজের কথা বলিয়া থাকি, তাহা এশিয়ায়ও কোন দিন ছিল না—ইয়োরোপেও কোন দিন ছিল না। এই স্বরাজ বর্ত্তমান যুগের খাশ আবিষ্কার। বর্ত্তমান যুগ বলিলে ইয়োরামেরিকার যুগ বুঝিতে হইবে। কেন না বিগত এক-শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এশিয়াবাসী কোন কর্ম্মক্ষেত্রের বা চিন্তাক্ষেত্রের সীমানা সিকি ইঞ্চিও বাড়াইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই যুগে এশিয়া মোটের উপর একদম মরিয়া রহিয়াছে। প্রাচ্যজগতের লোকেরা এই যুগে যদি কিছু আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য প্রভাবের গৌণফল মাত্র। আর তাহার পরিমাণও অতি অল্প। কাজেই বর্ত্তমান যুগকে ইয়োরামেরিকার যুগ বলাই সঙ্গত। স্বরাজ বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকার আবিষ্কার। এই নয়া পশ্চিমা মালই আমরা এশিয়ায় আমদানি করিতেছি।

ফরাসী-স্বরাজকে ধ্বংস করিবার জন্য ইয়োরোপের রাজরাজড়ারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। ইয়াঙ্কি-স্বরাজকেও টিপিয়া মারিবার জন্য ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল কম চেষ্টা করেন নাই। বস্তুতঃ দুনিয়া হইতে এই

কিম্ভূতকিমাকার নূতন শাসনপদ্ধতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য ১৮১৫ সালে ইয়োরোপে এক বিরাট্ "নরপতি-পরিষৎ" স্থাপিত হয়। তাহার নাম "হোলি এলায়্যান্স" বা ধর্ম্ম-সম্মিলন। জগতের সর্ব্বত্র রাজশক্তির সহায়তা করা এবং প্রজাশক্তি বা গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা দেওয়া এই সম্মিলনের কার্য্য ছিল। এই সম্মিলনের গতিরোধ করিবার জন্যই ইয়াঙ্কি-স্বরাজের সভাপতি মন্রো বলিয়াছিলেন—"তোমরা ইয়োরোপখানাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমেরিকার কোনো রাষ্ট্রে তোমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তোমাদের রাজতন্ত্রের দোহাই আমাদের নূতন মুল্লুকে চলিবে না।" সেই বিদেশী-বহিষ্কার-নীতি মন্রো-ডক্‌ট্রিন (১৮২৩) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা রাজতন্ত্রের দৌরাত্ম্য হইতে স্বরাজতন্ত্রের আত্মরক্ষার কৌশল। কাজেই স্বরাজ ইয়োরামেরিকারও অতি নয়া মাল। ফরাসীরা বিপ্লব সুরু করিবার সময়ে তাজা দৃষ্টান্ত খুজিয়া পাইত না। প্রাচীনকালের রোম এবং গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টা তাহাদের মাথা গরম করিয়া রাখিত। সেই সকল মান্ধাতার আমলের স্বরাজ সম্বন্ধে গান গাহিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের পাণ্ডারা জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিত। সেইগুলি ইয়োরোপের সর্ব্ব পুরাতন স্বরাজ। কিন্তু তাহাদের ধারা ইতিহাসে নামিয়া আসে নাই। সেইগুলি অল্পকালের জন্য জগতে দেখা দিয়াছিল—অল্প-কালের মধ্যে তাহাদের ধ্বংসও সাধিত হইয়াছিল। অধিকন্তু সেই সকল স্বরাজও আধুনিক স্বরাজের অনুরূপ নয়। গ্রীসের সর্ব্ববিখ্যাত রাষ্ট্রের নাম এথেন্স। এই এথেন্স একটা নগর মাত্র। তাহার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র বিশ হাজার। এই সংখ্যক স্বাধীন নরনারীর গোলাম ছিল চার লক্ষ। কিন্তু গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে গোলামজাতির কোনো অধিকার ছিল না। সুতরাং এথেন্সের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান দেশ-রাষ্ট্রীয় স্বরাজের মূল হইতে পারে না।

রোমের দৃষ্টান্তও ফ্রান্স কিম্বা ইয়াঙ্কিস্থানের নবীন স্বরাজের মূল হইতে পারে না। রোম প্রথম অবস্থায় একটা নগর মাত্র ছিল। এই হিসাবে রোমের মর্য্যাদা এথেন্সের অনুরূপ। কিন্তু কালে রোমের লোকেরা সমগ্র ইতালী জয় করিয়া বসে। তখন রোম-স্বরাজ ইতালী দেশের উপর কর্তৃত্ব সুরু করেন। ইতালীর অন্যান্য নগর নগর-সম্রাজ্ঞী রোমের অধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। রোমের লোকেরা ইতালীকে স্বদেশ অথবা দেশমাতা বিবেচনা করিত না। তাহারা রোমকেই "আমার দেশ" ভাবিত। অর্থাৎ ইতালী প্রাচীনকালে দেশ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই। ইতালী রোম-শাসিত নগর-সমবায় মাত্র ছিল। তাহার পর ইতালীর বাহিরে রোম-স্বরাজের দিগ্বিজয় চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত স্বরাজের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অতএব রোমের কোনো অবস্থাই আধুনিক স্বরাজের নজির নয়।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে স্বরাজ-কল্প বস্তু স্থানে স্থানে দেখা যাইত। সেগুলিও নবীন-স্বরাজের নজির হইতে পারে না। উত্তর জার্ম্মাণিতে কতকগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্র নগর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল। এই নগরসমূহের শাসনকর্ত্তারা কর, বিচার এবং অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন। এইগুলিকে খুব জোর গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজরাজড়াদিগের অধীন ছিল। উত্তরজার্ম্মাণির নগরপুঞ্জের সাধারণ নাম "হান্সা"। এই ধরণের নগররাষ্ট্র ইতালীতেও মধ্যযুগে কয়েকটা ছিল। রোম, ফ্লোরেন্স, পিসা, জেনোয়া, ভেনিস, নেপ্‌ল্‌স্, মিলান ইত্যাদি নগর-স্বরাজ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইতালীয় এবং জার্ম্মাণ নগররাষ্ট্রগুলি দেশব্যাপী স্বরাজের অথবা রাজতন্ত্রের কণ্টকস্বরূপ ছিল। ইতালী এবং জার্ম্মাণির দুর্দ্দশা এই সকল ক্ষুদ্র স্বরাজের সঙ্কীর্ণপন্থিতায় যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছিল। কাজেই বর্ত্তমান যুগের দেশ-

রাষ্ট্রীয় স্বরাজের কথা উঠিলে এই সকল নগর-স্বরাজের কথা না তোলাই কর্ত্তব্য।

অধিকন্তু এই সমুদয় নগরের স্বাধীনতা ভাঙ্গিয়া ফেলাই বর্ত্তমান যুগের স্বদেশ-সেবকগণের কার্য্য হইয়াছে। নবীন জার্ম্মাণি হ্যান্সানগরাবলীর ন্যায় অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্রের কবরের উপরে গঠিত। নবীন ইতালীও নগর রাষ্ট্রসমূহের কবরের উপরে গঠিত। ম্যাট্‌সিনির সাধনাই ছিল এই। ছোট ছোট কেন্দ্রের স্বাধীনতা ভাঙ্গিয়া ইতালীয় স্বরাজ গড়িতে হইবে ইহাই ম্যাট্‌সিনির প্রধান উপদেশ। মধ্যযুগে দান্তেও নগরস্বরাজের বিরুদ্ধে এবং ইতালীয় ঐক্যের স্বপক্ষে ভেরী বাজাইয়াছিলেন। দান্তের স্বপ্ন ফলিয়াছে—কিন্তু ম্যাট্‌সিনির সাধনা পূরাপূরি সিদ্ধিলাভ করে নাই। আজকাল নগর-স্বরাজ, অথবা ছোট কেন্দ্রের স্বাধীনতা আর নাই—ইতালীর ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি-বাঞ্ছিত স্বরাজ ইতালীতে নাই।

ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই আর এক প্রকার স্বরাজ ছিল। এই-গুলি দেশের রাজার অধীনেই থাকিত। কেবল কতকগুলি শাসন-ব্যাপারে তাহারা কেন্দ্রশাসনের নিয়ম মানিত না। প্যারি, লণ্ডন ইত্যাদি সহর এইরূপ অধিকারপ্রাপ্ত নগর। বলা বাহুল্য, এইগুলি ইতালীয় অথবা হ্যান্সা নগরস্বরাজের দৃষ্টান্ত নয়। এই সমুদয় অনেকটা ভারতীয় "শ্রেণী" বা পূগ-স্বরাজের অনুরূপ। কেবল শক্তি হিসাবে তুলনা করা গেল।

এশিয়ায় কোন্ ধরণের স্বরাজ ছিল? পশ্চিমারা বলিবেন,—এশিয়ার গ্রীক্‌স্বরাজও ছিল না—রোমান স্বরাজও ছিল না—হ্যান্সা স্বরাজও ছিল না—ইতালীয় স্বরাজও ছিল না। অর্থাৎ নগর-রাষ্ট্রের শাসনে গণ-তন্ত্র কোনো এশিয়ান সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরন্তু ভারতসন্তান তাঁহাদের গ্রাম্য-পঞ্চায়ত বা পল্লী-স্বরাজগুলির নাম করিবেন। এগুলি যদি কোন

রাজা বা জমিদার বা বাদশাহ বা নবাবের কোন প্রকার তোয়াক্কা না রাখিত তাহা হইলে বলিতাম—"ভারতীয় পঞ্চায়তগুলি এথেন্স বা রোম বা ভেনিস্। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পল্লীস্বরাজগুলি এমন কি উত্তর জার্ম্মাণির হান্সানগরাবলীর সমান স্বাধীনতাও ভোগ করে নাই। হান্সা-নগরগুলি জমিদার এবং সম্রাটের তাঁবে থাকিত বটে—কিন্তু খাঁটি স্বাধীন ও স্বায়ত্ত অধিকার অনেক বিষয়েই তাহাদের ছিল। শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন নগর এথেন্স বা নেপল্‌সের মতন একদম পূরা স্বাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চায়তগুলি একটা বৃহত্তর রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশ মাত্র। পল্লীশাসনে হয়ত পল্লীবাসীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু রাজা বা বাদশাহের এক্‌তিয়ার অসম্মান করা কোন পল্লীসমাজের ক্ষমতায় ছিল না। এইগুলি "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের" কেন্দ্র মাত্র। অতএব বর্ত্তমান-যুগের স্বরাজপ্রসঙ্গে ভারতীয় পল্লী-স্বরাজের নাম উল্লেখ করা চলে না।

তার পর রীস্ ডেভিড্‌স্ সাহেব তাঁহার "বৌদ্ধ-ভারত" গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে ক্ল্যান-রিপাব্লিক বা গোষ্ঠী-স্বরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত এই ধরণের স্বরাজ আরও অনেক ছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠী-স্বরাজগুলির দৌড় কতখানি ছিল জানা যায় না। এইগুলি বোধ হয় পূরা স্বাধীনই ছিল। কারণ তখনকার দিনে প্রবল রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয় নাই। এইগুলিকে এথেন্স, স্পার্টা ইত্যাদির সঙ্গে এক আসনে বসানো যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীকস্বরাজগুলির নাম করিবামাত্র ইয়োরোপীয় গৌরবের উজ্জ্বলতম চিত্র মনে আসে। ভারতীয় "গণ"-স্বরাজগুলির মূল্য কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কেন না এই ধরণের স্বরাজ দুনিয়ার সকল অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য বা বর্ব্বর ও আদিম জনগণের সমাজেও দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের [illegible]গুলি সাঁওতালি-স্বরাজ কি গ্রীক-স্বরাজ

এই প্রশ্ন সহজেই উঠিবে। যাহা হউক, এইগুলি গ্রীকস্বরাজ হইলেও মনে রাখা আবশ্যক যে গ্রীক নজিরে বর্ত্তমান স্বরাজ চলে না।

চীনে এই দুই ধরণের মধ্যে কোনোটাই ছিল না বলা যায় না। চীনারা আজকাল তাহাদের ইতিহাস হইতে স্বরাজের নমুনা খুঁটিয়া বাহির করিতেছে। চীনে পল্লী-স্বরাজ ত ছিলই। আর, অন্ততঃ ইহারা নিজেকে স্বরাজ-মেজাজী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও এই ধরণের স্বরাজ-মেজাজী বলা হয়। অর্থাৎ "ভাই ভাই এক ঠাঁই"—নীতি যাঁহাদের ধর্ম্মে বা আচার-ব্যবহারে দেখিতে পাই, তাঁহাদিগকেই স্বরাজ-মেজাজী বলিতে পারি। কন্‌ফিউশিয়াসের ও বিশেষতঃ মেন্সিয়াসের গ্রন্থাবলীতে এই ধরণের ভ্রাতৃভাবের এবং প্রজাশক্তির উপদেশ আছে। কোরাণেও আছে—হিন্দুশাস্ত্রেও আছে—বাইবেলেও আছে। তাহা হইলে দুনিয়ার সকল লোকই স্বরাজ-পন্থী, অন্ততঃ স্বরাজ-মেজাজী!

এশিয়ায় স্বরাজের কথাপ্রসঙ্গে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। হিন্দু-আমলে, মুসলমান-আমলে, তাঙ্-আমলে, মিঙ্-আমলে এশিয়ার নানা স্থানে বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণকে সংযত রাখিবার জন্য ধর্ম্মের শাসন এবং মন্ত্রিপরিষদের সমালোচনা মুগুর স্বরূপ ছিল। তাহার ফলে জনসাধারণ রাজার যথেচ্ছাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং হয়ত অনেক সময়ে "রামরাজ্যে" বাস করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে স্বরাজ ব্যবস্থা বলা চলে না। দিলীপ, রঘু, দশরথ, রামচন্দ্রের আমলেও ভারতে স্বরাজ ছিল না। রাজশক্তিকে খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা সকল দেশেই হইয়াছে। বরং ইয়োরোপে বিশেষতঃ বিলাতে খুব পাকা ব্যবস্থাই হইয়াছিল। সেই সকল ব্যবস্থার ফলেই কালে রাজহত্যা, রাজতন্ত্র প্রত্যাখ্যান এবং স্বরাজপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত সম্ভবপর হইয়াছে।

অধিকন্তু সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন করা প্রাচীন ও মধ্যযুগে এক

প্রকার অসম্ভব ছিল। রেলগাড়ী এবং খবরের কাগজের দিনে ইহা সম্ভবপর। কাজেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলি তখনকার দিনে অনেক বিষয়ে সম্রাটের এলাকা হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত। সেইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের জেলাগুলিও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা নবাবের এক্তিয়ার হইতে স্বাধীন ছিল। এইরূপে দেশের প্রায় সকল কেন্দ্রই এক প্রকার স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন কেন্দ্র ছিল। সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন-রজ্জু ছিল মাত্র—সেলামি ও খাজনা প্রদান। পল্লী হইতে প্রাদেশিক-কেন্দ্রে খাজনা পাঠানো হইত—প্রাদেশিক কেন্দ্র হইতে বাদশাহের বা সম্রাটের রাজধানীতে খাজনা পাঠানো হইত। অন্যান্য সকল বিষয়েই পল্লীগুলি পরস্পর স্বাধীন থাকিত এবং প্রদেশগুলিও পরস্পর স্বাধীন থাকিত বলিলেই চলে। ফলতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্য নামে মাত্র সাম্রাজ্য ছিল—এইগুলি অসংখ্য পল্লী-কেন্দ্রের অথবা প্রদেশ-রাষ্ট্রের একপ্রকার "ফেডারেশন" বা সমবায় মাত্র। তাঙ্-সাম্রাজ্য এইরূপ এক ফেডারেশন, মিঙ্-সাম্রাজ্যও এইরূপ এক ফেডারেশন, মোগল-সাম্রাজ্য এইরূপ এক ফেডারেশন, গুপ্ত সাম্রাজ্যও এইরূপ এক ফেডারেশন। কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইল। এশিয়াবাসী এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্য জনগণের স্বরাজ-পন্থিতা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। এই বিধানে জনপদগত স্বাধীনতা, বিদ্রোহ, স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা। এখানে স্বরাজের চিহ্ন কোথায়?

নবীন স্বরাজের লক্ষণ তিনটি। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র কেবল একটা নগর বা পল্লী মাত্র নয়—একটা বৃহৎ জনপদ বা "দেশ"। দ্বিতীয়তঃ, শাসন-কার্য্যে জনগণের প্রতিনিধিই কর্ত্তা। অধিকন্তু এই দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিনিধিতন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বিলাতে (১২৬৫)—আর নরপতিশূন্য

শাসন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইয়াঙ্কিসমাজে—বস্তুতঃ সুইটজর্লণ্ডে। অতএব এইরূপ প্রতিনিধি-তন্ত্রশাসিত স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র জগতে বর্ত্তমান-যুগের আবিষ্কার। সুতরাং কি এশিয়াবাসী, কি ইয়োরামেরিকান্ সকলকেই ইয়াঙ্কিস্থান এবং ফ্রান্সের নজিরই দিতে হইবে। নবীন এশিয়ার স্বরাজ পাশ্চাত্য রীতিতেই চলিবে। কথাটা স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

পূরা স্বরাজ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে নাই। কিন্তু রাজার সঙ্গে প্রজার বচসা ইয়োরোপীয় বিশেষতঃ বিলাতী ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগেই দেখা গিয়াছে। রাজা যুদ্ধে যাইবেন—অর্থাভাব। প্রজারা বলিল—"আমরা তোমাকে টাকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদিগকে তাহার পরিবর্ত্তে কি দিবে?" রাজায় প্রজায় দর-কষাকষি এবং চুক্তি ও কড়ার মধ্যযুগে বহুবার হইয়াছে। তাহার দ্বারা রাজশক্তি প্রজা সাধারণের বশে আসিয়াছে। এই বশ এড়াইতে চেষ্টা করিলেই রাজার দুর্গতিও ঘটিয়াছে। ফরাসী নরপতিগণ যথেচ্ছাচারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এই কারণে রাজদুর্গতির চরম দেখা গেল ফরাসী-বিপ্লবে। তাহার পর হইতে রাজারা সকল দেশেই অনেকটা ভাল-মানুষের বেশে বসবাস করিতে শিখিয়াছেন। ফলতঃ বিলাতের রাজাও আজ নামে মাত্র রাজা। বিলাতী রাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে "স্বরাজ"—কিন্তু কাগজে-কলমে ইংরেজেরা খুব রাজভক্ত। এইরূপ হাতপা-বাঁধা রাজার শাসনই অন্যান্য দেশেও চলিতেছে।

রাজায় প্রজায় দর-কষাকষির দৃষ্টান্ত এশিয়াবাসীর ইতিহাসে আছে কি? বোধ হয় নাই। থাকিলেও লোকেরা তাহা জানে না। এইজন্যই ইয়োরামেরিকানেরা বলিয়া থাকে—"এশিয়ার হাড়ে স্বরাজ পোষাইবে না।" এইখানে স্বরাজশব্দের অর্থ খাঁটি প্রজাতন্ত্রও হইতে পারে অথবা তাহার

লাগালাগি বিলাতী রাজতন্ত্রের অনুরূপ শাসনপ্রণালীও হইতে পারে। বিলাতী শাসনপ্রণালী জাপানীরা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আর ফরাসীদের পূরা স্বরাজ চীনারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তুরস্ক ও পারশ্যের ব্যবস্থায় এখনও গোঁজামিল চলিতেছে। এশিয়ায় স্বরাজ বা স্বরাজের লাগালাগি শাসনপ্রণালী লাগিবে কি না তাহার পরীক্ষা সবে মাত্র সুরু হইয়াছে। এশিয়াবাসী বলিতেছেন—"লাগিবে।"

আমি বলিতে চাই—"প্রজাতন্ত্রেও গুড় মাখানো নাই—রাজতন্ত্রেও বিষ মাখানো নাই। রাষ্ট্রশাসনে আবশ্যক গুণ বা শক্তি। "অ্যারিষ্ট-ক্রেসি" অর্থাৎ গুণতন্ত্র বা শক্তিতন্ত্রই আদর্শ শাসনপ্রণালী। জগতে চিরকাল এই শক্তিতন্ত্রই চলিয়া আসিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহার আকার ও নামকরণ বিভিন্ন হইয়াছে। এশিয়াবাসীও শক্তিতন্ত্র অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে ভুনিয়ায় শক্তিতন্ত্রের নবরূপ বিকশিত হইয়াছে। তাহার নজির অ্যারিষ্টটল-সংহিতায়ও নাই—ম্যাকিয়া-ভেলির গ্রন্থেও নাই;—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও নাই—কৌটিল্য-নীতিতেও নাই;—কন্‌ফিউশিয় সংহিতায়ও নাই—চাওলি গ্রন্থেও নাই;—আইনী আকবরীতেও নাই—সৈয়র. মোতাক্ষরীণেও নাই। জগতের সকলের পক্ষেই ইহা নূতন। ইয়োরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কু-শাসন, কু-নীতি, অত্যাচার, অবিচার, যথেচ্ছশাসন এবং প্রজাশক্তির অধোগতি চূড়ান্ত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই, ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ, প্রশিয়ার ফ্রেড্‌রিক, অষ্ট্রীয়ার হ্যাবসবুর্গরাজগণ, রুশিয়ার পিটার ও ক্যাথেরিণ—ইঁহারা সকলেই যথেচ্ছাচারের অবতার। ইঁহারা কেহ কেহ প্রকৃতিপুঞ্জের "মা বাপ" ছিলেন সত্য, সেই সকল "স্বদেশ-সেবক" কর্ত্তব্যপরায়ণ নরপতিকে "এন্‌লাইটেণ্ড্ ডেস্পট" অর্থাৎ "উন্নতিনিষ্ঠ সম্রাট্" বা "যথেচ্ছাচারী প্রকৃতি-রঞ্জক" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরাজতন্ত্র অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র তাঁহাদেরও

চক্ষুশূল ছিল। তাঁহারা রাষ্ট্রশাসনে প্রজার অধিকার একচুলও স্বীকার করিতেন না। এই অবস্থা হইতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন শক্তিতন্ত্রের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। তাহা হইলে এশিয়ায় হইতে পারিবে না কেন? পাশ্চাত্যেরা বলিবেন—"কিন্তু ফরাসী ও ইয়াঙ্কিদের চরম স্বরাজতত্ত্ব এশিয়ার জলবায়ুতে বাঁচিবে কি?" জবাব—"ফরাসী ও ইয়াঙ্কি স্বরাজ ইয়োরোপেও বাঁচিতে পারে না এইরূপ মত প্রথম প্রথম প্রচারিত হয় নাই কি? স্বরাজকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ইয়োরোপীয় রাজারা যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮১৫ সালের ধর্ম্ম-সম্মিলন" স্বরাজ-নির্য্যাতনের কল-বিশেষ। তথাপি স্বরাজ মরে নাই এবং ১৮৩০, ১৮৪৮ এবং ১৮৭০ সালের ঘটনায় স্বরাজের মূলমন্ত্রগুলি ইয়োরোপীয় নরপতিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এশিয়ান স্বরাজের ভবিষ্যৎ এখনই বিচার করিতে বসা বেকুবি।"

বিংশ শতাব্দীর অতি-পণ্ডিতগণ চীনাদিগকে বে-আক্কেল বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—"চীনারা স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্রের জন্য এত পাগল হইল কেন? ইহাদের সমাজে অশিক্ষিত, মূর্খ এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যধিক। যে দেশের জন সাধারণ লেখা পড়া জানে না সে দেশে স্বরাজ আকাশকুসুম মাত্র।" ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সেরও ঠিক এই অবস্থাই ছিল। তখন ফ্রান্সে দৈনিক সংবাদপত্র কয়খানা ছিল? লোকশিক্ষা, মাস্-এডুকেশন্, কম্পাল্সরি ফ্রী-এডুকেশন, বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষানীতি, ইত্যাদি তত্ত্ব তখন ফ্রান্সে কেন, ইয়োরোপের কোন দেশেই জানা ছিল না। কি ইংল্যাণ্ড, কি জার্ম্মাণি, কি আমেরিকা সর্ব্বত্রই জনসাধারণ অশিক্ষিত ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও আজকালকার সুপরিচিত শিক্ষাবিস্তার-নীতি জানা ছিল না। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

অর্থাৎ মাত্র ৫০।৬০ বৎসর হইল ছুনিয়ায় "লোকশিক্ষা"র আয়োজন স্থরু হইয়াছে। ফরাসীরা মূর্খ, নাম সহি করিতে অসমর্থ এবং কুসংস্কারপূর্ণ লোকজন লইয়াই বিপ্লব স্থরু করিয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ইত্যাদির আলোচনা বিপ্লববাদীরাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা এই সকল সংস্কারের জন্য বসিয়া থাকেন নাই।

অধিকন্তু, ফরাসী বিপ্লবের কর্ত্তারা সকলেই "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, শান্তিরাম সিং" ছিলেন। তখন ফরাসী রাজকোষে এক দাম্ড়িও ছিল না। ফ্রান্স রাষ্ট্র দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। সরকারী মালখানা লুটিয়া বিপ্লব-প্রবর্ত্তকগণ এক আধ্লাও পান নাই। এদিকে দেশভরা তখন ছুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। দরিদ্র জনগণ অন্নের জন্য দোকান বাজার সহর পল্লী উত্তম্ পুস্তম্ করিতেছিল। তাহার উপর প্রশিয়া এবং অষ্ট্রীয়ার রাজারা বিপ্লব-পন্থিগণকে জব্দ করিবার জন্য সসৈন্যে ফ্রান্স আক্রমণ করিতেছিলেন। বিপ্লবওয়ালাদিগের অবস্থা একদিকে "অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ," অপর দিকে সমর-শিক্ষার অভাব। একজনও পাকা নামজাদা সেনাপতি তাঁহাদের ছিল না। তাড়া হুড়া করিয়া ভলান্টিয়ার সংগ্রহ হইতে থাকিল। চব্বিশ বৎসরের ছোকরা "অজ্ঞাতকুলশীল" নেপোলিয়ান মুরুব্বি হইলেন। আরও কয়েকজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নেপোলিয়ানের সহযোগী হইলেন। সমর-বিদ্যায় কাহারও 'হাতে খড়ি' পর্য্যন্ত হয় নাই! বিপ্লবপন্থীরা বে-আক্কেলের মতন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। বুক ঠুকিয়া তাহারা ছুনিয়াকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। এমন কি, তাহারা প্রচার করিতে থাকিল—"আমরা ছুনিয়ার সর্ব্বত্র রাজবংশের ধ্বংসসাধন করিব। বিশ্ববাসী আমাদের সাহায্যে স্বরাজ লাভ করিবে।" অথচ তখন কর্ম্মকর্ত্তারা জীবনে প্রথম অস্ত্রধারণ করিতেছেন। জুর্দো পরে নামজাদা হন। তিনি ছিলেন মুদী। সেনাপতি মুরা ছিলেন বাবর্চি, আর মোরো ব্রিটানী প্রদেশে উকীলী

করিতেন। দেশের মাটি হইতে ইঁহারা উত্থিত হন—ঘটনাচক্রে কার্য্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

কাজেই সুন্-পন্থীরা বলিতে পারেন—"আমরাও চীনে বেশী বেকুবি আর কি করিতেছি? তোমরা পাশ্চাত্যজগতের ফরাসীবিপ্লব লইয়া বড়াই করিয়া থাক। আমাদের সকল দুর্ব্বলতাই তাহার ধুরন্ধরগণের ছিল। তবে তাহারা ছিল মাত্র আড়াই কোটি, আমরা চল্লিশ কোটি এই যা প্রভেদ। ফরাসীবিপ্লবের কথাগুলি স্মরণ কর,—চীনাদের বেকুবি দেখিয়া লজ্জিত হইবে না। ফরাসীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যাহা করিয়াছে আমরা এশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তাহাই করিতেছি। এই সকল বিষয়ে এশিয়া তোমাদের মুল্লুক হইতে এক শতাব্দী পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহাতে কি আসে যায়?" রক্তমাংসের মানুষ সর্ব্বত্রই এক। এশিয়াবাসীর চরিত্র, বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান বিচার করিবার সময়ে মাপ-কাঠি অন্যায়রূপে লম্বা করা উচিত নয়। যে নজরে পাশ্চাত্যের বিচার হইয়া থাকে সেই নজরেই প্রাচ্যেরও বিচার হউক। নিরপেক্ষভাবে কষ্টিপাথর ব্যবহার করিলে প্রাচ্যনরনারীকে সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যের মর্য্যাদা দিতে হইবে। পাশ্চাত্যেরা এইরূপ নিরপেক্ষ সমালোচনার ধার ধারেন না। তাঁহারা প্রাচ্যকে বেকুব চরিত্রহীন এবং নির্ব্বোধ সপ্রমাণ করিতেই চেষ্টিত। বর্ত্তমানযুগের এশিয়াবাসীও সাময়িক অকৃতকার্য্যতার ফলে নিরপেক্ষ বিচার প্রয়োগ করিতে অসমর্থ।

(১৩) য়ুয়ান্ শি-কাইয়ের মৃত্যু

আজ (৭ই জুন ১৯১৬) খবর পাওয়া গেল প্রেসিডেন্ট য়ুয়ানের মৃত্যু হইয়াছে। গত কল্য সকাল দশটার সময়ে তিনি মারা পড়িয়াছেন। এ কয়দিন পিকিঙ্ হইতে গুজব রটিতেছে যে, য়ুয়ান্ বিষ খাইয়াছেন

অথবা য়ুয়ানকে বিষ খাওয়ান হইয়াছে, এবং তাঁহার বাঁচা মরা দু এক-দিনের কথা। এক্ষণে লোকেরা বলিতেছে, য়ুয়ানের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে। আত্মহত্যা অথবা শত্রুর দুষ্মণি ইহাতে নাই। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি বিশ্বাস করুক।

য়ুয়ানের বয়স এক্ষণে ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। য়ুয়ান বর্ত্তমান চীনের নাম-জাদা লোকগণের মধ্যে অন্যতম। প্রেসিডেণ্ট না হইলেও য়ুয়ান্‌কে চীনা-সমাজে উচ্চ আসন দেওয়া হইত। মাঞ্চু আমলে য়ুয়ান্ ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম পদে কর্ম্ম করিয়াছেন। সেনাবিভাগের কাজে তাঁহার প্রতিপত্তি বেশী ছিল। ইনি কিছুকালের জন্য কোরিয়া প্রদেশে চীন-সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেই সময়ে কোরিয়া স্বাধীন ছিল। বস্তুতঃ চীন, রুষিয়া ও জাপানের চাপে পড়িয়া কোরিয়ার প্রাণ যায় যায় হইতেছিল। সেই সময়ে জাপানী দূতের সঙ্গে য়ুয়ানের ঠোকাঠুকি প্রায়ই হইত। তখন হইতে য়ুয়ান্ জাপান-বিদ্বেষী এবং জাপানীরা য়ুয়ান্‌কে চক্ষুশূলভাবে দেখিয়া আসিতেছে। এই হিসাবে য়ুয়ান্ চীনের স্বদেশ-সেবক।

কিন্তু আর এক হিসাবে য়ুয়ান্ চীনাদের স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ বিবেচিত হন। সম্রাট্ কোয়াঙ্‌ ভাবুক কাঙের পরামর্শে দেশ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। য়ুয়ান্ এই সংস্কারের আন্দোলনে "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" বন্ধু হন। পরে য়ুয়ানের কুচক্রে বুড়ী মহারাণী কোয়াঙ্‌কে একপ্রকার রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করেন, কাঙ্‌কে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য করেন এবং সংস্কারের আন্দোলন সমূলে উৎপাটিত করেন। এই ঘটনা ১৮৯৮ সালের কথা। তখন হইতে য়ুয়ান্ যুবক চীনের চক্ষুশূল রহিয়াছেন।

তাহার ১৩ বৎসর পর যুবক চীন বিপ্লব প্রবর্ত্তন করিল। মাঞ্চুরা য়ুয়ান্‌কে বন্ধুভাবে পরামর্শদাতা স্থির করিলেন। য়ুয়ান্ সুনের দলের

সঙ্গে দর-কষাকষি করিতে থাকিলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল মাঞ্চুবংশ রাখা হইবে না। তবে রাজবংশের খোরপোষ নবপ্রতিষ্ঠিত স্বরাজ হইতেই দেওয়া হইবে—রাজপরিবারের কাহারও গায়ে হাত দেওয়া হইবে না। য়ুয়ানের মধ্যস্থতায়ই বোধ হয় মাঞ্চুপরিবার ধনে প্রাণে বাঁচিলেন। এদিকে বিনা রক্তপাতে সুনের বিপ্লব সফলতা লাভ করিল!

য়ুয়ান্ মাঞ্চুদের উপকার করিলেন। আবার সুন্‌পন্থীরাও য়ুয়ান্‌কেই মুরুব্বি ঠিক করিল। সংস্কার-বিরোধী, কাঙ্-কোয়াঙের শত্রু য়ুয়ান্ বিপ্লবপ্রবর্ত্তক সুনের চিন্তায় স্বরাজের যোগ্য নেতা বিবেচিত হইলেন। বিপ্লব সুরু করিবার পর কয়েক দিনের জন্য সুন্ স্বরাজের প্রেসিডেণ্ট হন। পরে সকলে মিলিয়া য়ুয়ান্‌কে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিল। এইখানেই য়ুয়ানের ক্ষমতার পরিচয়। য়ুয়ান্‌কে বাদ দিয়া কোন কাজ হইবার জো নাই। য়ুয়ানের শক্তি না থাকিলে সুন্ তাঁহারই হাতে স্বরাজের ভার দিতে রাজি হইতেন কি? এইখানেই আবার সুনেরও অর্থাৎ গোটা বিপ্লবেরই দুর্ব্বলতা দেখিতেছি। বিপ্লব চালাইবার ক্ষমতা বিপ্লবপন্থীদিগের নাই! এই কারণে মাঞ্চু-দ্রোহী স্বরাজ-সেবকের দল মাঞ্চু-বন্ধু সংস্কার-বিরোধীকে স্বরাজের কর্ত্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

য়ুয়ান্ নেপোলিয়ান নন। য়ুয়ানের মাথায় লম্বাচৌড়া চিন্তা গিজ্ গিজ করিত না। য়ুয়ানের কর্ম্মতৎপরতা ছিল—কিন্তু তাহা কখনও অসমসাহসিকতার আকার গ্রহণ করে নাই। কিন্তু "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" য়ুয়ানের সমান করিতকর্ম্মা বা মাথাওয়ালা লোক ১৯১১ সালে গোটা চীনে এক জনও বোধ হয় ছিলেন না। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই ছিলেন না। মাঞ্চুরা হঠিল—কিন্তু যাহারা তাঁহাদিগকে হঠাইল, তাহাদের মধ্যে কেহই রাষ্ট্রের কর্ত্তা হইতে সাহসী হইলেন না। ফাঁকতালে য়ুয়ান্ দেশে "একমেবাদ্বিতীয়ং"

হইয়া পড়িলেন। য়ুয়ানের কপাল ভাল। সীজার ক্রমওয়েল নেপোলিয়ানের প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও য়ুয়ান তাঁহাদের মতনই স্বসমাজে কর্ত্তামি করিবার সুযোগ পাইলেন।

স্বরাজের প্রেসিডেন্ট হইবামাত্রই য়ুয়ান্ তাঁহার নিজমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। পার্ল্যামেণ্টের মতামত গ্রহণ না করিয়াই তিনি বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকা ধার লইলেন। এত বড় বে-আইনি কাজ গণতন্ত্রে কেন, আজকালকার রাজতন্ত্রেও অসম্ভব। এই কাণ্ডে স্বরাজ-সেবকগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। ১৯১৩ সালে তাহারা য়ুয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ইহাই চীনের দ্বিতীয় বিপ্লব। য়ুয়ান্ অতি সহজেই এই বিপ্লব কাবু করিলেন। সুন্, হোয়াঙ্ ইত্যাদি ধুরন্ধরগণ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাহার পর পার্ল্যামেণ্ট তুলিয়া দেওয়া হইল—এবং একে একে য়ুয়ান্ খাঁটি রাজা হইয়া বসিলেন। কেবল নামে রাজা হইবার বাকী ছিল। তাহার ব্যবস্থাও সে দিন তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে স্বরাজের কর্ত্তারা যে যে উপায়ে রাজবংশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, য়ুয়ানও ঠিক সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং য়ুয়ানের কাণ্ডকারখানায় বিস্মিত হইবার কারণ নাই। দ্বিতীয় ফরাসী স্বরাজের (১৮৪৮-৫২) সভাপতি লুই-নেপোলিয়ানের চরিত্র অবিকল এইরূপ ছিল। তিনি দ্বিতীয় নেপোলিয়ান্ নামে নব সম্রাট্ হন (১৮৫২-৭০)।

চীনারা য়ুয়ানের অতিবৃদ্ধি সহ্য করিল না। তাই তৃতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত। য়ুয়ানেরও অর্থাভাব এবং গোলাবারুদের অভাব, আর বিপ্লব-পক্ষীয়গণেরও অর্থাভাব এবং গোলাবারুদের অভাব। কাজেই দু-এক মাস সামনা-সামনি লড়াই হইতে না হইতেই যুদ্ধের বাজনা থামিয়া গেল। মাস দেড়েক ধরিয়া দুই পক্ষে কথা কাটাকাটি চলিতেছে। অবশ্য য়ুয়ান্ সম্রাট্ হইবার সঙ্কল্প অনেক দিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজকাল তর্ক

চলিতেছিল—য়ুয়ান্‌কে স্বরাজের সভাপতিত্ব হইতে তাড়ান হইবে কি না? যাহা হউক তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য চীনাদের আর মাথা ঘামাইতে হইবে না। আজ হইতে য়ুয়ান্‌-হীন চীনে স্বরাজ স্বাধীনপথে চলিতে পারিবে। দেখা যাউক স্বরাজ-সেবকগণ কোন্ পথে চলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী ভরিয়া ইয়োরোপে "মাৎস্য-ন্যায়" চলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া ভারতেও মাৎস্য-ন্যায় চলিয়াছিল। এই দুই মাৎস্য-ন্যায়ের রফা হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৮৫৮ সালে বৃটিশ ভারত নিষ্কণ্টক হইয়াছে—১৮৭০ সালে নবীন জার্ম্মাণি, নবীন ইতালী, নবীন ফ্রান্স, নবীন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারি এবং নবীন আমেরিকার জন্ম হইয়াছে। চীনে সেই মাৎস্য-ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরু হইয়াছে। "তাই-পিঙ্" বিপ্লব (১৮৫০-৬৪) হইতেই মাঞ্চু বংশের সিংহাসন টলিয়াছিল—পাঁচ বৎসর হইল মাঞ্চুবংশকে ধ্বংসও করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের ১৮৫৮ অথবা ইয়োরামেরিকার ১৮৭০ চীনে এখনও আসে নাই। চীনা মাৎস্য-ন্যায়ের রফা অর্থাৎ হেস্তনেস্ত কত দিনে হইবে কে জানে?

য়ুয়ান্ গেলেন—ইহাতেই কি চীনের তৃতীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব থামিয়া যাইবে? মানব-চরিত্রের বিজ্ঞান বলিতেছে—"না"। দুনিয়ার ইতিহাস বলিতেছে—"না"। হয় ত দু এক দিনের ভিতরই শুনিব—চীনা বিপ্লবওয়ালারা দলাদলি সুরু করিয়াছে। হয় ত এই দল, পাকাইবার আন্দোলনে স্বার্থান্ধ জননায়কও আছেন, আবার নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবকও আছেন, আবার বিদেশীয় কুচক্রীদিগের অঙ্গুলি-সঙ্কেতও আছে। অমনি হয় ত পাশ্চাত্যেরা বলিতে থাকিবেন—"এশিয়ার লোকেরা স্বাধীনভাবে স্বদেশের শাসনকার্য্য চালাইতে অসমর্থ। ইহারা গোলামের জাতি—পরাধীনতা এবং পরকীয় শাসনই এশিয়াবাসীর একমাত্র দাওয়াই।" হয় ত অমনি এক দল বিদেশী "চীন-বন্ধু" সুর ধরিবেন—"জাপানই এশিয়ার একমাত্র শত্রু।

চীনাদের সর্ব্বনাশ জাপানীরা করিল। পাশ্চাত্যেরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে চায়। কিন্তু জাপানই চীনের ভাগবাটোয়ারার সুযোগ খুজিতেছে।” ইত্যাদি।

দুনিয়ার হালচাল বুঝিবার জন্য একটা কাল্পনিক “সত্য-যুগে”র স্বপ্ন দেখা অনাবশ্যক। মানব চরিত্র বুঝিবার জন্য রামায়ণ মহাভারত বাইবেল গীতা কোরাণের “আদর্শ” এবং “কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য” নির্দ্দেশ অথবা দার্শনিক-গণের গবেষণা ঘাঁটিতে যাওয়া সময় নষ্ট করা মাত্র। পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই মানব-চরিত্রের, মানব দর্শনের এবং মানবাদর্শের একমাত্র সাক্ষী। অতএব বর্ত্তমান জগৎকে বুঝিবার জন্য এবং ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ফিলজফি-ক্লাশের বক্তৃতা, ধর্ম্ম-প্রচারকগণের বাঁধিগৎ এবং সাহিত্যে নিবদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীপুরুষের মুখরোচক কাহিনী লইয়া মাতামাতি করা নিষ্প্রয়োজন। এই গুলিকে বাজে মালরূপে “দূরাদস্পর্শনং বরম্” বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ১৭৮৯ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত আশী বৎসরের ইয়োরামেরিকান ইতিহাসকেই মানব-জাতির গীতা পুরাণ বাইবেল ও কোরাণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই ইতিহাসে যাহা নাই, মানব-চরিত্রে তাহা নাই—মানব চরিত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, এই ইতিহাসে তাহা আছেই আছে। মানুষ যদি দেবতা হয়, তাহার পরিচয় এই ইতিহাসে পাইব—আবার মানুষ যদি জানোয়ার হয়, তাহার পরিচয়ও এই ইতিহাসেই পাইব। ভবিষ্যপন্থী বর্ত্তমান-নিষ্ঠ ব্যক্তিকে অন্য কোন দর্শন বা বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া মানবতত্ত্ব বুঝিতে হইবে না।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্য চীনের সকল কথাই এই আশী বৎসরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। চীনারা দলাদলি কেন করিবে না? ইতালীয় স্বদেশ-সেবক স্বরাজভক্ত ম্যাট্‌সিনির নামডাক খুবই বেশী। ইনি ১৮০৫ হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা এবং ঐক্যপ্রতিষ্ঠা তাঁহার

জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল। এই জন্য পঁচিশ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে চিরপ্রবাসী থাকিতে হয়। তাঁহার বক্তৃতা ও লেখার জোরে ইতালীর বিভিন্ন স্বস্বপ্রধান রাষ্ট্রের জনগণ দেশ-সেবাকে ধর্ম্মভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনিকে যুবক ইতালীর যীশুখৃষ্ট বলিলেও দোষ হইত না। অথচ এই ম্যাট্‌সিনি এক দিনের জন্যেও কোনো দেশ-নায়কের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ম্যাট্‌সিনির কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে অন্যান্য স্বদেশ-সেবকগণের কার্য্যপ্রণালী একদম বনিত না। এমন কি ইনি সকলের সঙ্গে ঝগড়া ও শত্রুতা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। একে দেশটাই নানা টুক্‌রায় বিভক্ত—প্রত্যেক টুকরায় নানা রাষ্ট্রীয় দল—তাহার উপর এই স্বদেশ-সেবকগণের দলাদলিও প্রচুর। অথচ সমগ্র ইতালী জনপদের লোকসংখ্যা দুই কোটিরও কম ছিল। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—"ম্যাট্‌সিনির কীর্ত্তি বেশী কি অকীর্ত্তি বেশী?" অতীত ইতিহাসের দিকে নজর দিয়া বর্ত্তমানের লোক আমরা বুঝিতেছি যে, ম্যাট্‌সিনি আগা গোড়া ভুল করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনির প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালী বেকুবির দৃষ্টান্ত ছিল—ম্যাট্‌সিনি অনেক সময়ে দেশের শত্রুতাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ ম্যাট্‌সিনি রাষ্ট্রনীতির অ আ ক খ পর্য্যন্ত জানিতেন কি না সন্দেহ। এক ম্যাট্‌সিনির দৃষ্টান্তেই মানব-চরিত্র স্পষ্ট বুঝা যায়—কেন না আদর্শ প্রচারে ম্যাট্‌সিনি যত বড় তত বড় লোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কেহ জন্মেন নাই। জার্ম্মাণ ফিখ্‌টে, ইংরেজ কার্লাইল, ইয়াঙ্কি হুইট্‌ম্যান অথবা রুষ টলষ্টয় ইঁহারা কেহই ম্যাট্‌সিনিকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিবেন না।

চারিদিকে দেশের শত্রু—দেশের ভিতরে অসংখ্য দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার—তথাপি স্বদেশসেবকগণ দলাদলি ছাড়িতেছেন না। এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাস হইতে কোন দিন যাইবে না। রক্তমাংসের মানুষ সম্বন্ধে এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়াই ইতিহাসের আগামী অধ্যায়গুলি

কল্পনা করিতে হইবে। ইতালীর অবস্থা এইরূপ ছিল—অথচ ঘটনাচক্রে ইতালী কি দাঁড়াইল? মুখ্যতঃ কোনো স্বদেশসেবকের চেষ্টায় ইতালী বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের পাকচক্রে নবীন ইতালীর জন্ম হইয়াছে। এই পাকচক্রগুলি মানবসমাজের মজার জিনিষ। ঠিক এইরূপেই নবীন জার্ম্মাণিও দেখা দিয়াছেন। স্বদেশ-সেবকগণের অদূরদর্শিতা এবং দলাদলি জার্ম্মাণ সমাজে অত্যধিক ছিল—হাঙ্গারি এবং অষ্ট্রীয়ার শ্লাভ-প্রদেশেও অত্যধিক ছিল। রক্তমাংসের মানুষ কোথাও দেবতা নয়—তাহা হইলে মানবজাতির ইতিহাস রচিত হইত না। হয় পৃথিবী পচিয়া যাইত, না হয় পৃথিবী স্বর্গ হইত অর্থাৎ পৃথিবীর কোন মূল্যই থাকিত না। কাজেই স্বার্থপরতা, একগুঁয়েমি, "হাম্‌বড়া" ভাব, দলাদলি এবং পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি দেখিয়া বর্ত্তমান যুগের মানুষ ভয় পায় না। ভয় পায় বোধ হয় এক নিষ্কর্ম্মা লোকেরা!

ইয়োরোপীয়েরা এক কোটি, দেড় কোটি, দুই কোটি, আড়াই কোটি লোক সামলাইতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছিল। চীনারা চল্লিশ কোটি—ব্যাপার সহজ নয়। চীনকে ভাঙ্গিয়া যদি চীনারা বিশটা ছোট বড় মাঝারি রাষ্ট্র গড়ে, তাহাতেও এশিয়াবাসীর লজ্জিত হইবার কারণ নাই। আর যদি বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়াই চীনারা দলাদলি করিতে থাকে, তাহাতেও মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।

রামা যাহাকে দেশের হিতৈষী বিবেচনা করে, শ্যামা তাহাকে দেশের শত্রু বিবেচনা করে। আবার শ্যামার চিন্তায় যে ব্যক্তি স্বদেশসেবক, রামার চিন্তায় সেই ব্যক্তি স্বদেশদ্রোহী। কাজেই রামার পেটোয়ায় আর শ্যামার পেটোয়ায় দলাদলি ও লাঠালাঠি চলিবে না কেন? আর এই দলাদলি ও লাঠালাঠি হইতেই বিশ্বাসঘাতকতা দেশবৈরিতা ইত্যাদি আসিয়া জুটে। দুনিয়ার প্রত্যেক আন্দোলনেই এই সকল কম বেশী দেখা যায়। দেশ বা

সমাজ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইজারা নয়। সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতাও কোন মাথার একচেটিয়া নয়। কাজেই যাহার মাথায় কিছু ঘী আছে সেই দল পুরু করিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় বাধা দিবে কে? আর বাধা দেওয়াটাই দলাদলি। যে কোন ঘটনার ইতিহাসেই ইহার সাক্ষ্য পাইব।

বিলাতী রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা মনে নাই কার? সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ-সমাজে দলাদলি কম ছিল কি? আজ যিনি গরম দলের লোক কাল তাঁহাকে নরমদলের সামিল বিবেচনা করা হইতেছে। তখন নরম গরমের নূতন দল তৈয়ারি হইল। আবার এই দলবিভাগও একদিনের মধ্যেই বাতিল হইয়া গেল। পরন্তু আবার নূতন দল সৃষ্টি হইল। ধর্ম্ম-ব্যবস্থা লইয়া এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা লইয়া ইংরেজসমাজে এইরূপ ঘটিয়াছে। ফরাসীজাতির আশী বৎসর (১৭৮৯-১৮৭০)ও এই ধরণের দলাদলিতে ভরা। বিলাতীসমাজে যেরূপ দলাদলি, দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা দেখা গিয়াছে, ফরাসী-সমাজেও ঠিক সেইরূপ দেখা গিয়াছে। ফরাসী-জাতির আড়াই কোটি লোক সকলেই স্বদেশসেবক ছিল না। স্বদেশের শত্রুতা আচরণ অনেক ফরাসীই করিয়াছিল। অধিকন্তু স্বদেশসেবকগণের ভিতরে রোজ রোজ দলাদলি নূতন আকার গ্রহণ করিয়াছে। আজ যে ব্যক্তি নং ১ স্বদেশসেবক কাল তিনি স্বদেশদ্রোহী সাব্যস্ত হইয়া ফাঁসী কাঠে ঝুলিলেন। কোন কাজেই দেশশুদ্ধ লোক একমতাবলম্বী হইতে পারে না। নিতান্ত নিঃস্বার্থ লোকেরাও অনেক সময়ে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অসমর্থ হয়। ইহা পরিতাপের বিষয় কিনা জানি না,—মানবচরিত্র এইরূপ।

১৭৮৯ সালের ৫মে তারিখে ষোড়শ লুইয়ের আদেশ অনুসারে ফরাসী মহাসমিতি "এষ্টেট্‌স্ জেনার্যালের" বৈঠক বসিল। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের পর এই সমিতির বৈঠক ফরাসীজাতি আর দেখে নাই। সভা বসিবামাত্র দলাদলি

সুরু হইল। জনসাধারণের দল অন্যান্য দলকে ছাইয়া ফেলিল। জনসাধারণের কর্ত্তা ছিলেন সীয়ে। ১৭ই জুন ফরাসী মহাসমিতি জনসাধারণের বৈঠকে পরিণত হইল। নাম হইল "ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি"। পাদ্রীর দল এবং জমিদারের দল জনসাধারণের দলে মিশিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু রাজা ও রাণী ভিতরে ভিতরে জনসাধারণের বিরুদ্ধে দল পাকাইতে থাকিলেন। পল্টনের সাহায্যে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলিকে কাবু করিবার ফন্দি চলিতে লাগিল। বেগতিক বুঝিয়া প্যারির রাস্তার গুণ্ডারা ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির সহায় হইল। ১৪ই জুলাই তারিখে বাস্তিয়ে নামক বিখ্যাত গারদটা ইহারা লুটিয়া ফেলিল। এই বাস্তিয়ে দুর্গ লুটের তিথি আজও ফরাসী-সমাজে উৎসবের তিথি। রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তি এই দিন সর্ব্বপ্রথম জয়লাভ করে। বাঙ্গালাদেশের ফরাসী চন্দননগরেও ১৪ই জুলাই তারিখে উৎসব হইয়া থাকে। লোকেরা তাহাকে "ফান্তা" বলিয়া জানে।

দেশে তিষ্ঠান কঠিন বিবেচনা করিয়া হাজার হাজার জমিদার ফ্রান্স ছাড়িয়া জার্ম্মাণির দিকে পলাইতে থাকিলেন। কেবল পলায়ন নয়— অষ্ট্রীয়া ও প্রশিয়ার নরপতিদ্বয়ের সাহায্যে ফরাসী জনসাধারণকে জব্দ করাই মতলব ছিল। ফরাসী-রাণী ছিলেন অষ্ট্রীয়ার রাজার ভগ্নী। তাঁহার গোপনীয় পরামর্শ অনুসারেই কোন কোন জমিদার বিদেশী রাজরাজড়াগণের শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ, ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির বিবেচনায় রাজা রাণী এবং পলাতক জমিদারবর্গ সকলেই দেশের শত্রু দাঁড়াইয়া গেলেন।

এদিকে সহরে গুণ্ডার পাল বাড়িয়াই চলিয়াছে। অধিকন্তু দেশময় দুর্ভিক্ষ। কাজেই মফঃস্বলের লোকেরা রাজধানীতে দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে। নগরের শান্তি রক্ষা করা দুঃসাধ্য। এইখানেও রাজার এবং

ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলিতে বিরোধ। রাজা চাহেন সরকারী ফৌজের সাহায্যে নগর শাসন করিতে। ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি তাহা মঞ্জুর করিলেন না। রাজধানীতে জনসাধারণের শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। নগর রক্ষার জন্য ভলান্টিয়ার নিযুক্ত হইল। ভলান্টিয়ারগণের কাপ্তেন হইলেন লাফায়েৎ। ইনি ইতিপূর্ব্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে ইয়াঙ্কিদের স্বেচ্ছাসেবক ভাবে লড়িয়া আসিয়াছেন। প্যারির দেখাদেখি অন্যান্য নগরেও জনসাধারণের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল। ২৬শে আগষ্ট "মানবের অধিকার" ঘোষণা করা হইল। জনসাধারণ অনেকটা শান্ত হইল।

কিন্তু রাজপক্ষীয়েরা ষড়যন্ত্র ছাড়িলেন না। প্যারির নিকটবর্ত্তী ভার্সাই নগরে রাজপ্রাসাদ। এইখানে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির বৈঠকও বসিয়াছিল। রাজা ও রাণীর দেশদ্রোহিতা জনগণের বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলিকে ডিঙ্গাইয়া প্যারির গুণ্ডারা রাজা ও রাণীকে ভার্সাই হইতে প্যারিতে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসিল। মহাসমিতির ক্ষমতা এতদিনে রাস্তার লোকের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে বলিলেই চলে। রাজা ও রাণী রাজধানীর প্রাসাদে নজরবন্দ হইয়া থাকিলেন। অ্যাসেম্বলি ও ভার্সাই হইতে রাজধানীতে আসিল।

গরমের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ এক্ষণে অ্যাসেম্বলিকেও বাতিল বিবেচনা করিতে সুরু করিয়াছে। রাস্তার লোকেরা "হাভাতে" দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী, এবং সহরের গুণ্ডার দল স্বদেশী বক্তাদের পাল্লায় পড়িয়া আদর্শ রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। নূতন নূতন খবরের কাগজ রোজ বাহির হইতেছে—ফ্রান্সে ইহার পূর্ব্বে "দৈনিক" সংবাদপত্র ছিল না। কাগজের সুর দিন দিন বাড়িতেছে—আর রাষ্ট্রীয় খোসগল্পের আড্ডায় এবং ক্লাবের মজলিশে নূতন নূতন ফরমায়েশ তৈয়ারি হইতেছে। ফলতঃ ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির উপর দেশের লোক বিশ্বাস হারাইয়াছে। ন্যাশন্যাল

অ্যাসেম্বলি রাষ্ট্রশাসনের নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে পাদ্রী এবং জমিদার ও রাজা সকলেরই ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণের একতিয়ার এই প্রস্তাবে যারপরনাই বাড়িয়া গেল। কিন্তু "দেশের লোক" বুঝিল—"অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণ বড় নরম মেজাজের লোক। ইঁহারা প্রজাতন্ত্রের উপযুক্ত সেবক নন। জনসাধারণের যথোচিত অধিকার প্রবর্ত্তন ইঁহাদের হাড়ে কুলাইবে না।'

প্রায় দুই বৎসর এক প্রকার শান্তিতেই কাটিল। এক ফাঁকে রাজা ও রাণী রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া জার্ম্মাণির দিকে যাইতেছিলেন। রাস্তায় তাঁহারা ধরা পড়েন। এইবার জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিল। বাক্যবীর দাঁতো গুণ্ডার দল ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলিকে বলিল "রাজা দেশের শত্রু। এই রাজার অধীনে দেশ-শাসন আর চলিতে পারে না। জনগণের স্বরাজ স্থাপিত হউক। তাহার জন্য নূতন শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করুন।" আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। ১৭৯১ সালের জুলাই মাস।

এদিকে অষ্ট্রীয়ার রাজা ইয়োরোপের অন্যান্য রাজার সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে সুরু করিলেন। ফরাসী জাতির অতি-বৃদ্ধি বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। তাঁহারা ২৭শে আগষ্ট তারিখে এইরূপ এক ইস্তাহারও জারি করিয়াছেন। ফ্রান্সের খবরের কাগজওয়ালারা এই সংবাদ প্রচার করিয়া জনগণকে ক্ষেপাইয়া তুলিল। তাহাদের পরামর্শে ফরাসী সরকার অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (২০শে এপ্রিল ১৭৯২)। রাস্তার লোকের কথা অনুসারেই ফ্রান্স শাসিত হইতেছে।

প্রসিয়ার ও অষ্ট্রীয়ার পল্টন ফরাসী রাজা ও রাণীর পক্ষে লড়িতে আসিতেছে। এই কথা শুনিয়া ফ্রান্সের মফঃস্বল হইতেও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য লোকজন প্রস্তুত হইতে থাকিল। মার্সেইয়ে নগরে

পাঁচ শত ভলান্টিয়ার স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে একদম রাজধানীতে আসিয়া হাজির। সেই গানটা "মার্সেইয়ে" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাজধানীর জনসাধারণ মফঃস্বলের জনসাধারণের সাহায্যে ফুলিয়া উঠিল। রাস্তার লোক, ভলান্টিয়ার এবং গুণ্ডার দলই এক্ষণে ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তা। দাঁতোর নেতৃত্বে এই দল উঠিতে বসিতে থাকিল। দাঁতোর সমান আর একজন চরমপন্থী জননায়কের নাম রোব্‌স্‌পিয়ার। ইঁহাদের উত্তেজনায় রাজতন্ত্র রদ করা হইল, স্বরাজ প্রবর্ত্তিত হইল (২২শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২)। রাজাকে হত্যা করা হইল (২১শে জানুয়ারী ১৭৯৩)।

ইয়োরোপের রাজারা ফরাসী দেশটাকে ভাগবাটোয়ারা করিবার প্রস্তাব তুলিলেন। চীনের বাটোয়ারা সম্বন্ধেও এই ধরণের প্রস্তাব অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। ফরাসী স্বরাজ বিদেশী শত্রুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ অধীর হইয়া পড়িল। অথচ ঠিক এই সময়ে দাঁতো রোব্‌সপিয়ারের কাণ্ডকারখানায় ফরাসীরা দলাদলি সুরু করিল। বস্তুতঃ মফঃস্বল ভরিয়া বিদ্রোহ দেখা দিল। পল্লীর কৃষকেরা, নগরের দোকানীরা সকলেই রাজধানীর কর্ত্তামিতে ক্ষেপিয়া গেল। দাঁতো ও রোব্‌স্‌পিয়ার বিদ্রোহ নিবারণের জন্য হাজার হাজার দোষী নির্দ্দোষ ফরাসীর মুণ্ডপাত করিলেন। রক্তগঙ্গাই বহিয়া গেল। এই জন্য এই দিন কয়টাকে "জুলুমের রাজ্যকাল" ("রেইন্ অব টেরার") বলা হইয়া থাকে। দাঁতো রোবস্‌পিয়ারেও বেশী দিন বনিল না। দাঁতোকে হত্যা করান হইল। রোবস্‌পিয়ার্ ফ্রান্সে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তাঁহার প্রতাপে বিশ্বাসঘাতক বা দেশবৈরী সন্দেহে হাজার হাজার লোকের প্রাণ গেল। শেষ পর্য্যন্ত রোব্‌স্‌পিয়ারের মস্তকও 'গিলোটিনে' চড়িল (২৪শে জুলাই ১৭৯৪)।

এত গণ্ডগোলের পরও জমীদারপক্ষীয় লোকেরা রাজতন্ত্র পুনরায়

স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন (৫ই অক্টোবর ১৭৯৫)। কাজেই আবার ঘরোয়া লড়াই। এইবার নেপোলিয়ান স্বরাজের দলে কর্ম্ম করিবার সুযোগ পান। ধনীর দলের বিদ্রোহ শীঘ্রই থামিয়া যায়। বিদ্রোহ নিবারণ করিবার প্রধান যশ নেপোলিয়ানের হইল। এখন হইতে ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের একচেটিয়া প্রভাব। অলোকসামান্য প্রতিভার বলে নেপোলিয়ান দলাদলি বন্ধ করিলেন। অধিকন্তু নেপোলিয়ানের বাহুবলে ফরাসী জাতি ইয়োরোপের উপর কর্তৃত্ব করিবার গৌরব ভোগ করিল। ১৮০৯-১০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানী সম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করে। অত বড় সাম্রাজ্য ইয়োরোপের ইতিহাসে (রোম ছাড়া) আর কখনও দেখা যায় নাই। এই গৌরবের উন্মাদনায় ফ্রান্সে দলাদলি মাথা তুলিবার অবসর পাইল না। গৌরব ও যশের কাজ যদি চীনারাও করিতে পারে, তাহা হইলে চীনে দলাদলি কমিয়া আসিবে—অন্ততঃ দলাদলির কুফল কোন লোকের নজরে পড়িবে না। সংসারে যশোলাভের প্রভাব এত বেশী।

সীয়ের কর্ত্তামি হইতে নেপোলিয়ানের আবির্ভাব পর্য্যন্ত মাত্র ছয় বৎসর। এই অল্পকালের ভিতর নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন ও হুজুগ দেখা গিয়াছে। নানা কৌশলে নেপোলিয়ানের তাঁবে ফরাসী দেশ ঐক্যবদ্ধ হইল। স্বরাজের পাণ্ডারা টুঁ শব্দও করিলেন না। অথচ ১৮০৮ হইতে ১৮১২ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান "ফরাসীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। নেপোলিয়ানের গোলামী করাও ফরাসীরা স্বরাজসেবাই বিবেচনা করিল। য়ুয়ান্ যদি নেপোলিয়ান হইতেন, তাহা হইলে চীনারাও য়ুয়ান্‌কে মাথায় করিয়া রাখিত। তাহার পর এক শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ফ্রান্সে আজকাল স্বরাজ চলিতেছে—কিন্তু আজও ফরাসীরা নেপোলিয়ানকে হৃদয়ের রাজা বিবেচনা করিয়া থাকে। নেপোলিয়ানী আমলের ফরাসী গৌরব আজও

ফরাসীর চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বরাজ, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, যথেচ্ছাচার, ডেস্পটিজম্—ইত্যাদি শব্দের সমালোচনায় মানুষ ... না। মানুষ চায় কীর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা, সংসারে অমরতা।

১৮১৫ সালে বিদেশী রাজারা পুরাতন বুর্বোঁ বংশের সন্তানকে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার নাম অষ্টাদশ লুই। দলাদলি আবার সুরু হইল। কয়েক দল হইল রাজতন্ত্রী—কয়েক দল হইল প্রজাতন্ত্রী। অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর (১৮৩৪) পর দশম চার্ল্‌স্ রাজা হন। ইনি প্রজার অধিকার এক প্রকার তুলিয়া দিলেন। জমিদার এবং পাদ্রীর দল আস্কারা পাইল। কিন্তু জনসাধারণের মুরুব্বি কাগজওয়ালারা ধুয়া ধরিলেন—"এই গবর্ণমেণ্ট বে-আইনি কাজ করিতেছেন। সুতরাং এই গবর্ণমেণ্টের হুকুম দেশের লোক তামিল করিতে বাধ্য নয়। ফ্রান্স এই জুলুম সহ্য করিবে না।" ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে রাস্তার লোকেরা রাজধানী দখল করিয়া বসিল। রাজা সপরিবারে বিলাতে পলায়ন করিলেন। বুর্বোঁ বংশের ইনিই শেষ রাজা।

বিজয়ী জনসাধারণ আর এক জন রাজাকে সিংহাসনে বসাইল। তাহারা স্বরাজের জন্য লালায়িত নয়! ইনি অর্লিয়াঁ জমিদার বংশের সন্তান। নাম লুই ফিলিপ। এই ব্যক্তির ধরণ ধারণ অনেকটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মতন ছিল। রাজার চা'লও তাঁহার ছিল না—অথবা খাঁটি জনসাধারণের নেতাও ইনি ছিলেন না। ব্যবসাদার, উকীল ইত্যাদি পদস্থ লোক জনের সঙ্গে লুই ফিলিপের "দহরম মহরম" ও বন্ধুত্ব ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে রাজতক্তে বসাইয়া ফরাসী জাতি শান্তি পাইল না। রাজতন্ত্রীদের চোখ টাটাইতে লাগিল। রাজতন্ত্রই যদি দেশের শাসন-প্রণালী থাকিবে, তবে বনিয়াদি বংশের সন্তানকেই রাজা করা হউক।

দিকে স্বরাজপন্থীরা ভাবিলেন—"এ কি হইল? দশম চার্লসকে
এক রাজার বদলে আর এক রাজা বসাইবার জন্য!
গেল, পেট ভরিল না?"

লুই ফিলিপের এক পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী জুটিলেন। তাঁহার নাম
। ইনি ফরাসী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। গীজো জবরদস্ত রাজতন্ত্রী।
বিলাতী হাত-পা-বাঁধা রাজার শাসন পছন্দ করিতেন না।
লুই বা নেপোলিয়ানের যথার্থ প্রভুত্ব রাজার থাকা উচিত। এইরূপ
গীজোর মত। গীজোর মন্ত্রণায় লুই ফিলিপ প্রজাশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান
তে সুরু করিলেন।

এই সময়ে জনসাধারণের চাঁই ছিলেন লুই ব্লাঁ। ইনি শ্রমজীবী-
স্বদের ধুরন্ধরী করিতেন। কুলী মজুরদিগের সুখস্বাস্থ্য ও বেতন
দ্ধির জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৭৮৯-১৮১৫ পে
খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বাষ্পচালিত কল-কারখানা-সমন্বিত শিল্প প্রবর্ত্তিত চের ছাঁদা
কাজেই কুলী-বিভ্রাট, শ্রমজীবি-সমস্যা
। এক হিসাবে স্বরাজপন্থীদিগের সুবিধাই
কিন্তু তাহার পর হইতেই ীন থাকিলে হয় তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইত—
সমস্যা নূতন আকার করিতে হইত। খুন করিলে স্বরাজপন্থীদিগের বিরুদ্ধে দুনিয়ার
কোপ দৃষ্টি কিছু বেশী পড়িত। আর য়ুয়ান্ নির্ব্বাসিত হইলে তিনি
বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারিতেন। তাহাতে
স্বরাজের কর্ত্তাদের পদে পদে বিব্রত হইতে হইত। য়ুয়ানের মৃত্যুতে
বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িবেন—এদিকে স্বরাজসেবকগণ
বিনা গণ্ডগোলে অনেক কাজ হাসিল করিতে সমর্থ হইবেন।

তবে চীন ত দুনিয়ায় একমাত্র দেশ নয়। চীনের বাহিরে সর্ব্বত্র নানা
গণ্ডগোল চলিতেছে। এই গণ্ডগোলের ভিতরে থাকিয়াই চীনাদের কার্য্য
উদ্ধার করিতে হইবে। গোটা এশিয়ার ভাগ্যের সঙ্গে চীনের ভাগ্য

গ্রথিত। বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের ফলাফলের উপর এই ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রের শেষপর্ব্ব এখনও বহু দূরে। কাজেই চীনের হেস্ত-নেস্ত অতি শীঘ্র দেখিতে পাইব না। হয়ত দু এক বৎসরের ভিতরই ইয়োরোপে লড়াইয়ের বাজনা থামিবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের জের চলিতেই থাকিবে। ইহা যে "বিংশ শতাব্দী"র কুরুক্ষেত্র।"
